ISSN 0976-9463

তবু একলব্য

২৬ বর্ষ • ২ সংখ্যা
ক্রমিক ৪৩

TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed & Refereed Research Journal
কলা ও মানববিদ্যা বিষয়ক গবেষণাধর্মী রেফার্ড
ও
পিয়ার-রিভিউড ত্রৈমাসিক পত্রিকা

৪৩

মঙ্গালকাব্য

বিশেষ সংখ্যা

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন
সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য গবেষণাকেন্দ্র

43

TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed & Refereed Research Journal
Volume 26, Issue 2
Number 43
Published July 2021 September
First Edition : February 2022
ISSN : 0976-9463

TABU EKALAVYA

Chief Advisor : Swami Shastrajnananda
Selina Hossin
Ramkumar Mukhopadhyay
Soma Bandyopadhyay
Sadhan Chattopadhyay
President : Biplab Majee
Vice-President : Tapan Mondal
Executive Editor : Sushil Saha
Editor : Debarati Mallik
Working Editor : Tapas Pal
Editor-in-Chief : Dipankar Mallik
e-mail : tabuekalavya@gmail.com
Website : www.tabuekalavya.in
facebook : তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা
group : তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ, দিয়া, দে বুক স্টোর (দীপু), পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, পাতাবাহার

মূল্য : ৫০০ টাকা

ISSN : 0976-9463

তবু একলব্য

TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed & Refereed Research Journal

সভাপতি
বিপ্লব মাজী

সহ-সভাপতি
তপন মণ্ডল

মুখ্য উপদেষ্টা
স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
সেলিনা হোসেন
রামকুমার মুখোপাধ্যায়
সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়
সাধন চট্টোপাধ্যায়

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সুশীল সাহা

যুগ্ম সম্পাদক
তাপস পাল

সম্পাদক
দেবারতি মল্লিক

মুখ্য সম্পাদক
দীপঙ্কর মল্লিক

কার্যকরী কমিটির সম্পাদক
মধুসূদন সাহা ও সোমালি চক্রবর্তী

আহ্বায়ক
বিদিশা সিন্‌হা, অঙ্কিতা মুখার্জী, রামকৃষ্ণ মণ্ডল

উপদেষ্টামণ্ডলী

পবিত্র সরকার, সমীর রক্ষিত, শ্রীনলিনী বেরা, অমর মিত্র, জয়া মিত্র, বাসব চৌধুরী, তপোধীর ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রততী চক্রবর্তী, বারিদ বরণ ঘোষ, সত্যবতী গিরি, শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ ঘোষ, শহীদ ইকবাল, দীপক রায়, উদয়চাঁদ দাশ, সুখেন বিশ্বাস, শুভময় মণ্ডল।

সম্পাদকমণ্ডলী

সোনালি মুখার্জি, সনৎকুমার নস্কর, মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়, মীর রেজাউল করিম, হোসনে আরা জলি, বরেন্দু মণ্ডল, অর্জুন সেনশর্মা, শামস্ আলদীন, শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, সোমা ভদ্র রায়, স্বাগতা দাস মোহান্ত, আশিস রায়, মণিশঙ্কর মণ্ডল, বরুণজ্যোতি চৌধুরী, শ্যামাচরণ মণ্ডল, রাধেশ্যাম সাহা, সুব্রত ঘোষ, শকুন্তলা দাস, বিদিশা সিন্‌হা, সুবীর সেন, অনিমেষ গোলদার, হৃষিতা গুপ্তবক্সী, প্রিয়ব্রত ঘোষাল, শুভঙ্কর রায়, অর্ণব সাধুখাঁ, প্রসেনজিৎ বিশ্বাস।

বিষয় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকমণ্ডলী

গোপা দত্ত ভৌমিক, অপর্ণা রায়, বেলা দাস, রমেন কুমার সর, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, অতনু শাশমল, শেখর সমাদ্দার, জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বতোষ চৌধুরী, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ রায়, সুমনা দাস শূর, নন্দিনী ব্যানার্জী, সুজিতকুমার পাল।

কার্যকরী কমিটি

পুষ্পেন্দু মজুমদার, দিব্যেন্দু পালধী, দীপক কুমার ঘোষ, অরুণাভ চক্রবর্তী, অস্মিতা মিত্র, বৈশাখী পাঠক, ঐন্দ্রিলা চক্রবর্ত্তী, সুদীপ্তা ঘোষ, পিয়ালী দাশগুপ্ত, মিলন সিংহ, মনসা ঘাঁটা, দীপ্ত সরদার, সৈকত মাহাত, অলোকদ্যুতি নন্দী, বাপ্পা প্রামাণিক, কাকলি মোদক, জ্যোতি বসাক, সুপ্রিয়া বারুই, স্বরূপ দত্ত।

সম্মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ঊর্বী মুখার্জী, মৌমিতা বিশ্বাস, সোমদত্তা ঘোষ, বিপ্লব সাহা, লিপিকা বিশ্বাস, গৌতম দাস, সুশান্ত মণ্ডল, সুভাষচন্দ্র দাস, শম্পা সিন্হা বসু, সুব্রত পুরকাইত, মমতা চক্রবর্তী, দীপঙ্কর মণ্ডল, বিপুলকুমার মণ্ডল, সুব্রতকুমার মান্না, রুম্পা দাস, জয় দাস, অর্পিতা দাস, সন্দীপকুমার রায়, মিহিরকুমার মণ্ডল, প্রসূন মাজী, স্বরাজ কুমার দাশ, গিরিধারী মণ্ডল, তমসা দত্ত, বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য, মাধবী সাহা, পায়েল সাহা, নবনীতা বসু, সৌরভ সামন্ত, মন্টু বিশ্বাস, মিঠু সাঁতরা, টিনা বসু, সাবির মণ্ডল, সুস্মিতা বণিক, অরিন্দম সরকার, সুদীপ্ত সামন্ত, দীপাঞ্জন দে, দেবদীপ দাস, অনিন্দিতা মুখার্জী চৌধুরী

সূ|চি|প|ত্র

রামেশ্বরের 'শিবায়ন' : দাম্পত্য জীবন/দীপঙ্কর মল্লিক

১

মুকুন্দের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যকে রামকুমারের 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' উপন্যাসে ফিরে দেখা/সংহিতা মাল

১১

রামেশ্বরের শিবায়ন : কৃষি ও কৃষক-বৈচিত্র্যময় বৈদিক উত্তরাধিকার/অজয় কুমার দাস

১৮

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল : অনুষঙ্গে অর্থনীতি/নিরু বর্মণ

৩১

মনসার আত্মসংকট/পিয়ালী চক্রবর্তী (দে)

৩৮

কবি দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গাল ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গাল : একটি তুলনামূলক আলোচনা/সৌমিত্র বাগ

৪৬

বণিক চন্দ্রধর ও ব্যাধ কালকেতু হতাশা-সংকট-প্রতিবাদ-সারল্য-সমর্পণ/সুষমা সেন

৫৩

বিপ্রদাস ও বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গাল কাব্যে মনসা : নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই/নাজনিন পারভিন

৫৯

ধর্মমঙ্গাল কাব্যে সমকালীন রাজনৈতিক চিত্র/নব্যেন্দু রায় চৌধুরী

৬৫

মধ্যযুগের বন্দর-নগরী সপ্তগ্রাম : মঙ্গলকাব্যের আলোকে/সুদীপ্ত দাস

৭৩

প্রাণরাম চক্রবর্তীর বিদ্যাসুন্দর ও অন্যান্য কবির
বিদ্যাসুন্দর : একটি তুলনামূলক আলোচনা/সায়ন্তন মণ্ডল

৮৪

মনসা এবং চণ্ডী : মধ্যযুগের দুই দেবী চরিত্রের তুলনা/সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

৯০

নাটকের প্রেক্ষিতে মনসামঙ্গল কাব্যের প্রসঙ্গ
বিশ শতকের চাঁদ সদাগরের নৌকা/মৌ চক্রবর্তী

৯৮

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সৃষ্টিকথা/কল্পনা রায়

১০৫

মঙ্গলকাব্যের সপ্তডিঙার পালে ভ্রমণকথার রসাভাস/চন্দনা চক্রবর্তী

১১১

ত্রিদোষ তত্ত্ব ও হিউমোর‍্যাল থিয়োরির প্রেক্ষিতে গোসানী-মঙ্গল/নীতীশ ঘোষ

১১৯

বেহুলা-কথা: মধ্যযুগের কাব্যধারা আধুনিক যুগের ছোটোগল্পে/বুদ্রজিৎ দাস ঠাকুর

১২৬

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব/সঞ্জীত বর্মন

১৩৬

ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গাল' কাব্যে পুরাণ প্রসঙ্গা/রত্নজ্যোতি নায়েক

১৪৩

অভয়ামঙ্গাল কাব্যে শ্রীমন্ত চরিত্র : স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র সৃষ্টি/অলি আচার্য

১৫৬

রবীন্দ্রোত্তর কবিতায় মনসামঙ্গাল ও চণ্ডীমঙ্গালের প্রভাব/পল্লবী সাহা

১৬২

শিকারি কালকেতু উচ্চবর্গের শিকার : যুগ বদলায়, ছবি বদলায় না/অনিরুদ্ধ বিশ্বাস

১৬৭

মনসামঙ্গল কাব্যের ধারায় লোকাচার/মনিহার খাতুন
১৭৩
মঙ্গালকাব্যে বাঙালির খাদ্যোপাচার ও খাদ্যসংস্কৃতি/গৌতম দাস
১৮৮
শব্দকুশলী কবি ভারতচন্দ্র/ভবেশ মজুমদার
১৯৭
কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য : সর্বনাম প্রয়োগের বৈচিত্র্য/প্রণবেশ ঘোষ
২০৫
মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গালে তৎকালীন নারীপৃথিবীর পরিচয়/সামিম হোসেন খান
২১৪
মনসামঙ্গল কাব্যে প্রতিফলিত সমাজে নারীর অবস্থান/সৌমিলি দেবনাথ
২২২
কবিকঙ্কণের ফুল্লরার বারোমাস্যা : পাঁচ শতাব্দী পূর্বের বাংলার
বৎসর পরিক্রমা/তাপস অধিকারী
২২৭
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গালে জীবিকা : একটি
অনুসন্ধানমূলক সমীক্ষা/সুমন দাস
২৩৩
মঙ্গালকাব্যে সেকেলে শিক্ষাব্যবস্থার ছবি
প্রসঙ্গা মনসামঙ্গাল/অরিতা ভৌমিক অধিকারী
২৪৯
দ্বিজ বংশীদাসের চাঁদ : স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানে/আস্তাইন বিল্লা
২৫৭
মঙ্গালকাব্যের চিত্রিত বণিক পরিবারে নারীর স্থান/গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬৪
বাইশ কবির অন্যতম জানকীনাথের পদ্মাপুরাণ
একটি বিহঙ্গা অবলোকন/নির্মল দাশ
২৭১

বাংলা মঙ্গলকাব্যের খাদ্যজগতে মধুররস : মিষ্টান্নশিল্প
ও মিষ্টান্নবিলাসের আখ্যান/প্রীতম গোস্বামী
২৭৭
আধুনিকের চর্চায় মনসামঙ্গাল/শর্মিষ্ঠা নিয়োগী
২৮৪
কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর নারী মনস্তত্ত্ব এবং নারী চরিত্রের আধুনিকতা
ও অভিনবত্ব/রাকিবুল হাসান বিশ্বাস
২৮৯
চৈতন্য চরণ পালের পদ্মাপুরাণ সংগ্রহ
আঞ্চলিক সংস্কৃতির আলোকে/বুবুল শর্মা
২৯৭

রামেশ্বরের ‘শিবায়ন’ : দাম্পত্য জীবন

দীপঙ্কর মল্লিক

‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থের ‘গ্রাম্যসাহিত্য’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাধাকৃষ্ণের গানকে বলেছেন ‘সৌন্দর্যের গান’। হরগৌরীর গানকে বলেছেন ‘সমাজের গান’। এই গানে প্রকাশিত হয়েছে ‘ছোটো বড়ো সমস্ত বিঘ্নের উপর দাম্পত্যের বিজয়কাহিনি।’ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত কালপর্বে রামকথা, কৃষ্ণকথার পাশাপাশি শিবকথাও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বলার বিষয় হলো এই, শিবকথা মনসামঙ্গল কাব্য, চণ্ডীমঙ্গলকাব্য কিংবা নাথ সাহিত্যে এলেও প্রথম বিস্তৃত আকারে শিল্পিত রূপ লাভ করেছে ‘শিবায়ন’ বা ‘শিব-সংকীর্তন’ কাব্যে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন আখ্যানে প্রবেশের অভিমুখে দাঁড়িয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নেওয়া যাক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধানত তিনটি যুগে ভাগ করা হয়ে থাকে—

১. আদি বা প্রাচীন যুগ : দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী

২. মধ্যযুগ : ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী

 ২.১ আদি-মধ্য যুগ : ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী : চৈতন্য-পূর্ব যুগ

 ২.২ অন্ত-মধ্যযুগ : ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী : চৈতন্যত্তোর যুগ

৩. আধুনিক যুগ : ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু

এই যুগবিভাগ কালানুক্রমিক। প্রাচীনযুগের বাংলা সাহিত্যে যা নিদর্শন মিলেছে তা যেন “খনি থেকে তোলা সোনার মতো। তখনও ঠিক পালিশ পড়েনি। পালিশটা পড়ল পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। আর সেই পালিশের যথার্থ জৌলুস বাড়ল ষোড়শ শতাব্দী থেকে।”[১] গান দিয়ে বাংলা সাহিত্যের শুরু; সে-গানে আখ্যান এসে মিশেছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে। সে আখ্যান ছিল দু'ভাগে বিভক্ত—পৌরাণিক ও লৌকিক। পৌরাণিক আখ্যান মূলত ভাগবত-রামায়ণ-মহাভারতকেন্দ্রিক। আর লৌকিক আখ্যান মূলত মঙ্গলকাব্যকেন্দ্রিক। বলাবাহুল্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সব ছিল ‘গেয়’ সাহিত্য অর্থাৎ গান করা হতো। অন্যদিকে ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ ছিল পাঠ্যনিবন্ধ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ভাষার দিক থেকে দুটি ভাগে বিন্যস্ত। একটি পরিশীলিত সাহিত্যের ভাষা, অন্যটি জানপদী সাহিত্যের ভাষা। জানপদী বলতে লৌকিক আখ্যান কাব্যগুলিকে ধরা হয়, যেগুলি মঙ্গলকাব্য রূপে পরিচিত। এখানে জনপদের কাহিনি, পরিবেশ, ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে রচিত। পরিশীলিত সাহিত্যের উদাহরণ বৈষ্ণব পদাবলী আর জানপদী সাহিত্যের উদাহরণ

মঙ্গলকাব্য। ভাষা প্রধানত বিষয় নির্ভর। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা তাই কাব্যাত্মক। আর মঙ্গলকাব্যের ভাষা তাই গদ্যাত্মক। মঙ্গলকাব্যকে ভূদেব চৌধুরী বলেছেন, 'মাটির সম্পদ' (Growth of Soil) ও 'প্রাকৃতজনের শিল্প সম্ভার' (Art of common folk)। মধ্যযুগের মঙ্গলকবিরা দেশজ সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা প্রাচীন বাঙালির গ্রামকেন্দ্রিক জীবন ও গোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-সংস্কার, ধর্ম-দর্শন, পূজা-পার্বণ, শিল্পকলা অর্থাৎ লোকসমাজের সামগ্রিক জীবনচর্চা ও মানস প্রবণতাকে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের আলোচনা বিষয় রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে চিত্রিত শিব-পার্বতীর দাম্পত্য কথা।

লোকসমাজ এবং মার্জিত সমাজ—উভয় প্রান্তেই শিবঠাকুর অত্যন্ত জনপ্রিয়। মার্জিত সমাজের চোখে তিনি বৈদিক দেবতা রুদ্র(লোকসমাজের কাছে তিনি কৃষির দেবতা (্‌ ত্রপাল। উভয় সমাজের কাছে তিনি সর্বাধিক আলোচিত, চর্চিত এবং পূজিত। সপ্তদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকেই শিবায়ন কাব্যগুলির জন্ম হয়েছে। শিবায়ন নামাঙ্কিত কাব্যধারার সূচনাপর্বে 'মৃগলুব্ধ' নামাঙ্কিত শিব সম্পর্কিত কাব্য পাওয়া যায়। এই মৃগলুব্ধকে মঙ্গলকাব্যের আখ্যা দেওয়া যায়। বাংলাদেশের চট্টোগ্রামে মৃগলুব্ধের কাহিনি পাওয়া যায়। শিবমাহাত্ম্যমূলক এই মৃগলুব্ধের আখ্যান লিখেছেন রামরাজা ও দ্বিজ রতিদেব। রামরাজার লেখা গ্রন্থটি মূলত ব্রতকথার ঢঙে লেখা। তুলনায় দ্বিজ রতিদেবের কাব্যে সাহিত্যগুণ সামান্য বেশি। কাব্যটির রচনাকাল ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দ। শিব চরিত্রের তিনটি রূপ আমাদের সামনে উঠে আসে—জালিক শিব, হালিক শিব ও শঙ্খবণিক শিব।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর রাজসভার কবি শঙ্কর কবিচন্দ্রই সম্ভবত জালিক শিবের কাহিনির প্রথম রূপকার। ইনি মল্লভূমির অধিপতি রাজা বীরসিংহের রাজত্বকালে (১৬৫৬-৮২) তাঁর 'শিবমঙ্গাল' কাব্যটির রচনা করেছিলেন। কাব্যটির পুরো পুথি মেলেনি। কেবল 'মর্চ্চধরার পালা' শীর্ষক অংশটি সংগৃহীত এবং বর্তমানে সেটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথি বিভাগে রক্ষিত।

শঙ্কর কবিচন্দ্রের সমকালে শিবায়ন কাব্যধারার অন্য আর এক খ্যাতিমান কবির আবির্ভাব ঘটে। ইনি হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত রসপুর গ্রামনিবাসী রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র। কাব্যটি ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত। এঁর রচনায় স্বতন্ত্র বিশেষত্ব নজরে পড়ে। ইনি শিবের লৌকিক রূপের তুলনায় পৌরাণিক ভাবমূর্তিটিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে, ''কৃষাণ ও জালিক শিবের প্রথম পূর্ণাঙ্গ চরিত্রাঙ্কনের কৃতিত্ব কবিচন্দ্রের প্রাপ্য।''[২]

সুবিপুল ঘটনাসমূহকে সন্নিবেশিত করার জন্য কবি কাব্যটিকে মোট ২৬টি পালায় বিভক্ত করেছেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''ইহাই সর্বপ্রথম সুসংবদ্ধ শিব-মঙ্গালকাব্য... শিব-বিষয়ক কোনও কাহিনি লইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনও শিব-বিষয়ক একটি কোষ-গ্রন্থ (Encylopaedia) বলা যাইতে পারে।''[৩] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ''বাংলাদেশের যদি কোনও কবির গ্রাম্য মঙ্গালকাব্যকে পুরাণের সীমানায় তুলে ধরতে প্রয়াস করে থাকেন,

তবে তিনি হলেন শিব-মঙ্গালের কবি পণ্ডিত রামকৃষ্ণ রায়। কাহিনির ঘনপিনদ্ধ গ্রন্থননৈপুণ্যে, চরিত্রগুলির পৌরাণিক মহিমা ও সংযম, সর্বপরি কবির মার্জিত ভাষা ও পরিমিত অলংকরণ প্রশংসনীয় গৌরব লাভ করেছে।"[৪] এ রচনাটি সম্বন্ধে 'রামেশ্বর রচনাবলী'-র সম্পাদক অধ্যাপক পঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয় যে মন্তব্য করেছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য : 'এই সুবৃহৎ কাব্যের নায়করূপে আপাতদৃষ্টিতে দেবাদিদেবকে দেখিলেও মহাদেব নানা পৌরাণিক ঘটনায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন। ফলে তিনি কেন্দ্রীয় চরিত্র হইতে পারেন নাই এবং কাব্যটিও একটি সামগ্রিক রূপ লাভ করিতে পারে নাই। কাব্যের মধ্যে শিবকে ধ্যানমৌনী রজতগিরিনিভ যোগীশ্বররূপেই দেখা যায়। যে লৌকিক শিব এতদিন বাঙালির একান্ত আপনজন হইয়া ক্ষেতে চাষ করিয়াছেন বিলে মাছ ধরিয়াছেন, সেই আপনভোলা মানুষটির সাক্ষাৎ কোথাও মিলে না।' আসলে যে শিব চরিত্র নিয়ে মূলত কৃষিজীবী বাঙালিদের আনন্দের শেষ নেই, সেই শিব হলেন নিতান্তই কৃষিজীবী এক দরিদ্র মানুষ। ড. জীতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী 'The Religion of the Hindus' গ্রন্থের অন্তর্গত "The Hindu concept of God" নামাঙ্কিত প্রবন্ধে লিখেছেন, "Unsophisticated Villegers look upon him (Siva) as their familiar friend." সরাসরি শিব চরিত্রকে অবলম্বন করে কাব্য লিখেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম জনপ্রিয় কবি রামেধ্রের ভট্টাচার্য। রামেধ্রেরের শিব লোকজীবন থেকে উঠে আসা এক ভূমিনির্ভর কৃষক। বস্তুত কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে বঙ্গদেশের চিরন্তন আর্থিক কৌলীন্যের সূত্রে শিবও মিলে গিয়েছেন লোকজীবনের সঙ্গে। রামেধ্রেরের শিব তাই কৃষিদেবতা।

ল(ণীয় যে, একাধিক মঙ্গল দেব-দেবীর সঙ্গে শিবের সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর কপালে শোভিত চন্দ্র, তৃতীয় লোচনে অগ্নি, মস্তকের জটাযূথজালে গঙ্গা, গলায় নাগিনী কন্যা, দেহের অর্ধাংশ জুড়ে শাক্ত(দেবী চণ্ডী। মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে তিনি মনসার পিতা এবং আর্য সভ্যতাদীপ্ত বণিক চন্দ্রসদাগরের উপাস্য। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তিনি পশুকুলের র(াকর্ত্রী দেবী চণ্ডীর স্বামী। রাঢ়বঙ্গের ধর্মমঙ্গল কাব্যে তিনি আদিদেব নিরঞ্জনের সন্তান। অনুরূপে অন্নদামঙ্গল কাব্যে এই দেবতা অন্নদার অহংকারের কারণ। অন্নদা তাঁকে সর্বাগ্রে বরণ করতে ব্যাসের সঙ্গে ছলনা করেন। এভাবে শিব হয়ে ওঠেন প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র। শিবহীন যজ্ঞ এবং শিবহীন কাব্য নিতান্তই বর্ণ বিরল বলে প্রতিপন্ন হয়। ১৫টি পালায় বিন্যস্ত শিবায়ন কাব্যের প্রথম পালায় সৃষ্টির প্রকরণ আলোচনার পরে কবি দ্বিতীয় পালায় দক্ষযজ্ঞের প্রসঙ্গ তুলে আনেন। তৃতীয় পালায় গৌরীর জন্ম ও খেলাধূলা। সেই পুতুল খেলায় দেখা যায়, পুতুল মেয়ের সঙ্গে পুতুল ছেলের বিবাহ এবং সেই বিবাহে কৌলীন্যপ্রথার উজ্জ্বল উপস্থিতি। অর্থাৎ বাচ্চাদের খেলাতেও সমকালের প্রভাব স্পষ্ট। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যে সেই বর্ণনা রয়েছে—

ঘট্যা করা্য আপনে ঘটক শিরোমণি।
নারায়ণে বিভা দিল লক্ষ্মী ঠাকুরানী।।
বরযাত্রা কন্যাযাত্রা বসাইয়া ঘরে।
আপনে অভয়া অন্ন বিতরণ করে।।[৫]

বর-কন্যা দুজনকে দোলায় তুলে দিয়ে যে কথাগুলি গৌরী সেদিন বলেছিলেন, তা

তৎকালীন সমাজ-জীবনের কথাকেই মনে করিয়ে দেয়। তখনকার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের দুর্গতির চিত্র এঁকেছেন রামেশ্বর। সেই দুর্গতির পরিচয় পাওয়া যায় গৌরীর মেয়ে-জামাই বিদায়কালের বক্তব্যে। রামেশ্বর লিখেছেন—

জামাতার হস্ত তুল্যা নিল নিজ মাথে।
শাশুড়ীর কথা হইল জামাতার সাথে॥
কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কর তুমি॥
আঁটু ঢাক্যা বস্ত্র দিয় পেট ভরা ভাত।
প্রীত কর্যা যেমন জানকী রঘুনাথ॥[৬]

ঐ স্বল্প বয়সেই শাস্তির সমস্ত গুপনা রপ্ত করে 'অভয়া অশেষ খেলা খেলে।' এর পরেই ঘটক নারদের মধ্যস্থতায় শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহের সম্বন্ধ এবং চতুর্থ পালায় গৌরীর বিবাহ। এই বিবাহের বর্ণনায় কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য লোকায়ত বাংলার নারীকেন্দ্রিক আচার-বিচার-সংস্কার-প্রথার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। সেই বিবরণে এসেছে অধিবাস, গায়ে হলুদ, মঙ্গলস্নান, মঙ্গলগীত, নান্দীমুখ, জলসহা থেকে জামাই বশীকরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ। মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যে বহুবিবাহ প্রথা থেকে শাশুড়িরা জামাই বশীকরণের চিন্তা করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রম্ভাবতীর মতো শিবায়ন কাব্যে মেনকা জাদুবিশ্বাস আশ্রয়ী (ম্যাজিক পাওয়ার) এই বশীকরণের প্রসঙ্গ তুলেছেন—

ছামনি নাড়াইয়া অভিচারে দিল মন।
একে একে আরম্ভিল ঔষধের গণ॥
মন্ত্র পড়্যা গুড়ে চাউলি ব(দিল ফেল্যা।[৭]

বলাবাহুল্য, মহশ্বেতা দেবী জামাই বশীকরণ প্রসঙ্গ কত ভয়ংকর হতে পারে তার অসাধারণ চিত্র এঁকেছেন কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী প্রণীত বণিক খণ্ডের ধনপতি-লহনা-খুল্লনা আখ্যান অবলম্বনে রচিত 'বেনে বউ' উপন্যাসে। পঞ্চম পালায় কুচনি প্রসঙ্গ অর্থাৎ শিবের কোচ নগরে প্রবেশ, শিবের ভিক্ষা, ভিক্ষা দ্রব্য অর্থাৎ মোদক নিয়ে কার্তিক ও গণেশের কোন্দল—

হরমুখ দেখি হাসে নাচে এক পায়।
শূলী দিল ঝুলি দুঁহে লুটি করি খায়॥...
চারি হাতে মুঠি ধরে গিলে গজমুখে।
কার্ত্তিক কান্দেন করাঘাত মার্য়া বুকে॥
ভগবতী বলে ডাক্যা শুন গজানন।
কনিষ্ঠ কার্ত্তিকে কিছু দেহ বাছাধন॥[৮]

সমস্ত দেবসমাজ যে পরিবারটিকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করে থাকেন, সেই হর-গৌরীর পরিবার অন্নহারা! ভিক্ষার ঝুলি ভর্তি না থাকলে কৈলাসে হাড়ি চাপাতে পারেন না পার্বতী। স্বামী নিজের খেয়াল-খুশিতে চলার ফলে গৃহিণীর অভাব আরও পর্বতপ্রমাণ আকার ধারণ করে। গৌরীকে নির্বিকার চিত্তে শিব জানান তাঁর অলসতার কথা—

ক্ষেমা কর ক্ষেমঙ্করী খাব নাঞি ভাত।
যাব নাঞি ভিক্ষায় যে করে জগন্নাথ॥[৯]

'যে করে জগন্নাথ' বলে শিব কর্মবিরতি গ্রহণ করেন এবং তার প্রতিক্রিয়ায় শিব ও পার্বতীর কোন্দল। কেননা, 'ধার দিতে আর কেহ নাই অবশেষ।' সব থেকে বড়ো সমস্যা ক্ষুধা অনুভব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুরা দৌড়তে থাকবে মায়ের কাছে—

এখন বাপের কাছে বস্যা আছে পো।
ক্ষুধা পাইলে ক্ষেমঙ্করী খাত্যে দে না গো॥[১০]

নিরুপায় গৌরী। শিবের অবশ্য গৌরীর সমস্যা দূর করবার সময় কোথায়। অপরকে যিনি আশীর্বাদ বর্ষণ করে ভরিয়ে দেন; তাঁরই ঘরে নিত্য উপবাসের চিত্র। শিবায়ন কাব্যের একাদশ পালায় পার্বতী শিবকে অনুরোধ করেন শিব যেন তাঁর বোহেমিয়ান জীবন ত্যাগ করে অর্থাৎ ভিক্ষানির্ভর জীবন ত্যাগ করে কৃষিনির্ভর জীবন-যাপন করেন। পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম স্বামীকে পার্বতী বাঙালি গৃহবধূর মতোই বিনম্র পরামর্শ দেন শিব যেন পরিবার-পরিজনদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে কৃষিকর্মে মনোযোগ দেন। কেননা, পার্বতীর পরামর্শ এমন, ''চিন্তিলাম চন্দ্রচূড় চাষ বড়ো ধন।'' শিব প্রথমে রাজি হননি। কেননা, ত্রিশূল ভেঙে চাষের জিনিসপত্র তৈরি করলে দেবতাদের কাছে শিবের সম্মান কোথায় থাকবে? অবশেষে শিব রাজি হলেন। আমাদের মনে পড়তে পারে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি-সংকেত' উপন্যাসের শেষে অনঙ্গ বউ ঠিক এইভাবে গঙ্গাচরণ চক্রবর্তীকে কৃষিনির্ভর জীবন-যাপনের কথা বলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে—

কৃষি ও কৃষক ছাড়া বাঙালির কাছে গৌরবের বিষয় আর কিছুই ছিল না। সেজন্য কবিদের কাছে শিব ছিলেন কৃষক, আর কবিরা ছিলেন কৃষকের কবি।[১১]

রামেশ্বরের শিব হচ্ছেন কবির নিজস্ব কল্পনা। কৃষিকর্মের জন্যে প্রয়োজন হয়— ১. চাষের জমি ২. চাষের সরঞ্জাম ৩. উৎকৃষ্ট বীজধান ৪. বিশ্বস্ত কর্মচারী। এই বিষয়গুলি কীভাবে রামেশ্বরের কাব্যে এসেছে তা দেখা যাক—

পার্বতীর অভিলাষ পূরণার্থে কৃষিকর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক শিব দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের কাছে চাইলেন চাষ করবার জন্যে উর্বরা জমি। জমি নেওয়ার সময় অভিজ্ঞ কৃষকের মতো দুটি শর্তও আরোপ করলেন। শর্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ—প্রথম শর্ত : লিখিত পাট্টা দিতে হবে। না হলে পরবর্তীতে রাজায়-প্রজায় বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। শিবের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট —

শিব বলে শক্র কিছু চক্র বক্র আছে।
ক্ষেতে খন্দ দেখ্যা তুমি দ্বন্দ্ব কর পাছে॥
বিষয়ীর বচনে বিশ্বাসী বিধি নয়।
পাটাটুকি হল্যা পর কাল শুদ্ধ হয়॥[১২]

অন্য শর্তটি হলো অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টি র মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। শিব বর্ষার ওপর নির্ভরশীল ধানচাষের সমস্যার কথা উল্লেখ করে কৃষকের বাস্তব অবস্থার পরিচয়টি দিয়েছেন। শিবের দ্বিতীয় শর্তটি প্রকৃতির করুণায় নির্ভরশীল কৃষকেরই বক্তব্য—

বিশ্বনাথ বলে বাপু এই কালে কই।

দেখ আমি দুঃখী চাষী জট জেট নাই॥
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হবে সাবধান।
অঙ্গীকার কৈল ইন্দ্র তবে নিল দান॥[১৩]

শিব যেন অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত 'পল্লিগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থার বর্ণন' প্রবন্ধের 'ভুবন প্রতিপালক'। তিনি নিজেকে চিহ্নিত করেছেন পল্লিগ্রামের 'দুঃখী চাষী' রূপে। কৃষির জন্যে প্রয়োজনীয় লাঙ্গল, জোয়াল, কোদাল, দা, উখুন, পাশী ইত্যাদি যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্যে প্রযুক্তিবিদ্যায় সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে ডাকালেন শিব। বিশ্বকর্মা বিশ্বনাথের ইচ্ছানুসারে চাষের সরঞ্জাম নির্মাণ করলেন। রামেশ্বর বিশ্বকর্মার এই বিশাল কর্মযজ্ঞের বিবরণ দিয়ে জানালেন—

পাঁচ মণে পাশী করি আশি মণে ফাল।
দু মণের দু জলই অর্ধেকে কোদাল॥
দশ মণের দা আট মণের উখুন।
দশ দশ মণ দেখ করিয়া একুন॥[১৪]

'শিবায়ন' কাব্যে ব্যবহৃত এই চাষের সরঞ্জামসমূহ লোকসমাজের কাছে বহুল পরিচিত। অষ্ট াদশ শতাব্দীর কৃষিনির্ভর জীবন-জীবিকার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন কবি। উৎকৃষ্ট বীজধান সংগ্রহ করার জন্যে শিব গেলেন কুবেরের কাছে। কুবের সাগ্রহে তাঁর বক্তব্য শুনলেন। সানন্দে তাঁকে বীজধান দিলেন। উপরন্তু কৃতজ্ঞতার সুরে বিনয়ী কুবের বললেন—

যক্ষরাজে রক্ষা কর‍্যা আছ নিজ ধনে।
যত ধান্য চাও নেও ধার মাগ কেনে॥
ধূর্জ্জটি বলেন ধান্য ধার চাই কেন।
ধারিয়া শুধিব ধার রহে নাই যেন॥[১৫]

'ধারিয়া শুধিব ধার' বক্তব্য অকপট সারল্যে ভরা। এ যেন নির্লোভ কৃষকের স্বতঃস্ফূর্ত বক্তব্য। শিব বিশ্বস্ত ও কর্মে নিপুণ কর্মচারী রূপে ভীমকে কাছে পেলেন। ভীম যেমন বিশ্বস্ত, তেমনি মেজাজীও। 'কুবের মানেন ভয় ভীমের আস্ফালনে' বক্তব্য ভীমের স্বভাবকেই প্রমাণিত করে। কৃষকদেবতা শিব বৃষে চেপে চলেন। পিছনে ভীম। চাষের সরঞ্জাম তাঁর কাছে। শিবকে দূরে চাষকর্মে যেতে দেখে অশ্রুমুখী পার্বতী। অভাবের সংসারে কত কথা না শুনিয়েছেন পার্বতী। গালমন্দ করেছেন। কিন্তু বাস্তবিকই স্বীকার করতে হয় শিব-পার্বতী অর্ধনারীশ্বর। রামেশ্বর লিখেছেন, 'জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা।'

তৎকালীন সময়ে কৃষিকর্ম কীভাবে সম্পন্ন হচ্ছে তার গ্রহণযোগ্য একটি বিবরণ দিয়েছেন কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য। সেই বিবরণ অনুযায়ী দেখা যায়—

১. শিব মাটি সমান করলেন।
২. জমিতে বাসুই দিলেন।
৩. জমিতে উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢাল করলেন।
৪. বৃষ্টির জলে জমি চাষের উপযোগী করলেন।
৫. শুভক্ষণ দেখে 'হাল প্রবাহ' ও ধানের চারা রোপণ করলেন।

রাত দিন জমিতে পড়ে রইলেন শিব। শিবের নিপুণ কৃষিকর্মের পরিচয় দিয়ে কবি লিখেছেন—

চৈত্রমাস গেল সব চাষ হল্য পূর্ণ।
মাঠ কর্য়া মই দিয়া মাটি কৈল চূর্ণ॥
উঁচু নিচু চালিয়া সকল কৈল সম।
উত্তরে উন্নত কৈল দক্ষিণ দিগভ্যম॥
বৈশাখে বিছাতি কৈল শুভক্ষণ দিনে।
সার দিয়া সার্য্যা সব ভূমি বাতে বুনে॥[১৬]

'শুভক্ষণে' দেখে শিবের 'হলপ্রবাহ' শুরু হলো—"মনে জান্যা মাঘবান্ মহেশের লীলা।/মহীতলে মাঘশেষে মেঘ বরষিলা॥/দিন সাত বরষিয়া দিলেক ঈশানে।/হৈল হাল প্রবাহ শিবের শুভক্ষণে॥"[১৭] কৃষিনির্ভর গ্রামবাংলায় লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার কীভাবে শুভ ও অশুভ—এই দুয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে তার তথ্যবহুল দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী।[১৮] শুভক্ষণ দেখে শিবের 'হালপ্রবাহ'-এর মধ্যে লোকসমাজের 'Taboo' সংক্রান্ত ধারণার প্রকাশ দেখেছেন কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য। শিবের উপলব্ধিজাত বক্তব্য তাই লোকসমাজের কৃষি-সংক্রান্ত বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতিফলন—

হাল্যার দেখিয়া দুঃখ হরে হল্যা (হইল) মো।
কালে কালে কৈল হাল কামাঞের যো॥
সেই সেই কালে যার হয় হাল-যোগ।
ধরা শস্য হরে ধানে ধরে নানা রোগ॥
বৃষ কান্দে বাসব বরিষে নাই বাড়া।
তেঞি হাভাতিয়া চাষী হয় লক্ষ্মীছাড়া॥[১৯]

চাষে মনোযোগী শিব ডাক-সংক্রান্তির দিনে কৃষি-সংক্রান্ত কর্ম সম্পাদন করেন—"ডাক-সংক্রান্তি দিনে ক্ষেতে পুতে নল।/কার্ত্তিকের কত দিনে কাট্যা দিল জল॥/ধরণী সুধন্যা হৈল ধান্য আল্য ফুল্যা।/ভোলানাথ রহিলেন ভবানীকে ভুল্যা॥"[২০] রাত দিন জমিতে পড়ে রইলেন শিব। ভৃত্য ভীমের উৎসাহে ও শিবের নিরলস পরিশ্রমে সোনার ফসল ফলল। সুতরাং, খুশি হলেন পার্বতী—

ধান্য দেখ্যা পুণ্যবতী ধন্য ধন্য করে।
সার্থক শিবের চাষ সাবাস শঙ্করে॥[২১]

'আঞ্চলিক ঐতিহ্য অনুসারে শিব নিজেই একজন কৃষিজীবী।'[২২] অনুসন্ধিৎসু সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তীর অভিমত এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"কবির শিব ক্ষেত্রপতি কৃষক। তাঁহার কাব্যের শেষাংশে বাংলাদেশের কৃষকের জীবনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।"[২৩] ড. সুকুমার সেন খুব চমৎকার একটি মন্তব্য করেছেন শিবের কৃষিকাজ করা নিয়ে—"ধানচাষের কথা রামেশ্বরের কাব্যে যেমন বিস্তৃত ও নিখুঁতভাবে আছে এমন অন্য কোথাও নাই। শিব-সঙ্কীর্তনের চাষ-পালাটিকে সেকালের কৃষিবিদ্যার কড়চা (অর্থাৎ হ্যান্ডবুক) বলিতে পারি।"[২৪] রামকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'হর-পার্বতী' উপন্যাসের বিয়াল্লিশ অধ্যায়ে বর্ণিত

হয়েছে হরের 'হলকর্ষণ'। শিব যখন মন দিয়ে কৃষিকাজ করছেন এবং মাঝে মধ্যে অন্য এক গোপন সম্পর্কের মধ্যে যাতায়াত শুরু করেছেন, তখন দেখা যায় ঘরভাঙা নারদ পার্বতীর মনে সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস আর আশঙ্কার সমস্ত উপকরণগুলি রোপণ করেছেন—

আগো মামী মামা তো মজিল আদিরসে।
রাখিতে নারিলে তুমি আপনার রসে॥
মামাকে কর্‍্যাছে বস গোটা দশ মায়্যা।
রাত্রিদিন মামা তার পাছে বুলে ধায়্যা॥[২৫]

শিবের চরিত্রদোষ পরীক্ষার অভিলাষে পার্বতীর বাগদিনী রমণীর রূপ ধারণ করে শিবের সামনে উপস্থিত হলে শিব মোহিত হন। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনীর রূপদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক চন্দ্রশেখরের প্রতিক্রিয়ায় লেখক কাকুবক্রোক্তি অলংকারে জানান—"সৌন্দর্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়?" মুগ্ধ শিব অত্যুৎসাহী হয়ে জানান—

শিব বলে বল বল তুমি চাও কি।
অষ্ট বসু অষ্ট সিদ্ধি সব লহ দি॥[২৬]

শিবের মতিভ্রমণের কারণ অবগত হয়ে পুনরায় নারদের পরামর্শে পার্বতী শাঁখা পরার অভিলাষ ব্যক্ত করলে শিব জানান—

বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাহ জনকের ঘরে॥
সেইখানে শঙ্খ পর্‍্যা সুখ পাবে মনে।
জানিঞা জনকগৃহে যাও নাঞি কেনে॥[২৭]

অপমানিতা পার্বতী কৈলাস থেকে হিমালয়ে চলে আসেন। হিমালয়ে শুরু হয় কন্যার আগমনে আগমনী উৎসব। বিপন্ন শিব নিজে শঙ্খ তৈরি করেন। মাধব শাঁখারি নামে উপস্থিত হন হিমালয়ে এবং পার্বতীর হাতে শাঁখা পরান। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে—

ভিক্ষাজীবী শিব
↓
কৃষিজীবী শিব
↓
শিল্পজীবী শিব

শাঁখারি হিসেবেও কবি শিবকে এঁকেছেন অনবদ্য করে। এমন অভিজ্ঞ, রসিক শঙ্খবণিক পল্লির আনাচে-কানাচে সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। কাব্যের এই অংশে দেবতা শিব পরিপূর্ণমাত্রায় রক্তমাংসের মানুষে পরিণত হয়ে গিয়েছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> শিবের গানের কবি কোন্ পুরানো কালে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, শিব চাষ করিয়াছিলেন। নিভৃত পল্লী-বাঙ্গালার কৃষিজীবী আজিও সেই কথা স্মরণ করিয়া গৌরব বোধ করে।... বাঙ্গালার পল্লীদুহিতা আপনা অপেক্ষা অনেক অধিক-বয়স্ক পাত্রের ঘর করিতে গিয়া যেদিন দারিদ্র্যের পীড়নে পীড়িত হয়, আইয়তির লক্ষণ দুই গাছি শঙ্খের জন্য স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া দুঃখের রজনী জাগিয়া পোহায় এবং আপনার দুর্ভাগ্য স্মরণপূর্বক চোখের জলে ছিন্ন কন্থা সিক্ত করে, সেদিন হরগৌরী কোন্দলের প্রাচীনগাথার অনুধ্যানেই মনকে সান্ত্বনা দেয়,

যে জগজ্জননী মহামায়াও একদিন এইরূপ কষ্টে পড়িয়াছিলেন।[২৮]

শ্বশুর গৃহে ভোজনান্তে হর-পার্বতীর বাসরসজ্জা এবং দশমীর দিন গৃহে প্রত্যাবর্তন—

দশমী দিবস ভাল আর রব নাঞি।
বিজয়া বিজয় কর জননীর ঠাঞি॥[২৯]

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

বাঙলার লোকজীবনে বৃষভধ্বজ শিব প্রমথেশ অপেক্ষা গঞ্জিকা ধুস্তুরসেবী, পরস্ত্রীলোলুপ কৃষক শিব অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন—যাঁহাকে কেহ কেহ অস্ট্রিক সংস্কৃতিজাত কৃষি-দেবতার প্রতীক বলিয়া মনে করেন। পরে আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতির সমন্বয়ের সময় পৌরাণিক মহেশ্বর ও কুচনীর রূপমুগ্ধ বৃদ্ধ-শিব এক হইয়া গেলেন।[৩০]

আর্যরা 'এদেশে এসেই অনার্যদের কাছ থেকে কৃষিবিজ্ঞানে দী(া নেয়।' ফলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, 'কৃষিসংত্র(ান্ত দেবতা অনার্যদেরই।'[৩১] শিব অনার্য কৃষিদেবতা। শিবের সঙ্গে সংযুক্ত(ব্রত, গাজন, গম্ভীরা নৃত্যের বিষয়টি অনার্য প্রভাবজাত। কৃষক কর্মে ও ঘর্মে এক হয়ে যায়। সেই শিবরূপী কৃষকের কথা বলতে গিয়ে কবি লেখেন—

গৃহিণীর দুটি হাতে সাধের শাঁখা পরাবে বলে
বেলা নিভে এলেও মাঠের শেষ প্রান্তে এক কৃষক
বলদের সাথে নিরলস শ্রম দিয়ে যায়
ভাঙা চালের নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকে পার্বতী।
দুটি ছেলে মায়ের আঁচল ধরে ক্ষুধাতুর চাহনি
ধীর পায়ে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। (পার্বতীর প্রতীক্ষা')

উৎসের সন্ধানে

১. রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য : অনুভবে ও বিশ্লেষণে', পারুল লাইব্রেরী প্রা.লি, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ভূমিকা
২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৪৩
৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৪২
৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১২৩
৫. শ্রী যোগীলাল হালদার সম্পাদিত : 'রামেশ্বরের শিবায়ন', ক.বি. ১৯৫৭, পৃ. ৫১
৬. পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত : 'রামেশ্বর রচনাবলী', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, জানুয়ারি ২০১৩, খ্রি., পৃ. ৩৭৬
৭. তদেব : পৃ. ৩৯১
৮. তদেব : পৃ. ৩৯৬
৯. তদেব : পৃ. ৩৯৯
১০. তদেব : পৃ. ৪০০
১১. অতুল সুর : 'বাঙলা ও বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতি', ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ৪০১
১২. উৎস-৫, পৃ. ২২৩

১৩. তদেব : পৃ. ২২৪
১৪. তদেব : পৃ. ২২৫
১৫. তদেব : পৃ. ২৩১
১৬. তদেব : পৃ. ২৩৭-২৩৮
১৭. তদেব : পৃ. ২৩৩-২৩৪
১৮. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার', ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ১২৭-২৯
১৯. উৎস-৫, পৃ. ২৩৭
২০. তদেব : পৃ. ২৫৫
২১. তদেব : পৃ. ২৫৬
২২. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ৩৫
২৩. উৎস-৬, পৃ. ১৭১
২৪. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, আশ্বিন ১৪১৮, পৃ. ৩৭১
২৫. উৎস-৬, পৃ. ৪৫৮
২৬. উৎস-৬, পৃ. ৪৭০
২৭. উৎস-৬, পৃ. ৪৭৫
২৮. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : 'গৌড়বঙ্গ-সংস্কৃতি', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, মে ১৯৯৯, পৃ. ১৫০
২৯. উৎস-৬, পৃ. ৪৯৬
৩০. উৎস-২, পৃ. ৮৮
৩১. ওয়াকিল আহমেদ : 'লোককলা প্রবন্ধাবলী', গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ২০৪

মুকুন্দের ‘অভয়ামঙ্গাল’ কাব্যকে রামকুমারের ‘ধনপতির সিংহলযাত্রা’ উপন্যাসে ফিরে দেখা

সংহিতা মাল

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আখ্যান কাব্যের ধারায় একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী। বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাসে যে চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যধারার সূচনা ঘটেছিল, সেই কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি হলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যের নাম ‘অভয়ামঙ্গাল’। কবির জীবন এবং বংশ পরিচয় সম্পর্কে আমরা জানতে পারি যে কবির পৈতৃক বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে। ডিহিদার মাহমুদ শরিপের অত্যাচারে তিনি সাত পুরুষের বাসস্থান পরিত্যাগ করে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আড়রা গ্রামের পালোধি বংশজাত জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে গমন করেন। বিদ্যোৎসাহী রাজা বাঁকুড়া রায় কবিকে নিজের পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে তাঁর জীবিকা সংস্থান করে দেন। বাঁকুড়া রায় অল্পকালের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায় রাজা হন। রঘুনাথেরই সভাসদ রূপে বসবাসকালীন তাঁরই অভিলাষে মুকুন্দ তাঁর চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য রচনা করেন। চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যধারায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের পাঠ একালের পাঠকের কাছে সমান সমাদরের বিষয়। যেহেতু সেকালের পাঠ্যের উপাদানগুলি একালে বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে, সেই সূত্রেই চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের বিভিন্ন উপাদান ও সাহিত্যপ্রেমী বিদগ্ধমহলে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। লেখক রামকুমার মুখোপাধ্যায় মুকুন্দ চক্রবর্তীর উপর ড. সুকুমার সেনের একটি ইংরেজি পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার কাজ করতে গিয়ে কবি মুকুন্দের পদ্যে রচিত চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যটি পুনঃপুন পাঠ করেন এবং লেখকের এই যোগাযোগের সূত্রেই ‘ধনপতির সিংহলযাত্রা’ উপন্যাসটির বীজ বপন হয়।

রামকুমার চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের বণিকখণ্ড আখ্যানের প্রথম অংশটি গ্রহণ করেছেন। সেখানে উপনীত হয়েছে ধনপতির সিংহলযাত্রা থেকে বন্দিদশা পর্যন্ত। তাঁর উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্যের প্রথমদিক হল লেখক তাঁর রচনায় আখ্যানটির যথাযথভাবে পুনঃকথন করেছেন নিজের ভাষায়। সেখানে নেই কোনো সংযোজন, বিয়োজন, নেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। রামকুমার মুকুন্দের কাব্যকে সামনে রেখে কয়েক শতাব্দী অতিক্রম করে সেই দূরত্ব থেকে আবার পুনরায় ফিরে

দেখেছিলেন মধ্যযুগেরই বাংলা ও বাঙালিকে। সেই দৃষ্টিতে উঠে এসেছিল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বঙ্গভূমি। রচনাটির মধ্যে অপরূপ কথন ভাষার মূর্চ্ছনায় পাঠক 'পট-শিল্পের' উপস্থাপনার চমৎকারিত্ব প্রত্যক্ষ করেছেন। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কোনও কোনও মুদ্রিত পুথির শেষ ভাগে দুইটি পদ থেকে গ্রন্থ রচনাকাল সম্পর্কে জানা যাচ্ছে—"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা/কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।"[১] কোনো হস্তলিখিত প্রাচীন পুথিতেই এই পদ দুটি পাওয়া যায় না। এটি থেকে গ্রন্থ রচনার একটা সময়ের নির্দেশ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু এই পদটির প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহ উপস্থাপিত হয়। অনেকে রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকালকে (১৫৭৩-১৬০৩) কবির কাব্যরচনাকাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আজ পর্যন্ত এই সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটির দুটি ভাগ—১. আখেটিক খণ্ড ২. বণিক খণ্ড। এই প্রবন্ধে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গালের বণিক খণ্ডকে কেন্দ্র করে আলোচনার চেষ্টা করা হবে। ব্যাধের দ্বারা গুজরাটে দেবীপূজা প্রচারিত হওয়ার পর দেবী অভয়া সখীদের সঙ্গো যুক্তি করলেন স্বর্গের কোনো অপ্সরি নর্তকীকে মর্ত্যে উচ্চশ্রেণির মধ্যে পুজো প্রচার করার জন্য পাঠাতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে নর্তকী রত্নমালাকে অভিশাপ দিলেন নৃত্যে তালভঙ্গা করার অপরাধে এবং ইছানী নগরে বণিক লক্ষপতির ঔরসে রম্ভাবতির গর্ভে তার জন্ম হল, নাম হল খুল্লনা। তার বিবাহ হয় বণিক ধনপতির সঙ্গো। এরপর ধনপতির ব্যবসা-বাণিজ্যে যাবার উদ্যোগ, যাবার সময় খুল্লনাকে ঘট পেতে চণ্ডী পুজো করতে দেখে সক্রোধে ধনপতির পদাঘাত, সিংহলযাত্রার বর্ণনা, কালীদহে 'কমলেকামিনী' দর্শন। সিংহলে শালবাহন রাজার সমীপে এই বৃত্তান্ত কথন, রাজাকে ওই দৃশ্য দেখাতে না পারায় কারাবাস, খুল্লনার গর্ভে শাপভ্রষ্ট মালাধরের জন্ম শ্রীমন্তরূপে এবং পরবর্তীকালে পিতাকে উদ্ধারের আশায় তারও সিংহলযাত্রা 'কমলেকামিনী' দর্শন, বিবাহ ইত্যাদির ঘটনার মাধ্যমে তাঁর কাব্যটিকে আমাদের কাছে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন মুকুন্দ।

লেখক রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' উপন্যাসটি উপনিবেশ-পূর্ববাংলা তথা ভারতবর্ষের সঙ্গো নতুন সেতুবন্ধন। লেখক নিজেই বলেছেন, এই বইটির ভাষার মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্য আছে; এই ভাষা নির্মিত ভাষা। আসলে কাহিনি বিন্যাসে, চরিত্র বিন্যাসে যুগ-কাল-সময়কে অবহেলা করা যায় না এবং তারই বাস্তবায়িত রূপ দিতে গেলে ভাষাকেও যুগোপযোগী করে সাজাতে হয়। তাই লেখক এই ভাষাকে তৈরি করেছেন। বাংলা সাহিত্যে সমুদ্রের বর্ণনা খুব বেশি নেই, তাই এই বইতে তাকে নতুন কিছু শব্দ নতুন আঙ্গিকে ব্যবহার করতে হয়েছে। এই উপন্যাসে রয়েছে নবদ্বীপ, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, খড়দহ, মগরা, নীলাচল, শঙ্খদীপ, সর্পদহ, কালিয়দহ হয়ে ধনপতির সিংহলযাত্রার অনুপুঙ্খ বিবরণ। নানা অবলুপ্ত নদীপথ ও বিস্তৃত জনপদের বর্ণনা এবং অপ্রচলিত শব্দাবলির পুনরুদ্ধারে বাংলা কথাসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হয়ে উঠেছে। লেখক তাঁর এই রচনাটিতে সমাজের বিবর্তনশীল আধুনিক বিশ্লেষণের উপস্থাপনার পরিবর্তে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পরম্পরায় আধুনিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গো উপনিবেশ পূর্ব বাংলা তথা ভারতবর্ষের মেলবন্ধন করতে চেয়েছেন। মুকুন্দ এবং রামকুমার দু'জনের রচনাতেই বাঙালি সংস্কৃতির অনেক উপাদান লক্ষিত হয়। তবে দুই যুগে বসে দুই লেখক তাদের এই সংস্কৃতিকে কীভাবে পরিবেশন করেছেন—

সেই বিষয়টি দু'জনের পাঠ্যগ্রন্থ অবলম্বন করে অনুসন্ধানের প্রয়াস রইল।

রামকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর আখ্যানে গৌড়দেশ যাত্রার বিবরণ না দিয়ে সরাসরি সিংহল যাত্রার প্রসঙ্গ এনেছেন। এইখানেই উপন্যাসের নামকরণের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। কিংবদন্তির মাধ্যমে সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। এখানে 'সংস্কৃতি' শব্দটির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সমাজের সংস্কৃতি বহমান হয় সাহিত্যের মাধ্যমে। শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে 'সংস্কৃত শিল্প ইতিহাস' প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গো বিশদে আলোচনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে যে, যার দ্বারা কোনো বস্তু মার্জিত বা উন্নত হয় তাকে সংস্কৃতি বলে। 'সংস্কৃতি' শব্দটি ভারতেই বেশি প্রযুক্ত। ভারতীয় তথা বাঙালির ইতিহাসের সঙ্গো তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই সংস্কৃতিরই বিভিন্ন উজ্জ্বল দিক 'ধনপতির সিংহলযাত্রা'য় (২০১০) রামকুমার উপস্থাপিত করেছেন। বাঙালির হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে 'দক্ষিণ পাটনে দৈবজ্ঞ নিষেধ'-এ অপমানিত গণকের শাপে তৎকালীন বাঙালি সংস্কৃতির কিছু রূপচিত্র ধরা পড়ে। ধনপতি গণককে দ্বিচারী মনে করে নফরকে দিয়ে ধাক্কা মেরে তাকে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা করলে গণক চিৎকার করে যে কথাগুলো বলে—"দুষ্কর্মা, দুষ্কৃৎ, দুরাত্মা, দৈত্য, সাগরে ডুবুক সাততরী দেমাক, শিরে ভাঙুক সাতমনি বাজ, দু-সতিনে কোন্দল করুক নিত্যদিন,...ভিটায় ঘুঘু-চরুক জোড়ায় জোড়ায়...।"[২] ধনপতি ঘরের মানুষ যাতে বিপদাপন্ন হয়, তার জন্য দৈবজ্ঞকে ডাকা দৈবজ্ঞ খড়িবজ্র খাঁ-কে ডাক পাঠানোর মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতির একটা পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গো ধনপতি গণককে 'দ্বিচারী' বলে আখ্যায়িত করেছেন—তার মধ্যে রামকুমারের যে লেখনী কুশলতা লুকিয়ে আছে তা হল দৈব নির্ভরতাকে বিজ্ঞানের আলোয় দেখে নেওয়া। যেটা মুকুন্দের দৈবনির্ভরতার থেকে আলাদা। বিষয়টি তুলে ধরা হল—"গণক জাতটি বড়ো দ্বিচারী। রাত্রে পৃথিবী যখন ঘুমোয় ওরা গ্রহ-তারা হাতরায়। বুধ-শুক্র চিত্রা-মঘা দেখে।...এদের চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন।"[৩] চণ্ডীমঙ্গালে কবি মুকুন্দ এই বিষয়ে যা লিখেছেন তার কিছুটা তুলে ধরা হল—"খড়িবজ্র খাঁ বলে শুন মোর ভাষ/ ভাল যাত্রা নাহি কহে এই ছয় মাস।...এ বেলি শুনিঞা সাধু মুখ কইল বাঁকা/ নফরে হুকুম দিয়া মারে তারে ঢেকা।"[৪] কবি মুকুন্দের থেকে রামকুমার স্বাতন্ত্র্যতা দেখালেন তাঁর লেখনী কুশলতায়। রামকুমারের গণক যেন একালের ভবিতব্য নির্ধারক। যিনি আগামী ঘটনার সঠিক ইঙ্গিত দিতে পারেন।

রামকুমার মুখোপাধ্যায় প্রথম সমুদ্রকেন্দ্রিক জীবন কথার ছবি উপস্থাপিত করেছেন এবং এও বলা যায় একই সঙ্গো "ইকোলজি নভেল রচনায় তিনি যে ধারার ঐতিহ্য নির্মাণ করেছেন।"[৫] সে বিষয়েও আধুনিক কোনো সাহিত্য তেমন পাওয়া যায় না। 'ধনপতির সিংহলযাত্রা'য় 'Nature writing' : বা 'Environmental criticism' ধারারও একটা প্রভাব লক্ষ করা যায়। লেখক পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের বঙ্গাভূমির "গঞ্জ বাজার, নদী-সাগর, তার প্রকৃতি ও লোককথার জগৎ...."[৬] বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচনায় যা রত্ন সদৃশ। এর ফলে মুকুন্দের বণিকখণ্ড নতুন প্রাণ পেয়েছে রামকুমারের ধনপতির সিংহলযাত্রা নামক উপন্যাসের

মধ্যে। সেইসব রত্নমালার সংকলন সমগ্র উপন্যাস জুড়েই আছে। তবে বিশেষ কিছু অংশ তুলে ধরা হবে।

'সপ্তডিঙা উত্তোলন'-এ দেখা যায় সাধু ধনপতির পৈতৃক ডিঙাগুলিকে। ডিঙাগুলিকে ঘিরে তরণী পূজা পদ্ধতিতে লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের একটা প্রভাব লক্ষ করা যায়। এর উপস্থিতি মঙ্গলকাব্যে ছিল। রামকুমার তাকেই অনুসরণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক বহু প্রাচীন জনপদের কথা বলেছেন। সেখান থেকে তুলে এনেছেন অতীত সংস্কৃতিকে। মধুকর, দুর্গাবর, শঙ্খচূড়, চন্দ্রপাল, ছোটোমুঠি, গুয়ারেখি ও নাটশালা—এই তরীগুলির বর্ণনায় বাঙালির জলযান নির্মাণের সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। এগুলি ধনপতি সমৃদ্ধিরও পরিচয় দান করে। সপ্তডিঙা উত্তোলন শুধু নয় 'ধনপতির ডিঙাঘাটায় গমন', অজয় যাত্রা, মুক্তবেণী, নদ-নদীর মগরায় গমন—এই অধ্যায়গুলিতে বাংলার জীবনযাত্রার সম্পদ এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। অবলুপ্ত নদী জনপদ, এসবের ও বর্ণনা উঠে এসেছে রামকুমারের রচনায়। অনেক পুরোনো বাংলা শব্দ রচনাটির মধ্যে আছে, যা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ব্যবহার না হলেও শব্দগুলিকে অবলুপ্ত হতে দেননি লেখক। এর ফলে গ্রন্থটির আনুমানিক সময়কাল মঙ্গালকাব্য ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী হলেও বিষয়েও বাংলার রূপ, মিথ, ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে এটিকে সমকাল নিরপেক্ষ বলা চলে।[৭] উদাহরণ দেবী চণ্ডীর ভাষায়—

> ওরে পদ্মাবতী। আয় মা আয় বান্যা বেটা লাথ মেরেছে আমার ঘটে। ওই দেখ নিন্দামন্দ বাক বলে ডিঙা ঘাটে চলে। ওরে, তোর মা যায় গড়াগড়ি আর তুই নাগকুন্ডুলিতে পাছা পেতে নিদ্রা যাস...ব্যাটা বলে, স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা পূজে কুলেকালি দিয়েছে খুল্লনা। ওরে পুংলিঙ্গা পুরুষ তোর দুটো মাগ, তবু একটা বৎস নাই কেন রে?[৮]

সপ্তডিঙার বর্ণনায় ধনপতির সমৃদ্ধি প্রতীকটি ফুটে উঠেছে। উদাহরণ—

> যে ডিঙাটি প্রথম তোলে তার নাম মধুকর।...মধুকর যখন জল ভাঙে তখন লক্ষ্য অলির গুঞ্জন ধ্বনি ওঠে।...পরের ডিঙা দুর্গাবর।...দুর্গার দ-কারে দৈন্যনাশ, উ-কারে বিঘ্ননাশ, র-কারে রোগনাশক, গ-কারে পাপনাশ ও আ-কারে ভয় শত্রুনাশ-দুর্গা স্মরণে সাগর পথ নিরাপদ।...পরের ডিঙা শঙ্খচুড।...দৈত্যাকৃতি এই ডিঙার গমনের গমকে জলপ্রানী পালায় চকিতে।...ডুবুরি তোলে চন্দ্রপাল। দৈবসার ও তমাল বৃক্ষের পাটি দিয়ে তৈরি এক মালবাহী জলযান। পরের ডিঙা ছোটমুঠি।...ছোটমুঠির গায়ে রুপার কাজ,...মনে হয় কোজাগর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নায় সহাস্য লক্ষীর সাজ।...ডুবুরি তোলে গয়ারেখি ডিঙা।...গুয়া যাবে দক্ষিণপাটনে।গুয়ারেখির সম্মুখভাগ সিংহমুখী...শেষ ডিঙা নাটশাল। ওটিতে গারবদের বাস। কৌতুক, মজা, তামাশায় ভরপুর।[৯]

তরণির বর্ণনায় নয়; যেন মনে হয়, শব্দরাজি দ্বারা গঠিত 'কারুকার্যমণ্ডিত শিল্পপট' এঁকেছেন রামকুমার। এরকম বর্ণনা উপন্যাসের অন্যত্রও পাওয়া যায়। এই সাতখানি ডিঙা গড়েছিল বিশ্বকর্মার পাঁচ পুত্র যথাক্রমে—কাষ্ঠকার, শিলাকার, লৌহকার, তাম্রকার এবং সুবর্ণকার। মুকুন্দে সপ্তডিঙার বর্ণনায় এরকম চমৎকারিত্ব নেই, উদাহরণ—"প্রথমে তুলিলা ডিঙা নামে মধুকর/ সুদুই সুবর্ণে জাহার রই ঘর।/আর ডিঙ্গাখান তোলে নামে দুর্গাবর।/ আখণ্ড চাপিয়া তার বসিব গারব।"[১০]—এরকম ক্রমান্বয় বর্ণনা আছে। প্রাচীনকাল থেকে শত সহস্র বৎসর ধরে বাণিজ্যের পথেই বয়ে চলেছে দেশ। ময়ূরপঙ্খী নৌ-যানে রাজসিক ভঙ্গিতে সওদাগররা

বাণিজ্যযাত্রা করতেন বাঙালি সদাগর ধনপতির বাণিজ্যযাত্রাও ছিল সেই রূপ। ঔপনিবেশিক শিক্ষায় হারিয়ে যাওয়া সেইসব মধ্যযুগীয় বাণিজ্য জয়যাত্রার দৃশ্যমালার বর্ণনা দিয়েছেন রামকুমার। গ্রন্থটির প্রচ্ছদে রামানন্দ বসুর আঁকা পটচিত্রটি বাঙালির বাণিজ্য জয়যাত্রার ছবিকেই মনে করিয়ে দেয়—

> ঔপনিবেশিকতা একটি জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়, সমাজ-সংস্কৃতি,শিল্প-সাহিত্য চেতনার যে স্বাভাবিক গতি তা ধীরে ধীরে কৃত্রিমতা দিয়ে ঢেকে দেয়। উনিশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এরকমভাবে বাঙালির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার চেস্টা করেছিল বিজ্ঞান ও কারিগরির লোভ দেখিয়ে।[১১]

সেসময় অগ্রসর বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা সবাই এই ঔপনিবেশিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল আবার অনেকেই করেননি। কিন্তু আজও বাংলা সাহিত্য তার থেকে মুক্ত হয়নি। রামকুমার উত্তরাধুনিকতার কথাকার। কিন্তু তবুও 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' রচনাটির মাধ্যমে তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালিকে মধ্যযুগের বিস্তৃত ভারতবর্ষকে নতুন করে তুলে দিলেন বাঙালির পাঠকের হাতে। উপন্যাস সপ্তডিঙা ভাসিয়ে বাণিজ্য যাত্রার বর্ণনায় উঠে এসেছে নবদ্বীপ, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, খড়দহ, মগরা, নীলাচল, শঙ্খদীপ ও সর্পসহ কালিদহ হয়ে ধনপতির সিংহলযাত্রা অনুপুঙ্খ বিবরণ। তার সঙ্গে জনপদগুলির বর্ণনার মধ্য দিয়ে হারানো সম্পদ ফিরিয়ে দিচ্ছেন লেখক। লেখকের হাতে নদীমাতৃক বাংলার মানচিত্র উঠে এল। অসংখ্য জনপদ অতিক্রম করে ধনপতি সাগরে পড়লেন। সপ্তগ্রামের পরেই মগরার পথে দেবীর কোপে ধনপতিকে বহু ক্লেশ ধারণ করতে হয়েছিল। 'নদ-নদী মগরা গমন' পরিচ্ছেদের একটি বর্ণনা দেয়া হল—

> ঊষাকালে নগরিয়া দেখে জল থইথই মগরা, পুষ্করিণী, নয়ানজুলি, সীতাখাল সব ভাগীরথী কোলে আর আর নদী জল পাকশালে, শয়নমন্দিরে দেহারায়।...গঙ্গা ডাকে আমোদর যাত্রা করে জয়পুরের দৈবসার বনানীর মধ্য দিয়ে রাঙা পথে। এক্তেশ্বর দেউলের লিঙ্গ খানি বক্র, রূপবান বাঁকুড়া রায় বঙ্কিম, আমোদরও তাই সর্পিল, কোতুলপুর, কর্মকার পুকুর হয়ে... ঘোড়াদহ গরিয়ে....দারুকেশ্বর ছুঁয়ে মগরার পথে দ্রুত ধায়।[১২]

এই রকম আরও বিস্তীর্ণ জনপদ অতিক্রম করে সাগরে পড়লেন ধনপতি। তখন—"দুলে উঠলো সাগরতল, চঞ্চল হয় জললতা, উতলা জলতরঙ্গ দুর্গাবরের সবর জলদ্রোণীর বার্তা হলো জলস্ফীতির।"[১৩] ধনপতির নদীপথে যাত্রায় লেখকের প্রকৃতিবর্ণনাও ছিল অকৃত্রিম—

> সপ্তডিঙা ত্রিবেনীর পথে। আঘন হিমকণার খানিক ভাগীরথীর তরঙ্গে খানিক প্রভাত গগনে। নদী তটের সাতবর্গ কক্ষপত্রে হেম জলকনা। শ্বেতকমলে রজত।....দুগ্ধধবল তিন শশারুশাবক শমীবৃক্ষের তলে বসে সপ্তডিঙার গমন দেখে।...খাজুরের রসভান্ড নিয়ে ঘরে চালে সিউলি।[১৪]

গদ্যরীতির মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের বাংলার ধ্রুপদি বাচনভঙ্গির প্রকাশ। এখানে গদ্য সাঙ্গীতিক হয়ে উঠেছে। আর একটি প্রকৃতি বর্ণনায় পাই—

> জীর্ণপাতা বনের অপাঙ্গোর, আতন্ডির, কুলিতার দীর্ণ বল্কল খসে তিলক, ধূলিকদম্ব, নিসন্ধ্যার, ঘুরুনিয়া বায়ুতে বিষাদ বনরায় বেনুবন, মহুলফুল, নাগকেশর।...সপ্তঋষির সপ্তগ্রামের বৃক্ষবল্কলে খোদিত একটিই বাণী। প্রবাহিত নদীস্রোতে মর্মরিত একটিই বাণী আনন্দেরহো।[১৫]

গোটা উপন্যাসই এরকম শব্দরাজির গ্রন্থনায় কারুকার্যমণ্ডিত। রামকুমারের এই উপন্যাসের

বৈশিষ্ট্য হল এখানে মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণী, গাছ-গাছড়া, পাখ-পাখালি অর্থাৎ মনুষ্যেতরের মুখে সংলাপ বসিয়ে এরকম নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, সুপারি গাছরা এবং কবুতর, টিয়া, বাজ, পেঁচা, চিল, বাঁদর, প্রভৃতি প্রাণীরা কথা বলে নিজেদের ভাষায়। তাদের কথাবার্তার মধ্যে লেখক ধাঁধা ও হেঁয়ালির প্রকাশ ঘটিয়ে তাদের দিয়ে মানুষের বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে মানুষকেই দিশা নির্দেশ করেছেন। এগুলিতে বাংলার লোকসংস্কৃতির লোকায়ত ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটেছে। ধনপতির উজ্জয়িনী থেকে উজানী নগরে উপনীত হওয়ার দীর্ঘপথ অতিক্রম করার কাহিনির মধ্যে লেখক প্রাচীন ঐতিহ্যের যাত্রাপথকে উপস্থাপিত করেছেন। লেখক যাত্রার প্রতীক রূপে মকরসংক্রান্তির তুসু ভেলাকে নেয়, সেই ভেলায় ভেসে চাঁপাতলা, দুবরাজপুর, বাঁকা দামোদর, গোবিন্দপুর, বর্ধমান হয়ে নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর, ত্রিবেণী অতিক্রম করে সুরনদী গঙ্গা প্রবাহের পথ ধরে স্বর্গপুরের দিকে যাত্রা করে ধনপতি। এইভাবে চণ্ডীমঙ্গালের প্রচলিত পাঠকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখক বিস্মৃত অতীতে পৌঁছে দেন পাঠককে।

'বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহ' অধ্যায়ে বাণিজ্যে যেতে হলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করতে হলে উপযুক্ত বিনিময় দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। বিনিময় দ্রব্য আহরণের প্রথা সুষ্ঠ সংস্কৃতিমনস্কতার পরিচয় বহন করে। গ্রামীণ অর্থনীতির উৎপাদন ব্যবস্থায় ধনোৎপাদনের জন্য বিনিময় প্রথার প্রয়োজন হয় এবং এই বিনিময়ের দৌলতেই সৃষ্ট হয় নতুন শ্রেণির। সমাজে তারা 'বণিক' রূপে পরিচিত। চণ্ডীমঙ্গালের ধনপতি এই সম্প্রদায়ের। সেই সমাজে যে বিনিময় অর্থনীতি ও মুদ্রা অর্থনীতি প্রচলিত ছিল—তা সবই ছিল চণ্ডীমঙ্গালে। ধনপতি যেসব দ্রব্য বিনিময়ের জন্য সিংহল নিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলো সেই সময়ের বাংলার কৃষি সমৃদ্ধতায় ও খাদ্যশস্য নির্ভরতার প্রসঙ্গাকে মনে করিয়ে দেয়। 'ধনপতির সিংহলযাত্রা'-র বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহের একটি উদাহরণ দেওয়া হল—

> নারিকেল যাবে লঙ্কাদীপে। নারিকেল খাবে লঙ্কাবাসী। নারিকেলও কুমড়োর ব্যঞ্জনে বড় স্বাদ। নারিকেল পুলি ও সুস্বাদু। শঙ্খমুখ নারিকেলের বদলে মিলবে সাগর তনয় শঙ্খ। নারিকেল দিলে শঙ্খবলয় মিলবে মা লক্ষীদের হাতে উঠবে।[১৬]

এরকম আরও অনেক বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রাচীন সংস্কৃতিকে ধরবার চেস্টা করেছেন রামকুমার মুখোপাধ্যায়। লেখক রামকুমার মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গাল বারবার পাঠ করে আবিষ্কর্তা তথা স্রষ্টা হয়ে উঠেছেন। সেকালে মুকুন্দ তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রথা, ধর্মকে গতানুগতিক আদলে মান্যতা দিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু একালের স্রষ্টার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। রামকুমারের ধনপতি চণ্ডীর পূজা না করতে অনড়। দ্বাদশবর্ষ সে কারাবাসও করেছে। কিন্তু তবুও ধনপতির প্রেমিক মন খুল্লনার জন্য হাহাকার করে। লহনার কৃতকর্মের জন্য আপশোশ করে। তাই রামকুমার চণ্ডীমঙ্গালের প্রচলিত পাঠকৃতির মাধ্যমে যেমন বিস্মৃতপ্রায় অতীতকে তুলে ধরেছেন, তেমনি গ্রন্থটির শেষে গীতিরস সুধায় পরিপূর্ণ চিরবসন্ত প্রবাহিত সিংহলে পাঠককে যাত্রা করিয়েছেন। রামকুমার 'ধনপতির সিংহলযাত্রা'-য় যে বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন—তা মুকুন্দের বণিক খণ্ডের যুগোপযোগী ভাষ্য হয়ে উঠেছে।

উৎসের সন্ধানে

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস', এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর ২০০০ পৃ. ৫০২

২. রামকুমার মুখোপাধ্যায় : 'ধনপতির সিংহলযাত্রা', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৯
৩. তদেব : পৃ. ১৯
৪. সুকুমার সেন : 'চণ্ডীমঙ্গল', সাহিত্য অকাডেমী, নতুন দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ১৯৫
৫. দীপঙ্কর মল্লিক ও দেবারতি মল্লিক সম্পাদিত : 'রামকুমার মুখোপাধ্যায় 'কথা যাত্রার তিনদশক', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২০৬
৬. তদেব : পৃ. ১৯৭
৭. তদেব : পৃ. ১৯৭
৮. উৎস-২, পৃ. ৪৭
৯. তদেব : পৃ. ২২
১০. উৎস-৪, পৃ. ১৯৫
১১. অঞ্জন সেন : 'ঔপনিবেশিকতা থেকে উত্তর আধুনিকতা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২৫
১২. উৎস-২, পৃ. ১২৬
১৩. তদেব : পৃ. ১৬১
১৪. তদেব : পৃ. ১০৮
১৫. তদেব : পৃ. ১১২, ১১৫
১৬. তদেব : পৃ. ২৫

তথ্যের সন্ধানে

আকর গ্রন্থ

১. রামকুমার মুখোপাধ্যায় : 'ধনপতির সিংহলযাত্রা', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪২৫
২. সুকুমার সেন সম্পাদিত : 'কবিকঙ্কন মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৩

সহায়ক গ্রন্থ

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর ২০০০
২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ২০১৫-২০১৬
৩. অঞ্জন সেন : 'ঔপনিবেশিকতা থেকে উত্তর আধুনিকতা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, মহালয়া ২০১১
৪. দীপঙ্কর মল্লিক ও দেবারতি মল্লিক সম্পাদিত : 'রামকুমার মুখোপাধ্যায় 'কথাযাত্রার তিন দশক', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৩
৫. প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য : 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর', বাকপ্রতিমা, জুলাই ২০১২
৬. বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত : 'কবিকঙ্কন মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গাল বীক্ষা ও সমীক্ষা', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এপ্রিল-২০১৪

রামেশ্বরের শিবায়ন : কৃষি ও কৃষক-বৈচিত্র্যময় বৈদিক উত্তরাধিকার

অজয় কুমার দাস

যুনক্ত সীরা বি যুগা তনুধ্বং কৃতে যেনৌ বপতেহ বীজম্
গিরা চ শৃষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয় ইৎসৃণ্যঃ পক্কমেয়াৎঃ।।[১]

লাঙলগুলি (সীর) যোজনা কর। যুগগুলি (জোয়ালের খিল) বিস্তারিত কর। এ স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে, তাতে বীজ বপন কর। আমাদের স্তবের সঙ্গে আমাদের অন্ন পরিপূর্ণ হোক। সৃণিগুলি (কাস্তে) নিকটবর্তী পক্বশস্যে পতিত হোক।

এ ঋক্ (মন্ত্র) পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্য ঋগ্‌বেদের। বেদের যুগেই উন্নত কৃষি ব্যবস্থার পরিচয় মেলে। কৃষি প্রযুক্তিরও সন্ধান মেলে বেদের যুগে। বিস্তীর্ণ আর্য জনপদ গড়ে উঠেছিল সিন্ধু, গঙ্গা এবং যমুনানদীর তীরবর্তী ভূভাগে। আর্যরা নদী তীরবর্তী অঞ্চলে 'নগর' তৈরি করেছিলেন। 'লৌহময় নগর' অর্থাৎ দুর্গম নগর। আর্যদের কালে কর্মকার (কামার) সম্প্রদায়ের পরিচয় মেলে। কৃষি প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কামার সম্প্রদায়। কামার কৃষিকাজের উপযোগী লাঙল তৈরি করতেন। বলদের সাহায্যেই কৃষিকাজ সম্পন্ন করা হত। পশুদের মধ্যে বলদই ছিল গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পদ। বৈদিক ঋষিরা বলদ, গাভি বা গো-বৎসকে দেবতারূপে মান্যতা দিয়েছিলেন। ঋগ্‌বেদে কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা বৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। কূপ খনন, কর্ষিত ভূমিতে জলসেচন, গোচারণ এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ঋগ্‌বেদে লাঙল যোজনার কথা যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পশুদের জলপানের স্থান, চর্মরজ্জু সংযোজন, ক্ষেতে জলসেচন, জলাধার নির্মাণ, উৎপন্ন ধান সংগ্রহ এমনকি, ধান বহনের জন্য রথ প্রস্তুতের কথাও বলা হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র মেঘের দিকে গমন করেন, মেঘে ভ্রমণ করে তিনি উর্বরা ভূমিতে প্রচুর জলসেচন করেন। ক্ষেত্র স্থানে ছোটো ছোটো নদী একত্র হয়ে ঘৃততুল্য জল বইয়ে দেয়—

স ষহ্যো বনীর্গোদর্বা জুহোতি প্রধন্যাসু সস্রিঃ।
আপাদে যত্র যুজ্যাসোহরথা দ্রোণাশ্বাস ঈরতে ঘৃতংবাঃ।।[২]

ঋগ্‌বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ৫৭ সূক্তের প্রতিটি মন্ত্রই (আটটি মন্ত্র) কৃষিকর্ম অবলম্বনে লেখা। এমনকী মাটি কর্ষণের জন্য লাঙলের সম্মুখভাগে ফাল লাগানোরও উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে

ঋগ্বেদের মন্ত্রে। বলদের সাহায্যে যে লাঙল টানা হত একথাও বলা হয়েছে ৪র্থ মণ্ডলের ৫৭ সূক্তের ৪র্থ ঋকে (মন্ত্রে)। প্রাচীন আর্যঋষি বলেছেন, বলীবর্দসকল সুখে বহন করুক, মনুষ্যসকল সুখে কার্য করুক, লাঙল সুখে কর্ষণ করুক—

শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গালম্
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুন মস্ট্রামুদিঙ্গায়।[৩]

২

প্রায় তিন হাজার বছরের ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা প্রায় একই রকম থেকে গেছে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক। নিম্ন উর্বরা ভূমি শস্য উৎপাদনের অনুকূল। সুতরাং কৃষি ব্যবস্থার বিকশিত রূপ স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশে পূর্ণতা পেয়েছিল। সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী কৃষিকে কেন্দ্র করে বাঙালির লোকজীবন আবর্তিত হয়েছিল। বাংলার দেবদেবী, উৎসব-অনুষ্ঠান, লোকাচার, ব্রত-পার্বণ প্রভৃতি, এককথায় বাঙালির জীবন-যাপন প্রণালী তথা বাঙালি সংস্কৃতির রূপ অনেকটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল আমাদের পূর্বসূরিদের কৃষিজীবন। ভগবান কৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের কাঁধে থাকত লাঙল। মধ্যযুগের মঙ্গালকাব্য সে যুগের সামন্ততান্ত্রিক কৃষিজীবনের দর্পণ। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যে বাংলাদেশের সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার ছবি উপহার দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্য মধ্যযুগীয় কৃষি ও কৃষক সম্বন্ধীয় যথার্থ আকর গ্রন্থ। মাত্র তিরিশ-চল্লিশ বছর হল বাঙালির কৃষিবিদ্যা চর্চায় আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। লাঙলের বদলে এসেছে ট্র্যাক্টর, পাওয়ার টিলার, সংকর বীজ, ঔষধ আর রাসায়নিক সার। কৃষিজমি গেছে কমে। সাবেকি কৃষক বৃত্তি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। কৃষক আন্দোলন তার শক্তি হারিয়েছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং গ্লোবালাইজেশনের প্রভাব পড়েছে বাংলার কৃষিক্ষেত্রে। বিজয় মাল্য, নীরব মোদী, মেহুল চেস্কি আর বিমল মুখোপাধ্যায়দের হাতে কৃষক সমাজের ঘটে গেছে ঐতিহাসিক পরাজয়।

অরণ্য পরিবৃত বাংলাদেশ। জঙ্গাল কেটে প্রজাবসতি হচ্ছে। পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রেরও পত্তন হচ্ছে। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যে রয়েছে আর্য-অনার্যের সংঘাত। আমাদের মহাকাব্য রামায়ণে সেই সংঘাত সর্বব্যাপক দ্যোতনা লাভ করেছে। সমগ্র জাতীয় জীবন প্রতিভাসিত হয়েছে রামায়ণে। রামায়ণের যুগে স্বয়ং রাজা কৃষিক্ষেত্রে লাঙলের সাহায্যে চাষাবাদ করছেন। রাজা জনক লাঙল দিয়ে নিজেই ক্ষেত্র কর্ষণ করেছেন। সেই 'লাঙল পদ্ধতি' (সীতা) থেকে একটি শিশুকন্যা উত্থিত হয়। রাজা জনক সেই কন্যাকে যত্ন সহকারে লালন করেন। সেই কন্যাই সীতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহাকবি বাল্মীকি তাঁর 'রামায়ণম্' গ্রন্থের 'আদিকাণ্ড'-এ লিখেছেন—

> ন্যাসভূতং তদা ন্যস্তমস্মাকং পূর্ব্বজে বিভৌ।/অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙলদুত্থিতা ততঃ।।/ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।/ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্দ্ধত মমাত্মজা।।[৪]

অবশ্য 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এ কবি মিথিলার রাজা জনকের চাষাবাদের জন্য ক্ষেত্র কর্ষণের কথা বলেননি। রাজর্ষি (জনক নামে ঋষি রাজা হয়েছেন) জনক পুত্রকামনায় যজ্ঞভূমি কর্ষণ করেছেন। কবি কৃত্তিবাস তাঁর শ্রীরাম পাঁচালীতে লিখেছেন—

তাঁর (মিথিলার) রাজা হইল জনক নামে ঋষি।/পুত্রের কারণে রাজা যজ্ঞভূমি চষি।।/স্বহস্তে ক্ষেতেতে রাজা চষযে লাঙ্গালে।/ডিম্ব এক উঠে তাঁর লাঙ্গাল শিরালে।।/ডিম্ব ভাঙ্গি জনক করিল খানখান।/কন্যারত্ন দেখে তাহে লক্ষ্মীর সমান।।/পরমা সুন্দরী কন্যা যেন হেমলতা।/শিরালে হইল জন্ম নাম রাখে সীতা।[৫]

রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে যে কৃষিবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তা বহুশতাব্দী ধরে ভারতীয় সমাজের গভীরে স্থায়ী ভিত্তি লাভ করেছিল। কর্মমুখর ব্রাত্য কৃষকদের জীবন-জীবিকা বাস্তবতার সঙ্গেই সম্পৃক্ত। ভারতীয় পুরাণ গ্রন্থ এবং হিন্দুশাস্ত্রে কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ের নানা পরিচয় লাভ করা যায়। ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার ভারতীয় কৃষিবিদ্যাচর্চার এক অবশ্যম্ভাবী দান। এমনকি, কৃষি বিষয়ক অভিজ্ঞতাগুলি বাঙালির দৈনন্দিন জীবনচর্যায় নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক ও সরল হয়ে গেছে। বাঙালির ব্রত পার্বণ, ছড়ায়, ব্রতকথায়, ডাক ও খনার বচনে, রূপকথায় এবং উপকথায় কৃষি প্রযুক্তির কথা মেলে। একভাবে, কৃষিকথা এবং কৃষি প্রযুক্তির নানা বিষয় গাথা, গল্প ও কিংবদন্তিতে স্থানলাভ করেছে। বিশেষত, গ্রাম্য নিরক্ষর কিন্তু আশ্চর্য শিক্ষিত সচেতন প্রবীণ মোড়লের সৃষ্ট যে প্রবাদ সেখানেও জায়গা নিয়েছে। মঙ্গাল-কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং অধীত ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে আহৃত করে পুষ্টি ও লোকোত্তরতা লাভ করেছে। বিশেষত সম্পদ ও সৌন্দর্যের দেবী লক্ষ্মীর বারব্রত, ভূমি পুজো, পৃথিবীকে মাতা কল্পনা, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় থেকে ফসল ওঠা এবং নবান্ন উৎসব পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতায় লোকায়ত মানুষ কৃষিকেন্দ্রিক ফসলেরই উপাসনা করেছে। এমনকী পয়লা বৈশাখে মাঠে মাঠে আগুন জ্বালানোর মধ্য থেকে যে মাঙ্গালিক উৎসবের শুভ সূচনা তা গোয়াল পুজো, গোরু পুজো, লাঙল-জোয়াল পুজোর মহতী অনুধ্যানে বাস্তব সুন্দর হয়েছে। পুরাণের পুজো-পার্বণ অনেকটাই শাস্ত্র সম্মত। 'পদ্মাপুরাণ'-এ বৃক্ষরোপণের সময় 'জলসিক্ত দধি' এবং ফুল-মালার বৃক্ষকে অলংকৃত করা হয়। এছাড়া বস্ত্র দ্বারা বৃক্ষকে আবৃত করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কলশিতে ধান ভরে তা বৃক্ষমূলে স্থাপন করা হয়। গাভিকে বৃক্ষমধ্য থেকে উত্তর দিকে ছেড়ে দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃক্ষরোপণের সময় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ, বাদ্য ও মঙ্গালগানের সঙ্গো সঙ্গো বৃক্ষকে কলশির জল দিয়ে স্নান করানোর কথা বলা হয়েছে। পুরাণে যত্নপূর্বক অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণের কথা বলা হয়েছে। অশ্বত্থ বৃক্ষ সহস্র পুত্রের কার্য সাধন করে। অশ্বত্থ ধন প্রদান করে, অশোক শোক নাশ করিও, ক্ষীরী আয়ুঃপ্রদ, চন্দন পুণ্যপ্রদ, চম্পক শৌভাগ্যসূচক। 'পদ্মাপুরাণ'-এ পুরাণকার লিখেছেন—

যত্নেনাপি চ রাজেন্দ্র অশ্বথারোপণং কুরু/স তে পুত্রসহস্রস্য কৃত্যমেকঃ করিষ্যতি/ধনী চাশ্বথরক্ষেণ অশোকঃ শোকনাশনঃ।/অশ্বথথো রোগনাশায়া পলাশো ব্রহ্মাদস্তথা।/অঙ্কোলে কুলবৃদ্ধিস্ত খাদিরেণাপ্যরোগিতা।/নিম্বপ্ররোহকাণান্তু নিত্যং তুষোদ্দিবাকরঃ।।[৬]

তড়াগ (গভীর জলাশয়) প্রতিষ্ঠা এবং জলাশয় নির্মাণের কথাও 'পদ্মপুরাণ'-এ উল্লিখিত আছে। তড়াগ প্রতিষ্ঠার সময়ে বৈদিক মন্ত্রসহ মৎস নিক্ষেপের কথাও বেদে উল্লিখিত হয়েছে—"ততো নিক্ষিপ্য মকরান্ মৎস্যাদীংশ্চৈব সর্ব্বশঃ।"[৭]

পুরাণে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার মহত্ত্বের কথা উল্লিখিত আছে। পুষ্করিণীর জল দান করলে স্বর্গলাভ হয়। এই জল পবিত্র। জলহীন দেশে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করলেও স্বর্গলাভের পুণ্য অর্জন হয়—

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বাপীকূপতটাককম/কারয়েচ্চ বলৈঃ সর্ব্বৈস্তথা সর্ব্বধনেন চ।।/ততো বিনির্জলে দেশে যো দদাতি জলাশয়ম/বাসরে বাসরে তস্য কল্পং স্বর্গং বিনির্দ্দিশেৎ।[৮]

'মৎস্যপুরাণ'-এ বৃক্ষোৎসব বিধির উল্লেখ করা হয়েছে। বিধি অনুযায়ী বৃক্ষোৎসব সম্পন্ন করলে সমস্ত কামনা পূরণ হয়। যিনি একটি মাত্র বৃক্ষেরও প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিও স্বর্গলাভ করেন। তাঁর উত্তরকালের পুরুষেরা উদ্ধার প্রাপ্ত হয়—

অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যাদ্বৃক্ষোৎসবং বুধঃ।/সর্ব্বান কামানবাপ্নোতি ফলঞ্চানন্ত্যমশ্নুতে।।/ যশ্চৈকমপি রাজেন্দ্র বৃক্ষং সংস্থাপয়েন্নরঃ।/সোহপি স্বর্গে বসেদ্রাজন্ যাবদিন্দ্রাযুতত্রয়ম্।[৯]

হিন্দুশাস্ত্র 'স্মৃতিচিন্তামণিঃ' গ্রন্থে শরৎকালে (আশ্বিন মাসে) ও বসন্তকালে (বৈশাখ মাসে) নবান্ন ভক্ষণের কথা বলা হয়েছে। শুক্লপক্ষে নবান্ন ভক্ষণ করা প্রশস্ত। ব্রহ্মপুরাণের বচন উদ্ধৃত হয়েছে 'স্মৃতিচিন্তামণিঃ' গ্রন্থে। নতুন ধান সুন্দর রূপে পেকেছে, তা জেনে ক্ষেত্র স্বামী আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে গান ও বাদ্যসমেত সেখানে গেলেন—

শুক্লপক্ষে নবং ধ্বন্যং পক্বং জ্ঞাত্বা সুশোভনম্।।
গচ্ছেৎ ক্ষেত্রী বিধানেন গীতবাদ্যপুরঃসরঃ।[১০]

উক্ত শাস্ত্রগ্রন্থে আশ্বিন মাসে শালিধান সহযোগে নবান্ন শ্রাদ্ধের কথা বলা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্র ছাড়া পৌষ, চৈত্র এবং কার্তিক মাসে নবান্ন ভোজন নিষিদ্ধ। শাস্ত্রমতে ধান্যশুদ্ধি করাও নবান্নের উদ্দেশ্য। ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে চোদ্দোশাকের উল্লেখ পাওয়া যায়। চোদ্দশাক খেলে কার্তিকের টান থেকে রেহাই মেলে। আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য বাংলার একটি প্রবাদের উল্লেখ করে বলেছেন—"কারণ এই মাসে যমের বাড়ির ৮টি দরজা খোলা থাকে।"[১১] 'চরক সংহিতায়' হরিদ্রা ও করবীর ছাল এবং পলাশ বৃক্ষের ছালের ক্বাথ সহযোগে কুষ্ঠরোগ দূরীকরণের কথা বলা হয়েছে—

উভে হরিদ্রে কুটজস্য বীজং করঞ্জবীজং সুমনঃপ্রবালান্।
ত্বচং সমধ্যং হয়মারকস্য লেপং তিলক্ষারসুতং বিদধ্যাৎ।[১২]

মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ফলে আমাদের এই বাংলাদেশে শস্য উৎপাদন সম্ভব হয়। কালিদাস তাঁর 'মেঘদূত' গ্রন্থে লিখেছেন, কৃষিফল তোমার (মেঘের) উপর নির্ভর করে। তুমি (মেঘ) সদ্য হলকর্ষিত মালভূমির উপর আরোহণ করবে—

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকর্ষণসুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং।[১৩]

রামেশ্বরের শিবায়নে 'শূন্যপুরাণ'-এর প্রভাব আছে। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'-এ ধর্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতির বিবরণ আছে। একথা মনে করার সংগত কারণ রয়েছে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শূন্যপুরাণ' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"ধর্মঠাকুর বৃষ্টির দেবতা। তিনি অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি শস্যেরও দেবতা।"[১৪] শত শত বৎসরের কৃষিবিদ্যা চর্চায় লোকায়ত অভিজ্ঞতা সমাজ দেহে এত দৃঢ় দূর বিস্তৃত শক্তি অর্জন করেছে যে, তা

প্রবাদে রূপলাভ করেছে। কৃষিবিষয়ক লোকপ্রযুক্তি বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে কিংবদন্তির রূপ পেয়েছে। 'ধান ভানতে শিবের গীত'[১৫]—এ প্রবাদ সুশীলকুমার দে—তাঁর 'বাংলা প্রবাদ' সংগ্রহে তালিকাভুক্ত করেছেন। আবার রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর শিবায়নেও লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও ভিন্ন শিল্পরূপে পরিবেশন করেছেন তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তরে'—"এই মাত্র বুড়া বয়সের ঢেঁকি পাড়িয়া বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতেছিল, আবার এ শিবের গীত কেন।"[১৬]—একটি বাক্যে কৃষি উপকরণের আনুমানিক বিষয়গুলি উপস্থাপিত করে বঙ্কিমচন্দ্র সমকালের সামাজিক অব্যবস্থাকে কাঠঠোক্‌রার মতো ঠোক্কর দিয়ে পুঁতিগন্ধময় পঙ্কিলতাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন। ঠিক তেমনি লাঙল অনায়াসে স্থান করে নেয় প্রবাদে। কর্মবিমুখ ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় নিজেরা কায়িক শ্রম বা চাষাবাদ করতেন না। কিন্তু চাষযোগ্য জমির মালিক ছিলেন তারা, কেবল দেখাশোনা করতেন। তবু কৃষক লোকসমাজে হয়ে ওঠেন উপহাসের পাত্র—

'বামুন গেল ঘর, ত লাঙল তুলে ধর'[১৭]

চাষি বংশ পরম্পরায় দরিদ্র থেকে যান। কঠিন সমাজ, চাষির এই বারোমাসী দুঃখকে সমান উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন। সুশীলকুমার দে তাঁর 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থে এরকম প্রবাদ সংগ্রহ করেছেন—"চাষার কেবল এগার মাস দুঃখ, আর সকল মাস সুখ"[১৮] কৃষকের এমন দারিদ্র্য আর ঘোঁচে না—"কি করবে কার্তিকের চাষে, ভাত পাই না ভাদ্রমাসে।"[১৯] তবুও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই বৃত্তিকে বর্জন করা যায় না—"মনে মনে হাসে চাষা/কাঁধে লাঙল জাত ব্যবসা।"[২০] চাষ করলেও জমির মালিক কৃষক হতে পারেননি। প্রবাদে মেলে—"ঠিকের জমি, নিকের মাগ।"[২১]

কৃষককে এরকমভাবেই বেঁচে-বর্তে থাকতে হয় অনিশ্চয় অবস্থায়। আর পাকে-চক্রে ফসলের নানা ক্ষতি তো হয়ই। মই সে অর্থ তাৎপর্যেও ব্যবহৃত—"পাকা ধানে মই দেওয়া"[২১(ক)] এমন প্রবাদের সৃষ্টি বুঝি সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে।

কৃষক পরিবারের সন্তান হওয়ায় বর্তমান লেখক শুনে এসেছেন নানা কৃষি বিষয়ক ছড়া। বাংলার পল্লি কৃষকেরা এমন ছড়া স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতায় বলে এসেছে বছরের পর বছর। বর্তমান লেখকের কয়েকটি এমন প্রবাদ বা ছড়া তো কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে। যেমন—

১. "আষাঢ়ে রয় দলকে/শ্রাবণে রয় ফলকে/ভাদ্রে রয় শীসকে/আশ্বিনে রয় কিসকে।"[২২]

আষাঢ়ে চারা ধান রোপণে কেবল খড়ই হয়, ফসল ভালো হয় না। শ্রাবণই ভালো ফসলের উপযুক্ত সময়। ভাদ্রের শিষ দেখে মনে হয়, ফসল ভালো হয়েছে, কিন্তু তা হয় না। আর আশ্বিনে ধান্য রোপণে তেমন কিছু লাভ হয় না।

২. ষোল চাষে মুলা/তার অর্ধেক তুলা/তার অর্ধেক ধান/তার অর্ধেক পান।[২৩]

৩. চাষ বাস বৈশাখ মাস[২৪]

৪. গোয়াল গোরু চেঁচকো ঘাস খায়[২৫]

৪র্থ সংখ্যক দৃষ্টান্তে গোয়ালে বাঁধা গোরুর দুর্ভাগ্য সহজেই অনুমেয়। কোনো উন্মুক্ত মাঠের দূর্বা ঘাস নয়, জলাজমির নিম্ন শ্রেণির চেঁচকো ঘাসই তার সম্বল। বৃত্তি পরিবর্তনও বাংলার কৃষককে রক্ষা করতে পারেনি। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের গফুর ব্রাহ্মণ্য জমিদার তর্করত্নের

অত্যাচারে আদরের বলদ মহেশকে বেচে দিয়ে কন্যা আমিনার হাত ধরে চটকলে কাজে বেরিয়ে পড়েন। বৃত্তি পরিবর্তনও তাকে রক্ষা করতে পারেনি। যেখানে কৃষকের সম্মান তো দূরের কথা, মেয়েদেরও আব্রু থাকে না, সেখানে জীবনের আরেক যন্ত্রণাকে মেনে নিতে বাধ্য হয় গফুর। সুশীলকুমার দে মহাশয় তাঁর 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থে এরকম প্রবাদ সংগ্রহ করেছেন—

চাষ করে খাচ্ছিল আবদুল ছিল ভাল
চৌকিদারি নিয়ে আবদুল পরাণে মল।[২৬]

৩

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য এবং কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মঙ্গালকাব্যের এই দুই কবি অবিভক্ত মেদিনীপুরের মাটিতে বসেই তাঁদের কাব্যচর্চা করেছেন। মেদিনীপুর কৃষির আঁতুড়ঘর। রামেশ্বরের কাব্যের প্রকৃত নাম 'শিবসঙ্কীর্তন' বা 'শিবায়ন'। আর মুকুন্দের কাব্যের প্রকৃত নাম 'অভয়ামঙ্গাল'। প্রথমটি শিবকাহিনি বা শিবায়ন, দ্বিতীয়টি চণ্ডীকাহিনি বা চণ্ডীমঙ্গাল। চাষাবাদের উপযোগী উর্বর পলল মৃত্তিকার জেলা মেদিনীপুর। রামেশ্বরের শিবকাহিনির শিব কৃষকের প্রতিরূপ। সমগ্র অষ্টাদশ পুরাণ তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেও শিবের এমন নিম্নবর্গীয় ব্রাত্য কৃষক মূর্তির দেখা মেলে না। এমনকী 'শিবপুরাণ'—এও নয়। ভারতীয় দেববাদের অধিদেবতা যে শিব, কৃষি সংস্কৃতিতে তিনি যে ভারতীয় জীবনচর্যার কেন্দ্রস্থ শক্তি-উৎস, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাঙালি কবি রামেশ্বর তা দেখিয়েছেন তাঁর কাব্যে।

রামেশ্বরের কৃষক শিব প্রান্তিক, হতদরিদ্র। একান্তই নিজের হাতে লাঙল ধরা চাষা। লক্ষ্মীর বাসস্থান কৃষিতে। কাব্যে দরিদ্র শিব অভাব অনটনের কারণেই মাঠে কৃষিকাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। শিবের কৃষিকাজের এই বর্ণনা রয়েছে—"ষষ্ঠদিবসীয় নিশাপালা আরম্ভ"-এর মধ্যে। কতকগুলি পর্যায়ে শিবের চাষ বৃত্তান্তকে কাব্যরূপ দিয়েছেন কবি। শিবের চাষাবাদের মধ্য থেকে সমকালের সামন্ততান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার চিত্রকে পর্যায়ক্রমে শিল্পরূপ দিয়েছেন রামেশ্বর। 'ষষ্ঠদিবস'-এর এই পালার সূচনা "অথ চাষপালা আরম্ভ" শিরোনামে।

রামেশ্বরের শিব জানেন—"গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিণীর গুণে।"[২৭] তা সত্ত্বে সংসারের অনটন এড়াতে পারেন না তিনি। শিব জানেন, বসে বসে অন্নগ্রহণ করলে গাঙের বালিও কুলোয় না—"বসি খাত্যে আঁটে নাঞি বারিধির বালি।"[২৮] তাই তিনি চাষ করবেন, এমন চিন্তা করেছেন। চাষের মহিমা তিনি বোঝেন—

চিন্তিলাম চন্দ্রচূড় চাষ বড় ধন।.../চাষী বিনা চাষের মহিমা কেবা জানে।.../লক্ষ্মী পুষি চাষী করে সভাকারে তাজা।.../অতঃপর চলিল চাষের অনুবন্ধ।[২৯]

অবশেষে ভার্যা চণ্ডীর কাছে চাষের ছাড়পত্র পেয়েছেন তিনি। পত্নী তাকে জানিয়েছেন, বাণিজ্য তো তাঁর দ্বারা হবেই না, চাষ ছাড়া তিনি কোনো কর্মের যোগ্যই নন—'চাষ বিনে আর কোন কর্ম্মযোগ্য তুমি'। (ব্যবসায় বিচার)[৩০]। সুতরাং বাংলার হাজারো চাষির মতো শিবেরও বুকভরা আশা। স্ত্রীর প্রতি কৌতূহলী প্রশ্ন—"হালের সামাল কিসে হবেক সুন্দরী/কোথা হাল্যা কোথা হেল্যা কোথা বা লাঙল।" (ব্যবসায় বিচার)[৩১]

সব স্থির। তবুও দৈনন্দিন পারিবারিক বিষয়ে কলহ আর শেষ হয় না। কিন্তু শিব তার

সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন—'কুবেরের বাটী বীজ বাড়ি কর‍্যা আন।/...ভীম আছে হাল্যা আর অনির্ব্বাহ কি।"৩২ (হরপার্ব্বতীর কলহ) শিবের বাস্তব বুদ্ধিও প্রখর। বিনা বেতনে বিশাইকে দিয়ে তিনি বেগার খাটিয়ে নিতে চান। কাজের পরিকল্পনা করেও ফেলেন—"দেখ বিনা বেতনে বিশায়্যা বল্যা কালি,/গাছ কাট্যা গড়াইব লাঙ্গল জোয়ালি,/ঘাত করা ঘরে তারে পাতাইব শাল/শূল ভাঙা সাজসজ্জা করাইব ফাল।"৩৩ (হরপার্ব্বতীর কলহ) শিব জানিয়েছেন, তিনি হাল করেই জীবিকা নির্বাহ করতে চান—"শূল ভাঙ্গা হাল ফাল কর‍্যা হার ধর‍্যা খাব।"৩৪

এরপর শিব 'কৃষির উদ্‌যোগ' করেছেন। কোনো কাজই তিনি ফেলে রাখেন না। কিন্তু চাষের জন্য প্রয়োজন চাষযোগ্য ভূমি। ইন্দ্রই দিতে পারেন ভূমি। শিব ইন্দ্রের নিকটে গেলেন। এই অংশটি ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার স্বরূপ মুহূর্তে দ্যোতিত করে। ইন্দ্র এই কাব্যে জমিদারতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। জমিদারের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পেত না সাধারণ কৃষক। কিন্তু 'পাট্টায়' (এক ধরনের লিখিত দলিল) যেখানে জমির পরিমাণ আবাদি-অনাবাদি সমস্ত কিছুই লেখা থাকত। এই রায়তি পাট্টাই কৃষককে জমিদারের শোষণ, অত্যাচার থেকে রক্ষা করত। তাও সবক্ষেত্রে সম্ভব হত না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক আখ্যানের প্রেক্ষিতে সাঁওতাল জীবনচিত্রের বর্ণনা আছে। অমল আর অহীন্দ্র যখন দু'জনেই গোল্ড স্মিথের 'Deserted Village' কবিতার পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ করে চলেন—

> I'll fares the land, to hastening ills a prey/Where wealth accumulates, and men decay/Princes and lords may flourish, or may fade/A breath can make them, as a breath has made;/But a bold Peasantry, their Country's pride/When once destroyed, can never be supplied./আহীন্দ্রঃ His Companions, innocence and health./And his best riches, ignorance of wealth.35

তখন আবহমান দরিদ্র বাঙালি কৃষকের নিষ্করুণ জীবনচর্যার ট্র্যাজেডিকেই শিল্পচিহ্নিত হতে দেখি। সেদিনের সমাজতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থায় কেমন ছিল বাংলার কৃষকেরা? রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'বাংলার কৃষক সমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন—

> তারা (কৃষকেরা) ধারের টাকায় জমি চাষ করত, আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে অসমর্থ হয়ে ধৈর্যের প্রতিমূর্তি সেজে ভাঙা কুঁড়েয় বসে থাকত। আবার চাষ করত উর্বরা ভূমিতে। যুগ-যুগান্তর ধরেই তারা যা করেছে তা-ই আজও করে চলেছে। যে বীজ তারা বোনে, তা ধার করা, যে টাকায় তারা বছরের এগারোটা মাসের খোরাকি জোটায় তাও ধার করা, ধার যা করে তা বছরের শেষে কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেয়, আবার ধার করবে বলে। অত্যাচারীর ধনলিপ্সা ব্যর্থ করার মতো কোনও রাস্তাই ওইসব হতভাগ্যরা বার করতে পারে নি।৩৬

রামেশ্বরের শিবায়নে শিব ইন্দ্রের থেকে চাষভূমি গ্রহণ করবেন। তবে তাঁর সংশয় থেকে গেছে। কেননা, বিষয় (সম্পদ) মুখের কথার বস্তু নয়। তাছাড়া শত্রু তো রয়েছেই। সুতরাং তিনি কাগজে কলমে লিখে 'পাট্টা' করে নিতে চাইছেন—

> শিব বলে শত্রু কিছু চক্রবক্র আছে/খন্দ হলে ক্ষেতে তুমি দ্বন্দ্ব কর পাছে/বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়/পাটাটুকি পাল্যে পরিণাম শুদ্ধ হয়।/...করে লয়্যা মসী পত্র কশ্যপের বেটা/দেবদেবে লিখ্যা দিল দেবোত্তর পাটা।৩৭

শিব নিজেকে দুঃখী চাষিই বলেছেন। অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টির কারণে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। হালের গোরু (লাঙলের হেলে গোরু) সংগ্রহ করেছেন। কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় লোকপ্রযুক্তি যথা লাঙল, জোয়াল, কোদাল, ফাল, কাস্তে প্রভৃতি নির্মাণ করেছেন—"ঈশ্বরীর ইচ্ছায় বিশাই পায় পড়্যা,/লাঙল জুয়ালি মই সদ্য দিল গড়্যা,/...পাঁচ মনে পাশী করি আশী মনে ফাল,/দু মনে দু জোলই তার অর্দ্ধেক কোদাল।"[৩৮] এরপর শিব লাঙলের ঈষ ধরে পাশি মেরে ফাল পরিয়েছেন—"ঈষ ধর‍্যা পাশি মার‍্যা পরাইল ফাল।/বাঁট দিয়া কোদালে জুয়ালে দিয়া সলি।।"[৩৯] এভাবেই বাঁট দিয়ে কোদাল তৈরি করেছেন, জুয়ালে সলি (দড়ি বিশেষ) পরিয়েছেন। এরপর শিব বীজধানের খোঁজ করেছেন। কিন্তু দরিদ্র শিবের তো অর্থ নাই। কি করবেন তিনি? এ হল আবহমান বাঙালি দরিদ্র কৃষকের ছবি। মহাজনের কাছে ঋণের দায়ে আজীবন জড়িয়ে পড়েন বাঙালি কৃষক। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কৃষিঋণ কৃষককে বারোমাসিয়া শ্রমিকে (Bonded Labour) পরিণত করে। মহাজন কুবের টাকার ভাণ্ডার ঘড়। তাঁর কাছে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ আছে। তিনি (শিব) নিজে গেলে ধার নাও মিলতে পারে। কিন্তু কৃষক রমণীকে হয়তো ফেরাবেন না মহাজন কুবের। তাই পার্বতীকে পাঠিয়েছেন টাকা ধার করতে—"কাত্যায়নি কর্জ্জ কর কুবেরের কাছে।"[৪০] অবশেষে সংগৃহীত হল বীজধান। শিব চাষাবাদের জন্য কৃষিক্ষেত্রে যাত্রা করলেন। বাড়ি থেকে কৃষিক্ষেত্র অনেকটা দূরে। তাই সন্তান সন্ততিকে ফেলে যেতে মন চায় না। কেননা, দিন রাত সেখানে থাকতে হবে। তবুও যেতে হয়। শুভক্ষণে মাঘমাসে শুরু হয় 'হলকর্ষণ'। বর্তমান লেখক পল্লিগ্রামের কৃষককে বলতে শুনেছেন—"যদি বর্ষে মাঘের শেষ/ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।"[৪১] আর 'ডাকের বচন'—এ মেলে—"মাঘের মাটি হীরার পাটি।"[৪২] অর্থাৎ মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হলে, তারপর লাঙল করলে ভালো ফসল ফলে। রামেশ্বর সেই উত্তরাধিকাকে বহন করলেন তাঁর কাব্যে—"মহীতলে মাঘ শেষে মেঘরস দিলা"[৪৩] মাঘের এমন পুণ্য দিনে শুরু হল লাঙল (হল্য প্রবাহ), যা হিন্দু পঞ্জিকা সম্মত। রামেশ্বর লিখলেন—"হৈল হল—প্রবাহ শিবের শুভক্ষণে"[৪৪] তারপর 'আগুয়াচিরা', 'বড়ানি', 'কাদা', বাঁধ তৈরি, নালা (নিকাশি) ব্যবস্থা এসবের কিছু লিখেছেন রামেশ্বর। অনুচর ভীম খুব খেটেছেন। ভাত খেয়ে সকাল সকাল চাষ চষেন তিনি। শিবের স্নেহ বাক্য তাঁর প্রতি। রামেশ্বরের কলম স্বতঃস্ফূর্ত—"ভীম কর‍্যা ভোজন প্রভাতে যুড়ে হাল।"[৪৫] শিবের ক্ষেতে ফসল। অনেক ফসল। চৈত্র মাস সমাপ্ত হল। কৃষিকাজ সম্পূর্ণ হল। আবার আষাঢ় (বর্ষা) দুয়ারে দাঁড়ায়। পরিজনের আনন্দ আর ধরে না। নারদের ঢেঁকির ধান ভানা আর চিড়া কুটানোর শব্দ শোনা যায় সেই রাত থেকে। 'অথ চাষ পালা' সমাপ্ত হয়। ভারতীয় কৃষিবিদ্যা ও কৃষি সংস্কৃতি বিষয়ক লেখনীতে রামেশ্বর অমরতা লাভ করলেন। পুরাণের দেবাদিদেব মহেশ্বর সাধারণ কৃষক শিব হয়ে নেমে এলেন বাংলার মাঠে ঘাটে, শ্যাওলা ভরা পানা পুকুরে।

৪

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গালে কালকেতু দেবীর অনুগ্রহে অর্থ সম্পদ লাভ করেছেন। জঙ্গাল কেটে নগর পত্তন করেছেন তিনি। প্রজাবসতি করিয়েছেন। জঙ্গালকাটাই প্রজার সাক্ষাৎ মেলে

কবিকঙ্কণের কাব্যে। কৃষিজমিতে কৃষির পত্তন করতে চেয়েছেন তিনি। আহ্বান করেছেন বুলান মণ্ডলকে। 'বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতু'-র এই আহ্বান বাংলা সাহিত্যে কৃষকের মর্যাদা রক্ষণে প্রথম মাঙ্গালিক শঙ্খধ্বনি, সুডাক। কৃষকের প্রতি অনার্য নায়ক কালকেতুর এই মর্মস্পর্শী সহানুভূতি তাকে সাহিত্যে অমর করে রেখেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে এই মমত্ব পাওয়া কঠিন। কবিকঙ্কণের কাব্যে কালকেতু তা করেছেন। বুলান মণ্ডলকে কালকেতু সহজ শর্তে কৃষিজমিতে চাষ করতে বলেছেন। যত খুশি চাষের অনুমতি দিয়েছেন। সাত বছর কর মুকুবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 'পাট্টা' কাগজ করে দিতে চেয়েছেন। কাউকে ভয় করতে মানা করেছেন। ধীরে-সুস্থে সময় সুযোগ হলে তবেই বুলান মণ্ডলকে কিছু কিছু 'কড়ি' বা অর্থ দিতে বলেছেন। কালকেতু কোনো ডিহিদার নিয়োগ করবেন না। মুকুন্দরামের ব্যক্তিগত অত্যাচারের তিক্ত অভিজ্ঞতার ছায়া পড়েছে কাব্যে। বুলান মণ্ডল যতই চাল-ধান বেচুক না কেন, তিনি কোনো দান নেবেন না। মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন—"শুন ভাই বুলান মণ্ডল/আমার নগরে বৈস/যত ভূমি চাষ চষ/সাত সন বই দিয় কর।/হাল পীছে এক তঙ্কা/না করিহ কারে শঙ্কা/পাটায় নিশান মোর ধর।"[৪৬]

অপরপক্ষে, ভাড়ু দত্ত বুলানকে অবজ্ঞা করেছেন। তিনি যেন কালকেতুর কাছ থেকে জোর করে সব আদায় করে নিতে চেয়েছেন। ভাঁড়ুর আবেদনের মধ্যে থেকে কৃষি উপকরণের দুর্লভ চালচিত্র ফুটে উঠেছে—

হাল বলদ দিবে খুড়া দিবেহে বিছন-পুড়া
ভান্যা খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবে।[৪৭]

হাল বলদের সঙ্গো 'বিছন-পুড়া' ('ধানের গোলা')-ও চেয়ে নিচ্ছেন ভাঁড়ু দত্ত। সঙ্গো ঢেঁকি কুলাও। দরিদ্র চাষি বুলান মণ্ডল যিনি ভাঁড়ুর 'চিটা' বহন করতেন, ধান ভানতেন, দারিদ্র্যের তাড়নায় টেনি (নিম্নমানের কাপড় বা গামছা বিশেষ) পরে দিন কাটাতেন, কালকেতু সেই ব্রাত্য কৃষককে সম্মান জানিয়েছেন।

৫

ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান দেবতার দরিদ্র কৃষক রূপে আবির্ভাব শুধু রামেশ্বরের কাব্যে নয়, ভারতীয় সাহিত্য ধারায় তা অনন্য সংযোজন নিশ্চয়ই। কিন্তু রামেশ্বরের কাব্যে তা একান্তই মৌলিক। গ্রাম বাংলার মাঠ-ঘাট, পুকুর-ডোবা-পানা, গাছ-গাছালির সঙ্গো তা সম্পর্কের রসায়নে শিল্পসুন্দর। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'-এ 'অথ চাষ' অধ্যায়ে দিগম্বর শিবের উদ্দেশ্যে উপদেশের উল্লেখ আছে। ঘরে ঘরে ভিক্ষে করে খাওয়ার থেকে কৃষিকর্ম করা মঙ্গালজনক। কৃষিকাজ করলেই অভাব অনটনের অবসান হবে। প্রভুকে চাষের পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন বাংলার প্রাচীন কবিকুল। কথায় বলে, ভিক্ষায় দুঃখ যায় না। পুকুরের ধারের জমি নেওয়ার উপদেশ আছে কাব্যে। জল না থাকলে পুকুরের জলেই চাষবাস হবে। নিজের ঘরের ভাত অনেক সুখের। বাঘের ছাল পরার দরকার নেই। কার্পাস তুলোর চাষের পরামর্শ আছে। সেই তুলোতে বস্ত্র বয়ন করে সেই বস্ত্র পরিধান করবেন প্রভু। তিল, সরিসা, মুগ কলাই এবং কলা চাষের উল্লেখ আছে কাব্যে। রামাই পণ্ডিত লিখেছেন—

আম্নার বচনে গোসাঞি তুম্নি চস চাস/পুখরী কাঁদাত্র লইব ভুম খানি।/আরসা হইলে জেন ছিচত্র দিব পানি/ঘরে ধান্ন থাকিলেক প্ররভু সুখে অন্ন খাব।/অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব।।/কাপাস চসহ পরভু পরিব কাপড়।/কতনা পরিব গোঁসাই কেওদা বাঘের ছড়।।/তিল সরিসা চাস কর গোঁসাই বলি তব পাএ।/কত না মাখিব গোঁসাঞি বিভূতিগুলা গাএ।।/মুগ বাটলা আর চসিহ ইঁখু চাস।/সকল চাস চস পরভু আর রুইত্ত কলা।[৪৮]

এগুলি বাঙালির নিজস্ব চাষবাস। দিগম্বর শিবের প্রতি এমন কৃষিকর্মের উপদেশ ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গো একান্তই সামঞ্জস্যপূর্ণ। লাঙল দিয়ে হলকর্ষণ করে কৃষিকর্মের কথা উল্লিখিত রয়েছে 'শূন্যপুরাণ'-এ। লাঙল, জোয়াল, লাঙলে গোরুজোড়া, মই প্রভৃতি কৃষিকাজ বিষয়ক পদ্ধতির খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন রামাই পণ্ডিত। রামেশ্বরের শিবায়নের মতোই মাঘ মাসে কৃষির পত্তনের কথা উল্লিখিত আছে—"মাঘ মাসে গোঁসাই পিথিবি মঙ্গালিল"[৪৯] রয়েছে 'ভোজ' নামের বীজ ধানের উল্লেখ—"বীজ ভোজ নাহি দুগগা বল তার কথা।"[৫০] শ্রাবণ মাসে ধান রোপণ, ভাদ্রে ধান গাছের মোহময় রূপ, আশ্বিনের বরষা, কার্তিকের শিশিরপাত, অগ্রহায়ণের পাকা ধান পাঠককে চমৎকৃত করে—"অঘানে পাকএ সিস।"[৫১]

আর কাস্তে দিয়ে ধান কাটা। সর্বোপরি শিবের আজ্ঞায় ভীম ধান বাঁধা-ছাঁদা করে নিয়ে এলেন। হনুমান থাকলেন প্রহরী। নানা প্রজাতির ধানের বর্ণনা 'শূন্যপুরাণ'-কে কৃষিচর্যার মহাকোষ গ্রন্থ করে তুলেছে।

৬

কৃষিকর্মের অনুশীলন ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যগত। বিদ্যাপতি শিবের উদ্দেশ্যে বলেছেন, পুত্র পরিজনকে তিনি কী করে পালন করবেন—"সব বোল হুনি হর জগত কিসান।"[৫২] শিব হলেন জগতের কৃষক। এছাড়া 'ধর্মপূজা বিধান'-এ শিবের কৃষিকর্মের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে তাকে কৃষিকাজ করতে হবে, তাই তার অসহয়তা স্পষ্ট—"কোথা পাব হাল্যা গরু কোথা পাব ফাল।/কোথা পাব লাঙ্গল কোথা পাইব জুয়াল।"[৫৩]

নিম্নবর্গীয় ব্রাত্য কৃষকের এমন অসহায় পরিণতি বাঙালি সমাজের একান্ত বাস্তব ঘটনা। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যে সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজের এমন অসম অর্থনৈতিক বিন্যাসের ছবি ধরা পড়েছে। হরিহোড় বলেছেন—"বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে/আকুল অন্নের তরে/ঘুঁটে বেচা আমার সম্বল।/ভাঙা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে/বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে/অন্নের সংযোগ মোর নাই।"[৫৪] বাংলাদেশে কৃষক রোদে পুড়ে, জলে ভিজে কঠিন শ্রমে কৃষিকাজ করেও নিজের পেটের ভাত জোগাতে পারেনি। তারা দারিদ্র্য ও ঋণ নিয়েই মৃত্যুবরণ করে। অসম সমাজের এমনই নির্মম চিত্র—Karl Marx তাঁর 'Capital' (Das Kapital) গ্রন্থে লিখেছেন—

> Lastly nothing can have value, without being an object of utility. If the thing is useless, so is the labour contained in it the labour does not count as labour, and therefore creats no value.[৫৫]

কৃষকের জমি আজ শিল্পপতিরা কেড়ে নিয়েছে। চিমনির ধোঁয়া আজও ওঠে। বাতাস ভারি করে ('কালিন্দী', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)। কৃষক শিব এখন আবারও ভিক্ষুক। বলদের অপমৃত্যু (হত্যা বা নিধন) হয়েছে। বিদ্যাপতির শিব আজও বাঙালি পাঠকের স্মৃতিতে ফেরে।

বিদ্যাপতি তাঁর হরগৌরী বিষয়ক পদে লিখেছেন, বৃষে চড়ে শিব শ্মশানে বেড়ান—“বসহা চঢ়ল শিব ফিরহ মসান।”[৫৬] কৃষকেরা আজ শ্মশানে, সত্যিই মৃত্যুর দেশে। ধনতান্ত্রিক সমাজ, অসম রেনেসাঁ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সর্বোপরি বিশ্বায়নের জাঁতাকলে কৃষক আজ বন্দি। বহু শতাব্দী লালিত কৃষিপদ্ধতির একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে গেছে মাত্র প্রায় চার দশক পূর্বে। কিন্তু কিছুদিন আগেও তা ছিল বাস্তব, বাঙালির নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেই নস্টালজিয়ায় উদ্ভাসিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে A.L. Basham-এর সত্যভাষ্য। তিনি তাঁর ‘The Wonder that was India’ গ্রন্থে লিখেছেন—

> The basic livestock of the peasant were cattle, used for ploughing, transport and food. Villages employed a communal cowherd, who drove the cattle, branded with their owners' marks, to the waste beyond the ploughed fields every morning, and returned with them at dusk.[৫৭]

উৎসের সন্ধানে

১. রমেশচন্দ্র দত্ত অনুবাদিত : ঋগ্বেদ-সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড), ১০ মণ্ডল, ১০১সূক্ত, ঋক্ (মন্ত্র) সংখ্যা-৩, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ৫৯০

২. পূর্বোক্ত, ১০ মণ্ডল, ৯৯ সূক্ত, ঋক্ (মন্ত্র) সংখ্যা-৪, পৃ. ৫৮৭

৩. পূর্বোক্ত, ৪র্থ মণ্ডল, ৫৭ সূক্ত, ৪র্থ ঋক্ (মন্ত্র), পৃ. ৫৩২

৪. শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত : মহর্ষি বাল্মীকি ‘রামায়ণম্’ (আদিকাণ্ড), বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১১৫-১১৬

৫. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : কৃত্তিবাস ওঝা, ‘রামায়ণ’, (আদিকাণ্ড) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ভূমিকা), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৫০-৫১

৬. শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত : মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, ‘পদ্ম-পুরাণম’ সৃষ্টিখণ্ডম, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪১২, পৃ. ৩৫২

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০১

৯. শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত : মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, মৎস্যপুরাণম বৃক্ষোৎসব বিধি, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪০৬, পৃ. ২০৮

১০. শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য : ‘স্মৃতিচিন্তামণিঃ’, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪২৫, পৃ. ৩০৫

১১. আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য, চিরঞ্জীব বনৌষধ, চৌদ্দশাক, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২২, পৃ. ১

১২. বৈদ্যাচার্য কালীকিঙ্কর সেনশর্মা সম্পাদিত : ‘মহর্ষি চরক, চরক সংহিতা’ (প্রথম খণ্ড), দীপায়ন, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২২

১৩. কালিদাস : ‘মেঘদূত’, ‘পূর্বমেঘ’, কালিদাসের মেঘদূত, রাজশেখর বসু, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪১১, পৃ. ১৬

১৪. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : রামাই পণ্ডিত, ‘শূন্যপুরাণ’, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, ১৪২০, পৃ. পরিচায়িকা/৬

১৫. শ্রী সুশীলকুমার দে : 'বাংলা প্রবাদ', এ মুখার্জী এন্ড কো. লি., কলকাতা, ১৩৫৯, পৃ. ৪৫৫
১৬. খন্দকার শামীম আহমেদ সম্পাদিত : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কমলাকান্তের দপ্তর', কথা প্রকাশ, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০১৫
১৭. শ্রী সুশীলকুমার দে : 'বাংলা প্রবাদ', এ মুখার্জী এন্ড কো. লি., কলকাতা, ১৩৫৯, পৃ. ৫৬০
১৮. পূর্বোক্ত : পৃ. ৩৩৯
১৯. পূর্বোক্ত : পৃ. ২৪২
২০. পূর্বোক্ত : পৃ. ৬১৭
২১. পূর্বোক্ত : পৃ. ৩৯২
২১(ক) পূর্বোক্ত : পৃ. ৫০০
২২. লেখক কর্তৃক সংগৃহীত
২৩. লেখক কর্তৃক সংগৃহীত
২৪. লেখক কর্তৃক সংগৃহীত
২৫. লেখক কর্তৃক সংগৃহীত
২৬. উৎস-১৫, পৃ. ৩৩৯
২৭. পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত : রামেশ্বর ভট্টাচার্য 'শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন', রামেশ্বর রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা ২০১৩, পৃ. ৪৪৬
২৮. তদেব
২৯. তদেব
৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৭
৩১. তদেব
৩২. তদেব
৩৩. তদেব
৩৪. তদেব
৩৫. Gold Smith, Deserted Village : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'কালিন্দী' উপন্যাস থেকে উদ্ধৃতিটি গৃহীত, 'কালিন্দী', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭, পৃ. ১৮৮
৩৬. সুধীর রায়চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত : রমেশচন্দ্র দত্তের 'বাংলার কৃষক সমাজ', দীপায়ন, কলকাতা, ১৪০৩, পৃ. ২০-২১
৩৭. উৎস-২৭, পৃ. ৪৪৯-৪৫০
৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫১
৩৯. তদেব
৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫২
৪১. লেখক কর্তৃক সংগৃহীত
৪২. উৎস-২৭, পৃ. ১৮৩
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৪
৪৪. তদেব
৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৫

৪৬. সুকুমার সেন সম্পাদিত : মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'চণ্ডীমঙ্গল', সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩, পৃ. ৭৬
৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭
৪৮. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : 'রামাই পণ্ডিত', শূন্যপুরাণ, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, ১৪২০, পৃ. ১২২-১২৩
৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪
৫০. তদেব
৫১. তদেব : পৃ. ১২৫
৫২. উৎস-২৭, পৃ. ১৭২
৫৩. পূর্বোক্ত, 'ধর্মপূজাবিধান', পৃ. ১৫১
৫৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত : রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল' (প্রথম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪২৫, পৃ. ১৮২-১৮৩
৫৫. Karl Marx : 'Capital (Das Kapital), Finger print classics, Prakash Books India pvt. Ltd. New Delhi, 2020, P. 20
৫৬. শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত : বিদ্যাপতি, হরগৌরী বিষয়ক পদ, বিদ্যাপতির পদাবলী, প্রকাশক-শ্রী শরৎকুমার মিত্র, কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা, ১৩৫৯, পৃ. ৪৮১
৫৭. A.L. Basham : 'The wonder that was India', picador, London, 2004, P. 196

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গাল : অনুষঙ্গো অর্থনীতি

নিরু বর্মণ

মঙ্গালকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যটি রচিত হয়েছিল আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে। তাঁর কাব্যের শেষলগ্নে যে রচনাকাল জ্ঞাপক পদটি পাওয়া যায় তা হল—

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।।[১]

অর্থাৎ ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫২-৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর কাব্য রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবকাল নিয়ে পন্ডিত মহলে বিতর্ক থাকলেও তাঁর মৃত্যু হয় ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে। কাব্যটি তাঁর পরিণত বয়সেরই (৪০) ফসল। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই কবি আঠারো শতকের প্রথমার্ধের একটু একটু করে পালটে যাওয়া বাংলার জাতীয় জীবনকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ধনী ভূস্বামীর সন্তান হয়েও তাঁকে বারবার ভাগ্যবিড়ম্বনার কবলে পড়তে হয়েছিল। অবশ্য মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কল্যাণেই তাঁর ভাগ্যচক্রের গতি পরিবর্তন হয়। মহারাজা তাঁর অন্নসংস্থান ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেন। মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় কৃতবিদ্য এই কবিকে সভাকবি নিযুক্ত করেন।[২] সরস্বতীর বরপুত্র এই কবি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাই তাঁর কাব্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজ পরিবারের প্রশস্তি কীর্তন করে দায়মুক্ত হতে চেয়েছেন। কিন্তু এই বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার দীপ্তি স্থিমিত হয়ে যায়নি। রাজ প্রশস্তির মধ্যেও ভারতচন্দ্রের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সজাগ ছিল। আর তাই আঠারো শতকের ভাঙন ধরা ধর্মীয় সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির অন্তঃসারশূন্য ফাঁপা আড়ম্বরকে ব্যঙ্গোর কষাঘাতে তুলে ধরা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়নি।

ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবলগ্নে বাংলায় প্রচলিত ছিল ভূমিদাস বা সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। আর সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ভাগ্য জড়িত থাকে রাজনৈতিক সুস্থিরতার উপর। কিন্তু আঠারো শতক ভারতবর্ষের ইতিহাসে অবক্ষয়ের কালপর্ব হিসেবেই চিহ্নিত। এই সময়পর্বে ভারত জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেশের মানুষকে দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলেছিল। তবে তুলনামূলকভাবে বাংলায় রাজনৈতিক সুস্থিরতা বজায় থাকায় বাংলার মানুষ একপ্রকার শান্তিতেই দিনযাপন করেছিল। সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনাতেও বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধির কথাই বলা হয়েছে। উৎপাদনের দিক থেকে পূর্ববর্তী যুগের মতো এই

সময়পর্বেও বাংলা ছিল একপ্রকার স্বনির্ভর। ইতিহাসে উল্লেখ আছে সুবাদার শায়েস্তা খাঁর আমলে (১৬৬৪-১৬৮৮) 'সুবা বাংলা'য় টাকায় আট মন ধান পাওয়া যেত। আঠারো শতকে নবাব সুজাউদ্দিনের আমলেও (১৭৪৭-১৭৩৯) এই বাজারদর অব্যাহত ছিল।[৩] এর থেকেই তৎকালীন বাংলার দ্রব্যমূল্যের স্বল্পতার ধারণা অনেকটাই অনুমান করা যায়। অধ্যাপক সুশীল চৌধুরী নবাবি আমলের বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে সেই সময়কালে রচিত ফারসি গ্রন্থের উল্লেখ করে লিখেছেন—

> আঠারো শতকের প্রথমভাগে নবাবি আমলেও যে বাংলা সতেরো শতকের মতো সমান সম্পদশালী ও ক্রম উন্নতিশীল ছিল তার সাক্ষ্য মেলে তখনকার প্রায় সমসাময়িক ফার্সি ইতিহাস 'রিয়াজ-উল-বিলাদ' রচয়িতার লেখায়। তিনিও বাংলাকে 'জান্নাত-উল-বিলাদ' বা জাতির স্বর্গ বলে বর্ণনা করেছেন।[৪]

বাংলার অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল নবাবি আমলে বাংলায় রাজনৈতিক সুস্থিরতা। এই শতকের শুরুর দিকে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুতে (১৭০৭) দেশজুড়ে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছিল—তার সুযোগ নিয়ে বাংলায় দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ-র নবাবরূপে আত্মপ্রকাশ; ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে একই সঙ্গে সুবাদার ও দেওয়ানি পদ লাভ[৫] বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দিল্লির বাদশাহি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত নবাবি শাসন প্রতিষ্ঠা করে তিনি প্রজাকল্যাণেও মনোযোগ দিয়েছিলেন। মুর্শিদকুলির নতুন ভূমিসংস্কার ও কর বিন্যাস পদ্ধতি কৃষকদের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। মুর্শিদকুলি পরবর্তী নবাবদের আমলেও বাংলার এই আর্থিক অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল। অবশ্য নবাব আলিবর্দীর সময়কালে (১৭৪০-১৭৫৬) বাংলায় প্রায় এক দশক ধরে 'বর্গী হাঙ্গামা' (১৭৪২-১৭৫১) বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে প্রবল আঘাত হেনেছিল। বিশেষ করে বাংলার পশ্চিম অংশে শ্মশানের নীরবতা নেমে এসেছিল। ভারতচন্দ্র নিজেও 'বর্গী হাঙ্গামা'র পরোক্ষ ভুক্তভোগী। তাঁর কাব্যেও 'বর্গি হাঙ্গামা'র প্রসঙ্গ এসেছে। তবে তাঁর রচনায় বর্গি আক্রমণের তীব্রতার পরিচয় আমরা পাই না। মারাঠাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন বাংলার কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ তাঁর 'বাংলাদেশের আর্থিক ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন—"মারাঠা যদি বা কিছু অসুবিধা করেও থাকে তা রাজ্যের পশ্চিম অংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাজ্যের অন্যান্য অংশ ছিল শান্তিপূর্ণ। বাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সম্পদও সঞ্চিত হচ্ছিল।"[৬] অর্থাৎ ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে আমরা বলতে পারি প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বে নবাবি আমলে বাংলায় মোটামোটি সুসময় বজায় ছিল। কিন্তু বাংলার এই আর্থিক সমৃদ্ধির সুফল সাধারণ স্তরে কতটা পৌঁছেছিল—তার সন্ধান আমরা ইতিহাসের পাতায় পাই না। কেননা, আমরা জানি ঐতিহাসিক শুধু বড়ো সময়েরই কারবারি। আলোচক অশীন দাশগুপ্ত তাঁর 'ইতিহাস ও সাহিত্য' প্রবন্ধে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকের সময় ব্যবহারের পার্থক্য প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ঐতিহাসিক বড়ো সময়ের কারবারি। কোনও কোনও ঐতিহাসিক কী জীবনীকার দুর্লভ সৌভাগ্যে কখনও কখনও ছোট সময়কে ধরতে পারেন। ইতিহাসের ছাত্র সাধারণত ছোট সময় থেকে সরে থাকেন। ব্যক্তিগত সময় শুধুমাত্র সাহিত্যিকের।[৭]

ঐতিহাসিক ও পর্যটকরা যেখানে শুধু বাংলার সমৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরেই দায় সেরেছেন, সেখানে গণমানুষের প্রতিনিধি সাহিত্যিকের দল আলোর নীচে থাকা অন্ধকারের অতল গহ্বরেরও সন্ধান দিয়েছেন। আর তাই প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বের বাঙালির অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক পরিচয় পেতে আমরা সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত সময় ধরে এই পর্বের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের আশ্রয় নিতে পারি।

ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে আঠারো শতকের বাংলার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির পরিচয় দিয়েছেন। সেই সময় কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে প্রাচুর্য ছিল। কাব্যের 'মানসিংহ' অংশে এই প্রাচুর্যতার কথাই বলা হয়েছে—

ধান চালু মাষ মুগ ছোলা অরহর।
মসূরাদি বরবটী বাটুলা মটর।।
দেধান মাড়ুয়া কোদো চিনা ভুরা যব।
জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব।।[৮]

কাব্যের বর্ণনা পড়ে মনে হয় কবি তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি নিংড়ে বাংলাদেশের চাষ-আবাদের পরিচয় দিয়েছেন। ধান, মুগ, মুসুর, ছোলা, অরহর, মটর ইত্যাদি ফসল উৎপাদনের কথা সমসাময়িক পর্যটকদের বিবরণীতেও পাওয়া যায়।

কৃষিকাজ ব্যতীত আঠারো শতকের গ্রামবাংলায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কারিগরদের সন্ধান পাওয়া যায়। নবাবি আমলে কৃষিকাজের পরেই সুতোকাটা ও বস্ত্রবয়নে সবথেকে বেশি মানুষ নিযুক্ত থাকত। আঠারো শতকের সমাজ প্রেক্ষাপটে কৌলীন্য প্রথার বলি বাড়ির মেয়েরা সাধারণত এই কাজ করত। অনেক সময় আবার তাদের সুতো কেটে জমানো অর্থে ভাগ বসাত কুলীন স্বামী। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশে এই বাস্তব প্রতিচ্ছবিই ধরা পড়েছে—"দু চারি বৎসরে যদি আসে একবার।/শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার।।/সূতাবেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।/তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়।।"[৯]

কুলীন পত্নীর এই খেদোক্তিতে সমকালের কৌলীন্য প্রথার পাশাপাশি বাংলার মেয়েদের স্বনির্ভরতারও পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনৈতিক সুস্থিরতা, উৎপাদনের প্রাচুর্য, দ্রব্যমূল্যের স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে বাংলা হয়ে উঠেছিল দেশি-বিদেশি বণিকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় আর্মেনীয়, আরব, চিনা প্রভৃতি প্রাচ্যের বণিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গে পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্য কারবারের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বিশ্ববাজারের সঙ্গে বাংলার যোগসূত্র তৈরি ঔপনিবেশিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির আগমনেই সম্ভব হয়েছিল একথা বলা ঠিক হবে না। কেননা, ইউরোপীয়রা আসার বহু শত বছর আগে থেকেই বাংলার পণ্য ইউরোপের বাজার লাভ করেছিল। সংগত কারণেই অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম মন্তব্য করেছেন—

> বস্তুত ইউরোপে বাংলার পণ্যের পরিচয় ছিল বলেই ইউরোপের বণিকেরা জলপথে এদেশে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করে, কারণ তুর্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংযোগকারী বাণিজ্য পথগুলি তুর্কি সম্রাটের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।[১০]

জলপথে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংযোগে বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছিল একথা বলাবাহুল্য। নৌপথে বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণে কৃষিজাত দ্রব্য, শিল্পপণ্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ও দেশের বাইরে রপ্তানি হত। শুধু বিদেশি বণিকরাই নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বণিকরাও বাংলার হাটে-বাজারে উপস্থিত হয়ে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করত। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে এই কারবারিদের পরিচয় পাওয়া যায়—

> প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।/ইঙ্গারেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস।।/দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।/সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী।।.../সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন।/ লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সংখ্যা করে ধন।।[১১]

ব্যবসা-বাণিজ্যের এই অনুকূল পরিবেশে দেশি-বিদেশি বণিক সমাজের কল্যাণে বাণিজ্যের কাঁচা অর্থ বাঙালিদের আকর্ষিত করে তুলেছিল। বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনেকের কাছেই বিত্তশালী হওয়ার সুযোগ এসেছিল। কাব্যে এই বিত্তশালীদের বিলাসবহুল জীবনের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। 'পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল' জেনেও মানুষের চিন্তা-চেতনার বিবর্তন হতে শুরু করেছিল। ফলত কৃষিকাজের ক্ষেত্রে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। পূর্ববর্তী কবি রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে শিবের উক্তিতে বাঙালির এই চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে—

> চাষ অভিলাষ ক্ষেমা কর ক্ষেমঙ্করী।
> আর কিছু ব্যাবসায় বল তাহা করি।।[১২]

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যেও বৃদ্ধ দরিদ্র শিব গৃহিণী পার্বতীর সাথে ঝগড়া করে ভিক্ষাযাত্রায় বেড়িয়ে বাণিজ্য ব্যাপার না জানার জন্য আক্ষেপ করেছেন—

> বৃদ্ধকালে আপনার নাহি জানি রোজগার
> চাষবাস বাণিজ্য ব্যাপার।...
> বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্ধেক চাষ
> রাজসেবা কত খচমচ।[১৩]

আসলে আঠারো শতকের প্রথমার্ধে একটু একটু করে পালটে যাওয়া বাংলার জাতীয় জীবনকে বুঝতে অসুবিধা হয়নি যুগন্ধর কবি ভারতচন্দ্রের। তাঁর সংবেদনশীল মনে সহজেই তা দাগ কেটেছে; সৃষ্টিকর্মে প্রতিচ্ছবি হয়ে ধরা দিয়েছে।

সুজলা-সুফলা বাংলার আর একটি বড়ো বিশেষত্ব ছিল দ্রব্যমূল্যের স্বল্পতা। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের অন্যতম পার্শ্বচরিত্র হীরা মালিনীর মধ্য দিয়ে কবি সেই চিত্রই তুলে ধরেছেন—

> আট পনে আধসের আনিয়াছি চিনি।
> অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।।...
> আট পণে আনিয়াছি কাট আট আটি।
> নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আটি।।[১৪]

সেই সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্বল্পমূল্যের পরিচয় হীরার উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে এও সত্য যে, দ্রব্যমূল্য কম থাকলেও সাধারণ মানুষের কাছে তা ছিল মূলত নাগালের বাইরে। দ্রব্য কেনার মতো প্রয়োজনীয় অর্থসম্পদ তাদের থাকত না। অথচ এই সময় বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে বাংলার উদ্বৃত্ত কৃষিজাত ও শিল্পজাত পণ্যের

বিনিময়ে বিদেশ থেকে মূল্যবান ধাতব আমদানি হত। কিন্তু এই মূল্যবান ধাতব সামগ্রী বাংলার নবাবরা রাজস্ব হিসেবে দিল্লিতে প্রেরণ করত, আর যা কিছু অবশিষ্ট থাকত তা ব্যক্তিগত সঞ্চয় অথবা বিলাসের সামগ্রী অলংকার তৈরিতে ব্যবহার করা হত।[১৫] দৈনন্দিন ক্রিয়াকাণ্ড ও ছোটোখাটো বিনিময়ের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার হত না। সাধারণ মানুষকে কড়ি দিয়ে কাজ সারতে হত। আঠারো শতকে কড়ির মূল্য সাধারণ মানুষের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল—তার প্রমাণ পাওয়া যায় অন্নদামঙ্গল কাব্যে হীরা মালিনীর জবানিতে—

কড়ি ফটকা চিড়া দই   বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া   কড়ি লোভে মড়ে গিয়া
কূলবধূ ভূলে কড়ি দিলে।।[১৬]

অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের সময়কালে দ্রব্যমূল্য কম ছিল কিন্তু সাধারণ মানুষের হাতে পয়সা ছিল না। আর এক্ষেত্রে তাই সুলভ মূল্যের তাৎপর্য জনগণের সমৃদ্ধি নয়, দুর্দশাকেই ইঙ্গিত করে। এক্ষেত্রে বলা যায়, দ্রব্যমূল্যের স্বল্পতাই শুধু দেশের সমৃদ্ধির কারণ নয়, সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সচ্ছলতার দিকটিও সমানভাবে বিবেচনা করা উচিত। ভারতচন্দ্রের সময়কালে বাংলায় উৎপাদনের প্রাচুর্য ছিল, বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশও বজায় ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটেনি। তাঁরা দরিদ্রই থেকে গেছে। পূর্ববর্তী কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য 'শিবায়ন' কাব্যে অত্যন্ত মমতা দিয়ে বালিকা গৌরীর পুতুল খেলা প্রসঙ্গে বাঙালির এই দুঃখ-দারিদ্র্যের কথাই শুনিয়েছেন—

আঁটু ঢাকা বস্ত্র দিয়, পেট ভরা ভাত।
প্রীতি কর্য যেমন জানকী রঘুনাথ।।[১৭]

সেই সময়ে কন্যা বিদায়ের মর্মবেদনা বালিকা গৌরীর মধ্য দিয়ে কাব্যে প্রকাশ করা হলেও সমকালীন গ্রামীণ অর্থনীতির আর্থিক দীনতার চিত্রটি অপ্রকাশিত থাকেনি। আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভাধর কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গাল কাব্যেও সেই সময়ের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। কাব্যে আমরা অন্ন ভিখারি শিবকে পাই। অন্ন প্রত্যাশী শিব অন্নের খোঁজে গৃহস্থের দ্বারে পৌঁছালে শুনতে পান অন্নাভাবে গৃহস্থের শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি—

> কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।/অন্ন বিনা সবে আজ হয়েছি আকুল।।/কান্দিছে আপনা শিশু অন্ন না পাইয়া।/কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া।।[১৮]

এই চিত্র গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে বিদ্যমান ছিল। এই কাব্যেই আমরা 'অন্ন বিনা কলেবর অস্থিচর্মসার' পদ্মিনীকে পাই। পদ্মিনীর বর্ণনায় কবির সেন্স অব হিউমারের প্রশংসা করতেই হয়—"পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী।/পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী।।"[১৯] দেবী অন্নপূর্ণা পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হয়ে দীন-দুঃখী মানুষকে কৃপাদান করতে চেয়েছেন। অবশ্য দেবী অন্নদাকে এর জন্য বিশেষ অন্বেষণ করতে হয়নি, সহজেই সাক্ষাৎ পেয়েছেন দীন-দুঃখী পদ্মিনীর—

জয়ারে কহিলা দেবী হাসিয়া হাসিয়া।/এ গ্রামে কে বড় দুঃখী দেখহ ভাবিয়া।।.../হেন কালে এক রামা স্নান করি যায়।/তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়।।[২০]

কবির এই বর্ণনা তাঁর যুগসচেতন মানসিকতারই ফসল। অর্থকষ্টে ভোগা আঠারো শতকের সাধারণ মানুষের কাছে তেল কিনে অর্থ খরচ করা ছিল অনেকটা বিলাসিতার সামিল। সে সময়ে মানুষের চাহিদা ছিল সামান্য। মোটা চালের ভাত ও দেহ আবৃত করার মতো মোটা কাপড় পেলেই তারা খুশি থাকত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্যতম অপূর্ব সৃষ্টি ঈশ্বরী পাটনী তাই হয়তো দেবী অন্নপূর্ণাকে সামনে পেয়ে ঐশ্বর্যভোগ না চেয়ে অতি সামান্যই প্রার্থনা জানিয়েছেন—

প্রণমিয়া পাটুনি কহিছে যোর হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।।[২১]

চারিদিকে নিরন্ন মানুষের হাহাকার ধ্বনির মাঝে ঈশ্বরী পাটনী সন্তানের দুধভাতের ব্যবস্থা করে যেন অনিশ্চয়তার যুগে বেঁচে থাকার একটি নিশ্চিত আশ্বাস প্রার্থনা করেছেন। আর যুগের প্রেক্ষিতে ঈশ্বরীর এই প্রার্থনা হয়ে উঠেছে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক।

ভারতচন্দ্র যে সময়কালে কাব্য রচনা করেছিলেন, সেই সময়পর্বে অর্থাৎ নবাবি আমলে বাংলায় কৃষিজাত ও শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রপ্তানি বাণিজ্যের ব্যাপক বৃদ্ধি হলেও সাধারণ স্তরে এর সুফল পৌঁছায়নি। উৎপাদক শ্রেণির অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তাদের গড় আয় ছিল খুবই কম। কৃষিজাত ও অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য কম থাকায় উদ্‌বৃত্ত পণ্য বাজারজাত করার কোনো উৎসাহ কৃষকরা পেতেন না। আঠারো শতকের বাংলার সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের এই দুরবস্থার চিত্রই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে উঠে এসেছে। বাংলার অর্থনীতির বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সৃষ্টিকর্মে। সেখানে যেমন সমৃদ্ধির কথা আছে, তেমনি তার পাশাপাশি নিদারুণ দারিদ্র্যও জায়গা করে নিয়েছে।

উৎসের সন্ধানে

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত : ‘ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী’, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, মাঘ ১৪১৯, পৃ-৪৪১
২. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত : ‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে, ১৯৯৮, পৃ. ১৭
৩. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত : ‘বাংলাদেশের ইতিহাস’ (১৭০৪-১৯৭১), দ্বিতীয় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-পৌষ, ১৪০০, পৃ. ৪২
৪. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত : ‘বাংলাদেশের ইতিহাস’ (১৭০৪-১৯৭১), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯
৫. JADUNATH SARKAR (Edited) : ‘THE HISTORY OF BENGAL’, VOLUME-II, THE UNIVERSITY OF DACCA, DACCA, BANGLADESH, 1948. P. 399
৬. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ : ‘বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস’, প্রথম খণ্ড, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুদিত), রিভার্স সার্ভিস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ১০
৭. অশীন দাশগুপ্ত : ‘ইতিহাস ও সাহিত্য’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-

জানুয়ারি, ১৯৮৯, পৃ. ৪১
৮. উৎস-১, পৃ. ৩৯২
৯. উৎস-১, পৃ. ৩২৪
১০. উৎস-৩, পৃ. ২
১১. উৎস-১, পৃ. ২১৩
১২. পঞ্চানন চক্রবর্তী : 'রামেশ্বর রচনাবলী', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪১৯, পৃ. ৪৪৭
১৩. উৎস-১, পৃ. ৮৪
১৪. তদেব : পৃ. ২২৬-২২৭
১৫. উৎস-৩, পৃ. ৫৯৪
১৬. উৎস-১, পৃ. ২২৪
১৭. উৎস-১২, পৃ. ৩৭৬
১৮. উৎস-১, পৃ. ৯১
১৯. তদেব : পৃ. ১৭৯
২০. তদেব : পৃ. ১৭৯
২১. তদেব : পৃ. ২০৩

মনসার আত্মসংকট

পিয়ালী চক্রবর্তী (দে)

ইতিহাসের ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা কোনো যুগেই সহজ হয়নি। আর্যযুগে নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার বেশ কিছু নিদর্শন আমাদের কাছে আছে। কিন্তু তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল, তার আনুপূর্বিক বর্ণনা তেমন ভাবে পাওয়া যায় না। তাই আর্যযুগে নারীর সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সার্বিক কোনো পরিচয় পাওয়ার কোনো পথ আজ আর আমাদের কাছে খোলা নেই। দশম শতাব্দী থেকে যুগাতিহাস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্বচ্ছ হতে থাকে। রক্ষিত হয় ইতিহাসের নানান উপাদান, যা পরবর্তীকালে ইতিহাস রচনায় অত্যন্ত সহায়ক।

মধ্যযুগকে এক কথায় দেব-নির্ভর যুগ বলে চিহ্নিত করা হলেও সেই যুগের শিল্প সাহিত্যের মধ্যে কান পাতলে যুগের মর্মবাণী তথা গভীর গোপন আর্তি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যায়। কী অনুবাদ সাহিত্য, কী মঙ্গলকাব্য, পদাবলী সাহিত্য, আখ্যানকাব্য—সবের মধ্যেই দেব-বন্দনার অন্তরালে মানুষের অন্তরের গোপন কথা বেড়িয়ে পড়ে। পিতৃতান্ত্রিক তথা পুরুষশাসিত সমাজে বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্যে নারী যখনই পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে তখন সমাজের এক শ্রেণির পুরুষ তাদের অবদমিত করে রাখার চেষ্টা করেছে। শাসকের সহায়তায় নারীর উপর চাপ সৃষ্টি করে তার ক্ষমতাকে খর্ব করার চেষ্টা করেছে। তবে এই কথাও সত্য যে এক শ্রেণির প্রগতিশীল পুরুষ নারীদের অধিকার রক্ষায় সর্বদা সহায়তা করে গেছে। আজ পর্যন্ত নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে সাফল্য চোখে পড়ে তার পিছনে এক শ্রেণির পুরুষের সাহায্য ও সহযোগিতা যে অত্যন্ত সক্রিয়, তা বলাবাহুল্য।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি শিষ্ট আর্য সমাজের ফসল নয়, অনার্য ব্রাত্য মানুষের জনশ্রুতি তথা প্রচলিত আখ্যানকে আত্মসাৎ করেই রচিত। তুর্কি আক্রমণের মতো ঘটনা না ঘটলে মঙ্গলকাব্যের জন্ম হত কিনা সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। অবস্থার বিপাকে পড়েই সমাজের উপরিতলের মানুষ নীচু তলার মানুষের শরণে আসে। এরই সুবাদে অনার্য দেব-দেবীরাও আর্য সমাজে সমাদর পেতে শুরু করে। কিন্তু আর্যেতর সমাজের আর্য সমাজে স্থান পাওয়ার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করেই তাদের আর্য সমাজে সমাদর পেতে হয়েছিল। বিশেষ করে অনার্য সমাজে নারীদের প্রাধান্য থাকায় সেই

অনুপ্রবেশ আরও কঠিন হয়ে যায়। প্রথম মঙ্গালকাব্য মনসামঙ্গালের কাহিনিতে অনেক অনার্য দেবী মিলেমিশে একাকার হয়েছেন। আদি মনসামঙ্গাল কবির সৌজন্যে এই সম্মিলন সম্পন্ন হয়েছিল সন্দেহ নেই। পরে অন্যান্য মনসামঙ্গাল কবির সেই উৎস থেকেই কাহিনি সংগ্রহ করে তাদের কাব্য রচনা করেছেন। উৎস এক হওয়ায় প্রায় একই সময়ে রচিত দুই বাংলার মনসামঙ্গাল কবিদের কাহিনির মধ্যে মূলগত কোনো পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। মনসামঙ্গালের বিখ্যাত কবি বিজয়গুপ্ত জানিয়েছেন "প্রথম রচিল গীত। কানা হরি দত্ত"। কিন্তু তাঁর কালে সে কাব্যের নাকি কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। হয়তো কবি নিজেই হরিদত্তের 'মনসাগীত' আত্মসাৎ করেছেন তাঁর কাব্যে, বলা কঠিন। কবির নামে যদি অন্য কোনো কাব্য বা আখ্যানের পুথি পাওয়া যেত তাহলে অবশ্য কবির মৌলিকত্ব বা কবি প্রতিভা সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকত না। তবে সব মনসামঙ্গাল কবিই যে একই উৎস থেকে তাঁদের কাব্য উপাদান সংগ্রহ করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নাই। মনসা পরিকল্পনায় বৌদ্ধ মহাজ্ঞানী তান্ত্রিক জাঙ্গুলি তারা, দ্রাবিরদের সর্পদেবী মঞ্চাম্মা মহাভারতের নাগ দেবীর প্রভাব রয়েছে। পুরাণে মনসার জন্ম-কাহিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে দেবীর আভিজাত্য কোনো দিক দিয়ে খর্ব না হয় সেইজন্য নাগ-কুলের পিতা কশ্যপের সাথেও তার সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়েছে। শৈব ধর্মের প্রভাবে মনসামঙ্গাল কাব্যগুলিতে মনসাকে শিবের কন্যারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে সংস্কৃত উপপুরাণে মহাভারতের প্রভাবে মনসাকে নাগ পিতা কশ্যপ কর্তৃক সৃষ্ট বলে অভিহিত করা হয়েছে। একখানি উপপুরাণে বলা হয়েছে—মনসার জন্ম হলে পর বেদাদি অধ্যয়নের জন্য কৈলাসে শঙ্কর ভবনে যাত্রা করেন। হাজার বছর কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে মহাজ্ঞান লাভ করেন। তারপর মনসা একে একে ত্রিলোকের পূজা লাভ করার পর পিতা কশ্যপ তাকে জরৎকারু মুনির সাথে বিবাহ দেন। মনসার লৌকিক কাহিনির সাথে মহাভারতের বাসুকির ভগিনি জরৎকারুর কাহিনি একসময় মিলে যায়। বাংলায় মনসার যে কাহিনি পাওয়া যায় তা মহাভারতের আদি পর্বের অন্তর্গত সমগ্র নাগ কাহিনির সংক্ষিপ্ত রূপ।

মনসা ও চাঁদ সওদাগরের কাহিনি দুই দেব পূজক সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বের কাহিনি হওয়াই সম্ভব। পরবর্তীতে এর সাথে আরও সব কাহিনি যুক্ত হয়েছে। নেত ও শঙ্কুর কাহিনি আদিতে স্বতন্ত্র ছিল বলেই মনে হয়। এই কাহিনিকে পরবর্তীকালে মূল কাহিনির সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে এই অনুমান একেবারেই অসংগত নয়। মনসামঙ্গাল কাহিনিতে অনার্য দেবীর আর্য সমাজে পূজা পাবার দীর্ঘ সংগ্রামের কথা বলা আছে। একে অনার্য তাতে আবার নারী দেবতা ফলে তাঁর পক্ষে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যে সে যুগে সহজ ছিল না তা সহজেই অনুমেয়। সমগ্র মনসামঙ্গাল কাব্য জুড়ে মনসার দেবীত্বে রূপান্তরের জন্য আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রাম কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মঙ্গালকাব্যের দেবীদের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এমন কঠিন সংগ্রাম আর কোনো কাব্যের দেবীকে করতে দেখা যায়নি। সেদিক থেকে বিচার করলে মনসামঙ্গাল আসলে দেবী মনসার আত্মসংকট ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একের পর এক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে মনসাকে। একমাত্র নেত ছাড়া তাকে সেই সংকট মুক্তিতে সহায়তা করার কেউ ছিল না। আর্য সমাজের প্রতিভূ পিতা দেবাদিদেব মহেশ্বর

পর্যন্ত নিজের কন্যার প্রতি ক্ষণে ক্ষণে রুষ্ট হয়েছেন, তাকে কটু কথা বলেছেন। পরিবার-সমাজের কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি না পাওয়া একজন নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য একক সংগ্রাম যে কত কঠিন হয়ে উঠতে পারে, তা মনসামঙ্গালের কাহিনি পড়লে বোঝা যায়। যে জন্মের পর থেকে পিতা-মাতার সাহচর্য পায়নি, অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা যার নিত্য জীবনের সঙ্গী; তার পক্ষে এমন প্রতিস্পর্ধী কোপনস্বভাবা হওয়া বিচিত্র নয়।

মঙ্গালকাব্যের রীতি অনুযায়ী কাব্যের চরিত্রগুলিকে স্বর্গ থেকেই আমদানি করা হয়েছে। তবে মর্ত্যজীবনে এসে তাদের গা থেকে স্বর্গের বেশ-ভূষা সৌরভটুকুকে পর্যন্ত মুছে দেওয়া হয়েছে। তাদের আচার আচরণকে মর্ত-মানবের অনুসারী করেই প্রকাশ করা হয়েছে। দেবত্বের কোনো মহিমাই তাদের মধ্যে অবশিষ্ট রাখা হয়নি। মনসামঙ্গালে প্রধান চরিত্র মনসা ও চাঁদ সওদাগর। নাট্যকাহিনির মতো এই দু'এর দ্বন্দ্ব কাব্যে পর্যায়ক্রমে দেখানো হয়েছে। নাটকের টানটান উত্তেজনার মতোই কাব্যের পরতে পরতে রয়েছে উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা। বাসরঘরে লখিন্দরকে সর্পাঘাতে নিহত করা কাহিনির চূড়ান্ত পরিণতি, তারপর দীর্ঘ Falling Action এর পর ছয় ভাসুর, স্বামী, ১৪ ডিঙা মধুকর নিয়ে বেহুলার প্রত্যাবর্তন কাহিনির Catastrophe; বেহুলা লখিন্দরের স্বর্গে প্রত্যাবর্তনকে পৌরাণিক নাটকের ক্রোড় অঙ্ক বলেই চিনিত করা যায়। এবার আমরা মনসার সেই দীর্ঘ সংগ্রাম ও তার আত্মসংকটের কাহিনির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় ব্রতী হব।

চাঁদ সওদাগর শিব পূজক। স্বর্গের অরণ্যে দেব পূজার ফুল সংগ্রহ করতে গিয়ে অনিচ্ছাবশত দেবী মনসাকে অসম্মান করে ফেলেন। ক্রুদ্ধা মনসা চাঁদকে অভিশাপ দেন—"মর্ত্যে গিয়া মানব হইয়া জন্মগ্রহণ কর।" শিবের পরম ভক্ত চাঁদও কম যান না। তিনিও মনসাকে বলেন—"যদি বিনা অপরাধে আমাকে অভিশাপ দিয়া থাক, তবে তুমিও স্মরণ রাখিও, আমি পূজা না করিলে মর্ত্যলোকে তোমার পূজা প্রচারিত হইবে না।" একেবারে একটি আদর্শ নাটকের দ্বন্দ্বের বীজ বপন, সেই বীজ কিভাবে পরবর্তীকালে বিরাট মহীরূহ হয়ে দেখা দিল, মনসামঙ্গালের নরখণ্ডে সেই কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে।

মর্ত্য জীবনে চাঁদের পরিচয় সে বিজয় সাধুর পুত্র। চম্পক নগরে তার বাস। পরম শিবভক্ত। একজন প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য সওদাগর। তিনি জানতে পেরে একদিন স্ত্রী সনকার মনসার ঘট পদাঘাতে ভেঙে দেন। মনসা অত্যন্ত কুপিত হন। তিনি চাঁদের সর্বনাশ করার চেষ্টা করতে থাকেন। ইতিমধ্যেই মনসা মর্ত্যে কৌশলে রাখালদের পূজা আদায় করে নিয়েছে, হাসান-হোসেনকে জব্দ করে তাঁর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। চাঁদ সওদাগর বণিক সমাজে অত্যন্ত পরিচিত এবং মান্য একজন মানুষ। তাঁর পূজা পেলে যে মর্ত্যে মনসার পূজা সহজেই প্রচলিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। তাই মনসা চাঁদ সওদাগরের পূজা পাবার জন্য ব্যাগ্র হয়ে ওঠে। চাঁদের পদাঘাতে তাঁর ঘট ভেঙ্গো দেওয়া তাঁর সম্মানে চরম আঘাত। কেবল ঘটই ভাঙা নয়। চাঁদ মনসাকে 'চ্যাঙমুড়িকানী' বলে গালি দিয়েছে। কোপন স্বভাবা মনসার মনে এই অসম্মান যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। ফলে প্রতিস্পর্ধী মনসা চাঁদের অনিষ্ট করতে বদ্ধপরিকর হয়। নেতার পরামর্শে চাঁদের 'গুয়াবাড়ি' ধ্বংস করে তাকে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করে দেয়। কিন্তু সেখানেও বাঁধ সাধে চাঁদের পরম মিত্র শঙ্কু ধন্বন্তরি। সে তার মহাজ্ঞান মন্ত্রে ছাড়খার

হয়ে যাওয়া 'গুয়াবাড়ি' পুনরুজ্জীবিত করে দেয়। আবহ মন্ত্রে ওঝা সবকিছুকে পূর্বাবস্থায় এনে দেয়। চিন্তিত মনসা পরামর্শদাতা নেতর কাছে ছুটে যায়। নেত তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, নেতর কথা শুনে মনসা মালিনীর বেশ ধারণ করে শঙ্কুর নগরে প্রবেশ করল। আপন উদ্দেশ্য সাধন করতে মনসা যে কতটা বদ্ধপরিকর—তা তার উত্তম ও পরিপাটি সাজসজ্জা থেকেই অনুমান করা যায়—

নাগ আভরণ পরে নাগের জটাজুট।
কানে কর্ণফুল পরে নাগের মুকুট।।
পদ্মনাগের হার পরে পঞ্চনাগের শাঁখা।
আড়াই নাগের কাঁচলি পরে সহজে তিন বেঁকা।।
কোটিতে কিঙ্কিনী ভাল শোভিয়াছে ধোড়া।
চরণে নুপুর পরে বিমতিয়া বোড়া।।
ত্রিভুবন মোহ যায় পদ্মার প্রতাপে
সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিল দেবীর আভরণ সাপে।
তবু না কহিব আমি ওঝার মর্ম্ম।।

কিন্তু মনসার এই সাজ-সজ্জা বিফলে গেল। এরপর মনসা শঙ্কুকে মারতে গোয়ালিনী বেশ ধারণ করল। দধির পসরা নিয়ে ধন্বন্তরিকে বিষপ্রয়োগে বধ করতে অগ্রসর হয়। মনসার সে চেষ্টা বিফল হলে নেতার কাছে গিয়ে ধন্বন্তরি বধের উপায় জানতে চায়। শঙ্কু রায় নেতার পরম শিষ্য। তার পক্ষে শঙ্কু বধের নিদান দেওয়া অত্যন্ত বেদনার, তাই সে বলে—

আমার প্রতাপে ওঝা অমর অজয়।
প্রাণের অধিক আমার ওঝা শঙ্কু রায়॥

বিরক্ত নেত মনসাকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয়—

কোপ কর তাপ কর যেবা কর কর্ম।
তবু না কহিব আমি ওঝার মর্ম।।

আশাহত হয়ে মনসা তখন নিজের শক্তিতেই কার্য সম্পাদনে প্রয়াসী হয়ে ওঠে। সখির ছদ্মবেশে শঙ্কুর স্ত্রী কমলার কাছ থেকে শঙ্কুর মৃত্যুর উপায় জানতে উদ্যোগী হয়। নিজের লক্ষ্যে অটল থাকতে একজন নারীকে তার অস্তিত্ব রক্ষায় জন্য কত কিছু সহন করতে হয়, অন্তরে অপমানের তীব্র দহন প্রচ্ছন্ন রেখে বাইরে খুশির অভিনয় করে যেতে হয়, মনসা তার প্রকৃস্ট উদাহরণ। সে যেভাবে শঙ্কুর স্ত্রী কমলার সাথে সখ্যতা পাতিয়েছে তাতে মনসার অসাধারণ চাতুর্যশক্তির পরিচয় স্পস্ট হয়েছে। কমলার মন পেতে মনসা তাকে মহার্ঘ অলংকার উপহার দিয়েছে। কমলা শঙ্কুর মিলন কক্ষে মনসা শ্বেতমাছি হয়ে লুকিয়ে থেকে শঙ্কুর অক্ষয় পাঁজর মহাজ্ঞানের রহস্য জেনে নিয়েছে—

ভাদ্রমাস মঙ্গলবার অমাবস্যা হয়।...
তক্ষকে দংশে যদি ব্রহ্মতালুকায়।
তবে সে আমার মৃত্যু জানিও নিশ্চয়।।

শঙ্কুর এই আত্মকথন মনসাকে শঙ্কু বধে সহায়তা দিয়েছে। এসবই মনসার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। চাঁদ সওদাগরকে দিয়ে বণিক সমাজে পূজা পাওয়ার জন্য, পরিকল্পনার জন্য এসকল প্রয়াস। কারও চরম ক্ষতি করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। নিরুপায় হয়ে তাঁকে একাজ

করতে হয়েছে। চাঁদের পূজা পাবার পর সে যে ধন্বন্তরিকে জিইয়ে দেবে এই ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহ থাকে না যখন জাহ্নবীর কাছে গিয়ে তাঁকে বলতে শুনি—

ধন্বন্তরি ওঝা মা থুইলাম তোমার ঠাঁই।
যখনে চাহিব আমি তখন যেন পাই।।

ধন্বন্তরি বধ সম্পন্ন হতেই মনসা চাঁদের চরম সর্বনাশে মেতে ওঠে। সওদাগরের ছয় পুত্রকে হত্যা করতে চাইলে নেত তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—"কুমার বধিতে না পারিবা চান্দর বিদ্যমান।" মহাজ্ঞানের অধিকারী চাঁদ সওদাগরের অনিষ্ট করা ততোটা সহজ নয়। তাই নেত তাকে চাঁদের উপবন ধ্বংসের পরামর্শ দেয়। মনসা বুঝতে পারে যতক্ষন সে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণে সমর্থ না হচ্ছে ততক্ষন সে চাঁদের অনিষ্ট করতে সচেষ্ট থাকলেও তার কোনো বড়ো ক্ষতি করে উঠতে পারবে না। ফলে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করতে মনসাকে যে হীনজীবী নটির বেশ ধারণ করতে হয়েছে তাতে মনসার দেব মাহাত্ম্য নিঃসন্দেহে খর্বিত হয়েছে। নিজের রূপ যৌবন দিয়ে সে চাঁদ সওদাগরকে ভুলিয়েছে। যাঁর পূজা সে পেতে চায় তার সাথে এহেন আচরণ সব সময়েই নিন্দনীয়। কিন্তু এ কথা ঠিক, এছাড়া মনসার সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না। ধনবল, লোকবল কোনো দিক দিয়েই সে চাঁদের সমগোত্র নয়। নারীর ছলাকলা তখনি একমাত্র অবলম্বন হয়, যখন তার সামনে আর কোনো উপায় থাকে না। মনসা অনন্যোপায়, তাই তাকে ছলের আশ্রয়ে মায়াজাল বিস্তার করে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করতে উদ্যত হয়েছে। চাঁদ হীনবল না হলে মনসা যে তার সাথে কিছুতেই পেরে উঠবে না সেকথা মনসা ছাড়া আর কে ভালোভাবে জানে এরপরই মনসা নেতর পরামর্শে বিষ-অন্নে চাঁদের ছয় পুত্রকে হত্যা করে। কিন্তু তাদের সকলকে জাহ্নবীর হেফাজতে রাখতে সে ভোলেনি। গঙ্গার পুরীতে গিয়ে মা গঙ্গাকে অনুরোধ করে মনসা—

যত্ন করিয়া রাখিবা তোমার ঠাঁই
যখনে চাহিব আমি তখন যেন পাই।।

মনসার কৃপায় ঝালু-মালুর খেও দিতে গিয়ে সুবর্ণঘট প্রাপ্তি এবং মনসার নির্দেশে তাদের পূজার আয়োজন শুনে সনকা সুন্দরীর গমন এবং দেবীর পুত্রবর আশীর্বাদের পিছনেও রয়েছে পূর্ব-পরিকল্পনার প্রভাব। মনসার পূজা প্রচারের জন্য মর্ত্যে অনিরুদ্ধ এবং ঊষাকে আনা জরুরি। এই কাজ সম্পন্ন করতেও মনসাকে কম কাঠ-খড় পোড়াতে হয়নি। পিতা মহেশ্বরকে রাজি করিয়ে স্বর্গের নর্তক-নর্তকীকে মর্ত্যে আনতে মনসাকে ছলা-কলা কাকুতি মিনতিকেই আশ্রয় করতে হয়েছে। চাঁদ মর্ত্যে তাঁর পূজা প্রচারের যে কত বড়ো মূর্তিমান বিদ্রোহ তা মহাদেবকে বোঝাতে মনসাকে কম বেগ পেতে হয়নি। চাঁদ চম্পক নগরে তাঁর পূজা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। তাকে লঘুজাতি 'কানী' বলে গালি দিয়েছে। হেতালের বাড়ি দিয়ে তাঁর কাঁকাল বাঁকা করে দিয়েছে। যেখানে মনসার পূজা করতে দেখেছে সেখানে উপস্থিত হয়ে পদাঘাতে পূজার ঘট ভেঙে দিয়েছে। কন্যার চেয়ে যে সেবক বড়ো হতে পারে না—এই যুক্তিও মনসাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। তবে ঊষা অনিরুদ্ধকে মর্ত্যে নিয়ে যাবার সময় মনসা পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিতে ভোলেনি—

আপনার নিজ কার্য্য করিয়া সাধন।
আরবার আনি দিব তোমার সদন।।

কন্যার চেয়ে বাপের কাছে শিষ্যের গুরুত্ব বা দাম বেশি একথা শোনার পর কন্যার মনের অবস্থা বোঝা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। বিশেষত মহাদেব যখন মনসাকে সাবধান করে বলেন—

অনিরুদ্ধ ঊষা মোর প্রাণের দোসর।
মর্ত্যলোকে দুঃখ তারে দিও না বিস্তর।।
মোর বোল না শুনিয়া যদি দাও তাপ।
তুমি নহে কন্যা আমার আমি নহি বাপ।।

তখন উপেক্ষিতা সন্তান হিসেবে মনসার মানসিক অবস্থা আমাদের বুঝে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। মনসা এভাবে ঘরে বাইরে আপন-পরের কাছ থেকে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছে বারবার। কিন্তু তার স্থির লক্ষ্য তাকে তাঁর সাফল্যের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেছে। পুরুষশাসিত দেব-সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করেছে আপন সাহস, ধৈর্য্য আর ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। পিতাকে দেওয়া তাঁর প্রতিটি প্রতিশ্রুতি মনসা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। সব ব্যাপারে সে নেতার পরামর্শ নিয়েছে। মর্ত্যজীবনে অনিরূদ্ধ ঊষার দিকে সব সময় নজর রেখেছে। সমস্যা সে সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই কিন্তু কখনোই সমস্যার রাশ হাতের বাইরে যেতে দেয়নি। ভক্তকে কষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত রাখলেও মনসা কখনোই ভক্ত বেহুলাকে ছেড়ে যায়নি বা চাঁদকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েও রক্ষার উপায় করে দিয়েছে। বেহুলাকে স্বর্গ জীবনে দেওয়া কথা মনসা কখনো বিস্মৃত হয়নি। মনসার এই মহত্বের কথা খুব কমই আলোচিত হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রভাবে মনসার এই অপবাদ সমাজে দৃঢ় হয়েছে। পুত্রশোক ভুলে চাঁদ আবারও নৌকা সাজিয়ে বাণিজ্য যাত্রা করেছে। বাণিজ্য করে বহু ধনসামগ্রী নিয়ে চাঁদ যখন স্বদেশের পথে তখন মনসা আবির্ভূত হয়ে চাঁদের কাছে নিতান্ত অসহায়ের মতো প্রার্থনা করেছে—"মোর তরে ফুল জল দেহ একবার।" প্রতিদানে চাঁদের কুৎসিত অপমান লাঞ্ছনা তাঁর প্রাপ্তি হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই চাঁদের চরম ক্ষতি করা ছাড়া মনসার সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না। মনসার রোষে চাঁদের চোদ্দো ডিঙা মধুকর সমুদ্রে নিমজ্জিত হল। সেখানেও মনসা পিতৃআজ্ঞা স্মরণে রেখেছে। বারে বারে অপমানিত হয়েও চাঁদের পরিত্রাণের পথ খোলা রেখেছে। গঙ্গার কাছে চাঁদের ডুবে যাওয়া তরি ও বাণিজ্যের সকল দ্রব্যাদি সুরক্ষিত রেখেছে নেতর পরামর্শে—

চান্দর যতধন থুইলাম তোমার স্থানে।
ভালমতে মা তুমি রাখিও যতনে।।

চোদ্দো ডিঙা মধুকর ডুবে গেলে সমুদ্রের জলে ভাসমান চিল শকুন যখন মড়া ভেবে চাঁদের মাথায় ঠোকর দিচ্ছে তখন নেতর আদেশে মনসা একখানি কলাগাছ এনে চাঁদকে জলে ভেসে থাকতে সাহায্য করেছে। কারণ সে জানে চাঁদ ছাড়া বণিক সমাজে তাঁর পূজা প্রচলনের আশা নেই। তাই চাঁদকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। বিপদের চরমতম মুহূর্তে মনসা চাঁদের উদ্দেশ্যে লিপি প্রেরণ করেছে—

আমারে পুজহ যদি চাঁদ সদাগর।
চোদ্দ ডিঙা বাড়াইয়া দিব তব ঘর।।

কিন্তু চাঁদের অপরাজেয় পৌরুষ কিছুতেই মনসার বশ্যতা স্বীকার করতে নারাজ। মনসার এতসব প্রচেষ্টা বারবার ব্যর্থ হওয়ায় মনসার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। কিন্তু নেত তাকে সর্বদা সঠিক মার্গ প্রদর্শন করায় মনসা রক্ষা পেয়েছে। বারো বছর অশেষ দুঃখ-কস্ট সহন করে চাঁদ অবশেষে তাঁর চম্পক নগরে প্রত্যাবর্তন করে। এত দুঃখের মধ্যেও পুত্র লখিন্দরের মুখ দেখে সব দুঃখ ভুলে যায় সে। পুত্রের বিবাহ দেবার জন্য সর্বগুণসম্পন্না উজানী নগরের সায়বেনের কন্যা সুলক্ষণা বেহুলাকে নির্বাচন করে। মনসার অনিস্টের কথা মাথায় রেখে এমন মেয়ে সে নির্বাচন করেছে যে সব বিপদ থেকে লখীন্দরকে রক্ষা করতে পারবে, মনসার সঙ্গে সমানে সমানে জুঝতে পারবে। বিবাহের আয়োজনে কোনো রকম ঘাটতি রাখলেন না চাঁদ। বিবাহের রাতে মনসা যাতে লখিন্দরের কোনো ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য লোহার বাসর ঘর নির্মাণ করলেন। কিন্তু দেব কারীগর বিশ্বকর্মা মনসার ভয়ে ভীত হয়ে লোহার বাসরঘরে ছিদ্র রাখতে বাধ্য হলেন। শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চাঁদ লখিন্দরের অনিষ্ট রোধ করতে সমর্থ হল না। বিবাহের রাত্রে লোহার বাসর ঘরের ছিদ্রপথে কালনাগিনী প্রবেশ করে লখিন্দরকে দংশন করল। অপযশ দূর করতে সতী সাধ্বী বেহুলা সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে মৃত স্বামীর ভেলায় উঠে বসলেন। শুরু হল কৃচ্ছসাধনার দীর্ঘ অধ্যায়ের। কিন্তু এখানেও মনসা অতন্দ্রপ্রহরীর মতো বেহুলার সহায় থেকেছে। পথে সকল বিপদ থেকে বেহুলাকে পরিত্রাণ করে এনেছে। আপু ডোমের ঘাট, ধোনা মোনার ঘাট, টেটনের ঘাট অতিক্রম করে বেহুলার ভেলা ধোপানির ঘাটে এসে পৌঁছায়। নেতার রহস্যময় শক্তির পরিচয় পেয়ে বেহুলা তার শরণাপন্ন হয়। অবশেষে নেতারই সাহায্য ও সহযোগিতায় বেহুলা স্বর্গের সভায় উপস্থিত হয়। স্বর্গের দেবাদিদেব মহেশ্বরকে নৃত্যগীতে সন্তুস্ট করে তাঁর কাছে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চায়। দেবাদিদেব মনসাকে আদেশ দেন লখিন্দরকে জিইয়ে দিতে। মনসা আপত্তি করলে দুই নারী বেহুলা ও মনসার মধ্যে যে বাক্‌যুদ্ধ হয় তাতে বেহুলারই জয় হয়। মনসার 'বার মাস্যা' যেন একজন নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনি। প্রত্যুত্তরে বেহুলা তার ছয় মাসের দুঃখ বর্ণনা করে মনসার মন জয় করে নেন। স্বর্গের সভায় দুই নারীর দ্বৈরথ অত্যন্ত মনোগ্রাহী। অবশেষে মনসা বেহুলার দুঃখে কাতর হয়ে লখীন্দরকে জীইয়ে দিতে রাজি হয়। সুচতুর বাক্‌শিল্পী বেহুলা একে একে লখিন্দর, ছয় ভাসুর, চোদ্দ ডিঙা মধুকর সব মনসার কাছ থেকে উদ্ধার করল। প্রতিদানে বেহুলাও মনসার শেষ আর্তি রক্ষা করেছে—

পদ্মা বলে বেহুলা শুনহ বচন।
অপযশ খণ্ডে যেন তোমার কারণ।।

চাঁদ সওদাগরের কাছে মনসা পুজোর আবেদন জানিয়েছে—

মোর বোলে পদ্মাবতী পূজ সদাগর।
ধন জন চোদ্দ ডিঙা যাবে তব ঘর।।
অহঙ্কার করি যদি না পূজ বিষহরি
এইরূপে আরবার যাব দেব পুরী।।

তাতেও চাঁদের মন গলত কিনা তবে দেবী চণ্ডীর নির্দেশ অমান্য করার কোনো উপায় হয়তো চাঁদের ছিল না—

পদ্মাবতী পূজা কর চান্দ সদাগর।
একই মূর্তি দেখ সব না ভাবিও পর।।

হয়তো চাঁদ সদাগরকে আশ্বস্ত করেছিল। তাই সকলের অনুরোধ রাখতে চাঁদ বাম হাতে মনসাকে ফুল, জল দিলেন। মনসা তাতেই সন্তুষ্ট হলেন। শেষ হল দুই পূজক সম্প্রদায়ের দীর্ঘ সংগ্রাম ও সংঘাতের ইতিহাস। নিজের পূজা মর্ত্যে প্রচলন করার জন্য মনসার এই একগুঁইয়ে স্বভাবের মধ্যে যতই অনার্যসুলভ আচরণ থাকুক না কেন—সব ছাড়িয়ে মনসার আত্মসংকট ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাস যেভাবে কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে তা স্বতন্ত্রভাবে, ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার্য সন্দেহ নাই।

সহায়ক গ্রন্থ

১. বিজয় গুপ্ত : মনসা মঙ্গল
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য : মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস
৩. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
৪. নীহাররঞ্জন রায় : ‘বাঙালির ইতিহাস’
৫. দীনেশ চন্দ্র সেন : বৃহৎবঙ্গ

কবি দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গাল ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গাল : একটি তুলনামূলক আলোচনা

সৌমিত্র বাগ

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কয়েকটি লৌকিক দেবদেবীর (যেমন—মনসা, চণ্ডী, ধর্ম প্রভৃতি) মহিমা ও প্রশস্তিজ্ঞাপক কাহিনি নিয়ে একটি কাব্যশাখা গড়ে ওঠে—যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গালকাব্য নামে পরিচিত, তা আমরা সকলেই জানি। তুর্কি আক্রমণের ফলে মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনার জন্য মঙ্গালকাব্যগুলি রচিত হয়েছিল, এইরকম মত প্রচলিত আছে। এই মঙ্গালকাব্যের প্রধান তিনটি ধারা—মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল ও ধর্মমঙ্গাল। মঙ্গালকাব্যের এই ইতিহাসের ধারায় ষোড়শ শতাব্দী বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কারণ আমাদের আলোচ্য চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের সৃজনযুগ হল চৈতন্য প্রভাবপুষ্ট এই ষোড়শ শতাব্দী। এই শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যধারার দু'জন কবি দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দ চক্রবর্তী (যিনি চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি তো বটেই, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি) এঁদের আবির্ভাব ঘটে। দ্বিজ মাধবের কাব্য সমালোচনায় মুকুন্দের কথা ভুলে যাবার উপায় থাকে না। কারণ দুই কবির কাহিনির মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে এবং কাহিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে দু'জনেই একইরকম সামঞ্জস্য বজায় রেখেছেন। ফলে দ্বিজমাধবের কাব্যের কোনো অংশ পড়তে গেলেই মুকুন্দের কাব্যের সেই অংশের কথা মনে পড়ে যায় এবং তাঁদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[১]

চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যধারার মুকুন্দের পূর্ববর্তী কবি হিসেবে মানিক দত্ত ও দ্বিজ মাধবের কথা আমরা জানি। মানিক দত্তের উল্লেখ মুকুন্দের উক্তিতেই শুধু পাই। তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে দ্বিজ মাধব নিশ্চিত ব্যক্তিত্ব। মাধব চণ্ডীমঙ্গালের পূর্ববঙ্গাধারার শ্রেষ্ঠ কবি। ভোলা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সন্দীপ প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর কাব্য পাওয়া গেছে। দ্বিজ মাধব ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে 'সারদাচরিত' বা 'সারদামঙ্গাল' নামে চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য লেখেন। আর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বা সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে 'অভয়ামঙ্গাল' নামে চণ্ডীকাব্য লেখেন। অর্থাৎ মাধব আর মুকুন্দ সমসাময়িক কবি। মুকুন্দ মাধবের কাব্যের সাথে পরিচিত ছিলেন কিনা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দ দু'জনেই নিজ নিজ গুণে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। দু'জনেই ষোড়শ শতাব্দীর

ঐশ্বর্য যুগের মঙ্গালকবি। স্বাভাবিকভাবেই দু'জন কবির কাব্যেই বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি, পরিবার জীবন প্রভৃতির ছবি ধরা পড়েছে। দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যধারার ঐশ্বর্য যুগের সর্বপ্রথম কবি। পাঁচালি ও লোককথা থেকে তিনিই প্রথম এই কাহিনিকে একটি কাহিনি সূত্রে গ্রথিত করেন। তাঁর পথ অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে মুকুন্দ চক্রবর্তী একটি অখণ্ড কাব্যের মর্যাদা দান করেন।[২] দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দ দু'জনের কাব্যেই কাব্যবিষয়, বর্ণনাকুশলতা, চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতিতে নানারকম সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। দু'জনের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিচারের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে।

প্রথমত, কাহিনির ক্ষেত্রে উভয় কবির কাব্যের মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষ করা যায়। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও কালিকাপুরাণ অনুসারে চণ্ডী মঙ্গালদৈত্য বধ করে কীভাবে মঙ্গালচণ্ডী আখ্যা পেলেন—সেই কাহিনি মাধবে আছে। দেবীর এই মূর্তি অনেকটাই উগ্রমূর্তি। মুকুন্দ দেবীর এই ভয়ংকরী মূর্তির কাহিনিকে গ্রহণ করেননি। তিনি স্নেহময়ী জননী উমার কাহিনিকে গ্রহণ করেছেন। তবে উমার এই মমতাময়ী ছবির সঙ্গো মঙ্গালচণ্ডীর চরিত্রগত কিছু মিল থেকে গেছে। যেমন—ভক্ত বিপদে পড়লে এই দেবীও দশভুজা সিংহবাহিনী মূর্তিতে আবির্ভূত হন। মুকুন্দ বলেছেন—

নিজ মূর্তি ধরিতে চন্ডিকা কৈল মন।
মহিষমর্দিনী রূপ ধরিলা চন্ডিকা।

আর দ্বিজ মাধবে আছে—

অঙ্গাশুচি হৈয়া রামা করয়ে দেবাচর্চা।
সাক্ষাৎ হইল তানে দেবী দশভুজা।।[৩]

মুকুন্দ উমার কাহিনিবর্ণনা প্রসঙ্গো দক্ষের শিবনিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস, উমার জন্ম, তপস্যা, মদনভস্ম, শিবের সঙ্গো বিবাহ, গণেশ কার্তিকের জন্মের কথা বললেও চণ্ডীমঙ্গালের কাহিনির সাথে এর সংযোগ নেই।[৪] মাধবের কাব্যে উমার এই কাহিনি না থাকলেও নীলাম্বরকে ঘিরে উমা মহেশের গার্হস্থ্যকথা শুনিয়েছেন। শিবের পূজার জন্য ফুল আনতে দেরি করায় নীলাম্বরকে শিব শাপ দিতে চাইলে দেবীর প্রতিক্রিয়া—

চরণে ধরিয়া দেবী শিবের বুঝান।।
ইন্দ্রের নন্দন নীলা অতি শিশুমতি।
তার তরে শাপ দিতে না হয় মুকতি।।
দেবীর চরণে হর ক্রোধ সম্বরনে।
দেবার্চান হেতু গেল বল্লুকার বনে।।

কবি এখানে উমার কল্যাণময়ী মূর্তিটি সুন্দরভাবে এঁকেছেন। যদিও দেবী নীলাম্বরকে শিবের শাপ দেওয়া থেকে মুক্তি দিতে পারেননি।[৫]

দ্বিতীয়ত, দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দ দুজন কবির কাব্যের গঠনের দিকে লক্ষ করলে দেখি যে দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যটিকে চোদ্দোটি পালায় বিভক্ত করেছেন। এর ফলে তাঁর কাব্যটি সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর কাব্যে কালকেতু ও ধনপতির কাহিনি থাকলেও তিনি অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় গ্রহণ করেছেন। যেখানে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন সেখানে শুধু প্রসঙ্গা

উল্লেখ করেছেন। আসলে তাঁর সামনে সেরকম কোনো আদর্শ ছিল না। তিনি নিজের মতো করে একটি কাহিনির আদল তৈরি করতে গিয়ে কাব্যটিকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছেন। মুকুন্দ তাঁর কাব্যটিকে এইরকম পালাভাগ করেননি। তাঁর কাব্যটিতে তিনটি খণ্ড পাই—দেবখণ্ড, আখেটিকখণ্ড ও বণিকখণ্ড। দেবখণ্ডে দক্ষকন্যা সতী কীভাবে পতিনিন্দায় দেহত্যাগ করেছিলেন এবং পরে আবার হিমালয় গৃহে উমা হয়ে জন্মে শিবের সাথে বিবাহ এবং পতির দারিদ্র্যে গৃহত্যাগ করলেন সেই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আখেটিক খণ্ডে ব্যাধ কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনি পাই। কালকেতু কীভাবে দেবীর কৃপায় বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে দেবীর পূজা প্রচার করলেন তা পাই। বণিক খণ্ডে দেখি ধনপতির কাহিনি। মুকুন্দের কাব্যে এই খণ্ডবিভাগ থাকলেও যেভাবে এক কাহিনি আর এক কাহিনিতে গড়িয়ে গেছে তাতে সমগ্র কাব্যটি অখণ্ড হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়ত, মুকুন্দের কাব্যে পুরাণের অনেক প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। শুধু পুরাণ নয়, রামায়ণ ও মহাভারত থেকেও তিনি বিভিন্ন কাহিনি এনেছেন। ফলে মুকুন্দের কাব্যের দেবখণ্ড হয়ে উঠেছে বাংলা পুরাণ। মাধবের কাব্যে পুরাণের সঙ্গে তন্ত্রের প্রভাবও লক্ষ করা যায়। তন্ত্র যেহেতু গুরুপ্রধান তাই মাধব তাঁর কাব্যে গুরু বন্দনা করেছেন। তন্ত্রের প্রভাবেই তাঁর কাব্যে সরস্বতীকে বিষ্ণুর পত্নী বলা হয়েছে। নীলাম্বরকে শাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠানো এবং শাপমোচনের পর স্বর্গে ফিরে গিয়ে শিবের কাছে নীলাম্বরের যে মৃত্যুঞ্জয় শিক্ষা গ্রহণ তা তন্ত্রসাধনারই অঙ্গ। মুকুন্দের কাব্যে নীলাম্বরের এই কাহিনিটি শুধু একটি গল্প হয়ে থেকেছে।

চতুর্থত, মুকুন্দের কাব্যে গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ অংশটি সমাজ ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। এখানে তিনি একদিকে যেমন বংশপরিচয় ও নিজের গ্রামের প্রশংসা দিয়েছেন, পাশাপাশি নিজের গ্রাম দামিন্যায় কীরকম রাজনৈতিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল তারও বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর পরিবার কীভাবে ডিহিদারদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিলেন তা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

অধর্মী রাজার কালে　　প্রজার পাপের ফলে
খিলাত পাইল মামুদ সরিপ
উজির হইল রায়জাদা　　বেপারী বৈশ্যের খদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হইল ঐরি
মাপে কোনে দিয়া দড়া　　পনর কাঠায় কুড়া
নাহি মানে প্রজার গোহারি।[৬]

এই অত্যাচারে কবি তাঁর ভাই রমানাথ, স্ত্রী এবং শিশুপুত্রকে নিয়ে লুকিয়ে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হন—

প্রভু গোপীনাথ নন্দী　　বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই　　সঙ্গে রামানন্দী ভাই
পথে চন্ডী দিলা দরশনে।[৭]

অন্যদিকে দ্বিজ মাধবের আত্মকথা অংশটি আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব সেখানে কবির

নিজের নাম, বাসস্থান ছাড়া তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে সেরকম কিছু জানা যায় না—

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তদ্বীপ সার
ত্রিবেণী যে গঙ্গা যথা বহিছে ত্রিধার
সপ্তদ্বীপ মধ্যে নদীয়া যে মহাস্থান
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র অনেক প্রধান
পরাশর সুত জান মাধব যে নাম
কলিকালে হইল জগত অনুপাম।।[৮]

আত্মকথার এই অংশে কবির ব্যক্তিজীবনের ছায়া দেখা যায় না।

পঞ্চমত, কবি মুকুন্দ বাস্তব রসের কবি। তাঁর বাস্তবতা কৌতুকমিশ্রিত হয়ে পরিবেশিত হওয়ায় এক অন্য মাত্রা পায়। তবে তাঁর বাস্তবতা অনেকটা ব্রাহ্মণ্য সংস্কার দ্বারা চালিত। ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের বশবর্তী হয়েই মুকুন্দ কালকেতুর পিতা ধর্মকেতুকে শেষ বয়সে সন্তানের হাতে সংসার অর্পণ করে কাশীবাস করিয়েছেন। উচ্চবর্ণের রীতি অনুসারেই ধর্মকেতু পুত্র কালকেতুর বিবাহ ব্যাপারে ঘটকের দ্বারস্থ হয়—

সোমাঞি পন্ডিত সনে বসি এক স্থলে
চরণে ধরিআ ধর্মকেতু কিছু বলে।
সুতের বিভার হেতু করি অভিলাষ
কিরাত নগরে কর কন্যার তপাষ।[৯]

দ্বিজ মাধবের কাব্যেও বাস্তবতার দৃষ্টান্ত আমরা পাই। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর এই বাস্তবতা মুকুন্দের থেকে স্বাভাবিক ও সংগতিপূর্ণ এবং প্রশংসিত হয়েছে। মাধব ব্যাধ সমাজের ছবি আঁকতে গিয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার মাধ্যমে প্রভাবিত না হয়ে ব্যাধ জীবনের আদিমতা বজায় রেখেছেন। যেমন—নিদয়া বনের মধ্যে কাঠ কুড়াতে গিয়ে কালকেতুকে জন্ম দিয়েছে। মাধব মুকুন্দের মতো ধর্মকেতুকে কাশীবাসে না পাঠিয়ে জীবনের সঙ্গে সংগতি রেখেই দেখান কীভাবে ধর্মকেতু শিকারে বেড়িয়ে সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হচ্ছে। বৃদ্ধবয়সে ধর্মকেতুর খেদ মাধবের চরিত্রটিকে একটি অন্য মাত্রা দিয়েছে।[১০] আবার দ্বিজ মাধবের কাব্যে কালকেতু যে বণিকের কাছে যায় তার নাম সোমদত্ত। তার স্ত্রীর কোনো উল্লেখ তাঁর কাব্যে নেই। কিন্তু মুকুন্দ বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে যে কতটা মনোযোগী ছিলেন তার প্রমাণ বণিক মুরারি শীল ও তার স্ত্রী। মাধবের কাব্যের সোমদত্ত এখানে মুরারি শীল নামে পরিচিত। মুকুন্দের মুরারী জাত বেনে। কালকেতুর সঙ্গে কথাবার্তার জন্য মুরারি তার স্ত্রীকে পাঠায় আর সে দেওয়ালে আড়ি পেতে সবকিছু কথা শোনে। মূল্যবান আংটিকে পিতলের দামের মূল্যে সে কালকেতুকে ঠকাতে চেয়েছে। সে প্রকৃতই বণিক সমাজের কথার ধূর্ততায় একালের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। এছাড়া দ্বিজ মাধবের কাব্যে ভাঁড়ু দত্ত আর পাঁচজন সাধারণ প্রজার মতোই একজন প্রজা। এরা নিজেদের কুলীন বলে পরিচয় দিয়ে লোক ঠকিয়ে খায়। মুকুন্দের ভাঁড়ুদত্ত নিজেকে কায়স্থ সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে চতুরতার মাধ্যমে সবকিছু হাসিল করতে

গিয়ে হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে।

ষষ্ঠত, মুকুন্দের কাব্যে সমাজ বিন্যাস ও নগর পরিকল্পনার যে বাস্তব ছবি উঠে এসেছে তা মাধবের কাব্যে খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে এসেছে, মুকুন্দের কাব্যের মতো বাস্তবধর্মী নয়। দ্বিজ মাধবের কাব্যে গুজরাট নগরে বিভিন্ন জাতের ও পেশার মানুষের কথা থাকলেও তাতে কবির সহৃদয়তার ছাপ পাওয়া যায় না। কিন্তু মুকুন্দ ব্যক্তিগত জীবনে অত্যাচার, অনাচারের ছবি দেখে স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন এক সমাজের ছবি যেখানে হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র সকলশ্রেণির মানুষ সব রকম বৈষম্য ভুলে গিয়ে পাশাপাশি সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে। যে ভূমিব্যবস্থায় ডিহিদারি অরাজকতা থাকবে না। কালকেতু বুলান মন্ডলকে বলেছে—

আমার নগরে বৈস জত ভূমি চাষ চষ
তিন সন দিও কর।
হাল পীছে এক তঙ্কা না করিহ কারে শঙ্কা
পাটায় নিসান মোর ধর।[১১]

দ্বিজ মাধবের বুলান মন্ডল দেবীচণ্ডীর স্বপ্নাদেশে গুজরাটে এসে কালকেতুর জমি পত্তন নিয়েছে। কবি মুকুন্দ কলিঙ্গদেশকে বানের জলে ভাসিয়ে কৃষকদের গুজরাটে এনেছেন। জীবনবোধের এই বিশিষ্টতা মাধবের কাব্যে নেই।

সপ্তমত, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখি দেবীচণ্ডীর কৃপায় কালকেতু গুজরাট নগর পত্তন করেন। গুজরাট নগর পত্তন করতে গিয়ে কালকেতুকে বনকর্তন করতে হয়েছে। বনকর্তন অংশে কবি মুকুন্দ যে সমস্ত গাছপালার পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর উদ্ভিদবিদ্যার গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। গুজরাটের নগর পত্তনের জন্য গভীর জঙ্গালের অনেক গাছই কেটে ফেলতে হয়েছে। কিন্তু মানব জীবনের সঙ্গে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে যে গাছগুলি অপরিহার্য ভূমিকা নেয়, সেইসমস্ত গাছগুলিকে (যেমন—সর, নল, বাঁশ, বাবলা, শিমুল, নিম, কেয়া প্রভৃতি) ধ্বংস করা হয়নি। এতে তাঁর পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় পাই। এই পরিবেশভাবনা দ্বিজ মাধবের কাব্যে নেই।

অষ্টমত, দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দ—দুজনের কাব্যই চৈতন্যপ্রভাব যুগে লেখা। দ্বিজ মাধবে এর নিদর্শন বিষ্ণুপদগুলিতে চৈতন্যলীলার স্বীকৃতি। দ্বিজ মাধব এই পদগুলির মাধ্যমে মঙ্গালকাব্যের গতানুগতিক বর্ণনার মধ্যে কিছুটা গীতিরসপ্রবণতা যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। হয়তো সবক্ষেত্রে কবির উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তবুও তাঁর এই প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে।[১২] মুকুন্দও চৈতন্যযুগের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভক্তিবিহ্বলচিত্তে বন্দনা করেছেন—

অবনীতে অবতরি চৈতন্য ঠাকুর হরি
বন্দহুঁ সন্ন্যাসী চূড়ামণি
ভুবনবিখ্যাত নাম সুধন্য নদীয়া গ্রাম
জম্বুদ্বীপ-সার নবদ্বীপ
মহি কলি অন্ধকারে চৈতন্য অবতারে
প্রকাশিলা হরিনাম দীপ।[১৩]

মুকুন্দ বিষ্ণুর মাহাত্ম্যবর্ণনায় নিজের ভক্তিবিহ্বলতাকে ঢেলে দিয়েছেন—

হরিতে অবনী-ভার যদু-কুলে অবতার
মধ্যে লেখে যশোদা নন্দন
শৈশব শয়ন রঙ্গা করিল শকট-ভঙ্গা
পুতনার করিল নিধন।[১৪]

আসলে দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দ—এঁরা ব্যক্তি জীবনে যে ধর্ম্মমতেই দীক্ষিত হোক না কেন, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাংলাদেশে যে নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল তার দ্বারা দু'জনই প্রভাবিত হন এবং তার ছাপ দু'জনের কাব্যেই পড়েছে।

এছাড়া প্রতিটি মঙ্গালকাব্যে আমরা রন্ধনজাত খাবারের প্রসঙ্গা পাই। চণ্ডীমঙ্গালকাব্যও এই ধারার ব্যতিক্রম নয়। আসলে রন্ধনপ্রণালীও একটি আর্ট। এই আর্টের মধ্য দিয়ে আমরা মধ্যযুগের বাঙালির কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে বুঝতে পারি। তবে এই ধরনের কৃষ্টি স্থান-কাল ভেদেও আলাদা হয়। মাধব যেহেতু পূর্ববঙ্গাধারার কবি আর মুকুন্দ যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের কবি, সুতরাং দু'জনের রন্ধনপ্রণালীর মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকবেই। দ্বিজ মাধবের কাব্যে খুল্লনার সাধভক্ষণের খাবারের তালিকায় দেখি লাউয়ের ব্যঞ্জন, কুমড়োর ব্যঞ্জন, মুলো শাক ভাজা, পালং শাক ভাজা, বাথুয়া শাক ভাজা, পুঁই শাকের ব্যঞ্জন প্রভৃতি। অর্থাৎ এই রন্ধনজাত দ্রব্যে নিরামিষের প্রাধান্য। অন্যদিকে মুকুন্দের কাব্যে খুল্লনার ভোজন তালিকায় আমরা পাই শোল মাছের ঝোল, দুধ, ক্ষীর, মুসুরের সুপ, আমসী, লাউয়ের ব্যঞ্জন প্রভৃতি। অর্থাৎ এই তালিকায় আমিষ ও নিরামিষ উভয়রকম ব্যঞ্জনের উল্লেখ আছে। দু'জন কবির কাব্যে অঞ্চল অনুযায়ী ব্যঞ্জন পালটে যাচ্ছে।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন, দ্বিজমাধব বড়ো কবি না মুকুন্দ শ্রেষ্ঠ কবি—এর এককথায় উত্তর মুকুন্দ চক্রবর্তী। তবে দ্বিজ মাধবের কাব্যও যে উৎকৃষ্ট কাব্যগুণের অধিকারী তা উপরের আলোচনা থেকে উঠে আসে। মুকুন্দের মতো মাধব বর্ণনাকুশল কবি ছিলেন না। তাঁর প্রকাশভঙ্গিও মুকুন্দের মতো মার্জিত নয়। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য তিনি কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে গল্পের গতিরোধ করেননি। কাহিনি তাঁর কাছে বড়ো। দ্বিজ মাধবের কবিযশ কবি মুকুন্দ অনেকটাই হরণ করে নিয়েছেন। মুকুন্দ মাধবের বিষয়বস্তুকে নিজে পুনর্গঠিত করে কাব্যনির্মাণ করেছেন। তাই মুকুন্দের কাব্য থেকে মাধবের কাব্যকে নিরাপদে দেখে বিচার করার প্রয়োজন।

উৎসের সন্ধানে

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস', কলকাতা বুক হাউস, ১৩৪৬, পৃ. ২৬৯

২. তদেব : পৃ. ২৬৫

৩. শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত : 'দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গালচণ্ডীর গীত', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২, ভূমিকা দ্রষ্টব্য

৪. তদেব

৫. তদেব

৬. সুকুমার সেন সম্পাদিত : 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গাল', সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৩, পৃ. ৩

৭. তদেব : পৃ. ৩
৮. উৎস-২৩, পৃ. ৬-৭
৯. উৎস-৬, পৃ. ৪২
১০. সত্যবতী গিরি : 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দ ও চণ্ডীমঙ্গালের অন্যান্য কবি', বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গাল বীক্ষা ও সমীক্ষা', এবং মুশায়েরা, বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ২১১
১১. উৎস-৬, পৃ. ৭৬
১২. ক্ষেত্রগুপ্ত : 'কবি মুকুন্দরাম', প্রকাশক প্রেমময় মজুমদার, রথযাত্রা ১৯৫৪, পৃ. ৪৩
১৩. উৎস-৬, পৃ. ১-২
১৪. তদেব : পৃ. ৫৬

বণিক চন্দ্রধর ও ব্যাধ কালকেতু
হতাশা-সংকট-প্রতিবাদ-সারল্য-সমর্পণ

সুষমা সেন

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগ বিভাগ কতখানি প্রয়োজনীয় তা বুঝতে পারি না। কোনো একটি লেখাকে মধ্যযুগীয় বলে চিহ্নিত করে দেওয়া হলে পাঠক তার ভিতর ওই যুগের বৈশিষ্ট্যগুলিই খুঁজে চলে। সময় কালের প্রেক্ষিতে প্রাচীন-মধ্য না বিচার করে রচনার পাশে সময়কালটি উল্লেখ করে দিলেই তো সমস্যা মিটে যায়। বাকিটা পাঠক, সমালোচকের বিবেচনা। মঙ্গালকাব্য মধ্যযুগের কাব্য বলেই প্রথম থেকে জানি। মধ্যযুগের সমাজ, অর্থনৈতিক অবস্থা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, ধর্মীয় নিয়ম-নীতি পাওয়া যায় মঙ্গালকাব্যের গল্পগুলিতে। কিন্তু মাঝেমাঝে মন বলে তারও বেশি যেন কিছু পাওয়া যায়। মধ্য-আধুনিক সব মিশে যায়। চাঁদ আর ইন্দ্রজিৎ কখন যেন একই সংকটের শিকার হয়ে যায়। মঙ্গালকাব্যের আঙিনায় দাঁড়িয়ে আমরা ধীরে ধীরে কিছু চরিত্রকে দেখি। তাহলে বুঝতে পারব যুগ বিভাজন হয়তো বাহুল্য—"গ্রাম দেব দেবীর মাহাত্ম্যোপ্যাখ্যান উপলক্ষ্যে প্রাচীন কাহিনি ও রূপকথা একত্রিত হইয়া যে গেয় আখ্যায়িকা কাব্যগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকেই ব্রতগীত-পাঞ্চালী বলিতেছে।"[১] বিদগ্ধ সমালোচকের কথা থেকে জানা গেল গ্রামীণ দেবদেবীকে নিয়েই মূলত এই পাঁচালি লেখা হয়েছে। নাগরিক দেবতার চরণধূলি বঞ্চিত এই ধরনের ব্রতগীত। মঙ্গালকাব্য কাকে বলে সে বিষয়ে একজন সমালোচক বলেন—

> আনুমানিক খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গাসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যান-কাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গালকাব্য নামে পরিচিত। কিন্তু ইহা বাংলাদেশের একটি বিশেষ যুগের সাহিত্য-সাধনার হইলেও, ইহার সৃষ্টি প্রেরণা কোনোও একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম বিশ্বাস হইতে আসে নাই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া বাংলা দেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, মঙ্গালকাব্যগুলি তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে।[২]

বিভিন্ন সময়ের কথা একসঙ্গো গাঁথা হয়েছে মঙ্গালকাব্যে। অর্থাৎ কোনো একটি বিশেষ সময় কালের নিরিখে তাকে চিনতে চাওয়া ঠিক হবে না।

মঙ্গালকাব্য বললে প্রথমেই মনে আসে মনসা-মঙ্গালকাব্যের কথা। সনকা এবং চাঁদের দ্বন্দ্ব বাঙালি জীবনে পরিচিত। মনসা অবশ্য শুধু বাংলা দেশেই পুজো পেয়েছেন এমন নয়। মহাভারতোত্তর যুগে সর্পকে পুং দেবতা নাগরাজ বাসুকিরূপে পুজো করা হলেও, দাক্ষিণাত্যে এর পরিবর্তে স্ত্রী সর্পদেবতাও পুজো পেয়ে থাকেন। জীবিত সর্পের পুজোর বদলে বিশেষ কোনো বৃক্ষকেও সর্পাধিষ্ঠিত কল্পনা করে পুজো হয়। ক্ষীরের বিষ প্রতিষেধক গুণ থেকেই সুহীর প্রতি আদিম সমাজের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছিল। এই গাছে সর্পপুজোর ধারা বাংলায় দেখা যায়। ভারতের সীতামনসা গাছ বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। উত্তরপ্রদেশে মেহুও, বোম্বাইয়ে থোর, গুজরাটে নানোপরদেশী, মহারাষ্ট্রে নিবডুঙ্গা, দক্ষিণে চেংমুর প্রভৃতি। বাংলায় এর নাম মনসা। বাংলায় মনসা চেংমুড়ী বলেও পরিচিতা। পূর্বভারতীয় মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাঙ্গুলী দেবীর কথা পাওয়া যায়। পুজোর নিয়ম থেকে মনে হয় জাঙ্গুলীর সঙ্গে মনসার মৌলিক সম্পর্ক আছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে সর্পদেবী পূজিত হয়েছেন। মনসামঙ্গাল কাব্যের কাহিনিও নানান সামাজিক ঘটনার পরম্পরা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। বন্দনা অংশ-সৃষ্টিপালা-মনসার জন্মকথা-গঙ্গাশান্তনু শঙ্খচুড় তুলসী কপিলাকথা-রাখালের গল্প-মুসলমানের পরাজয়ের গল্প-সমুদ্রমন্থনের কাহিনি ও চাঁদ সদাগর আর ধন্বন্তরির জন্ম-জেলেদের পূজা-সনকার পূজা ও চাঁদের দ্বন্দ্ব-ধন্বন্তরির পরাজয়-চাঁদের সঙ্গে মনসার সংগ্রাম-বেহুলার অভিযান ও পূজা প্রচার। চারটি পৃথক কাহিনি এখানে আছে; রাখালদের কাহিনি, জেলেদের কাহিনি, মুসলমানদের পরাজয়ের কাহিনি এবং বণিক সম্প্রদায়ের কাহিনি। এর ভিতরে সবথেকে উল্লেখযোগ্য বণিক সম্প্রদায়ের কাহিনি। মনসামঙ্গাল কাব্যের গল্প বলতে সাধারণত চন্দ্রধর বণিকের কাহিনিই পাঠকসমাজে আলোচিত হয়। চন্দ্রধর মঙ্গালকাব্য তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত চরিত্র—

পুত্র হইল হর-চন্ডীকার বরে।
সেই তপস্বী যে কাম্য-সাগরে মরে।।
পুত্র পাইয়া মহানন্দে কোটিধর।
শিবের আজ্ঞায় নাম রাখে চন্দ্রধর।।[৩]

দ্বিজ বংশীদাসের বিবরণ থেকে যেমন জানতে পারা যায় বেদের নিয়মানুসারে ষষ্ঠী পুজো থেকে চূড়াকর্ম সকলই হয়েছে চন্দ্রধরের, তেমনই এও শোনা যায় পিতার আজ্ঞায় চাঁদ শঙ্কর-পার্বতীর পুজো করেছিল। শুধু মহাদেবের নয়, হরগৌরীর পুজো করেছিল সে। তারপরই সেই মহাজ্ঞান লাভ হয় মহাদেবের থেকে।

শিবের উপাসক চন্দ্রধর ছিলেন স্বাধীন বণিক। সিন্ধু সভ্যতার সময় বণিকেরা যেত ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য করতে। গুপ্ত যুগে তাদের মানচিত্র হয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চল। মঙ্গালকাব্যের সময় দেখা যায় তারা সিংহল যাচ্ছে বাণিজ্য ডিঙা ভাসিয়ে। মঙ্গালকাব্যের পর বাংলা সাহিত্যে আর বণিক চরিত্র পাওয়া যায় না। রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গালেও কোনো বণিক নেই। চণ্ডীমঙ্গালের ধনপতি আর মনসামঙ্গালের চন্দ্রধর মঙ্গালকাব্যের চরিত্র-মিছিলে দুই উল্লেখযোগ্য বণিক। যদিও ধনপতি চাঁদের মতো স্বাধীন বণিক ছিল না। গৌড়েশ্বরের আদেশে সিংহলে কাঠ আনতে গিয়েছিল সে। চন্দ্রধর নিজের ইচ্ছায় কালীদহে সপ্তডিঙা মধুকর

ভাসিয়েছিল। শুধুমাত্র জীবিকায় নয়, চিন্তায়, যাপনে, দৃষ্টিভঙ্গিতে চাঁদ ছিল স্বাধীন; হয়তো একটু বেশিই স্বাধীন। এই স্বাধীনচেতা মনোভাব কি একা করে সকলের থেকে! চন্দ্রধরের একাকিত্বের কারণ কি তার এই মনোভাব! অপরের ইচ্ছাকে মূল্য দিতে নারাজ চাঁদ। তাই অনায়াসে ভেঙে দেয় সনকার পুজোর ঘট। এ কেমন মানুষ যে অপরের বিশ্বাসকে সামান্য সম্মানটুকু করতে পারে না? নারী করছে আর এক নারীর আরাধনা। পুরুষের অহংবোধকে আঘাত করছে সেই আরাধনা। নিজে মহাদেব ছাড়া কারোর পুজো নাই করতে পারে, কিন্তু সনকাও পারবে না এ কেমন কথা! পুরুষতন্ত্রের কথা সম্ভবত এমনটাই হয়। পাঁচশো বছর আগে দেখা চাঁদ থেকে আজকের চাঁদ—চাঁদের পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু সনকার প্রতি এই ক্ষেত্রে ব্যবহার তার একই। চেংমুড়ি কানীরে পুজো করা চলবে না। এই একটিমাত্র জায়গায় চন্দ্রধরকে মানতে অসুবিধা হয়। যদি এমন হত, চাঁদ বিষহরির পুজো করে না, কিন্তু অপরের পুজোয় বাধা দেয় না—তাহলে কি চাঁদের ব্যক্তিত্ব খুব কমে যেত, না কি সনকার পুজোর কারণে মনসা আর লখার প্রাণ নিতে পারতেন না, গল্পের বুনন আলগা হয়ে যেত দ্বিতীয় কারণটার কারণেই হয়তো চাঁদ—কাহিনিতে এতটা নিষ্ঠুর, কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক। নিষ্ঠুর হলেও চাঁদকে অস্বীকার করতে পারে না পাঠক। চাঁদের উপস্থিতি, চাঁদের পরাজয়, চাঁদের একাকিত্ব, সব কিছু নিয়েই গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তাকে।

অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত 'বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গাল' গ্রন্থের ভূমিকার সামান্য অংশ উদ্ধার করছি, "চাঁদ সদাগর চরিত্রটি গড়ে উঠেছে বাংলার বেশ কয়েকটি যুগ-লক্ষণকে স্পর্শ করে। এর সঙ্গো বিভিন্ন গোষ্ঠী-ভাবনার সত্যও মিলেমিশে গেছে।...বিপ্রদাসের মনসামঙ্গালে চাঁদের চরিত্রে অন্তত চারটি মৌলিক উপাদান লক্ষ করি।...অহংকার,...পুরুষ-প্রধান ভাবাদর্শ (Patriarchal Idea)-এর মূর্ত প্রতিনিধি।...প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব।...গাম্ভীর্যের পাথরের আড়ালে স্নেহশীল মূর্তি"।[৪] ঠিকই, চাঁদ অহংকারী, পুরুষতন্ত্রে বিশ্বাসী, প্রতিবাদী এবং স্নেহশীল। তারই সঙ্গো সে বড়ো একা। হয়তো এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিই তাকে আরও একা করে দিয়েছে। নিজের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নির্দ্বিধায় যে পরিবারের সকলের বিপরীতে দাঁড়ায় তার তো একাকিত্বই শেষ আশ্রয়।

সপ্তডিঙা ডুবে যাওয়ার মতো শোক শিশু সন্তানের মুখ দর্শন করে নিমিষে ভুলে যেতে পারে যে তার কাছ থেকে কিছু শেখার থাকে বৈকি। পার্থিব ধন-সম্পদ যে জীবনে খুবই তুচ্ছ তারই আভাস পাওয়া যায় চাঁদের আচরণে—"দেখি পুত্র মুখ/ মাধুর কৌতুক/পূর্ব শোক পাশরিলা।"[৫] আরও শিখতে হয়, নিজের মতের সঙ্গো কখন আপস করতে হবে। দেবলোকে বেহুলার লাস্য নৃত্যের পর চাঁদ মনসাপূজার কথা ঘোষণা করো "চান্দে বোলে, 'দিব আমি নব লক্ষ পূজা'/পূজার আদেশ করে চন্দ্রধর রাজা"।[৬] পুত্রবধূর সম্মানের থেকে যে নিজের জেদ কখনোই বেশি মূল্য পেতে পারে না তাও ঠিক সময়ে বুঝিয়ে দেয় চাঁদ বণিক। চাঁদের সঙ্গো মনসার লড়াই, তার ব্যক্তিগত আদর্শ রক্ষার লড়াই। মহাদেবের শিষ্য চাঁদ। মহাদেব মঙ্গাল জ্ঞানের প্রতীক। সেই জ্ঞান থেকে অজ্ঞানের দিকে পথ হাঁটবে না মধ্যযুগের চাঁদ। নিজের কাছে তার গতিপথ স্পষ্ট। তার জন্য তাকে শাসক, দাম্ভিক যা পরিচয়ই পেতে হোক না কেন। অস্তিত্বের সংকট এখানে মনসার। সে এসে হাত জোর করে চাঁদের দরজায় দাঁড়ায়।

চাঁদের পুজো না পেলে মর্ত্যে তার পুজো প্রচার হবে না। সপ্তডিঙা, ছয়পুত্র সব কিছু কেড়ে নেওয়ার পরেও কোনো লাভ হয় না মনসার যদি না চাঁদের পুজো সে পায়। পাঁচশো বছর পরে সেই অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে চাঁদ সদাগর। বিজয় গুপ্ত, কানাহরি দত্ত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মতো কবিদের হাতে চাঁদের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। তার বহুদিন পরে শম্ভু মিত্রের লেখনী চাঁদকে নতুন করে চিনিয়েছে। নতুন ঠিক নয়, মঙ্গালকাব্যের চাঁদের ভিতরেও ছিল অস্থিরতা। সময়ের সঙ্গো সঙ্গো তা অস্তিত্বের সংকটে পরিণত হয়েছে মাত্র। মঙ্গালকাব্যের চাঁদ কাঠুরে, ভিক্ষুক, আশ্রিত কতরূপে প্রাণধারনের চেষ্টা করে গিয়েছে নৌকাডুবির পর। বাঁচার লড়াই করতে হয়েছে তাকে প্রতিমুহূর্তে। নিজের পরিচয় ভুলে ব্রাহ্মণ গৃহ ধান নিড়ানোর কাজও করেছে সে, তবু অবিচল থেকেছে সে মহাদেবের প্রতি। "জীবনের থিক্যা অংক কষ্যা কষ্যা শিবাইয়ে পৌঁছ্যাতে চাই, সেথা শিবাই মেলে না। আর শিবাইয়ের থিক্যা অংক কষ্যা কষ্যা জীবনে পৌঁছ্যাতে চাই, দেখি জীবন মেলে না।"[৭]

"তবু পাড়ি দেব শিবের সন্ধানে।"[৮] যুগ যুগ ধরে চাঁদ পাড়ি দেয় সত্যের সন্ধানে। তার এই লড়াইয়ের সঙ্গো মিলে যায় বহু মানুষের সংগ্রাম। মঙ্গালকাব্যের যুগ থেকে বেরিয়ে আসে চন্দ্রধর তার ব্যক্তিত্বের কারণে। সমাজ 'অন্য রকম' ভাবে বাঁচতে চাওয়া মানুষগুলোকে সবসময় সম্মান দিতে পারে না। কোথাও একটা সেই মানুষটাকে মাথা নোয়াতেই হয়। সকলের মতো তাকে নিজেকে করে নিতেই হয়। তার ভিতর দুটি সত্তার কথোপকথন চলে অনবরত—"কেন তুমি ঘড়ি ধরে অফিসেতে ছুটবে/সব্বাই করে বলে সব্বাই করে তাই!"[৯] চন্দ্রধরকেও হয়তো শেষপর্যন্ত সব্বাই যা করে তাই করতে হয়েছে। তবু মঙ্গালকাব্যে তার উপস্থিতি উজ্জ্বল। চরিত্রে বেশ কিছু নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও চাঁদ বণিক পাঠকের খুব কাছের একজন। তার সপ্তডিঙা ডুবে গেলে মানুষ কষ্ট পায়। চাঁদের সংগ্রামকে নিজের সংগ্রাম মনে করে।

১৪৯৪ সালে লেখা হয়েছিল বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' কাব্য। এই সময়কালটি যেমন সুনির্দিষ্ট ভাবে পাওয়া যায়, মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের সময়কাল সেই ভাবে পাওয়া যায় না। কালজ্ঞাপক শ্লোক অনুযায়ী সেটি ১৫৪৪ বা ১৫৭৭ সাল হওয়া সম্ভব। আবার কাব্যের মানসিংহকে আকবর বাদশাহের সমসাময়িক বলে ধরে নিলে ১৬১০-এর আগে চণ্ডীমঙ্গাল লেখা হতে পারে না। অনুমান করে বলা যায় ষোড়শ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। মঙ্গালকাব্যে চন্দ্রধর বণিকের পর যে চরিত্র সবথেকে বেশি আলোচিত হয়েছে সম্ভবত সে ব্যাধ কালকেতু। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর নায়ক। চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের দ্বিতীয় পর্বে কালকেতুর দেখা পাওয়া যায়। ধর্মকেতু ব্যাধের ঘরে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর কালকেতু রূপে ফিরে আসে। কালকেতুর স্ত্রী ফুল্লরা গতজন্মে ছিল নীলাম্বরপত্নী ছায়া। এই কালকেতু-ফুল্লরাকে দেবী চণ্ডী নির্বাচন করেন মর্ত্যে তাঁর পুজো প্রচারের জন্য। দেবীর কৃপায় ব্যাধ কালকেতু গুজরাট নগরের রাজা হন। ভাঁড়ু দত্তের কুকর্মের কারণে কলিঙ্গারাজের সঙ্গো যুদ্ধ হল কালকেতুর। কলিঙ্গারাজাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন দেবী চণ্ডী। তাঁর ভক্ত কালকেতু সসম্মানে গুজরাট ফিরে আসেন এবং দেবীমাহাত্ম্য প্রচার করেন। চন্দ্রধর ও কালকেতুর ভিতর দুটি খুব স্পষ্ট পার্থক্য আছে। একটি হল সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য আর দ্বিতীয়টি হল ধর্মীয় আদর্শগত পার্থক্য। চন্দ্রধর শিবের উপাসক। সমস্ত কাব্য জুড়ে তার চলে মনসার সঙ্গো

দ্বন্দ্ব এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব। অপরদিকে কালকেতু প্রথম থেকেই চণ্ডীর স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রিত। চণ্ডীর দেখা পাওয়ার আগে কালকেতু বা তার ব্যাধ সমাজ কাকে পূজা করে শিকারে বার হত তার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় না। ছোটোনাগপুরের অধিবাসীরা ওঁরাও জাতির মধ্যে স্ত্রী দেবতা 'চণ্ডী'র কথা পাওয়া যায়। তিনি প্রসন্ন থাকলে পশুশিকার ভালো হয় এই কথা শোনা যায়। কিন্তু বর্তমান মেদিনীপুর অঞ্চলের কালকেতু 'চণ্ডী'কে পূজো করে পশুশিকার করতে যেত বলে উল্লেখ নেই। হঠাৎই একদিন স্বর্ণগোধিকার ছদ্মবেশে কালকেতুকে দেখা দেয় মা চণ্ডী। তাহলে কালকেতুর জন্মের পর, বিবাহের সময় কোন্ দেবতার পুজো হয়েছিল? জন্মের পর ষষ্ঠী পুজো হয়েছিল জানা যায়। আর তো কোনো বিশেষ দেবতার কথা পাওয়া যায় না। মনসামঙ্গাল কাব্যের কাহিনির তুলনায় চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য অনেক নিস্তরঙ্গা। সবকিছু সেখানে পরিপাটি করে সাজানো। কালকেতুকে একটি আংটি দেন দেবী। কালকেতুও তা গ্রহণ করে। ব্যাধ জীবনের অপরিসীম দারিদ্র্যই কি ধন গ্রহণের একমাত্র কারণ? ভালো থাকার উগ্রবাসনা নয় কি? প্রথম থেকেই চণ্ডিকা সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে চলে কালকেতুর। মুরারি শীল সোনার আংটিকে পিতলের আংটি বললেই শোনা যায় আকাশবাণী—

এমন সময় হৈল আকাশ-ভারতী।
লইতে বীরের ধন না করহ মতি।।
সাত কোটি টাকা দেহ অঙ্গুরীর মূল।
দিয়াছেন চন্ডী বীরে হয়ে অনুকূল।।
অকপট সাত কোটি টাকা দেহ বীরে।
বাড়িবে তোমার ধন অভয়ার বরে।।[১০]

শুধু কালকেতু নয়, পুজো প্রচারের জন্য মুরারিকেও অর্থ দান করতে রাজি দেবী। হিন্দু দেব দেবী অর্থের বিনিময়ে নিজের পুজোর প্রচার করছেন মর্ত্যে! কালকেতু তো প্রথম থেকেই নিবেদিত প্রাণ। স্তব করে কালকেতু—

শঙ্খিনী শূলিনী　　　কপাল মালিনী
তিনলোকে তোমা সেবে।।[১১]

ত্রিলোকে যদি এই দেবীর সেবা শুরু হয়ে গিয়েছে তাহলে কালকেতুর ভূমিকা পূজা প্রচারে কতটুকু! কলিঙ্গারাজের সঙ্গো যুদ্ধের সময়ও দেখা যায় দেবী চণ্ডী কালকেতুকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন। কখনো আকাশবাণী, কখনো স্বপ্নদর্শন। বরপুত্রের জন্য মা সবসময় বরাভয়দাত্রী। কিন্তু একটা কথা বুঝতে অসুবিধা হয়, কালকেতুকে রাজা করার কি প্রয়োজন ছিল? নিত্য বনে ব্যাধেদের উন্নতিকল্পে কি চণ্ডিকার ধন ব্যবহার করা যেত না? মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে সুদূর গুজরাট গিয়ে রাজা হয়ে কালকেতু নিজের পরিচিত গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মহাশ্বেতা দেবীর 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসে দেখা যায় মেদিনীপুর অঞ্চলে লোধা শবরেরা কালকেতুকে তাদের আদিগুরু বলে বিবেচনা করে। কালকেতু কি সত্যিই এই সম্মানের উপযুক্ত! কালকেতুকে একজন ভালো রাজা হিসেবে দেখানো দরকার ছিল। মামুদ শরীফের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কবি যে শাসকের ছবি বসে দেখতেন তার ছাঁচে কালকেতুর রাজা রূপ পেল। বোলান মণ্ডলের মতো প্রজা এল। কালকেতু তিন বছরের জন্য খাজনা মুকুব

করল। সমস্ত জীবিকার, সমস্ত জাতের, সমস্ত শ্রেণির মানুষকে সমান সম্মান দিয়ে নিজের রাজ্যে জমি দিল প্রজাবৎসল রাজা কালকেতু। কিন্তু না বুঝতে পারল ভাঁড়ুর চাতুরী, না করতে পারল কলিঙ্গারাজের সঙ্গো যুদ্ধ। ফুল্লরা যদি বা ব্যাধ জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, কালকেতু তাও নয়। তার রাজা পদের প্রতি মোহ আছে অথচ পদ ধরে রাখবার ক্ষমতা নেই। সে জানে চণ্ডিকার বর আছে তার জন্য। চন্দ্রধর নিজের মত প্রকাশ করতে চেয়েছিল, কালকেতু নিরাপদ আশ্রয় চেয়েছিল। কী করে যে গুজরাট নগরী ইন্দ্রের রাজসভার থেকে অসাধারণ হয়ে যায় তা বোঝা কঠিন। নাট্যকার বুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী যখন বিংশ শতাব্দীতে রচনা করেন 'ফুল্লকেতুর পালা' তখন সেই পুরোনো বৃত্তান্তই নতুন করে আবার শুনতে পাওয়া যায়। শুধু অবাক হতে হয় যখন দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর কালকেতু তার অস্ত্রাগারকে ধানের গোলায় পরিণত করে। কারণ তার কাছে মনে হয়েছে ধানের থেকে বড়ো অস্ত্র আর কিছু হয় না। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকের চন্দ্রধর ও কালকেতু বিংশ শতকে অনেক বদলে গিয়েছে। তাদের জীবনযুদ্ধ বদল ঘটাতে বাধ্য করেছে। তবু মনে হয় বীজটুকু নিশ্চিতভাবেই পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশে রোপণ করা হয়েছিল। নয়তো বিংশ শতকে হঠাৎ পরিবর্তন সম্ভব হত না। মঙ্গালকাব্যে নিম্নবর্গীয় মানুষগুলির কথা, ভূস্বামীর অত্যাচারের কথা, দেবতার রোষ ও সন্তোষের কথা সবই বলা হয়েছিল আর সেই বলার মধ্যেই নিহিত ছিল চাঁদের অঙ্ক কষার সংগ্রাম, কালকেতুর যৌথ খামারের মানসিকতা।

উৎসের সন্ধানে

১. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথমখণ্ড পূর্বার্ধ, নবম পরিচ্ছেদ, মনসার ব্রতগীত পাঞ্চালি, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ৪০এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলকাতা, পুনর্লিখিত তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫৯, পৃ. ১৭৫
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস', ভূমিকা, মঙ্গালকাব্য কি, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬৪, পৃ. ১
৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ও সংকলিত : 'বাইশ কবির মনসামঙ্গাল বা বাইশা', দ্বিজ বংশীদাস চাঁদ সদাগরের পূর্বকথা চাঁদের জন্ম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪, পৃ. ৫৯
৪. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত : 'বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গাল', ভূমিকা, রত্নাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র লেন, কলকাতা, পৃ. ৬৮-৬৯
৫. উৎস-৩, পৃ. ৫৯
৬. তদেব : পৃ. ২৬০
৭. শম্ভু মিত্র : 'চাঁদ বণিকের পালা', এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, পৌষ ১৪০০, পৃ. ১১৯
৮. তদেব : পৃ. ১২২
৯. অঞ্জলি বসু : 'বাদল সরকার : এবং ইন্দ্রজিৎ', কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭, পৃ. ৪০
১০. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : 'কবিকঙ্কণ চন্ডী', বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃ. ৬০
১১. তদেব : পৃ. ৬৩

বিপ্রদাস ও বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা : নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই

নাজনিন পারভিন

প্রাক-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে মঙ্গালকাব্য। মঙ্গালকাব্যগুলি পৌরাণিকতার মোড়কে মোড়া থাকলেও এর আড়ালে লুকিয়ে আছে মানবিকতার আবেদন। যুগের তাগিদে মঙ্গালকাব্যের কবিদের অলৌকিকতার আশ্রয় নিতে হলেও তাঁরা ভুলে যাননি সামাজিক পরিবেশ, ঘর-সংসার, মানুষজন ও তাদের দ্বন্দ্বকে। যার ফলে তাঁদের কাব্যের মধ্যে ফুঁটে উঠেছে মনুষ্যসুলভ স্বভাব বৈশিষ্ট্য। মঙ্গালকাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'মনসামঙ্গাল' কাব্য। এই কাব্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাই অনার্য দেবী মনসা আর্য সমাজে পূজা প্রচার তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কী অসম্ভব কৃচ্ছ্রসাধন করেছে জয়লাভের জন্য। এই জয়লাভ এক দেবীরূপে মানবীর জয়লাভ।

মনসার জন্ম কীভাবে হয়েছে এই নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক থাকলেও একথা নিশ্চিত, তার জন্ম পার্বতী থেকে হয়নি। আর জন্মদাত্রী পার্বতী নয় বলেই শিবের সঙ্গো মনসার যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছে তখন তাকে চিনতে না পেরে রূপে মুগ্ধ হয়ে কামনার দৃষ্টি দিয়েছে—

মনসা দাড়াইলো মহাদেবের অগ্রেতে।
দেখিয়া লোভিত হর চাহে কাম চিত্তে॥
ভয় পাইয়া মনসা কহেন পূর্বকথা।
আমি তোমার সুতা তুমি মোর পিতা॥[১]

একজন পিতার কাছ থেকে কামনার দৃষ্টি পাওয়া এবং কন্যা হিসেবে পরিচয় দেওয়া—এর থেকে অপমানজনক ঘটনা কী হতে পারে? কিন্তু এই ঘটনা সম্ভব হয়েছে সেই সময়ে যখন উচ্চবর্গের পুরুষেরা অবাধে মিলিত হতো নিম্নবর্গের নারীদের সঙ্গো। মনসার মত হাজার হাজার সন্তানের আবির্ভাব হত, যাদের কোনো পিতৃপরিচয় থাকত না। আর এই সমস্ত সন্তানদের খবর উচ্চবর্গের পুরুষেরা নেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করত না। থেকে যেত অন্ধকারের মধ্যে—যাদের প্রতিনিধি হয়ে উঠে এসেছে মনসা। আর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে নিজের অধিকারটুকু উচ্চবর্গের মানুষদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার পথটা খুব একটা মসৃণ ছিল না।

সমস্ত নারীর মতো মনসাও চেয়েছে এক সুখী পরিবার। যেখানে বাপ, মা ও ভাই থাকবে। তার জন্য সে শিবের সঙ্গে যেতে চেয়েছে 'নিজঘর'[২]-এ। কিন্তু মনসার সেই বাসনা পূরণ হয়নি। কারণ চণ্ডীও চায়নি নিজের সুখী পরিবারের দুঃখ ডেকে আনতে। তাই মনসাকে দেখে চণ্ডী ভেবেছে শিবের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত। পিতা-কন্যার সুমধুর সম্পর্কে চণ্ডীর এই ভাবনায় সে অপমানিত বোধ করেছে—

শুনিয়া মনসা কোপে হইল হুতাশন।
আপনার খাইয়া মোরে বল কুবচন।।
আপন প্রকৃতি যেন দেখসি আমায়।
হেন অসম্ভব কথা প্রস্তাবে কোথায়।।[৩]

আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মনসা চণ্ডীকে মৃত্যুর মুখে ফেলতেও পিছুপা হয়নি। সৎ মায়ের কাছে মনসা যেমন মেয়ের মর্যাদা পায়নি তেমনই পায়নি ছোটো দুই ভাইয়ের কাছে শ্রদ্ধা বরং এর পরিবর্তে পেয়েছে তাচ্ছিল্য—

মন্দিরে আনিলা বাপু কাহার রমণী।
কেমন প্রকারে মোর বধিল জননী।।[৪]

যাদেরকে মনসা নিজের ভাই মনে করেছে তাদের মনে তার জন্য বিন্দুমাত্র ভালোবাসা প্রকাশ পায়নি। চণ্ডী বারবার ঘৃণাবশত দূরে সরিয়ে দিলেও মা-কে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে—

সত মা হইয়া এত করে অপমান।
কতেক লাঞ্ছনা আর চক্ষু হৈল কাণ।।
এতসব দুঃখ পদ্মা বিসরিয়া মনে।
পুনরপি ধরিলেক চণ্ডীর চরণে।।[৫]

কিন্তু মনসার সেই আশা পূরণ হয় না—

চণ্ডিকারে মনসা বিনয় বলে যত।
জ্বরপিত্ত মুখে যেন চিনি লাগে তিতো।।[৬]

এত অপমান সহ্য করেও সে তার কর্তব্য করেছে। চণ্ডী যখন মারা যায় তখন শিব সন্তাপ করলে তার দুঃখ-কষ্ট না দেখতে পেরে বলেছে—"না করা সন্তাপ বাপু দিব জিয়াইয়া।"[৭] কিন্তু শেষপর্যন্ত সে চণ্ডীর ঘরে স্থান পায়না। শিব তাকে কর্তব্য বিমুখ পিতার মতো নির্বাসন দিয়ে এসেছে সিজুয়া পর্বতে—প্রচলিত সমাজ থেকে অনেক দূরে। কারণ এই সমস্ত সন্তান (নেতো, ধামাই) দেরকে সমাজ কোনো কালেই মেনে নেয় না। সিজুয়া পর্বতে বাসকালে যখন পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনেছে তখন নেতো, মনসা—দুজনেই বেদনার্ত হয়েছে। আবার চণ্ডীর শিবকে বাঁচানোর আগমন বার্তায় অভিমান প্রকাশ করলেও সেই অভিমান শেষপর্যন্ত টিকে রাখতে পারেনি। অভিমানের থেকে বড়ো হয়ে উঠেছে পিতার প্রতি এক মেয়ের ভালোবাসা। পিতা-মাতার কাছ থেকে মনসা কোনোদিন কোনো ভালোবাসা পায়নি এমনকি পিতা-মাতার দায়িত্ব কর্তব্যটুকু তারা পালন করেনি তাই দুঃখ প্রকাশ করে বলেছে—

পিতার বর্তমানে সতা রহিতে না দিলে তথা
কেমনে যাইব তার লক্ষে।

কে পালিবে আমা সভা   কেবা আর দিবে বিভা
কান্দে দেবি ভাবি মন দুঃখে।।[৮]

এই দুঃখ মনসার সারাজীবন থেকে গেছে। মনসার জন্ম যেমন সুখের হয়নি তেমনি তার বিবাহও সুখের হয়নি। যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে অনেক কষ্টে এক বৃদ্ধ ঋষির সঙ্গো আবার সৎ মায়ের চক্রান্তে বিয়ের রাতেই স্বামী ত্যাগ করে চলে গেছে-এর—থেকে দুঃখ এক নারীর জীবনে আর কী হতে পারে—

কান্দে দেবী নেতো হাতে ধরি
ঋষি গেল থুয়্যা একেশ্বরী।[৯]

জরুৎকারু মুনির পলায়ন শুধুমাত্র সর্প ভয়ে ভীত হয়ে নয় এই ভীতি মাতৃপরিচয়হীন, নামমাত্র পিতৃপরিচয়ের এক সন্তানের সংস্পর্শে আসার ফলে সমাজে তার পরিণতি কী হতে পারে সেই ভাবনার ফলাফল।

সিজুয়া পর্বতে সুখে বসবাস করলেও তার মনে শান্তি ছিলনা, তার বিবেক প্রতিনিয়ত দংশন করেছে তার নারীসত্তাকে সমাজে সম্মানের সঙ্গো বাঁচার জন্য। সমাজ ও সমাজের মানুষজন যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে প্রথমে নারী হিসেবে ও তারপর শিবের কন্যা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য। আর্য শিবের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও সমাজ তাকে মেনে নেয়নি—তাই শিব কন্যার উর্ধ্বে শুধুমাত্র নারী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিতা লাভে সে অনড়। মনসার সমগ্র নারীজীবন প্রথমে কন্যা হিসেবে, পরে বধূ হিসেবে এবং শেষে মাতা হিসেবে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ সন্তানের জন্মও স্বাভাবিক হয়নি। এরকম পরিস্থিতিতে তাকে বেছে নিতে হয়েছে এক ভয়ংকরী রূপ। অচিন্ত্য বিশ্বাস 'বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গাল' কাব্যের মনসার চরিত্র প্রসঙ্গো বলতে গিয়ে বলেছেন—

> মনসার প্রতি হিংসা গ্রহণের মানসিকতা ষড়যন্ত্র করার ভাবনা হয়তো এই দুঃখপূর্ণ জীবন অভিজ্ঞতারই ফল। যে পিতা তাকে আশ্রয় দিলেন না, যে সৎ মাতা তাকে নানাভাবে লাঞ্ছনা করেছেন-ষড়যন্ত্র করে স্বামীর সঙ্গো সংসার পর্যন্ত করতে দেননি, সেই পিতা ও মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল অভিজাত সমাজকে আঘাত করে তার অস্তিত্ব জাহির করেছেন। এখানে মনসা নারী হিসেবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন-তার মধ্যে প্রতিভাত হয় মধ্যযুগের লাঞ্ছিতা সর্বরিক্তা এক নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামী মানসিকতা, প্রত্যয় ও তার বিজয় অভিযান।[১০]

আর এই আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মনসার ছায়াসঙ্গী হিসেবে থেকেছে আর এক বঞ্চিত, উপেক্ষিত নারী নেত। বিপ্রদাস তার কাব্যে বঞ্চিত মানসার মধ্যে দিয়ে আর এক বঞ্চিত নারী নেতোকে প্রকাশ করেছেন খুব সুন্দরভাবে।

মনসা তার সমস্ত কার্য সম্পন্ন করেছেন নেতোর পরামর্শ মতো। নেত পর্দার আড়ালে থেকে মনসাকে উৎসাহ দান করেছে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে। বিপ্রদাস ও বিজয়গুপ্ত মধ্যযুগের কবি হওয়ার কারণে মনসার পূজা প্রচারে অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়ায়ে যে অলৌকিকতার আশ্রয় নিয়েছেন তা আসলে আধুনিককালে ম্যাজিকের সমগোত্রীয়। তাই দেখতে পাওয়া যায় রাখাল, হাসানহাটির নৃপতি সৈয়দ হাসান আর জালু-মালুদের কাছে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য

দেখিয়েছে কিছু ম্যাজিক। কিন্তু বাধার মুখে পড়তে হয়েছে চাঁদ সওদাগরের কাছে স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে। এই স্বীকৃতি লাভের পথ যে কত কঠিন ছিল তার ইঙ্গিত পাই বিজয়গুপ্তের কাব্যে—

যে হাতে পুজি আমি শঙ্কর ভবানী।
সেই হাতে পূজা খাইতে চাহ দুস্টকানী।।
দূরে যাও লুঘুজাতি না বলিস আর।
এত দেব মধ্যে করিস ধামনা ভাতার।।[১১]

সামন্ততন্ত্রের প্রভুত্বের দাম্ভিকতায় মনসাকে লঘুজাতি বলে যেমন দূরে সরিয়ে দিয়েছে তেমনি পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যে নারীদের অবস্থা ছিল করুণতর তা বোঝা যায় সনকা চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

শিব ভক্ত স্বামীর চক্ষুর আড়ালে সনকার মনসাকে পুজো দেওয়া আসলে এক নারীর হৃদয়ে আরেক নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে, সেই সঙ্গো প্রকাশ পেয়েছে নারীর স্বাধীনভাবে বাঁচার ইচ্ছাশক্তিও। কিন্তু সেই ইচ্ছাশক্তি খুব সহজেই অবদমিত হয়ে যায় পুরুষতন্ত্রের প্রাবল্যের কাছে চাঁদ সওদাগরের ঘট ভাঙাকে কেন্দ্র করে—

> শিব দুর্গার পুত্র আমি সর্ব দেবে জানি।/লঘুজাতি হইয়া আইসে পূজ্যমানি।।/তাহারে পুজিতে মোর মনে নাহি লয়।/ভাঙ্গিব তাহার মাথা কহিলাম নিশ্চয়।।/এত বলি সদাগর ক্রোধ হইল অতি।/ঘট ভাঙ্গিতে সাধু চলে শীঘ্রগতি।।/দন্ত কড়মড় সাধু হেতাল বাড়ি লোফে।/সাধু রূপ দেখিয়া পদ্মার প্রাণ কাপে।।/অন্তরীক্ষ হইলা পদ্মা নাগরথে চড়ি।/হেতাল বাড়ি দিয়া সাধু ঘট করে গুড়ী।।/ভাঙ্গিলেক ঘট সাধু অতি ক্রোধ হইয়া।/সোনেকারে গালি পাড়ে ঘট ভাঙ্গিয়া।।[১২]

মনসা তার অস্তিত্বের সংকটে বিপর্যস্ত। সে তার অপমানের কথা পিতা মহাদেবকে জানালে তার কথায় বোঝা যায় যে, সমাজে মান্যতা দানের ক্ষমতা চাঁদের হাতে—

চান্দ যদি পুজা করে একত্রিত।
তবে সে তোমার পূজা হবে পৃথিবীতে।।[১৩]

এই স্বীকৃতি লাভের লড়াইয়ে সে পাশে পায়নি তার পিতাকে। এখানে আমরা সমাজ ভয়ে ভীত এক পিতৃসত্তার অস্তিত্বকে লক্ষ করি। তাই অনুনয়-বিনয় করে যখন মনসা স্বীকৃতি পায়নি তখন তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে ছলনার। তাই অপমানিত মনসার মুখে উচ্চারিত হয়েছে—

চান্দর অপমান আর সহিতে না পারি।
আজু কাটিব জাইয়া চান্দর গুয়া বাড়ী।।[১৪]

সে চাঁদের ছয় পুত্রকে বিষ প্রয়োগে শেষ করেছে। স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সে নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব। এই ক্ষমতার লড়াইয়ে অসংখ্য ক্ষতি হয়েছে এমনকি তার ভক্ত অর্থাৎ অনুগত বেহুলার ক্ষতি করতে পিছুপা হয়নি। তাই বেহুলার গলায় শুনতে পায় খেদ—

দুঃখ সিন্ধুজল ভাসিয়া বিকল

তিল দয়া নাহি তোমা।
তোমা ছাড়া গতি অন্য নাহি মতি
কত দুঃখ দেহ আমা।।[১৫]

এখানে এক অনুগতের ক্ষতি অপেক্ষা তার কাছে সমস্ত বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অবহেলিত নারীর জয় লাভের লড়াই বড়ো হয়ে উঠেছে। শোষিতকে সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের প্রাপ্য আদায় করতে হয় আর তার চাওয়ার মধ্য দিয়েই মধ্যযুগের পর্দার আড়ালে থাকা সমস্ত নারীর চাওয়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

উচ্চবর্গের সমাজের প্রতিভূ চাঁদ সওদাগর নিজের সমস্ত ক্ষতি স্বীকার করলেও এক নিম্নবর্গের সমাজ বিচ্যুত নারীর কাছে মাথা নত করতে অনিচ্ছুক। কিন্তু চাঁদ সওদাগর অনড়-অটল পৌরুষ্যত্ব ধরে রাখতে পারেনি; শেষপর্যন্ত মনসার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়েছে সমাজে নিজেদের (ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির) অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য। তবে শেষ চেস্টা করেছে মনসাকে এক কঠিন শর্ত দিয়ে—

স্থলে যদি চলে ডিঙ্গা যায় মোর দ্বারে।
তবে সে মহিমা জানি পূজিব তাঁহারে।।[১৬]

কিন্তু সেই শর্তেও মনসা উত্তীর্ণ হয়েছে যার ফলে মন থেকে না হলেও যুগের তাগিদে মেনে নিতে হয়েছে মনসাকে। বিজয়গুপ্ত ও অন্যান্য কবিরা যেখানে বাঁ হাতে পুজো দিয়ে তাচ্ছিল্য সহকারে মনসাকে স্বীকৃতি দান করেছেন সেখানে বিপ্রদাস সাদরে গ্রহণ করেছেন—

নাগ পূজিবারে পুষ্প নাহি আটে শেষে।
দাড়ি গোঁপ ছিঁড়িয়া পুজিল অবশেষে।।[১৭]

নারী হিসেবে মনসার কাছে গ্রহণ করার পথ অপেক্ষা গ্রহণ করার মানসিকতায় বড়ো হয়ে উঠেছে। যার ফলে গর্বের সঙ্গো সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে।

প্রাচীন যুগে মানসার মতো সন্তানদের অভাব ছিল না যাদের চোখের জলের হিসাব কেউ রাখতোনা। এই সমস্ত সন্তানদের প্রতিনিধি হিসেবে উঠে এসেছে মনসা মধ্যযুগে। এতদিন ধরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যাদেরকে নিন্দার চোখে দেখত অমার্জিত, অশোভন বলে ঘৃণা করত সেই সমাজের মানুষ মনসার কাহিনি। কস্টকর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মনসা প্রমাণ করেছে জীবনের ধর্ম হল নতুন নির্মাণ, নতুন করে স্বপ্ন দেখা, প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করা ও পরিপূর্ণ শক্তির আলোকে উদ্ভাসিত হওয়া। মনসার আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি দেবতার অন্তরালে সমাজের সমন্বয়ের কাহিনি, যে বিবাদ শেষ হতেই চায় না—এই শতকে এসেও।

উৎসের সন্ধানে

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত : 'বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গাল', রত্নাবলী, কলকাতা, এপ্রিল ২০০২, পৃ. ১৬
২. তদেব : পৃ. ১৭
৩. তদেব : পৃ. ১৮
৪. তদেব

৫. তদেব : পৃ. ১৯
৬. তদেব
৭. তদেব : পৃ. ১৮
৮. তদেব : পৃ. ৩৮
৯. তদেব : পৃ. ৪৪
১০. তদেব : পৃ. ৬৪
১১. জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত : 'কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪২, পৃ. ১৪১
১২. তদেব : পৃ. ১৪৮
১৩. তদেব : পৃ. ১৫২
১৪. তদেব
১৫. উৎস-১, পৃ. ২০৩
১৬. তদেব : পৃ. ২১১
১৭. তদেব : পৃ. ২১৪

ধর্মমঙ্গল কাব্যে সমকালীন রাজনৈতিক চিত্র

নব্যেন্দু রায় চৌধুরী

চতুর্দশ শতাব্দীর আলংকারিক আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে সাহিত্যের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, 'রসসিক্ত বাক্য'ই হল কাব্য। এই রস হল আনন্দের হেতু-স্বরূপ। অর্থাৎ যে কাব্য পাঠের ফলে পাঠক চিত্তে রস নিবৃতকরণের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ হয়, সেই কাব্যই হল প্রকৃত সাহিত্য। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে মানুষের কাছে সাহিত্য শুধুমাত্র আনন্দের হেতু স্বরূপ হয়ে থাকেনি। বরং, যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সাহিত্যও হয়ে উঠেছে বাস্তব ঘেঁষা। তাই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে সাহিত্যে দেশাচার, কালাচার ও রাজনীতির প্রবেশের কথা স্বীকার করেছেন। সাহিত্যিক সাহিত্যকে জীবনের গতিশীলতা ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, দেশাচার ও জীবন-চেতনার সঙ্গে স্বীয় কল্পনা ও সৃজনশক্তির জারণ ক্রিয়ার মাধ্যমে এমন একটি বিশেষ নান্দনিকতায় পৌঁছে দেয়, যা পাঠ করা মাত্রই পাঠক চিত্তে তৃপ্তি ও প্রশান্তি আসে। সেই ভাবনারই প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর ধারা মঙ্গলকাব্যে। মঙ্গলকাব্যের অন্যতম শাখা ধর্মমঙ্গল কাব্য রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য হিসেবে প্রসিদ্ধ। রাঢ়ের জনজীবনকে কেন্দ্র করে রাঢ়ের কবিরা কাব্য রচনা করার ফলে কাব্যের উপকরণ হিসাবে তৎকালীন সময়ে রাঢ়বঙ্গের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র স্থান পেয়েছে। তাই রাঢ়বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানার জন্য ধর্মমঙ্গল কাব্যে রাজনৈতিক ভাবধারা আলোচনার প্রয়োজনীয়তা থেকেই যায়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল ধর্মাশ্রিত। এই সময়ে অধিকাংশ কবি দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে কাব্য রচনা করলেও, মধ্যযুগের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের বাইরে তারা অবস্থান করতে পারেননি। ফলে একনিষ্ঠ ও অবিমিশ্র দেবমহিমা রচনা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ধর্মমঙ্গল কাব্যও এই ভাবনার ব্যতিক্রম নয়। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান উপাধি নিয়ে মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতুব-উদ্দিন-আইবক দিল্লির সিংহাসনে বসেন। কুতুব-উদ্দিন-আইবেকের দুঃসাহসিক পার্শ্বচর মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে নদিয়া ও লখনাবতী আক্রমণ করে এবং বিজয় লাভ করে। বঙ্গের ইতিহাসে তাকেই বলা হয়েছে তুর্কি আক্রমণ। মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে বঙ্গদেশে সমৃদ্ধি ও শক্তির মূল-পীঠস্থান

গৌড় 'লখনাবতী' নামে পরিচিত ছিল। তাদের এই আক্রমনের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার। তুর্কি আক্রমণের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গো জনৈক ঐতিহাসিক নীতিশ সেনগুপ্ত তাঁর 'বঙ্গভূমি ও বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন—

> হিন্দু রাজাদের দুর্বলতার এবং রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে এরা সবাই হিন্দুস্থানে রাজ্য দখল করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। এই আক্রমণকারীরা তাদের নতুন ধর্ম ইসলাম ধর্মের উদ্দীপনাতেও উদ্দীপ্ত হয়ে এই ধর্ম প্রচার করতে ইচ্ছুক ছিল।[১]

শুধুমাত্র মুসলমান ধর্মের প্রসারই নয়, সঙ্গো সঙ্গো হিন্দু রাজ্য লুণ্ঠন ও হিন্দু মন্দির ধ্বংসও ছিল তুর্কি আক্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই প্রসঙ্গো রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে লিখেছেন—

> বিধর্মীর সহিত যুদ্ধ মুসলমানের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ, মুসলমান রাজ্যের সীমান্তস্থিত হিন্দুরাজ্যে শান্তি ছিল না। মুসলমানগণ হিন্দুরাজ্য লুণ্ঠন অন্যায় মনে করিতেন না, বিশেষত তুরস্কজাতীয় মুসলমান ধ্বংসে ও লুণ্ঠনে বিশেষ পারদর্শী। মুসলমান রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত হিন্দুরাজ্যের গ্রাম ও নগরগুলি অচিরে ধ্বংস হইতএবং অধিবাসীগণ পালায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিত। এইরূপে মুসলমান রাজ্য বর্দ্ধিত হইত ও হিন্দুরাজ্য আয়তনে ক্ষুদ্র হইয়া যাইত।[২]

ফলে তুর্কি বিজয় সমগ্র বঙ্গাদেশের চালচিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। তুর্কি বিজয় থেকে লুণ্ঠন, নৃশংসতা, হত্যা, অরাজকতা ও শোষণের যে সূত্রপাত ঘটে, তা অব্যাহত ছিল অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মাঝে ধর্মমঙ্গালের কবিদের দেব-বন্দনা হয়ে উঠেছে সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রের বিশৃঙ্খল ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত। মধ্যযুগে উগ্র-সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেও বেশ কিছু উদারচেতা নরপতির আবির্ভাব হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হুসেন শাহ এবং তার পুত্র নসরৎ শাহ। বিদেশি হলেও তারা ছিলেন মানসিক দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষ, উদারচেতা ও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। ফলে বাংলার পীড়িত হিন্দুরা এই সময়কালে কিছুটা স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নিতে পেরেছিল। হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) সময়কাল স্বর্ণযুগ হলেও তিনি সমগ্র বাংলায় নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারেননি। তার সময়কালে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সেনাবাহিনী সরস্বতী নদী অতিক্রম করে উড়িষ্যা ও বঙ্গোর সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির ওপর অত্যাচার ও লুণ্ঠন করত। ফলে সেই গ্রামগুলির জনজীবন বিপন্ন হয়। তাই অখণ্ড বঙ্গাদেশে নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৫০৮-১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি শাহ ইসমাইল গাজির নেতৃত্বে উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্রের অনুপস্থিতিতে উড়িষ্যার কটক ও জাজপুর আক্রমণ করে ও জয় করে এবং বিজয় উপলক্ষ্যে তিনি নতুন একটি মুদ্রার প্রচলন করেন। কিন্তু হুসেন শাহের এই আক্রমণ ও জয়কে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম সাফল্য বলা চলে না। কারণ উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্র এই সংবাদ পাওয়ার পরে রাজ্যে প্রত্যাগমন করে হুগলির আরামবাগের কাছে মান্দারন দুর্গ অধিকার করেন। ধর্মমঙ্গাল কাব্য ধারার আদিকবি রামাই পন্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'-এর 'শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা' অংশে জাজপুরে মুসলমান শাসকদের আগমনের কথা একটু অন্য ভাবে বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

বেদ করে উচ্চারণ বের‍্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখাআ সবাই কম্পমান।
মনেতে পাইআ স্মর্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান।।
এই রূপে দ্বিজগন করে সৃষ্টি সংহারন
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈন্ট্রে ডাকিআ ধর্ম মনে ট পাইআ মর্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার।।
ধর্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথাএ ট কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবন লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম।।
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলে ত দম্বদার।
জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার।।[৩]

জাজপুর ছিল ধর্মঠাকুরের আদি পীঠস্থান। 'শূন্যপুরাণ' কাব্যে থেকে জানা যায় জাজপুরের জনজীবন স্থানীয় ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে ক্লিস্ট ও বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। তখন তারা এই অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে কল্কি অবতারের আগমনের কল্পনায় লীন হয়। তাই ধর্মঠাকুর যবন বেশে অন্যান্য দেবগণকে নিয়ে জাজপুর আক্রমণ করেন। অর্থাৎ বলা চলে, জাজপুরে মুসলমান আক্রমণকে তারা অদৃস্টের বিধান বলেই মেনে নেয় এবং এই আক্রমণের ফলে উড়িষ্যার মার্জিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি অনেকটাই বিধ্বস্ত হয়েছিল।

রাঢ়বঙ্গোর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনে পোর্তুগিজদের ভূমিকা ছিল অন্যতম। ১৪৯৮-খ্রিস্টাব্দে কালিকট বন্দরে প্রথম পোর্তুগিজ ভাস্কো-দা-গামা আসেন। তখন বাংলার সুলতান ছিলেন হুসেন শাহ। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগিজরা এলে নসরৎ শাহ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়ে পোর্তুগিজরা উপনিবেশ স্থাপনে ব্যর্থ হয়। ১৫৩২-খ্রিস্টাব্দে নসরৎ শাহ নিহত হলে আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু সীমিত কালের মধ্যেই তাঁর খুল্লতাত গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮খ্রি.) তাকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করে নিজে সিংহাসনে বসেন। অযোগ্য সুলতান হওয়ার কারণে তিনি বিদেশি শক্তি পোর্তুগিজদের এদেশে বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপনের ছাড়পত্র দেন। ফলে তাঁর রাজত্বকালেই প্রথম বাংলা তথা রাঢ় বাংলায় পোর্তুগিজরা বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করে। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হুমায়ুন শের খাঁ'র কাছে বিল্বগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং দিল্লির সিংহাসনে বসার পরে 'শের খান' নাম নিয়ে একছত্র হিন্দুস্থানের সম্রাট রূপে অভিষিক্ত হন। কিন্তু বঙ্গাদেশ থেকে দিল্লির দূরত্ব অধিক হওয়ার করণে তিনি জায়গিরদারি প্রথার উদ্ভব ঘটান। বঙ্গাদেশকে কয়েকটি জায়িগীরে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটি জায়গীরে শাসনের জন্য একজন আফগান শাসককে নিযুক্ত করেন।

এর ফলে বাংলাদেশে জায়গীরদারি প্রথা ও বারোভূঁইয়ার উদ্ভব হয়। অপরদিকে ক্রমশ ফিরিঙ্গি তথা পোর্তুগিজরা বাণিজ্যিক স্বার্থে বঙ্গাদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। তারা হুগলিতে ঘাঁটি নির্মাণের করে। এরপর ক্রমশ রাঢ়বঙ্গোর তমলুক, হিজলি, পিপলি, বালেশ্বরে এবং পূর্ববঙ্গোর চট্টগ্রাম, ঢাকা, বরিশাল, যশোর, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলায় বাণিজ্য কুঠির নির্মাণ করে। পূর্ববঙ্গে তাদের শাসনের ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় চট্টগ্রাম। সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গালের কবি রূপরামের কাব্যে তার বিবরণ মেলে—

নিকট উসতপুর দেখদেখি অতি দূর
অপরূপ দেখিল দেহারা।
দক্ষিণে ফিরিঙ্গি পাড়া তার আগুয়া কেতারা
বাম দিকে থাকে দদুঝোঝা।।[৪]

ফিরিঙ্গিরা জলপথে দস্যুবৃত্তি করত। তাদের অত্যাচারে বঙ্গাদেশের জনজীবন অশান্ত হয়ে ওঠে। এই দস্যুরা গ্রামবাসীদের বন্দীকরে নিয়ে গিয়ে দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলিতে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসি বণিকদের কাছে ক্রীতদাস রূপে বিক্রয় করতো। কবি মানিক গাঙ্গুলির কাব্যে তার বর্ণনা মেলে—

দেশে দেশে দরিদ্র ব্রাহ্মণ কত আছে।
ধন লয়ে স্বেচ্ছায় যদিপি কেহ বেচে।।[৫]

তিনি কাব্যের আরেক স্থানে সাধারণ মানুষকে ফিরিঙ্গি দস্যু কর্তৃক বিক্রয়ের প্রসঙ্গো লিখেছেন—“মাগু ছেলা বিকাবেক চৈতন্যের হাতে।”[৬] ফিরিঙ্গি দস্যুদের রাজত্ব সপ্তদশ শতকে প্রায় অস্তমিত হয়ে এলেও তাদের অত্যাচারের রেশ সাধারণ মানুষের মধ্যে দীর্ঘ দিন ছিল। সেই প্রসঙ্গা মেলে কবি নরসিংহ বসুর কাব্যে—

তমোলুক দক্ষিণে সম্মুখে সোনজড়া।
রাতারাতি পার হইল ফিরিঙ্গীর পাড়া।।[৭]

আপরদিকে শের খানের সময়ে যে বারোভূঁইয়ার উদ্ভব হয় তারা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং নিজেদেরকে স্বাধীন রাজা হিসেবে ঘোষণা করতে থাকে। ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। বারোভূঁইয়াদের শক্তির কথা বোঝাতে গেয়ে কবি মানিকরাম গাঙ্গুলি স্পষ্ট ভাবে লিখেছেন—“বারভূঁঞা বসে আছে বুকে দিয়া ধাল।”[৮] আবার কবি ঘনরাম চক্রবর্তীও তাদের সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে এই বারোভূঁইয়াদের আর্থিক ক্ষমতার পরিচয় মেলে—“গজপৃষ্ঠে নৃপতি বেষ্টিত বারভূঞা।”[৯] বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সময় কাল ১৬৭৫-১৬৯১ খ্রিস্টাব্দ। তার রাজত্বকালে দিল্লির সিংহাসনে ছিল ঔরঙ্গাজেব এবং বাংলার সুবেদারী পদে শায়েস্তা খান প্রতিষ্ঠিত ছিল। পিতা ঘনশ্যামের মৃত্যুর পরে বর্ধমানের সিংহাসনে বসে তিনি বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁ'কে সন্তুস্ট রাখেন এবং দিল্লিশ্বরের সুনজরে থাকার ফলে ভূমিসম্পদ লাভ করেন। শোভা সিংহের সঙ্গো চন্দ্রকোনার যুদ্ধে নিহত হন। তিনি প্রকৃত অর্থেই বর্ধমান রাজবংশের সূচনা করেন। ধর্মাত্মা ব্যক্তি হওয়ার জন্য দেব-দ্বিজের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেনে। তাই ধর্মমঙ্গালের কবি যাদুনাথ তাঁর কাব্যে রাজা কৃষ্ণরামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন—

খেত্রী বংশতে জন্ম নাম কৃষ্ণরাম।
প্রভাতে উঠিয়া মুখে স্বরে যার নাম।।
কৃষ্ণরামের নামে তাপ বিমোচনে।
চিরকাল রাজুতি করে বর্ধমানে।।[১০]

১৭০০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি নায়েব সুবেদার পদ লাভ করেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হলে বাংলায় অরাজকতা দেখা দেয়। ফলে ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর হাতে বাংলার শাসন ভার অর্পণ করা হয়। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুবেদার পদে নিযুক্ত করা হয় এবং ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাংলার শাসনকার্য চালান। শাসনকার্যের সুবিধার্থে তিনি জমিদারি প্রথার উদ্ভব ঘটান। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কর্তৃক জমিদারতন্ত্রের উদ্ভবের পিছনে প্রধান কারণ হল বঙ্গদেশে সুশৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখা এবং রাজস্ব আদায় করা। তিনি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কঠোর ছিলেন। যেসমস্ত জমিদাররা সঠিক সময়ে রাজস্ব প্রদান না করত, নবাব তাদের রাজ্য আক্রমণ করতে পিছুপা হত না। এই প্রসঙ্গে ড. নীতিশ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

> যে সব জমিদার ও জাগিরদাররা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান ছিলেন, যাঁদের নিজেদের জমিদারিতে কোনো কায়েমি স্বার্থ ছিল না এবং নিজেদের তহবিল থেকে যথোপযুক্তভাবে ব্যয় না করে রাজস্ব প্রদানে গাফিলতি করতেন, মুর্শিদকুলি তাঁদের সবাইকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। পরিবর্তে তিনি এক নতুন জমিদারশ্রেণী নিযুক্ত করেছিলেন, যার অধিকাংশই হিন্দু। তারা যথাসময়ে রাজস্ব দিয়ে নিজেদের স্থান সুদৃঢ় করেছিলেন। যারা রাজস্ব দিতেন না নবাব তাঁদের প্রচণ্ড শাস্তি দিতেন।[১১]

কর-আদায়ের ক্ষেত্রে নবাবের কঠোর মানসিকতা কবি নরসিংহ বসু লিখেছেন—

নবাব জাফর খান নবন্দি হাকিম।
দরবার দেশে দেশে প্রতাপ অসীম।।
মাঝে মাঝে লোকের খাজনা লেন বুঝে।
বেবাক করিল পুন বাকী বুলে খুজে।।[১২]

এই সময়ে রাজনগরের রাজা তথা জমিদার ছিল আসাদুল্লাহ (১৬৯৭-১৭১৮খ্রি.)। তিনি ধার্মিক রাজা ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের উপর তিনি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ'কে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য করার জন্য তিনি নবাবের সুনজরে ছিলেন এবং কর দানের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে ড. সুকুমার মাইতি নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন—

> আসফুল্লা বা আসাদউল্লা খাঁ অত্যন্ত দানশীল ও অভিজ্ঞ নরপতি ছিলেন অনেক সময় তিনি নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে মুর্শিদাবাদের নবাবকে যুদ্ধে সাহায্য করে রাজকর থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ নিজ রাজ্যের পশ্চিম সীমাকে ছোটনাগপুরের আদিম অসভ্য জাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য আসফুল্লা খাঁকে বীরভুম রাজ্য জায়গীর স্বরূপ দান করেন।[১৩]

কবি নরসিংহ বসু রাজার উকিল হিসেবে নিযুক্ত হন এবং আঠারো বছর ওকালতি করেন—

কৃপা করি নৃপমণি রাখিল ছাকর।
ওকালতি একক্রমে আঠারো বছর।।[১৪]

ফলে কবি রাজা আসফুল্লার সময়ের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তকে প্রত্যক্ষভাবে দেখেন। কবি তার অন্নদাতা রাজা আসফুল্লার প্রশংসা করে লিখেছেন—

বাঙ্গালায় বীরভূম বিখ্যাত অবনী।
শ্রীআসফুল্লা খান রাজা শিরোমণি।।
প্রবল প্রতাপ ভূপ সমরে প্রচণ্ড।
সব দেশে যশ গায় রাজা ঝারিখণ্ড।।[১৫]

আসফুল্লার রাজত্বে প্রজারা নিরাপদ থাকলেও কোন এক অজানা বিপদের আশঙ্কা ছিল। এক্ষেত্রে আমাদের অনুমান করা অসংগত নয় যে, এই আশঙ্কা ছিল নবাবের রাজকর আদায়ের কঠোরতা। কবি নরসিংহ বসু তাই বলেছেন—

দেশে নাই ডাকাচুরি রিপু কম্পবাণ।
তবু ভয়ে থাকে সদা হাতে করে প্রাণ।।[১৬]

এক সময় রাজা আসফুল্লা খাঁর খাজনা বাকি পড়ে যায়। ফলে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ'র রুষ্টতার জন্য আসফুল্লা খাঁর জমিদারি বিপন্ন হয়। কবি তখন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গো অন্নদাতা রাজার মধ্যস্থতা করার উদ্দেশ্যে রাজা আসফুল্লার প্রতিনিধি হয়ে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন এবং নিষ্কর জমির খাজনা স্বরূপ একলক্ষ টাকা পরিশোধের জন্য সময় চেয়ে নিয়ে রাজনগর চলে আসেন—

বীরভূমে বিদায় আনিতে বাকী কর।
রাত্রি দিনে চলে যাই দাখিল নগর।।
সবিশেষ সকল কহিল সমাচার।
নৃপ আজ্ঞা খাজনার কি কড়ি বিচার।।
নিষ্কর পড়িল দিব টাকা এক লাখ।
কার্তিকের ত্রিশা ভোরে পাঠায় বেবাক।।
জোড়া জামা শিরোপা দিলেন মহারাজ।
বিদায় করিল যাই মুর্শিদাবাদ।।[১৭]

কবি মুর্শিদাবাদ যাত্রাকালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েন এবং জুজুটির খেজুরতলায় ধর্মঠাকুরকে দর্শন করেন। এই সময় বর্ধমান জেলার ইতিহাসের ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে দেখা যায়, কৃষ্ণরামের মৃত্যুর তিন বছর পরে তার পুত্র জগৎরাম রায়(১৬৯২-১৭০২খ্রি.) জমিদারিতে বসেন। তিনি মাত্র চার বছর রাজত্ব করেন। মোগলদের সাহায্য করার জন্য ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে 'চৌধুরী' খেতাব লাভ করেন। তাঁর দুই পুত্র ছিল; যথা—কীর্তিচাঁদ রায় ও মিত্রসেন রায়। ১৭০২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কৃষ্ণসায়েরে পুষ্করিণীতে স্নান করার সময় গুপ্ত আততায়ীর ছুরির আঘাতে জগৎরাম রায়ের মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্তিচাঁদ রায় জমিদারি পদে বসেন। কিন্তু মুঘল যুগে জমিদারি বংশানুক্রমিক ছিল না। ফলে একলক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টকার বিনিময়ে কীর্তিচাঁদ রায় রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেন। মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বকালে

চিতুয়া-বরোদার শোভা সিংহের ভাই হিম্মৎ সিংহ ও চন্দ্রকোনার রাজা মিলিত হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে কীর্তিচাঁদ নবাবের পক্ষে যোগদান করে বিদ্রোহীদের দমন করেন। ফলে মুর্শিদকুলি খাঁর সুনজরে থাকেন এবং নবাবের সহায়তায় তিনি পিতামহের ষড়যন্ত্রকারীদের দমন করেন। কীর্তিচাঁদ শুধুমাত্র সুশাসক'ই ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনেক কবি নিজের কাব্যে রাজা কীর্তিচাঁদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন এবং দেবদেবীর মাহাত্ম্য গাঁথায় রাজার সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছেন। ধর্মমঙ্গালের কবিরাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে রচিত ধর্মমঙ্গাল কাব্যে কবি ঘনরাম চক্রবর্তী রাজা কীর্তিচন্দ্রের গুণগান করে লিখেছেন—

নূতন মঙ্গাল দ্বিজ কবিরত্নে গান।
মহারাজা কীর্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ।।[১৮]

রাজা চারিত্রিক দিক দিয়ে ছিলেন সত্যবাদী, প্রজাপালক, দেব-দ্বিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, দাতা, সদাচারী ও পরাক্রমি। কবি নরসিংহ বসু তাই রাজা কীর্তিচন্দ্রের চরিত্রের প্রশংসা করে লিখেছেন—

বসুধা মিরাস ভূমি ছিল পূর্বাপর।
মথুরা বসুজা কৈল শাঁখারিতে ঘর॥
অধিকারী সে দেশে কীর্তিচন্দ্র রায়।
জগজনে যাহার যশের গুণ গায়।।[১৯]

রাজা কীর্তিচাঁদের রাজত্বকালে মুর্শিদকুলি খাঁ ব্যতীত আর তিনজন নবাব মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসেন। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে অপুত্রক মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু হলে জামাতা সরফরাজের পিতা তথা কটকের শাসক সুজাউদ্দিন মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসেন। তারপর সরফরাজ খাঁ বসেন। সরফরজা খাঁ নিহত হলে আলিবর্দি খাঁ (১৭৪০-১৭৫৬খ্রি.) নবাব হন। তাঁর রাজত্বকালে দেশজুড়ে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আলিবর্দি খাঁ'র রাজত্বকালে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল বর্গি আক্রমণ। নাগপুরের শাসক ভোঁসলের দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে একটি দল গঠিত হয়। বাংলা সাহিত্যে এদেরকেই বলা হয়েছে 'বর্গী'। এই দল বঙ্গাদেশের মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার গ্রামগুলিতে লুঠপাট চালাতে থাকে এবং গ্রামবাসীদের ওপর শারীরিক অত্যাচার করে। ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এই বর্গি আক্রমণ সম্পর্কে যথার্থই লিখেছেন—"পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বরোচিত নির্দয়তা ও ভয়াবহ অত্যাচারের যাহা কিছু নিদর্শন আছে, বর্গীর অত্যাচারের তুলনায় তাঁহার কোনটি অপেক্ষা অল্প ভীষণ নহে।"[২০]

এই বর্গী আক্রমণের ভয় সাধারণ মানুষের মনে এতটাই প্রবল ছিল যে, বাঙালির লোকসাহিত্যের অন্তর্গত ঘুমপাড়ানি ছড়াতেও তা স্থানলাভ করেছে—

খোকা ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।।

শুধু গ্রাম্য ছড়াতেই নয়, সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের পুথিতেও বর্গি আক্রমণের ভয়াবহতা ধরা পড়েছে। যার নিদর্শন স্বরূপ গঙ্গারাম লিখিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' ও 'ভাস্কর পরাজয়'-এর

নাম উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতকে শুধুমাত্র বর্গি আক্রমণ' নয়, ইংরেজ বণিকদের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গো সঙ্গো স্থানীয় জমিদার ও তালুকদারদের অত্যাচার ও ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ফলে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে। শুধুমাত্র রাজা বা জমিদারই নয়, তাদের পারিষদ বা কর্মচারীরা ছিল এই অত্যাচারের অন্যতম অঙ্গা। ধর্মমঙ্গাল কাব্যে কবি ঘনরাম চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গো লিখেছেন—

> কেবা আছে অখিলের এমন অবিচারী।/মিছা অপবাদ দিয়া লুটে ঘর দ্বারি।।/অসতে আদর নিত্য সৎপথে কণ্টক।/সজ্জন জনারে পীড়া ঠেকাইয়া ঠক।।/ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বিষ্ণু বিষয়ে বঞ্চিত।/বিবরে বলিব কত পাত্রের দুর্নীত।।/রাজকর লোকের তেসনি নিল বাড়া।/অতেব সকল প্রজা হোলো দেশছাড়া।।[২১]

শুধুমাত্র অস্টাদশ শতাব্দীতেই নয়, পূর্ববর্তী সপ্তদশ শতাব্দীতেও সেই প্রজা উৎপীড়নের ধারা অব্যাহত ছিল। কবি রামদাস আদকের কাব্যে ইছাই ঘোষের ওপর মহামদের অত্যাচারের রূপকে সে যুগে সাধারণ মানুষের উপর শাসকবর্গের অত্যাচার ফুটে উঠেছে—

> সোমঘোষ গোয়ালা গোউড়েদেশে ঘর।/বাকী তার হৈল অনেক রাজকর।।/পঞ্চাশ কাহন দেয় সাত কাহন বাকী।/মাউদিয়া জানিলে কাগাজখানা দেখি।।/পাত্র বলে সোমঘোষ খাজনা নাঞি দেয়।/শুনিয়ে কোটাল তারে ধাক্কা মেরে লয়।।/ধাক্কা মেরে কোটাল লইল দড়বড়ি।/সোমঘোষ গোয়ালার পায়ে দিল বেড়ি।।/এইরূপে বন্দী রয় এগার বচ্ছর।/অন্ন বস্ত্র সোমঘোষ মাগে ঘরে ঘর।।[২২]

সুতরাং সাহিত্য শুধুমাত্র রসস্পৃহা নিবৃতকরণের মাধ্যম নয়, সমাজ-বাস্তবতা প্রকাশেরও মাধ্যম। ধর্মমঙ্গালের কবিরা রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের সময়ে জন্মগ্রহণ করেণ এবং কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। ফলে তারা জীবন দিয়ে যে সমাজ-বাস্তবতা ও উত্তাল রাজনীতিকে অনুভব করেন, সেই লব্ধ বাস্তবতাকে দেবমহিমার সাথে সম্পৃক্ত করে কাব্যে স্থান দিয়েছেন এবং কাব্য শরীর গঠন করেছে। ফলে মধ্যকালীন বাংলাদেশের ইতিহাসকে জানতে হলে ধর্মমঙ্গাল কাব্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা থেকে যায়।

উৎসের সন্ধানে

১. নীতিশ সেনগুপ্ত : 'বঙ্গাভূমি ও বাঙালির ইতিহাস'. কলকাতা : দে'জপাবলিশিং, ২০০৮, পৃ. ৫৫
২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাঙ্গালার ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড. কলিকাতা : মনোমোহন প্রকাশনী, ১৯৬৩. পৃ. ৬
৩. নিমাইচন্দ্র পাল : 'রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ', কলকাতা : বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ১৪২০. পৃ. ১৫৭
৪. অক্ষয়কুমার কয়াল : 'রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গাল'. কলকাতা : ভারবি, ২০১৫, পৃ. ২০৫

মধ্যযুগের বন্দর-নগরী সপ্তগ্রাম : মঙ্গালকাব্যের আলোকে

সুদীপ্ত দাস

মঙ্গালকাব্য[১] মধ্যযুগের বঙ্গাসাহিত্যের একটি ঐশ্বর্যময় এবং জনপ্রিয় শাখা। মঙ্গালকাব্য একান্তভাবেই বাংলার নিজস্ব সম্পদ, ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশে নেই। পঞ্চদশ শতাব্দী[২] থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত মোটামুটি চারশত বছর জুড়ে রচিত বঙ্গাসাহিত্যের এক বিশেষ শ্রেণির 'ধর্মবিষয়ক আখ্যান-কাব্য'[৩] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'মঙ্গালকাব্য' নামে পরিচিত। যদিও মঙ্গালকাব্যগুলি লিখিত রূপ পাওয়ার বহু আগে থেকেই, এর কাহিনিগুলি ব্রতকথা ও ছড়ার আকারে প্রচলিত ছিল এবং পাঁচালি রীতিতে মুখে মুখে গাওয়া হত[৪]—এগুলি সাধারণভাবে দেবদেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনামূলক আখ্যায়িকা কাব্য; বৃহত্তর বঙ্গাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমুদয় অখ্যাত বা স্বল্পখ্যাত দেবদেবীর (যথা—মনসা, চণ্ডী, শীতলা প্রমুখের) পূজা প্রচলিত ছিল, যাঁরা স্থানীয় স্তরে প্রসিদ্ধ হলেও সমাজের উচ্চকোটিতে স্বীকৃতি বা সম্মানের আসন পাননি প্রধানত তাঁরাই মঙ্গালকাব্যের উপজীব্য। প্রসঙ্গাত, এই দেবদেবীগণ দেশীয় প্রাক্‌আর্য অস্ট্রিক গোষ্ঠীর[৫]। মঙ্গালকাব্য ধারায় তিন শ্রেণির মঙ্গালকাব্যকে প্রধান বলা যায়—মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল ও ধর্মমঙ্গাল। এছাড়া কালিকামঙ্গাল, অন্নদামঙ্গাল, শিবায়ণ বা শিবমঙ্গাল, শীতলামঙ্গাল, ষষ্ঠীমঙ্গাল প্রভৃতি অন্যান্য বহু অপ্রধান মঙ্গালকাব্য বিভিন্ন কবি কর্তৃক রচিত হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গালকাব্যগুলির সর্বাধিক গুরুত্ব স্বীকৃত হয় সমকালীন বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির নিখুঁত পরিচয় ধরা আছে বলে। মঙ্গালকাব্য নিছক কাব্য নয়; এগুলিতে প্রতিফলিত সমাজচিত্র ইতিহাসগত দিক থেকে মধ্যযুগীয় বঙ্গাদেশের এক মূল্যবান album। লিখিত আকারে মঙ্গালকাব্যের যে-রূপ আমরা পাই, তার কাহিনি কয়েকটি নির্দিষ্ট আঙ্গিকে বিভক্ত; যথা—দেবদেবীর বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। এই নরখণ্ড[৬] ইতিহাসবিদ ও ইতিহাসের গবেষকদের কাছে স্বর্ণখনিসম। তবে, সমকালীন সমাজজীবনের প্রতিনিধিত্ব করলেও এগুলিকে ঐতিহাসিক 'তথ্যসূত্র' হিসেবে নির্দ্বিধায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে কারণ এগুলি ঐতিহাসিক 'reports or documents'[৭] নয় আর এতে মাঝেমধ্যে কল্পনা ও অতিরঞ্জনের দোষ থেকে যায়। এবার আসি মূল আলোচনায়। শহর হিসেবে সাতগাঁও[৮] বা সপ্তগ্রামের অস্তিত্ব প্রাক্‌সুলতানি যুগ থেকেই ছিল

কি না বা তার প্রাচীনত্ব কতখানি, সে বিষয়ে ঊনবিংশ শতক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বহু পণ্ডিত মানুষ চর্চা করে আসছেন[৯]। আমাদের আলোচ্য তা নয়। এই প্রবন্ধে আমাদের ফোকাস থাকবে মধ্যযুগের বন্দর-নগরী সপ্তগ্রামের উপর, নির্দিষ্ট করে বললে পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর সপ্তগ্রাম[১০]—যে কালপর্বে বাণিজ্য-নগরী হিসেবে তার সমৃদ্ধির সূচনা ও সমাপ্তি। সপ্তগ্রামের উত্থান এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠার পশ্চাতে ভাগীরথীর মূল স্রোত সরস্বতী নদীর নাব্যতা বেড়ে যাওয়া ও বেগবতী হয়ে ওঠার যুক্তি উপস্থাপন করা হয়।[১১] অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি[১২] থেকে ধরা হয় যে সরস্বতীর নতুন গতিপথ তৈরি হয়েছিল। আগে রূপনারায়ণের খাতে বইত দক্ষিণ-পশ্চিমবাহিনী হয়ে। এখন সে ত্রিবেণী থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে গিয়ে বেতোড়ের কাছে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হতে থাকে[১৩], ফলে বৃহদাকার বাণিজ্য-তরী এই অঞ্চলে সহজে প্রবেশ করতে আর কোনো বাধা রইল না। বলা হয়, এটিই হয়ে ওঠে ভাগীরথীর মূল গতিপথ, যার কিছুটা অংশের নাম হয় সরস্বতী।[১৪]

বাণিজ্য-নগরী হিসেবে সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধির এটি নিশ্চিতভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তবে এটিই প্রধান বা একমাত্র কারণ নয়। তাই যদি হত, তবে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর পরিবর্তে খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতাব্দী নাগাদই বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে সপ্তগ্রামের পরিচয় পাওয়া যেত। তা কিন্তু আমরা পাই না। এমনকি চতুর্দশ শতাব্দীতে (১৩২৮ সালে) সপ্তগ্রামে সুলতানি টাঁকশাল তৈরির পরেও এখানকার বাণিজ্যের কথা পাওয়া যায় না।[১৫] তবে সপ্তগ্রামের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যে ক্রমশ বাড়ছিল, ১২৯৮-তে জাফর খান গাজির সপ্তগ্রাম দখলের ঘটনায় তা সহজেই অনুমেয়। আসলে বন্দর-নগরী সপ্তগ্রামের ক্রমবর্ধমান বিকাশ সুনিশ্চিত হয়েছিল সমসাময়িক অনুকূল ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক পরিস্থিতির সার্থক সমন্বয়ের ফলে। প্রথমত, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমে অবস্থিত হওয়ায় সপ্তগ্রাম জলপথে যোগাযোগ ও পণ্য পরিবহনের সুবিধা পেয়েছিল। আর সরস্বতী নদীর জলস্ফীতি তো ছিলই! দ্বিতীয়ত, তাম্রলিপ্তের পতনের পর যে চট্টগ্রাম বন্দর বাংলার প্রধান বৈদেশিক বাণিজ্য-বন্দর হিসেবে কাজ করছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সেই চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে আরাকান, ত্রিপুরা ও বাংলার মধ্যে গোলমাল তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। ফলে ভাগীরথীর গুরুত্ব বাড়তে থাকে ও সপ্তগ্রাম বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায়।[১৬] তৃতীয়ত, বলা যায় যে ১৪৫০ সাল নাগাদ উত্তরে মালদার কাছে পাণ্ডুয়া থেকে অনেক দক্ষিণে গৌড়ে রাজধানী সরিয়ে আনা হয়েছিল।[১৭] স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ তো ছিলই, ওই সমসাময়িক কালেই পর্যটকদের লেখা থেকে আমরা গৌড়ের প্রধান আমদানি ও রপ্তানির বন্দর হিসেবে সপ্তগ্রামের উত্থান লক্ষ করি।[১৮] অর্থাৎ, মহানগরী হিসেবে রাজধানী গৌড়ের উত্থান বাণিজ্য-নগরী সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছিল। বন্দর-নগরীগুলিতে পারিপার্শ্বিক এলাকার কৃষিজ উদ্বৃত্ত ও বাণিজ্যলব্ধ ধনের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ শুধু অর্থনৈতিক সচলতা বৃদ্ধি করে না, ওই এলাকার নগরায়ণের প্রক্রিয়াকেও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায়। বস্তুত, বন্দর-নগরীর উন্মেষ ও টিকে থাকা সর্বদাই পশ্চাদভূমির উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল।[১৯]

আন্দাজ করা কঠিন নয় যে, সপ্তগ্রাম এভাবেই ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে অখ্যাত গঞ্জ থেকে 'হাট' (স্বল্পায়তন গ্রামীণ বাজার), অতঃপর এক বা একাধিক (সাতটি) গ্রামীণ বাজার এলাকার সমন্বয়ে একটি বৃহত্তর বাজার এলাকা বা বাণিজ্য-নগরীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই ধরনের সম্ভাবনাময় হাট-বাজারের অস্তিত্বের স্পষ্ট ইঙ্গিত সমকালীন মঙ্গলকাব্যে উপস্থিত। জগজ্জীবন ঘোষালের[২০] 'মনসামঙ্গাল' থেকে আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

বানিয়া কাসারি হাটি বায়ান্ন বাজার।
একে একে সকল নগর হৈল পার।।[২১]

'কাসারি হাটি' (কাঁসার পণ্যসামগ্রীর হাট), 'বায়ান্ন (বাহান্ন) বাজার' কথাগুলি এখানে স্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী যে মধ্যযুগের অর্থনৈতিক কাঠামোয় হাট/বাজারের উপস্থিতি যথেষ্ট সুলভ এবং স্বাভাবিক। এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক হাট/বাজারকে কেন্দ্র করে ক্রমশ নগরায়ণ বিস্তার লাভ করেছিল।আবার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী[২২] বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যে আমরা লক্ষ্য করি 'হাট'-এর উল্লেখ—

দক্ষিণে বিজয়হাটি বামে গোলাহাট।
সম্মুখে মদনপুর সওয়া কোশ বাট।।[২৩]

বর্তমানে সপ্তগ্রাম গ্রাম-পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ডিঙ্গালহাট আজও এইরকম 'হাট'-এর ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই প্রক্রিয়ায় শুরু থেকেই বণিক এবং ব্যাপারিরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছেন।

এইভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে সপ্তগ্রাম একটি বর্ধিষ্ণু এবং রাঢ় অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সেই শহর চাক্ষুষ করতে সওদাগর চাঁদো অধিকারী উৎসুক, উদগ্রীব—

বুহিত্র[২৪] চাপায়্যা কূলে চাঁদো অধিকারী বলে
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্তঋষি স্থান সর্বদেব অধিষ্ঠান
সোক্ষ মোক্ষ বম্যন্তর ধাম।।[২৫]

অতঃপর তিনি ত্রিবেণী ঘাটে তাঁর মধুকর ডিঙা নোঙর করে পরম ঔতসুক্যে ও উৎসাহে শহর ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। শহরের ঐশ্বর্য তথা জাঁক প্রত্যক্ষ করে তিনি বিস্মিত হয়ে যান। সে এক—

অভিনব সুর পুরী দেখি ঘর সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের ঝারা।
নানা রত্ন অবিশাল জ্যোতির্ময় কাঁচ চাল
গজ মুক্ত-প্রলম্বিত বারা।।[২৬]

তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন—

সভে দেবে ভক্তি অতি প্রতি ঘরে নানা মূর্তি
রত্নময় সকল প্রাসাদ।।[২৭]

তাঁর মনে হয়েছে—

পুরুষ মদন যেন রমণী সাবিত্রী হেন
আভরণ সব স্বর্ণময়।[২৮]

এবং শহরের এইরূপ দেখে তাঁর উপলব্ধি হয়, এই স্থানে—

ছত্রিশ আশ্রমে লোক নাহি কোন দুঃখশোক
আনন্দ বঞ্চয়ে নিরন্তর।।[২৯]

চাঁদো'র প্রায় একশো বছর পরে আরেক সওদাগর ধনপতি এসে শহর সপ্তগ্রামের যে রূপ দেখেছিলেন, সেই দেখা কিন্তু চাঁদ সদাগরের দেখা'র থেকে বিশেষ কিছু আলাদা নয়। ধনপতি সাতগাঁও-র দরাজ প্রশংসা করে বলছেন, "রাঢ় মধ্যে সপ্তগ্রাম অতি অনুপাম।।"[৩০] ১৫৮৩ এবং ১৫৯৪-এর মধ্যে বাংলায় আসেন পরিব্রাজক রালফ ফিচ। তিনিও যথারীতি সপ্তগ্রামকে বেশ বড়োসড়ো একটি শহর বলেছেন যেখানে মোটামুটি সব জিনিসপত্র পাওয়া যায়।[৩১] সুতরাং, বিপ্রদাস বা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি যে মোটেই বাড়িয়ে বলেননি, সেটা বেশ বোঝা যায়।

মোটামুটিভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শহর সপ্তগ্রাম, বন্দর ও ত্রিবেণীর মধ্যে সংযোগ হয়ে গিয়েছিল[৩২] অর্থাৎ শহর সপ্তগ্রাম বর্তমান ভাগীরথী বলতে যা বোঝায় তার দিকে এগিয়ে চলেছিল। অন্যদিকে জনবসতির চাপে সরস্বতীর দক্ষিণ পাড় ধরে শহর বাঁক নিয়ে আরও দক্ষিণে বেড়ে যাচ্ছিল। ১৪৯৫-৯৬ সালের বিপ্রদাস পিপিলাই[৩৩]-এর মনসামঙ্গালে জনবহুল সপ্তগ্রাম শহরের প্রথম একটি ছবি পাওয়া যায়। প্রথম দর্শনে চাঁদ সদাগর সেখানে দেখেছিলেন 'ঘর সারি সারি' এবং 'রত্নময় সকল প্রাসাদ'-এর সহাবস্থান। বিপ্রদাসের বর্ণিত সপ্তগ্রাম কেবল ঘিঞ্জি নয়, প্রাঞ্জল, কোলাহল মুখরিত এবং জমজমাটও—

আনন্দে বাজায় বাদ্দি শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গাদি
দেখি রাজা বড়ই প্রসাদে।।[৩৫]

কৃষ্ণরাম দাসের[৩৬] 'ষষ্ঠীমঙ্গাল' কাব্যে শহর সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে যে কথাগুলি আছে তা বিপ্রদাসের বক্তব্যের অনুরূপ, তবে অনেক বেশি কৌতূহলোদ্দীপক! বলা হচ্ছে—

সপ্তগ্রাম নাম ধরণীতে নাহি তার তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথীর কূল।।
নিরবধি যজ্ঞদান পুণ্যবান লোক।
অকাল মরণ নাই, নাই দুঃখ শোক।।[৩৭]

কি বলতে চাইলেন কৃষ্ণরাম সপ্তগ্রাম এতটাই জনাকীর্ণ যে বাড়ির চালে পর্যন্ত লোক বসে থাকে নাকি আসলে দ্বিতল ঘরের কথা বোঝাতে চাইলেন যাই বুঝিয়ে থাকুন, এটা পরিষ্কার পঞ্চদশ শতাব্দীর সপ্তগ্রাম বেশ জনবহুল।

আশ্চর্যের যে, সপ্তগ্রাম রাঢ় অঞ্চলেরই নগর এবং কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী নিজে রাঢ়[৩৮] অঞ্চলের অধিবাসী হওয়া সত্বেও রাঢ়ের খুব একটা সুখ্যাতি কিন্তু তাঁর কাব্যে শোনা যায় না। যেমন, কবিকঙ্কণ কালকেতুর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

ব্যাধ গো হিংসক রাঢ়[৩৯] চৌদিকে পশুর হাড়।
শ্মশান সমান য়েই স্থান[৪০]।

অর্থাৎ, রাঢ় অঞ্চল সম্পর্কে খুব একটা ইতিবাচক ধারণা বোধহয় তৎকালে প্রচলিত ছিল না। অথচ রাঢ় অঞ্চলকে ভালো না বললেও বন্দর-নগরী সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে প্রশংসা সেখানে যথারীতি উপস্থিত—

রাঢ় মধ্যে সপ্তগ্রাম অতি অনুপাম।
দুই দিন সাধু তথা করিল বিশ্রাম।।[৪১]

রালফ ফিচ তাঁর লেখাতেও, বিশেষত দক্ষিণ রাঢ় নিয়ে ভালো অভিজ্ঞতা শোনাননি।[৪২]

সপ্তগ্রাম যে শুধু পারিপার্শ্বিক গ্রাম্য এলাকার উদ্বৃত্ত শস্য ও পণ্যদ্রব্যের সচলতাকে অব্যাহত রেখেছিল তাই নয়, বিভিন্ন ভাষা, পেশা, ধর্ম, জাতি এবং বর্গের মানুষদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের হাতছানি দিয়ে টেনে এনেছিল—যা আখেরে বহুজাতিক সংস্কৃতির উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে তাকে বিকশিত করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'-তে 'হাটপত্তন' উপলক্ষ্যে হাট-কে কেন্দ্র করে মুসলমান, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ, বণিক, ইতর জাতি প্রমুখের আগমনে জাতি-ধর্ম-পেশা নির্বিশেষে বহু মানুষের বিচিত্র সম্মিলনের প্রাঞ্জল ছবি দেখি।[৪৩] তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে আমাদের আলোচ্য যুগে সপ্তগ্রাম নগরের জনগোষ্ঠীর বিশ্লেষণ এক দুরূহ সমস্যা। নগরের মধ্যে বসবাসের শ্রেণিবিভাগ ছিল কিনা বা জনবসতি কোনো পরিকল্পনামাফিক হয়েছিল কিনা বলা বেশ মুশকিল। এই কাজে সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যগুলি আমাদের কিছু সাহায্য করতে পারে। বিপ্রদাসের চাঁদ সদাগর প্রথমেই সপ্তগ্রামের স্থান মাহাত্ম্যের কথা তুলে ধরেছেন—

তথা সপ্তঋষি স্থান সর্বদেব অধিষ্ঠান
সোক্ষ মোক্ষ বম্যন্তর ধাম।।[৪৪]

সেখানে ঋষিমুনিগণ 'শুদ্ধমতি' হয়ে নিরন্তর 'তপ জপ' করেন।[৪৫] এরপর তিনি 'ছত্রিশ আশ্রম' লোকের কথা বলেছেন, যারা নাকি কোনোরকম দুঃখশোক ছাড়াই সপ্তগ্রামে বসবাস করেন। সর্বদা আনন্দিত থাকার বিষয়টি নিশ্চয়ই অতিরঞ্জন। তবে এই 'ছত্রিশ আশ্রম' অর্থাৎ চিরাচরিত হিন্দু সমাজের ছত্রিশ জাতের বাস মোটেই অবাস্তব নয়। কবি মুকুন্দরামও তাঁর 'চণ্ডী' কাব্যে বহু প্রকার জাত, ধর্ম এবং পেশাজীবী মানুষের কথা বলেছেন যাদের উল্লেখ 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ' এবং 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে' পাওয়া যাবে। অন্ত্যজ কিংবা জাতি সংকরের সমাবেশও সেখানে সুপ্রচুর। জাতি এবং পেশার মধ্যে উপবিভাগের বিবরণ সুলভ, যেমন—সাধারণ মুসলমানের মধ্যে জোলা (তাঁতি), মুগবি (বলদের গাড়িতে ধান বওয়া), কাবাড়ি (মাছ বেচা), বণিকদের মধ্যে সুবর্ণবণিক, শঙ্খবণিক, গন্ধবণিক প্রভৃতি।

বিপ্রদাস চাঁদ সদাগরের চোখ দিয়ে আমাদের দেখিয়েছেন, উল্লিখিত 'ছত্রিশ আশ্রমে লোক'-এর মধ্যে সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ 'দ্বিজগণ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁদের অবস্থান সমাজ ও শহরের কেন্দ্রে—

বৈসে যত দ্বিজগণ সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ
তেজময় যেন দিবাকর।
সর্বতত্ত্ব জানে মর্মে বিশারদ গুরুধর্মে
কুলগুরু দেবের দোসর।।[৪৬]

চাঁদ আরও দেখেছেন, শহর মধ্যে 'প্রতি ঘরে নানা মূর্তি' এবং সেখানে 'শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গাদি' বাজছে। এর পাশাপাশি তিনি সেখানে 'যবন' বা মুসলমান নগরবাসীদেরও প্রত্যক্ষ করেছেন—

নিবসে যবন যত তাহা না বলিব কত
মোগল পাঠান মোকাদীন।
ছৈয়দ মোল্লা কাজি কেতাব কোরান বাজি
দুই ওয়াক্ত করে তছলিম।।
মসিদ মোকাম ঘরে ছেলাম নমাজ করে
ফয়তা করয়ে পিত্য-লোকে।[৪৮]

তবে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে তিনি 'মোগল'দের উল্লেখ করেছেন দেখে অনেকে বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যের এই অংশকে প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্তী কালের সংযোজন বলে মত দিয়ে থাকেন। সেই বিতর্কে না ঢুকে আমরা বলতেই পারি মধ্যযুগের বন্দর-নগরী সপ্তগ্রাম যথার্থই একটি 'cosmopolitan' রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগকারী বাণিজ্যপথের গুরুত্বপূর্ণ অংশে অবস্থিতির জন্যে সপ্তগ্রাম বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। আর কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের লেখা থেকে মনে হয়, সপ্তগ্রামের পরে মোহনার মুখ পর্যন্ত তেমন কোনো বন্দরও নেই। ফলে বাণিজ্য-তরীগুলি একদিকে যেমন সপ্তগ্রামে নোঙর করে তাদের পরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে নিত, তেমনই ব্যবসার জন্যে বিভিন্ন প্রকার পণ্যসামগ্রীতে জাহাজ বোঝাই করত। উল্লেখ্য, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকের বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'চাঁদো অধিকারী' (চাঁদ সদাগর) দূরদেশে বাণিজ্য-যাত্রার পথে তাঁর মধুকর ডিঙা (বাণিজ্য-তরী) নিয়ে সপ্তগ্রামে নোঙর করেছিলেন। আবার ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে লেখা মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর ধনপতি সওদাগর দূর বাণিজ্যে পাড়ি দেবার পথেই ত্রিবেণীর ঘাটে দিন দুয়েকের জন্য সপ্তডিঙা (সাতটি বিশালাকার বাণিজ্য-তরী) ভিড়িয়ে একদিকে সপ্তগ্রামের বাজার থেকে নানান জিনিসপত্র কিনে তাঁর সপ্তডিঙা সাজিয়ে নিচ্ছেন—

কিনে বেচে নানা দ্রব্য নায়ে দিল ভরা।
বাহ বাহ বলি সদাগর করে ত্বরা।।[৪৯]

অন্যদিকে দীর্ঘ যাত্রার জন্য দরকারি রসদ (যেমন—পাণীয় জল) সংগ্রহ করে নিয়ে সমুদ্রের মোহনার উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা শুরু করেন সরস্বতী নদী বেয়ে—

নায়ে তুলে সদাগর নিল মিঠা পানী।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন ফরমানি।।[৫০]

সপ্তগ্রামে যে বড়ো বাজারের আড়ত ছিল, এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান। মুকুন্দরাম পরিষ্কার করে আমাদের আরও জানিয়েছেন যে সপ্তগ্রামের বণিকেরা অন্য কোথাও না গিয়ে সপ্তগ্রামে বসেই ব্যবসা করছে—

সপ্তগ্রামের বেণে (ব্যবসায়ী) সব কোথাও না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।।[৫১]

আর বাইরের বণিকেরা সেখানে বাণিজ্য করতে আসে—

ও সব সফরে যত সদাগর বৈসে।
সবে ডিঙা লয়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে।।[৫২]

অর্থাৎ বিদেশি বণিকের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করেই এদের যাবতীয় সমৃদ্ধি। ভেনিসের বণিক ও পরিব্রাজক সিজার ফেডেরিকি-র লেখায় আমরা এই বক্তব্যের সমর্থন পাই; ১৯৬৭-তে সপ্তগ্রামে এসে তিনি দেখেছিলেন যে, সেখানে ব্যবসাদাররা চাল, উৎকৃষ্ট চিনি, লাক্ষা, রকমারি মশলাপাতি এবং বিবিধ প্রকারের বস্ত্রসম্ভার সহ বহুবিচিত্র পণ্যাদির পসরা সাজিয়ে কেনা-বেচা করছেন।[৫৩] সমকালীন পর্তুগিজ দলিল ঘাঁটলেও দেখব যে যারা এখানে ভিড় করছে বাণিজ্য-পণ্য সংগ্রহ করতে তারা প্রধানত আরব, তুর্কি, পারসিক বা ভারতের অন্য জায়গার বণিক। সুতরাং বিপ্রদাসের চাঁদ সদাগর যেমনটা বলেছিলেন, সপ্তগ্রামে নাকি 'দুঃখশোক' নেই, 'নিরন্তর আনন্দ', 'সব আভরণ স্বর্ণময়', 'রত্নময় সকল প্রাসাদ' এবং 'প্রতি ঘরে কনকের ঝারা' তা আক্ষরিক অর্থেই হোক কিংবা প্রতীকী, সেই ঐশ্বর্যের পশ্চাতে নিশ্চিত ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যে সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধ অংশগ্রহণ।

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় ১৪৭৫ সাল-কে বন্দর-নগরী সপ্তগ্রামের ইতিহাসের জলবিভাজিকা বা সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ বিন্দুরূপে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্যই এর অর্থ এই নয় যে তারপরেই সপ্তগ্রামের অস্ত ঘটেছিল। ১৬২০ সালে পাটনা থেকে লেখা দুটি ইংরেজি চিঠি থেকে এটা বেশ বোঝা যায় যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সপ্তগ্রাম মারফত তখনও বাণিজ্য চলছিল।[৫৪] তবে ক্রমশ তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ম্লান হতে শুরু করেছিল যা আর পুরাতন অবস্থায় ফিরে যায়নি। একদিকে ইতিমধ্যে গৌড় থেকে রাজধানী স্থানান্তর হয়ে গেছে এবং অন্যদিকে সপ্তগ্রামের কাছে সরস্বতী নদী মজতে শুরু করেছে[৫৫] যার দরুন বড়ো জাহাজের সরস্বতী নদী দিয়ে আসতে সমস্যা হচ্ছে। আসলে ভাগীরথীর সঙ্গে সরস্বতীর সংযোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল যা পরবর্তীতে লুপ্ত হয়।[৫৬] কখনও উড়িষ্যার রাজার আক্রমণ, কখনও বা আফগান, বাংলার সুলতান এবং উঠতি মুঘলদের বারবার সংঘর্ষে সপ্তগ্রামের রাজনৈতিক পরিবেশ টালমাটাল হয়ে যায়।[৫৭] ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতা সর্বদাই নগরীর সমৃদ্ধির হানি ঘটায়।

উপরন্তু ১৬৩২ সালে মুঘল সুবেদার কাশিম খান হুগলি দখল করে পর্তুগিজদের বাড়বাড়ন্ত খর্ব করেন এবং মুঘল শুল্কবিভাগ সহ অন্যান্য দপ্তর সপ্তগ্রাম থেকে হুগলিতে[৫৮] সরিয়ে নিয়ে আসা হলে সপ্তগ্রামের প্রশাসনিক গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায়।[৫৯] হুগলি জয়ের সুদূরপ্রসারী ফল হয় যে প্রথমে ওলন্দাজ ও ইংরেজ এবং পরে ফরাসি ও অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানি ও বণিকরা হুগলিতে স্থায়ী আস্তানা গাড়ে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই ইউরোপীয় পর্যটকদের লেখায় সমৃদ্ধ বন্দর-নগরী হিসেবে হুগলির বর্ণনাই আরও বেশি বেশি করে পাওয়া যেতে থাকে যে ধারা চলতে থাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলকাতার উত্থান পর্যন্ত। হুগলি হয়ে ওঠে বাংলায় মুঘলদের প্রধান বন্দর। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি সেখানে কুঠি স্থাপন করে।[৬০] ধীরে ধীরে সপ্তগ্রামের মহিমা যে হ্রাস পাচ্ছে, তা সমকালীন মঙ্গলকাব্যেও প্রতিফলিত হতে দেখি। কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ[৬১] বিরচিত মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের

বাণিজ্য যাত্রার পথে সপ্তগ্রামের উল্লেখ মাত্র নেই। আছে কেবল সপ্তগ্রামের পার্শস্থ ত্রিবেণীর উল্লেখ (যা কিনা বহু আগে থেকেই ধর্মীয় মাহাত্ম্যের জন্যে খ্যাতি লাভ করেছিল)—"ত্রিপিনীতে কহে সাধু গঙ্গার কাহিনী।"[৬২]যদিও অতীতের সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে তিনি যে ওয়াকিবহাল লখিন্দরের বিবাহযাত্রা পর্বে তার প্রকাশ দেখি এইভাবে—

বর্দ্ধমান উজানি সমাজ সপ্তগ্রাম।
যতেক বণিক আইল কত লব নাম।।[৬৩]

এ থেকে বোঝা যায়, ঐশ্বর্যময় সপ্তগ্রাম তখন অতীত, ভাগীরথীর তীরে উন্মোচিত হয়ে উঠছে নতুন একগুচ্ছ ছোটো-বড়ো-মাঝারি শহর।

উৎসের সন্ধানে

১. 'মঙ্গল' শব্দ কল্যাণার্থে ব্যবহৃত। যে কাব্য রচনায় গানে তথা শ্রবণে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বা কল্যাণ সাধিত হয়, সেই কাব্যই মঙ্গলকাব্য।

২. মঙ্গলকাব্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন 'মনসামঙ্গল' (বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাই বিরচিত) পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেখা। অন্য কোনো মঙ্গলকাব্যের এত প্রাচীন লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি। দ্রষ্টব্য: সুখময় ভট্টাচার্য, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম', কলকাতা: জি. ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং, ১৯৭৪, পৃ. ৩

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ. ৯

৪. সত্যবতী গিরি : 'মধ্যযুগের বাংলার ভাষা ও সাহিত্য', মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, (অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত), কলকাতা, কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৯২, পৃ. ২২৫

৫. তদেব : পৃ. ২২৫

৬. বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার বিস্তৃত ও অনুপুঙ্খ পরিচয়, রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের বৃহত্তর চিত্রকল্প সহ বিবিধ বিষয় নরখণ্ডে বিধৃত।

৭. David L Curley : Poetry and History : Bengali Mangal-kabya and Social Change in Precolonial Bengal. New Delhiõ Chronicle Books, 2008. P. 4

৮. সাতটি গ্রাম নিয়ে গঠিত বলে একে 'সাতগাঁও' বা সপ্তগ্রাম বলা হত, যদিও কোন কোন গ্রাম ছিল এ নিয়ে বিতর্ক আছে। বেশিরভাগ পণ্ডিত সুধীরকুমার মিত্রের বক্তব্য অনুসরণ করে বলেছেন এই সাতটি গ্রাম হল: বাসুদেবপুর, বংশবাটী, খামারপাড়া, কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর, শিবপুর ও ত্রিশবিঘা। দ্রষ্টব্য: সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: মিত্রাণী প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬০। পৃ. ৭৪৫

৯. যেমন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একটি মনোজ্ঞ লেখায় প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাচ্ছেন যে ক্ষেত্রসমীক্ষায় সপ্তগ্রামে পাল-সেন যুগের বহু মূর্তি পাওয়া যায়। এছাড়াও ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ সহ উনি বলেছেন যে ১২৯৮ সালে জাফর খান গাজি সপ্তগ্রাম দখল করার আগেই এটি একটি বড় শহর ছিল। দ্রষ্টব্য: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,

"সপ্তগ্রাম", ইতিহাস চিন্তা (প্রবন্ধ সংকলন), কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০। পৃ. ৩৮৪-৪১০

১০. ১৫৯৫-৯৬ সালে লেখা আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরি'তে সাতগাঁ বা সপ্তগ্রামকে বঙ্গাদেশের ১৯টি 'সরকার'-এর মধ্যে অন্যতম বলা হয়েছে, যার মধ্যে ছিল ৫৩টি পরগণা বা রাজস্ব 'মহাল'। সম্রাট আকবরের রাজস্ব-সচিব তোডরমল-এর রাজস্ব বন্দোবস্তের উপর ভিত্তি (আনুমানিক) করে আবুল ফজল 'সরকার সাতগাঁও'-এর বার্ষিক খাজনা ধরেছিলেন ৪, ১৮, ১১৮ টাকা যার মধ্যে শুধু সপ্তগ্রাম বন্দরের খাজনা ধরা হয় ৩০,০০০ টাকা। দ্রষ্টব্য: অনিরুদ্ধ রায়, মধ্যযুগের ভারতীয় শহর। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৩। পৃ. ১৫৪; প্রসঙ্গাত 'সরকার' হল মধ্যযুগে সাম্রাজ্যের একটি প্রশাসনিক একক। গ্রাম ছিল সর্বনিম্ন প্রশাসনিক একক।

১১. নীহাররঞ্জন রায় : 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব), কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩। পৃ. ৭৪-৭৯

১২. কারণ, এইখানেই কোথাও একটা তাম্রলিপ্ত বন্দরের অবস্থান ছিল বলে ধরা হয়। এবং অষ্টম শতাব্দীতেই যেহেতু তাম্রলিপ্তের পতন ঘটে সেহেতু ধরে নেওয়া যেতে পারে ঐ সময়ের আশেপাশেই নদীর গতিপথ পরিবর্তন হবার ফলে বন্দরের পতন ত্বরান্বিত হয়।

১৩. রায় : 'মধ্যযুগের ভারতীয় শহর', পৃ. ১৫৩

১৪. তদেব : পৃ. ১৫৩

১৫. তদেব : পৃ. ১৩৭

১৬. তদেব : পৃ. ১৪৩, ১৫৫

১৭. তদেব : পৃ. ১৪৩, ১৫২

১৮. তদেব : পৃ. ১৫২

১৯. রীণা ভাদুড়ী : "মধ্যযুগে বাংলায় নগরবিন্যাসের ধারা (সুলতানী আমল)", মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, (অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত), কলকাতা: কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯২, পৃ. ৫৮

২০. কবি জগজ্জীবন ঘোষাল উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরের কবি। তিনি আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁর 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচনা করে থাকবেন।

২১. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত : 'জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গাল', কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১০, পৃ. ১১৫

২২. রাঢ় বাংলার মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যের মঙ্গালকাব্য ধারায় সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' নামে পরিচিত এবং জনপ্রিয়। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গালের আনুমানিক রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষে।

২৩. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রণীত সচিত্র কবিকঙ্কণ চণ্ডী (ভূমিকা ও টিকা: নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়), এলাহাবাদ: ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯২১, পৃ. ৯২

২৪. বুহিত্র : বাণিজ্য-তরী

২৫. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত : 'বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গাল', কলকাতা: রত্নাবলী, ২০০২, পৃ. ১৩৪

২৬. তদেব : পৃ. ১৩৫

২৭. তদেব : পৃ. ১৩৫

২৮. তদেব : পৃ. ১৩৫
২৯. তদেব : পৃ. ১৩৪
৩০. সচিত্র কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড। পৃ. ২০১
৩১. Foster, William (Ed), Early Travels in India, New Delhi : Oxford University Press– 1985. p. 24
৩২. ১৫০৫ সালের একটি শিলালেখ থেকে প্রকাশ পায় যে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার্থে একটি সাঁকো করে দিয়েছিলেন।
৩৩. ১৪৯৫-৯৬ সালে বারাসত অঞ্চলের কবি বিপ্রদাস পিপিলাই-এর লেখা মনসামঙ্গল কাব্য বাংলার সর্বপ্রাচীন মনসামঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম।
৩৪. বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল। পৃ. ১৩৫
৩৫. তদেব : পৃ. ১৩৫
৩৬. কলকাতার কাছে নিমতার অধিবাসী কৃষ্ণরাম দাস বাংলা মঙ্গল-সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি। তিনি মোট ছয়টি মঙ্গালকাব্য রচনা করেছিলেন—চণ্ডীমঙ্গাল, কালিকা মঙ্গাল, ষষ্ঠীমঙ্গাল, রায়মঙ্গাল, শীতলামঙ্গাল ও কমলামঙ্গাল। কৃষ্ণরামের "ষষ্ঠীমঙ্গাল"-এর রচনাকাল ১৬৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দ।
৩৭. কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, (সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত), কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮। পৃ. ১৫১
৩৮. 'রাঢ়' অঞ্চল বলতে বোঝায় বর্ধমান, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর এবং চব্বিশ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকা।
৩৯. রাড় = রাঢ়।
৪০. 'সচিত্র কবিকঙ্কণ চণ্ডী', ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড। পৃ. ৭০
৪১. তদেব : পৃ. ২০১
৪২. Foster. Early Travels in India. p. 24
৪৩. সচিত্র কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড। পৃ. ৮৪-৯১
৪৪. বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গাল, পৃ. ১৩৪
৪৫. তদেব : পৃ. ১৩৪
৪৬. তদেব
৪৭. তদেব : পৃ. ১৩৫
৪৮. তদেব
৪৯. সচিত্র কবিকঙ্কণ চণ্ডী। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড। পৃ. ২০১
৫০. তদেব : পৃ. ২০১
৫১. তদেব
৫২. তদেব
৫৩. রীণা ভাদুড়ী, 'মধ্যযুগে বাংলায় নগরবিন্যাসের ধারা', পৃ. ৫২
৫৪. O'Malley, L. S. S. & Manmohan Chakravarti, Bengal District Gazetteers: Hooghly. Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1912. P. 187-191
৫৫. রায়, শহর। পৃ. ১৫৭

৫৬. তদেব : পৃ. ১৫৭
৫৭. তদেব : পৃ. ১৫৮
৫৮. তদেব : পৃ. ৩২৯
৫৯. তদেব : পৃ. ৩২৯; ১৫৭৯ সালে আকবরের কাছ থেকে বাদশাহী ফরমান নিয়ে পর্তুগিজরা গঙ্গার উপরে হুগলি বন্দর গড়ে তোলে।
৬০. তদেব : পৃ. ৩২৯-৩০, ৩২৬
৬১. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ মনসামঙ্গাল-রচয়িতা। ক্ষেমানন্দ কবির নাম, 'কেতকাদাস' (কেতকা অর্থাৎ দেবী মনসার দাস বা ভক্ত) তাঁর নামের বিশেষণ। ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দের পরে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্য রচনা করে থাকবেন।
৬২. অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গাল, কলকাতা, লেখাপড়া, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ। পৃ. ২২৪

প্রাণরাম চক্রবর্তীর বিদ্যাসুন্দর ও অন্যান্য কবির বিদ্যাসুন্দর : একটি তুলনামূলক আলোচনা

সায়ন্তন মণ্ডল

মধ্যযুগের সাহিত্য পাঠের আগ্রহ বর্তমান সময়ে বাঙালির অনেক কমে গেছে। তবু মধ্যযুগের যেসব সাহিত্য পাঠ আজও হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম ধারাটি মঙ্গালকাব্যের।

এই মঙ্গালকাব্যগুলির মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে 'মনসামঙ্গাল', 'চণ্ডীমঙ্গাল', 'ধর্মমঙ্গাল'-এর মতো কাব্যগুলি। অপ্রধান হিসেবে জ্ঞানচক্ষুর আড়ালে রয়ে গেছে 'কালিকামঙ্গাল', 'শীতলামঙ্গাল', 'রায়মঙ্গাল', 'সূর্যমঙ্গাল'-এর মতো কাব্যগুলি। 'কালিকামঙ্গাল' নানা কবির হাতে নানাসময় রচিত হয়েছে। এই কাব্যধারার অন্যতম কবি প্রাণরাম চক্রবর্তী। কবিবল্লভ তাঁর উপাধি। তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ প্রস্ফুটিত হয়েছে; বস্তুত কবি তাঁর কালকেই নানাভাবে উপস্থাপিত করেছেন। অথচ তিনি আজও অনেক পরিমাণে অবহেলিত। একসময় বাংলাদেশে (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গোও) 'কালিকামঙ্গাল'-এর কাহিনি অত্যধিক জনপ্রিয় হয়েছিল। তবে কালিকামঙ্গাল বলতে অনেকে শুধু বিদ্যাসুন্দরের গল্পই স্মরণ করেন। বিদ্যাসুন্দরের গোড়াপত্তন সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো এক্ষেত্রে প্রাণিধানযোগ্য।[১] তাঁর বিবেচনায়, বিদ্যাসুন্দর তথা কালিকামঙ্গালের জনপ্রিয়তার পিছনে মূল শক্তি ছিল বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয় ও মিলনের কাহিনি। বিদ্যাসুন্দর গল্পের দেবী কালিকা সুন্দরের উপাস্য ও তার মূল সহায়িকা শক্তি। প্রাণরাম চক্রবর্তীর পূর্বে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি যাঁদের হাতে কাব্যরূপ নিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবি দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ, সাবিরিদ খান, কবিকঙ্ক, গোবিন্দদাস প্রমুখ। প্রাণরামের পরবর্তী সময়ে এ কাব্য লিখে খ্যাতি পান বলরাম চক্রবর্তী, কৃষ্ণরাম দাস, দ্বিজ রাধাকান্ত, রামপ্রসাদ সেন ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রমুখ।

প্রাণরামের কাব্য ছত্রে কবির স্বাক্ষর উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ভাষা-ছন্দ-অলংকার-প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগে তিনি দক্ষ ছিলেন। তাঁর জন্মজাত লেখনী শক্তি তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদাভাবে চিনতে সাহায্য করে। এবার আমাদের মূল আলোচনায় প্রবেশ করে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যধারার অন্যান্য কবিদের সঙ্গো প্রাণরামের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করব। আলোচনার সময় আমরা প্রত্যেক কবিকে আলাদা করে তুলে ধরছি এবং প্রাণরামের কাব্যের সঙ্গো তাঁদের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করছি।

● **কবি কঙ্ক এবং কবি প্রাণরাম :** প্রথমেই আসবে কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে প্রাণরামের বিদ্যাসুন্দরের তুলনামূলক আলোচনা। প্রাণরামের আগে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন কবি কঙ্ক। অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহের কবি কঙ্কের লেখা বিদ্যাসুন্দর কাব্যটি দীর্ঘ সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। তার সন্ধান পান ময়মনসিংহের অধিবাসী প্রাচীন সাহিত্যপ্রেমী চন্দ্রকুমার দে। দীনেশচন্দ্র সেনের অনুরোধে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে পালাগান সংগ্রহের সময় তিনি কবি কঙ্কের কাব্যটি উদ্ধার করেন।

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, বাংলা ভাষায় রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যধারার মধ্যে সর্বপ্রাচীন কাব্যটি কবি কঙ্কের রচিত। তিনি সম্ভবত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালের লোক। কঙ্ক নিজের আত্মপরিচয় দিয়েছেন কাব্যে। কিন্তু প্রাণরামের কাব্যে কবির কোনো আত্মপরিচয় অংশ নেই। কবি কঙ্কের কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে কোনো প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য প্রাণরাম তাঁর কাব্যের রচনাকাল উল্লেখ করেছেন।

প্রাণরামের বিদ্যাসুন্দর কালিকার মাহাত্ম্যপ্রচারক কাব্য নয়; বিপ্রগ্রামবাসী এক পীর কবিকে এই কাব্য রচনার আদেশ দেন। কঙ্কের কাব্যে উল্লেখিত দেবতা সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর; প্রাণরামের কাব্যে উল্লেখিত দেবী কালিকা। এক সময় মময়মনসিংহ অঞ্চলে কঙ্কের কাব্য ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। কবি কঙ্কের কাব্য ও প্রাণরামের কাব্যের কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। মূল কাহিনি বর্ণনায়ও ব্যতিক্রম রয়েছে। কঙ্ক ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব। তিনি বিদ্যাসুন্দরের গল্পের মধ্য দিয়ে বিষ্ণু মাহাত্ম্য প্রচার করার চেষ্টা করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য কবি কঙ্কের কাব্য সম্পর্কে বলেন—

> কঙ্কের কাব্য আদিরস-প্রধান নহে। চৈতন্যে আসক্তি দেখিয়াই মনে হয়, তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, সেই জন্য রচনায় নীতির সংযম কোথাও তিনি লঙ্ঘন করেন নাই। কঙ্কের রচনা সরল ও মধুর, অনেক স্থানে বৈষ্ণব কবিতার সুরও ধ্বনিত হইতে শোনা যায়।[২]

● **কবি শ্রীধর এবং কবি প্রাণরাম :** শ্রীধর জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত শ্রীধরের দুটি অসম্পূর্ণ পুথি। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—

> 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর'—শ্রীধরের কাব্য কোন নামে পরিচিত হইয়াছিল জানা যাইতেছে না। ইহাতে কালিকার কোনো বর্ণনা বা মহিমা ছিল না বলিয়া মনে হয়; তাই উপস্থিত ক্ষেত্রে শ্রীধরের কাব্যকে 'বিদ্যাসুন্দর' নামেই অভিহিত করিতে হইবে।[৩]

শ্রীধর রচিত বিদ্যাসুন্দরের কাহিনির অনেক স্থানেই সংস্কৃত ভাষার সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাব্যের মাঝে মাঝে যেমন সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায়, তেমনি প্রাণরামের কাব্যেও মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায়। শ্রীধরের রচনায় সুন্দরের পিতার নাম গুণসার ও মাতার নাম কলাবতী; সুন্দরের পিতার রাজ্যের নাম বিজয়নগরী রত্নাবতী। প্রাণরামের রচনায় সুন্দরের পিতার নাম গুণসিন্ধু ও মাতার নাম পুণ্যবতী; তাঁর পিতৃরাজ্যের নাম রত্নাবতী-পুরী। শ্রীধরের রচনায় বিদ্যার পিতার নাম বীরসিংহ, মাতার নাম শীলাদেবী। অপরদিকে প্রাণরামের রচনায় বিদ্যার পিতার নাম বীরসিংহ, মাতার নাম রমা। শ্রীধরের রচনায় কবির পাণ্ডিত্য তাঁর কবিত্বকে অনেকাংশে আড়াল করেছে।

● **কবি সাবিরিদ খান এবং কবি প্রাণরাম :** সাবিরিদ খান ছিলেন চট্টগ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলমান কবি। তিনি খুব সম্ভবত শ্রীধর কবিরাজের বিদ্যাসুন্দর রচনার অব্যবহিত পরেই বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি নিয়ে কাব্য রচনা করেন। সাবিরিদ খান তাঁর কাব্যমধ্যে নিজের আত্মপরিচয় দিয়েছেন; প্রাণরাম তাঁর কাব্যে নিজের আত্মপরিচয় দেননি। সাবিরিদ খান সংস্কৃত ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। প্রাণরামের মতো তিনিও তাঁর নিজের কাব্যের স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার করেছেন। শ্রীধর কবিরাজ ও সাবিরিদ খানের রচনাপ্রণালী দেখে একথা খুব সহজেই অনুমেয় যে, উভয়ে সমসাময়িক কালের কবির ছিলেন। প্রাণরামের কাব্যে কাব্য রচনাকাল উল্লেখ থাকলেও, সাবিরিদ খানের কাব্যের কোথাও কাব্য রচনাকালের উল্লেখ নেই। সাবিরিদ খানের কাব্যের ভাষা সংস্কৃতানুগ এবং সম্পূর্ণ আরবি-পারসির প্রভাব মুক্ত। প্রাণরামের বিদ্যাসুন্দর ও সাবিরিদের বিদ্যাসুন্দর—উভয় কাব্যে অলংকারের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। তবে স্বভাব-স্ফূর্ত কবিত্বের পরিচয় সেভাবে সাবিরিদের কাব্যে পাওয়া যায় না, তাঁর পাণ্ডিত্য কবিত্ব-বিকাশের অন্তরায় হয়েছে। অপরদিকে প্রাণরামের রচনায় তাঁর কবিত্বের সুললিত প্রকাশ ঘটেছে।

● **কবি গোবিন্দদাস এবং কবি প্রাণরাম :** গোবিন্দদাস ছিলেন চট্টগ্রামের অদূরবর্তী দেবগ্রামের বাসিন্দা। তিনি তাঁর কাব্যে কাব্য-রচনাকালের উল্লেখ করেছেন; প্রাণরামও তাঁর কাব্য রচনাকাল উল্লেখ করেছেন। গোবিন্দদাসের কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়কাহিনি উপলক্ষ্য মাত্র; কালীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস অধিক দেখতে পাওয়া যায়। এই কথা প্রাণরামের কাব্যের ক্ষেত্রে পুরোপুরি বলা যায় না—উভয়ই তাঁর কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। গোবিন্দদাস পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্যের প্রকাশ দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল। তাঁর কাব্যে চরিত্র ও স্থান নামে কিছু কিছু বদল ঘটেছে। তাঁর কাব্যে বীরসিংহের রাজধানী রত্নাপুর, সুন্দরের পিতা গুণিসার, মাতা কলাবতী, বসতি গৌড়রাজ্যের কাঞ্চিনগর। তাঁর কাব্যে মালিনীর নাম রম্ভা। প্রাণরামের কাব্যে বীরসিংহের রাজধানী 'কাঞ্চিনগর' বা 'বর্ধমান', সুন্দরের পিতা গুণসিন্ধু, মাতা পুণ্যবতী, বসতি রত্নাবতী-পুরী।

● **কবি কৃষ্ণরাম দাস এবং কবি প্রাণরাম :** 'বিদ্যাসুন্দর' তথা 'কালিকামঙ্গল' কাব্যধারার অন্যতম প্রধান কবি কৃষ্ণরাম দাস। কবি কৃষ্ণরাম তাঁর কাব্যে বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিয়েছেন; প্রাণরাম সে পথে হাঁটেননি। কৃষ্ণরাম দাস অনেকগুলি কাব্য রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বোৎকৃষ্ট রচনা হল 'কালিকামঙ্গল' কাব্য। তিনি যখন এই কাব্য রচনা করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বছর। প্রাণরামের কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরের সুপরিচিত প্রণয় আখ্যান ব্যতীত অন্য কোনো উপাখ্যান নেই। কৃষ্ণরামের কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরের সুপরিচিত প্রণয় আখ্যান ব্যতীত আরও দুটো উপাখ্যান আছে। কৃষ্ণরামের কাব্যে সুন্দরের পিতা গুণসিন্ধু, মাতা রত্নাবতী, নিবাস কাঞ্চিনগর। প্রাণরামের কাব্যে সুন্দরের পিতা গুণসিন্ধু, মাতা পুণ্যবতী, বসতি রত্নাবতী-পুরী। কৃষ্ণরামের কাব্যে বীরসিংহের রাজধানী 'বর্ধমান' বা 'কাঞ্চিনগর'। কৃষ্ণরামের কাব্যে মালিনীর নাম বিমলা; প্রাণরামের কাব্যে মালিনীর আলাদা করে কোনো নাম নেই। কৃষ্ণরামের রচনা সহজ-সরল হলেও তা মার্জিত ও সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা-মুক্ত; প্রাণরামের

রচনা সম্পূর্ণ গ্রাম্যতামুক্ত একথা বলা যায় না।

কবি বলরাম চক্রবর্তী এবং কবি প্রাণরাম : রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের পূর্বে, খুব সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে কবি শেখর বলরাম চক্রবর্তী বিশুদ্ধ মঙ্গালকাব্যের আদর্শে কালিকামঙ্গাল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। তিনি তাঁর কাব্যে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনিকে গৌণ করে, দেবী কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণনাকে মুখ্য করে তুলেছেন। একথা বলাবাহুল্য যে, তাঁর কাব্যে মঙ্গালকাব্যের নিষ্ঠা সম্পূর্ণ রক্ষা পেয়েছে। অন্যান্য কবিদের থেকে পৃথক পথে হেঁটে আদিরস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সংযমের সীমা অতিক্রম করেননি। তিনি তাঁর কাব্যে নিজের যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে কবির বাবা-মা'র নাম জানা,পারিবারিক জীবনের নানা তথ্য পাওয়া যায়; প্রাণরামের কাব্যে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। বলরাম চক্রবর্তীর কাব্যে সুন্দরের পিতা গুণসাগর, মাতা গুণবতী, বস্তি 'উৎকল দ্রাবিড় দেশে' মানিকনগর। প্রাণরামের কাব্যে সুন্দরের পিতা গুণসিন্ধু, মাতা পুণ্যবতী, বসতি রত্নাবতী-পুরী। বলরামের কাব্যে বিদ্যার পিতার নাম বীরসিংহ, মাতার নাম কুন্তী, নিবাস বর্ধমান। প্রাণরামের কাব্যে বিদ্যার পিতার নাম বীরসিংহ, মাতার নাম রমা।

● **কবি ভারতচন্দ্র এবং কবি প্রাণরাম :** যুগসন্ধির কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যের নাম 'অন্নদামঙ্গাল'। বিদ্যাসুন্দর উক্ত কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণযোগ্য—'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। সমগ্র মঙ্গালকাব্যের ঐশ্বর্যযুগের মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।[৪]

ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যের বিদ্যাসুন্দর অংশে সমকালীন ভঙ্গুর সমাজ এবং নাগরিক জীবনের বিলাসিতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি পরোক্ষভাবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার মোহময় বিলাস-জীবনকে শব্দবাণে খুব সূক্ষ্মভাবে বিদ্ধ করেছেন। তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ পেয়েছে, অপরদিকে রাজসভার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দিকটি অত্যন্ত সুচতুরভাবে বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

আদিরস থাকলেও, প্রাণরামের বিদ্যাসুন্দরে আদিরসের এমন ব্যাপকতা দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশ দেখতে পাই, প্রাণরামের কাব্যে এরকম কোনো অংশ দেখতে পাই না। প্রাণরামের কাব্যের মতো ভারতচন্দ্রের কাব্যেও দেবী কালিকা সুন্দরের মুখ্য সহায়িকা রূপে আবির্ভূত হয়ে, তাকে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে বিদ্যার ঘরে যাওয়ার মতো অনৈতিক কাজে সাহায্য করেছিলেন। প্রাণরামের কাব্যে মালিনীর আলাদা করে কোনো নাম নেই, মালিনী সুন্দরকে পুত্রস্নেহে ভালোবাসত। অপরদিকে ভারতচন্দ্রের কাব্যে মালিনীর নাম হীরা। তার চরিত্রস্খলন এবং অর্থলোভের উল্লেখ আছে। ভারতচন্দ্র যুগের উপযোগী করে তাঁর কাব্যকাহিনি রচনা করেছিলেন, অন্ধভাবে মঙ্গালকাব্য রচনার চিরাচরিত প্রথাকে অনুসরণ করেননি।

● **কবি রামপ্রসাদ সেন এবং কবি প্রাণরাম :** রামপ্রসাদ সেন চব্বিশ পরগণা জেলার ভাগীরথী তীরস্থ কুমারহট্ট নামক গ্রামে এক কুলীন বৈদ্য বংশে ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ

করেন। রামপ্রসাদ তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে সুন্দরভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। প্রাণরামের কাব্যে এমন কোনো আত্মপরিচয় অংশ পরিলক্ষিত হয় না। রামপ্রসাদ তন্ত্রোক্ত কৌলিক ধর্মাচারী ছিলেন। সেই জন্য তাঁর আরাধ্যা ছিলেন শক্তির অন্যতম রূপভেদ দেবী কালিকা। তবে দেবী কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণনা এই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি বর্ণনাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কবি রচিত শ্যামাসংগীত-এর স্বাদ আস্বাদন করে অনেক পাঠক কাব্যের আধ্যত্মিক তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য এই কষ্টকল্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁর 'রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর' প্রবন্ধের এক স্থানে বলেছেন—

> রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত বিদ্যাসুন্দরের মত আদিরসের কাব্য; তাহাতে চঞ্চলচিত্ততা আছে, রূপতৃষ্ণা আছে, হীরা মালিনী আছে, গুপ্ত প্রণয় আছে —সে প্রণয়ও সম্পূর্ণ রূপজ।[৫]

অন্যদিকে প্রাণরামের কাব্যে আদিরসের তীব্রতা রামপ্রসাদকে ছাপিয়ে যায়নি। প্রাণরাম তাঁর কাব্যের শেষে সুন্দরকে দিয়ে শবসাধনা করিয়েছেন; রামপ্রসাদ এক্ষেত্রে প্রাণরামের অনুসারক। উভয় কবির কাব্যের মধ্যে এই জাতীয় সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের 'বিদ্যাসুন্দর' ধারায় তথাকথিত যে সমস্ত প্রথা মেনে চলার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, প্রাণরাম সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রয়াসই তাঁর পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী কিংবা সমকালীন সময়ের 'বিদ্যাসুন্দর' রচয়িতাদের মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র আসন দিয়েছে। তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠক কিংবা শ্রোতামণ্ডলী ছিলেন নগরজীবনের ভিতরে বা বাইরে থাকা সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবনযাপনকারী মানুষজন। তাই কাব্য পাঠকদের কাছে তিনি কোনো চেষ্টাকৃত পাণ্ডিত্য দেখানোর প্রয়াস করেননি। যা সহজবোধ্য ও স্বাভাবিক, তাকেই নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক অভিমত,

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে যে কয়জন কবি কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দ্বিজ শ্রীধর, কবি কঙ্ক, সাবারিদ খান, প্রাণরাম চক্রবর্তী, কৃষ্ণরাম দাস ও কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে শেষোক্ত তিন জন কালিকামঙ্গালের আদর্শমতো সুন্দরকে কালিভক্তরূপে চিত্রিত করিয়া বিদ্যাসুন্দর গল্প রচনা করিয়াছিলেন।[৬]

প্রাণরামের পূর্বে তিন-চারজন কবি বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কথা অবলম্বন করে কালিকামঙ্গালের কাহিনি লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও, তাঁদের কাব্যের সঙ্গে প্রাণরামের কাব্যের কাহিনি উপস্থাপনা, কবিত্ব প্রকাশ, ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার ইত্যাদি প্রসাধন কলার নৈপুণ্য বিচারের প্রেক্ষিতে প্রাণরামকেই এ ধারার প্রথম সার্থক কাব্যকার বলা যেতে পারে। তাই ভারতচন্দ্র পূর্ববর্তী বিদ্যাসুন্দর তথা কালিকামঙ্গাল কাব্যধারায় প্রাণরাম চক্রবর্তী একজন প্রকৃত শক্তিশালী রচনাকার।

উৎসের সন্ধানে

১. "বিদ্যাসুন্দরের গোড়া কিন্তু গুজরাটের রাজধানী অনহলিপত্তনে—ইংরেজী ১১ শতকে। সেখানে বিলহণ নামে একজন কাশ্মীরি পণ্ডিত রাজার মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতেন; ক্রমে তাঁহাদের প্রণয় সঞ্চার হয় এবং আরও কিছু সঞ্চার হয়। সেই ৫০টি কবিতার নাম চৌরপঞ্চাশিকা। রাজা তাঁহার কবিতায় সন্তুষ্ট হইয়া কন্যার সঙ্গো তাঁহার বিবাহ দেন ও তাঁহাদের দুই জনকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেন।...এই গল্পটি বাঙ্গালাদেশে খুব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ছড়াইয়া পড়িলে কি হয়, ইহা আর আদিরসের গল্প নাই, ইহা কালিকামঙ্গাল, অন্নদামঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছে।... গল্পের ভিতর গল্প—ভারতবর্ষের এক নূতন ব্যাপার; ঠিক যেন চীনে বাক্স—একটার ভিতর একটা, তার ভিতর একটা। আমাদের পঞ্চতন্ত্র তাই, হিতোপদেশ তাই, বৃহৎকথা তাই, কথাসরিৎসাগর তাই, মহাভারত তাই, পুরাণগুলিও তাই। বাঙ্গালায় আসিয়া বিদ্যাসুন্দরও তাই হইয়া পড়িয়াছে। উপরের বাক্স কালিকামঙ্গাল, ভিতরের গল্প বিদ্যাসুন্দর।" ('কালিকামঙ্গাল বলরাম কবিশেখর বিরচিত', চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, চৈত্র ১৩৫০ মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস', এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি. এবং সপ্তর্ষি প্রকাশন-এর যৌথ উদ্যোগে প্রথম যৌথ প্রকাশ : মে ২০১৫, পৃ. ৬৯৮

৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় খণ্ড : প্রথম পর্ব, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ১১৯

৪. উৎস-২, পৃ. ৬৫৯

৫. বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'প্রবন্ধ সংগ্রহ', জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৬৩, পৃ. ৮৯

৬. উৎস-৩, তৃতীয় খণ্ড : প্রথম পর্ব, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ১১৯

মনসা এবং চণ্ডী : মধ্যযুগের দুই দেবী চরিত্রের তুলনা

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যযুগের মঙ্গালকাব্য ধারার ইতিহাসে অন্যতম দুই প্রধান কাব্য হল—মনসামঙ্গাল ও চণ্ডীমঙ্গাল। ভারতবর্ষে মাতৃমূর্তির পুজো প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। মঙ্গালকাব্যের ক্ষেত্রেও দেবীদেরই প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। আর্য সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গো অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ যে বিশেষ প্রয়োজনে ঘটেছিল, তার ইতিহাস আমরা সবাই মোটামুটি জানি। আমরা জানি, যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে নিতান্ত বাধ্য হয়ে আর্য দেব-দেবীর সঙ্গো অনার্য দেব-দেবীদের আত্মীয়তার বন্ধন দেখানো হয়েছিল। সেখানে দুই অনার্য দেবী মনসা ও চণ্ডীর সঙ্গো আর্য দেবতা শিবের নিকট সম্পর্ক স্থাপন করে সৃষ্টি হয়েছিল মনসামঙ্গাল ও চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য। সম্পর্কের দিক থেকে মনসা শিবের মানসকন্যা ও চণ্ডী শিবের ঘরণী। আমাদের আলোচ্য বিষয় এই দুই মঙ্গালকাব্যের দেবীর চরিত্রের তুলনা ও পারস্পরিক সম্পর্ক। মূল আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে একবার আমরা ফিরে দেখে নেব এই দুই দেবীর অনার্য পরিচয়ের দিক—

> আদিতে চণ্ডী ছিলেন অনার্য ব্যাধ জাতির দেবী। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি শিবের গৃহিণী পার্বতীর সঙ্গো এক হয়ে গেলেন। সাপের দেবী ভয়ঙ্করী মনসা যে আর্যমণ্ডল-বহির্ভূত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সমন্বয়ের যুগে তাঁকে শিবের মানসকন্যা বলে প্রচার করা হল।[১]

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থ থেকে আমরা এও জানতে পারি যে দক্ষিণ ভারতে 'মঞ্চাম্মা' নামে এক সর্পের দেবী ছিলেন। কোনো কোনো অর্বাচীন পুরাণেও 'মনসা নামটির উল্লেখ আছে।' দ্রাবিড় উপজাতিদের মধ্যে 'চণ্ডী' শিকারের দেবী হিসেবেই পূজিত হন। কাজেই দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর আর্যেতর দেবী হিসেবেই মনসা ও চণ্ডীর উৎপত্তি। পরবর্তীকালে আর্য সংস্কৃতিতে এঁদের স্থান দেবার জন্য শিবের সঙ্গো সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল।

মনসামঙ্গাল কাব্যে যে সর্পদেবী মনসাকে আমরা চিত্রিত হতে দেখি তাঁর কাহিনি আগাগোড়াই বৈচিত্র্যময়। এই কাব্যের সুপরিচিত কবিগণ যেমন নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ—এঁদের মধ্যে প্রথম দু'জন তাঁদের কাব্যের নাম রেখেছিলেন—'পদ্মাপুরাণ'। এই দু'জনেই মনসার জন্ম পদ্মপাতায় হয়েছে বলে লিখেছেন, কিন্তু কেতকাদাস

ক্ষেমানন্দ একটু ভিন্ন মত পোষণ করে জানিয়েছেন যে 'কেয়াপাতায়' মনসার জন্ম। আর সেই কারণেই মনসার আর এক নাম 'কেতকা'। কবি নিজে মনসার ভক্ত বলে নাম নিয়েছিলেন 'কেতকাদাস', পদ্মপাতা বা কেয়াপাতা যাই হোক না কেন জন্ম থেকেই মনসার জীবনের সঙ্গে দুর্ভাগ্য জড়িত। দেবী মনসার চরিত্রের যে ক্রুরতা, প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব, যে নির্মমতা আমরা দেখি, তার বীজ উপ্ত রয়েছে মনসার জীবনের এই ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে। কাজেই সেই তথ্যগুলো আমাদের একবার দেখে নিতে হবে মনসার চরিত্র বিশ্লেষণ করবার আগে।

মনসার জন্মকাহিনির দিকে নজর ফেরালে দেখা যাবে মনসার পিতা শিবই অনেকাংশে তাঁর ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। নিজের অসংযমী চরিত্রের কারণে কামনাকে সংযত করতে না পেরে শিবের বীর্যপাত হয়। সেই বীর্য গিয়ে পড়ে পদ্মপাতার ওপরে, মতান্তরে কেয়াপাতায়; সেখান থেকে পদ্মের মৃণাল বেয়ে তা নামে পাতালে। সেখানে বাসুকী নাগ তামার খোলে তা যত্ন করে রাখেন। জন্ম হয় মনসার। সাপেদের সাহচর্যে বড়ো হয়ে উঠতে থাকেন মনসা। বাসুকীর কাছে পরিচয় জানতে চেয়ে তিনি শোনেন দেবাদিদেব শিব তাঁর পিতা। পিতার কাছে যাবার জন্য পদ্মের মৃণাল বেয়ে তিনি পৌঁছান পদ্মবনে। শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। শিব মনসার পরিচয় জেনে তাঁকে নিয়ে উপস্থিত হয় স্বর্গে। চণ্ডী শিবের ঘরনী; যিনি কিনা এতদিন মনসার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, তিনি হঠাৎ করে শিবের কন্যাকে মেনে নিতে পারেন না। শুরু হয় তীব্র অশান্তি। ক্রমাগত চণ্ডী মনসাকে নির্যাতন করতে থাকেন। জন্মের অস্বচ্ছতার জন্য কথা শোনান। একদিন এইরকম চরম অশান্তির সময় জ্বলন্ত অঙ্গার ছুঁড়ে মারেন মনসাকে। সেই আঘাতে মনসার এক চোখ কানা হয়ে যায়। জন্মাবধি আপন পরিবার পরিজন ছেড়ে বড়ো হয়ে ওঠা মনসা, স্নেহ-মমতার স্পর্শ, মাতৃ সান্নিধ্য, পিতার নিরাপদ আশ্রয় না পাওয়া মনসা, বিমাতার সংসারে ন্যূনতম শান্তিটুকু পেলেন না। উলটে কানা চোখ নিয়ে আরো তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন, চণ্ডী কোনো মতে তাঁর সংসারে মনসাকে আশ্রয় দিতে চাইলেন না। শিব বাধ্য হলেন সাংসারিক শান্তির জন্য মনসার অন্যত্র বাসের ব্যবস্থা করে দিতে। সিজুয়া পর্বতে মনসার থাকার ব্যবস্থা হল। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই অপমান ও অসম্মান মনসা মেনে নিতে পারলেন না। শিবের কারণেই তাঁর জন্ম, শিবের কারণেই তাঁর পরিবার না পাওয়া, নিরাপত্তা হারানো। কাজেই এইসব ঘটনার অভিঘাতে মনসা অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলেন। এরপরে কাহিনি যত এগিয়েছে ক্রূর, চক্রান্তে পটু, অমানবিক, হিংসুক এক রমণীকে মনসার মধ্যে স্পষ্ট হতে দেখি।

শিবের প্রতি মনসার ক্ষোভ দানা বাঁধছিল অনেক দিন ধরেই, চণ্ডীর আচরণ তাতে ঘৃতাহুতি দিল। সমুদ্র মন্থনের ফলে ওঠা গরল শিব পান করে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন যখন, মনসা সেই বিষ নামাতে রাজি হলেন না। নিজের পিতার মৃত্যুও তাঁর কাছে শ্রেয় মনে হয়েছিল বিমাতা শাস্তি পাবেন ভেবে। শিব ও চণ্ডীর প্রতি তাঁর ক্রোধ ও প্রতিহিংসা প্রকাশ পেল অত্যন্ত বিবেকহীনভাবে। চণ্ডীর দুর্ভাগ্য বিকৃত উল্লাসে উল্লসিত করল মনসাকে—

বিষজালে মরিল মহেশ মোর বাপ,
চণ্ডীকা রাণ্ডিকা হৈল ঘুচিত সন্তাপ।।

আলোচক সনৎকুমার নস্করের ভাষায়—"পিতার মৃত্যুশোককেও অতিক্রম করে যায় 'সতাই' চণ্ডীর প্রতি প্রতিহিংসা বাসনা। দেবী যেন এখানে প্রতিশোধ-পরায়ণা মানবীতে রূপান্তরিত।"[২] পরে নারদের পরামর্শে মনসা পিতার বিষ নামিয়ে প্রাণ বাঁচান। কিন্তু চণ্ডীকে আগুনে ফেলে দেবার চেষ্টা করেন। ফলে চণ্ডীর পিঠ পুড়ে যায়। এই ধরনের ঘটনা একেবারে নিম্নস্তরের রুচিহীন কলহ ও অশান্তিকে সামনে তুলে ধরে। এখানে মনসা ও চণ্ডী কোনো দেবীর মধ্যে দেবীত্বের ছিঁটেফোটা দেখা যায় না। বরঞ্চ দু'জনেই অসংস্কৃত, রুচিহীন, বিবেকহীন কলহপরায়ণা, নিম্নবর্গীয় রমণীতে পরিণত হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এরপরে চণ্ডীর সাথে মনসার সম্পর্ক আরও খারাপ হতে থাকে। মনসার ভাগ্য যে সত্যিই খারাপ, দেবকন্যা হওয়ার পরেও নিয়তির নির্বন্ধকে মানতে তিনি বাধ্য; তা প্রমাণিত হয় যখন বিবাহিত জীবনেও সুখ তাঁর অনায়ত্ত থাকে। অনেক খোঁজার পর মুনি জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিবাহ স্থির হয় কিন্তু সেই সংসারজীবনেও তিনি সুখী হতে পারেননি। সংসার শুরু হতে না হতেই মুনি তাঁকে ত্যাগ করে চলে যান। বিপর্যস্ত মনসা স্বাভাবিকভাবেই আরও অশান্ত, আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ক্রোধ তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়। সুস্থ স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনযাপনের স্বপ্ন যে তাঁর কোনোদিনই বাস্তবায়িত হবে না তা বুঝতে পেরে অসহায় আক্রোশে উন্মত্তবৎ হয়ে ওঠেন।

পাতালে থাকাকালীন যে সাপেদের সাহচর্য তিনি পেয়েছিল, সেই সাপেরাই হয়ে ওঠেন এরপর থেকে তাঁর সহায় ও অস্ত্র। সহচরী নেতার পরামর্শে তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। চণ্ডীর সঙ্গে বিবাদে ও জন্মের ত্রুটির কারণে স্বর্গে তিনি মান্যতা পাননি। নেতার পরামর্শে মর্ত্যে পূজার প্রচলন করতে উদ্যোগী হন। আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় নিজের সর্বশক্তি কাজে লাগিয়ে মনসা উদ্যোগী হলেন নিজের পুজোর প্রচারে। আর এই কাজে তাঁর সহায় হল সর্পকূল। মানুষ সাপকে ভয় পায়, ভয়ংকর এই সরীসৃপ প্রাণীটি তার বিষের দৌলতে সহজেই প্রাণ নিতে পারে। এমনিতে মর্ত্যের মানুষ মনসাকে পুজো করবে না। কেননা, মনসার কোনো দৈবী মহিমা ও কৌলিন্য কিছুই নেই। শিবের মানস কন্যা হলেও জন্ম তাঁর রহস্যে ঘেরা। মর্ত্যের মানুষ অত সহজে কাউকে দেবত্বে বরণ করে না। তাই 'ভয়' দেখানো ও ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করে পুজো নেবার কৌশলই একমাত্র আয়ুধ হয়ে ওঠে মনসার—

> পরবর্তী সমস্ত কাহিনীতে এই বিষধর সর্পই হয়ে উঠেছে তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির মোক্ষম হাতিয়ার। উদ্দেশ্যপূরণ করতে গিয়ে মনসা কোথাও কৌশলী, চক্রী, নীতিহীন নিষ্ঠুর, আবার কোথাও অনুগতজনকে দাক্ষিণ্য দিয়ে বাঁধা রাখেন নিজের কাছে। তাঁর এই একরোখা মনোবৃত্তির পিছনে আছে বিমাতা চণ্ডীর লাঞ্ছনা, পিতা শিবের অবহেলা, স্বামী জরৎকারুর অবজ্ঞা। স্বর্গালোকে পাওয়া কষ্ট যন্ত্রণা, অবজ্ঞা অপমানের যেন তিনি উসুল করতে চেয়েছেন মর্ত্যলোকে।[৩]

নরখণ্ডে যে মনসাদেবীকে দেখা গেল তিনি বিবেকহীন ও নিষ্ঠুর। ছলে-বলে-কৌশলে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধি অর্থাৎ পুজো পাওয়ার জন্য তিনি সদা তৎপর। পারেন না এমন হীন কাজ নেই। দেবখণ্ডে ঘনিয়ে ওঠা এই কার্যকারণই নরখণ্ডে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি

চন্দ্রধর বণিক তথা চাঁদ সদাগরের ওপর। চম্পক নগরের চাঁদ সদাগর ধর্মমতে শৈব। অন্ত্যজ শ্রেণির মধ্যে যে মনসার ঘট পুজো তখন শুরু হয়েছে, কোনো লব্ধ প্রতিষ্ঠা ব্যক্তি যতক্ষণ না তাঁর মান্যতা দিয়ে মনসার পুজো করছেন, ততদিন মর্ত্যে মনসার প্রচার সেইভাবে হওয়া সম্ভব নয়। তখনকার দিনে সমাজে বণিকদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি ছিল বিশেষভাবে। ফলে সেই কারণেই মনসা চাঁদ সওদাগরকে নির্বাচন করেছিলেন তাঁর প্রচারক হিসেবে। কিন্তু আর্য দেবতা শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত চাঁদ কোনো মতেই অনার্য ও অকুলীন দেবী মনসার পুজো করতে রাজি হলেন না। শুরু হল সংঘাত—দেবী ও মানবে। যেন-তেন প্রকারে চাঁদ সদাগরকে পুজোয় রাজি করাতে কোমর বেঁধে নামলেন মনসা। বিসর্জন দিলেন সমস্ত নৈতিকতা। চাঁদকে ছলনা করে হরণ করলেন তাঁর মহাজ্ঞান। সেই মহাজ্ঞানের আর এক অধিকারী ধন্বন্তরী ওঝা যিনি কিনা চাঁদের বন্ধু, ফলে চাঁদের বন্ধু মনসার শত্রু এই অপরাধে তাঁকে ও তাঁর শিষ্যদের অকারণে সাপের বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করলেন। এক্ষেত্রে মনসার কোনো বিচারবোধ, কোনো মানবিক দ্বিধা কাজ করেনি। এই কাহিনিতে মনসা ছলনাময়ী, কূটকৌশল অবলম্বনকারিণী এক খল রমণীতে পরিণত হয়েছেন। চাঁদ শিবের অনুরক্ত, যে শিবের কারণে মনসার এত দুর্ভোগ, তাই কি চাঁদের প্রতি তাঁর এত ভয়ানক প্রতিহিংসা! চাঁদ মনসার পুজো করতে চাননি। লাঠির আঘাতে মনসার ঘট ভেঙে দিয়েছেন। মনসাকে চ্যাং মুড়ি কানি বলে গালি দিয়েছেন। মনসা ক্রোধান্বিত হয়ে চাঁদের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিরাপরাধ ধন্বন্তরি ওঝা ও তাঁর শিষ্যদের হত্যা করেছেন। মনসার এই ধরনের আচরণই জনমানসে ভীতি তৈরি করেছে। নারী হলেও মনসার মধ্যে মাতৃহৃদয়ের প্রকাশ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মমতাময়ী, কল্যাণময়ী রূপ—যা আমরা দেবী চরিত্রের মধ্যে দেখতে অভ্যস্ত, মনসা তা থেকে শতহস্ত দূরে।

পরিবার ধ্বংসের ভয়ানক খেলায় মনসা মেতে উঠেছেন। কেননা, তিনি নিজে পরিবারের ছত্রছায়ায় আশ্রয় পাননি। চাঁদের স্ত্রী সনকা লুকিয়ে তাঁর পুজো করতেন। অথচ তিনি সনকার কোনো পুত্রকে বাঁচিয়ে রাখেননি। একের পর এক প্রতিকূল আবর্ত তৈরি করে দিয়েছেন চাঁদের সামনে। সনকার হাহাকার তাঁকে স্পর্শ করেনি। সপ্তডিঙা মধুকর ডুবিয়ে দেওয়া, চাঁদকে ভিখারি করে তোলা—এসব যদিও বা অপমানের প্রতিশোধ বলে দ্বিধাগ্রস্থভাবে মেনে নেওয়ার একটা জায়গা থাকে কিন্তু কোনো মতেই কি চাঁদকে শাস্তি দিতে গিয়ে তাঁর ছয়পুত্রকে হত্যা করবার মতো হীন চক্রান্তকে মেনে নেওয়া যায়? কিন্তু মনসা তখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। আর তাই তাঁর অনুগত সাপেদের তিনি আজ্ঞা দিলেন চাঁদের ছয়পুত্রকে হত্যা করতে—

> চাঁদবান্যার তিলেক নাহিক মায়া মো। বিষ খায়্যা মরুক তাহার ছয় পো।।
> চাঁদের ভবনে তুমি চল বিঘতিয়া। ওদন-ব্যঞ্জনে বিষ উগারহ গিয়া।।
> বিঘতিয়া গেল তথা দেবীর বচনে। উগারিল কালকূটি ওদন-ব্যঞ্জনে।।
> মধ্যাহ্নের কালে ভুঞ্জে তনয় সকল। ছয় পুত্র মৈল তার খাইয়া গরল।।
> সনকা বান্যানী কান্দে, নাহি বান্ধে চুল। ধূলায় ধূসর তনু কান্দে শোকাকুল।।

আত্মপ্রতিষ্ঠার উদগ্র নেশায় মনসা এমনভাবেই নিজের বিবেকবোধ, ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়েছেন। লখিন্দরকে বাসর ঘরে হত্যা করবার জন্য যেখানে যত যোগাযোগ ছিল সব কাজে লাগাতে মনসা এতটুকু ভুল করেননি। মাঝে মাঝে সংশয় হয় এই নীতিহীনতা ও বিবেকশূন্য

হওয়া কি অনার্য দেবী বলেই সম্ভবপর হল। এত কুটিল ও জটিল চরিত্র না হলেও 'চণ্ডী' দেবীকেও আমরা পরবর্তীকালে দেখেছি নিজের পুজোর প্রচার ঘটাতে অন্যকে বিপর্যস্ত করতে। কোনো দোষ না থাকলেও খুল্লনা ছাগল চরিয়ে দিনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে। নিজেই ধনপতিকে কমলেকামিনী রূপে দেখা দিয়েছেন ও পরে সেই দেখাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। অনার্য দেব-দেবীদের আর্য সংমিশ্রণ ভালোবেসে নয়, দায় মাথায় নিয়ে তা করতে এগিয়ে এসেছিলেন তৎকালীন সমাজরক্ষাকারীগণ। এটা তাদেরই মনের অন্ধকারের ফল নয়তো! এই দ্বিধা একেবারে অহেতুক নাও হতে পারে।

নিজের অহংবোধকে তৃপ্ত করতে কুচক্রী মনসা লখিন্দরের বাসর রাতেই কালনাগিনী দিয়ে তাকে হত্যা করালেন। সনকা বা বেহুলা কারোরই হাহাকার ও মর্মান্তিক দশা তাঁর হৃদয়কে দ্রবীভূত করতে পারেনি। চাঁদের ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষকে খাটো করতে না পারার দাম দিল পরের ঘর থেকে সদ্য বধূ হয়ে আসা বেহুলা। আসলে ক্ষমতাবানেরা চিরকালই ক্ষমতার জোরে ভয় দেখিয়ে তাদের কাছে নতিস্বীকার করাতে বাধ্য করেছে। মধ্যযুগের মঙ্গালকাব্যে মনসার মাধ্যমে নীতিজ্ঞানহীন বিবেকবুদ্ধিহীন ক্ষমতাবান ব্যক্তির কথাই তো বলা হয়েছে। যার ক্ষমতা আছে—ভয় দেখানোর ক্ষমতা। বিভিন্ন যোগাযোগ আছে, যারা সাপের মতোই ক্রূর, ক্ষতিকারক, কিছু বিশেষ সুবিধার জন্য যারা সহজে বিক্রি হয়ে যায়, তাদেরই সহয়তায় সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে বাধ্য করা হয় মাথা নোয়াতে। মনসা তো সেই স্বার্থপর, স্বৈরাচারী ব্যক্তিদেরই প্রতীক যাদের কৌলিন্য নেই, আর সেই কৌলিন্য আদায় করতে গিয়ে যে-কোনো পন্থা অবলম্বন করতে তারা পিছপা হয় না। আর সেই কারণেই বেহুলা স্বর্গে গিয়ে মনসাকে কথা দেয় যে চাঁদ সদাগরকে সে রাজি করাবে, মনসাকে পুজো করতে—"বেহুলা বলেন মাতা কোপ কর দূর। করিব তোমার পূজা আমার শ্বশুর॥"

সেই শর্তে মনসা একে একে ফিরিয়ে দেয় তার স্বামী লখিন্দর, তার ছয় ভাশুর, সপ্তডিঙা মধুকর, ধনদৌলত—অর্থাৎ যা কিছু মনসা হরণ করে নিয়েছিল তার সবই বেহুলা ফিরে পায়। পরিবর্তে চাঁদকে মনসা পুজোয় রাজি করানোর ভার নেয়। কিন্তু তা তো সহজ নয়, চাঁদ যে হাতে 'দেব শূলপানি'র পুজো করে সেই হাতে 'চেঙ মুড়ি কানি'র পুজো করতে কিছুতেই রাজি হতে চান না। শেষপর্যন্ত বেহুলার চোখের জলের কাছে হার মেনে মনসাকে বাঁ হাতে ফুল ছুঁড়ে দেয়। মনসা তাতেই রাজি। কেননা সমাজপতি চন্দ্রধর বণিকের হাতের ফুল মানে সমাজের উঁচুতলাতে তাঁর প্রতিষ্ঠা। মনসার চরিত্রের এই দেউলেপনা তাঁকে পুজো পাইয়ে দেয় ঠিকই কিন্তু তাঁর মহত্ব বা মহিমা কি তাতে আদৌ বাড়ে! সর্পদেবী মনসাকে লোকে তখনও ক্ষতি ও মৃত্যুর ভয় থেকেই মান্যতা দিয়েছিল, আজও মমতাময়ী মনসাদেবী নয়, ভয়াল ও ক্রুদ্ধা দেবী, তাঁর থেকে কি কি ক্ষতি হতে পারে সেসব ভেবেই লোকে তাঁর নামগান করে। ভক্তির পুজো আর ক্ষমতাবানের ক্ষমতাকে সমীহ করে পুজো এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য চিরটাকালই থেকে এসেছে আর থাকবেও।

এবার আমরা মঙ্গাল কাব্যধারার আর এক কাহিনি চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাব। দেবী চণ্ডী শিবের ঘরনী। তবে চণ্ডীকে পুরাণ স্বীকৃত দেবী বলেই মান্যতা দেওয়া হয়। তাঁর

উদ্ভবের ইতিহাসে অনার্য ও বৌদ্ধ উৎসের সন্ধান পাওয়া গেলেও পৌরাণিক দেবী চণ্ডীর উপস্থিতি মার্কণ্ডেয় পুরাণসহ বিভিন্ন পুরাণে পাওয়া গেছে—

> প্রথমে তিনি ছিলেন ব্যাধ-শবরের দেবী। পরে ধীরে ধীরে তাঁর প্রভাব স্ত্রী সমাজে এবং তার পরে সমাজের প্রধান বণিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁকে শিবের পার্বতী, মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী এবং ব্রতকথার মঙ্গালচণ্ডীর সঙ্গে একত্র করে এমনভাবে একটি মিশ্র দেবীর পরিকল্পনা করা হয়েছে যে, তাঁর মধ্যে কতটুকু আর্যেতর আর কতটুকু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আছে, তা নির্ণয় করা সহজ নয়।[৪]

অসুরদলনী দেবী চণ্ডী মমতাময়ী চণ্ডীতে পরিণত হয়েছেন ধীরে ধীরে। সেই দেবী চণ্ডীকেই আমরা একেবারে সাধারণ বাঙালি ঘরের একদিকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে থাকা মুখরা বউ, যে প্রয়োজনে ছলনা ও কৌশলের আশ্রয় নিতে পারেন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে, অন্যদিকে মমতাময়ী, কল্যাণময়ী যিনি ভক্তকে সর্বদা রক্ষা করে আসছেন সমস্ত বিপদ থেকে সেই মাতৃরূপে দেখতে পাই।

প্রচলিত চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের দুটি কাহিনি, একটি 'কালকেতু-ফুল্লরা'র কাহিনি নিয়ে 'আখেটিক খণ্ড', অপরটি 'ধনপতি-লহনা-খুল্লনা'কে নিয়ে 'বণিক খণ্ড'। প্রথমটিতে ব্যাধ শ্রেণির মানুষদের কথা, দ্বিতীয়টিতে বণিক শ্রেণির কথা—অর্থাৎ সমাজের দুই স্তরের মানুষদের সামাজিক অবস্থান, বিশ্বাস, জীবনযাপন ধারা ইত্যাদির পরিচয় ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের যে সময় পর্বের কথা মঙ্গালকাব্য বিশেষত মনসামঙ্গাল ও চণ্ডীমঙ্গালে প্রকাশ পেয়েছে সেই সময় সমাজে বণিকদের একটি বিশেষ স্থান ছিল। প্রকারান্তরে তাঁরাই ছিলেন সমাজপতি, তাই মনসামঙ্গালে যেমন চাঁদসদাগরের সমর্থন মনসার আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল, তেমনই চণ্ডীমঙ্গালেও ধনপতি সদাগরের থেকে পুজো পাওয়ার জন্য দেবী চণ্ডীকে যথেষ্ট কৌশলী ও চক্রান্তের অবতারণা করতে হয়েছে। তুলনায় কালকেতুর আখ্যানে যে দেবী চণ্ডীর দেখা পাওয়া যায় সেই দেবী অনেকাংশে কোমলহৃদয়। ব্যাধ সম্প্রদায় অর্থাৎ অনার্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দেব-দেবীদের প্রতি বিশ্বাস ও ধর্মাচারণের প্রতি মেনে নেবার সহজাত প্রবৃত্তি থাকার কারণেই হয়তো কালকেতু ফুল্লরা নাকাল হয়েছে কম। আর বৃত্তিগতভাবে ও ধর্মমানার ক্ষেত্রে বণিকসম্প্রদায়ের মধ্যে শিবপুজোর প্রচলনই লক্ষ করা যেত। উচ্চবংশ তথা সমাজের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের মধ্যে আর্য প্রভাব ত্যাগ করে অনার্য দেবী চণ্ডীকে মান্যতা দেওয়ার কথা ভাবতেই পারা যেত না। বরঞ্চ একধরনের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভাবই প্রকাশ পেত চণ্ডীর উদ্দেশ্যে। সেই জন্য হয়তো ধনপতির ক্ষয়ক্ষতি ও ভোগান্তিও তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে চণ্ডীর হাতে।

কালকেতুর আখ্যানে আমরা দেবী চণ্ডীকে বন্যপশুদের রক্ষাকারী দেবী ও শস্য-ফসলের দেবী হিসেবে চিত্রিত হতে দেখি। অভয়াদাত্রী হিসেবে চণ্ডীর পরিচিতি এই অংশে। চণ্ডীমঙ্গালকে 'অভয়মঙ্গাল' ও বলা হয় তাই। খুব বেশি মাত্রায় রুক্ষ বা ক্রুদ্ধা রূপে তিনি দেখা দেন না এই কাহিনিতে। বরঞ্চ কালকেতুর প্রতি অতিরিক্ত স্নেহের প্রকাশ দেখা যায় কখনো-সখনো।

অবশ্য নিজের পুজো মর্ত্যে প্রচার করবার ক্ষেত্রে মনসার মতো চণ্ডীও প্রথমে অত্যন্ত হীন ও কৌশলী মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর যখন ফুল তুলছিলেন তখন চণ্ডী চক্রান্ত করে সেই ফুলের মধ্যে কীট হয়ে লুকিয়ে থাকলেন—"কুসুম ভিতরে চণ্ডী পাতিলেন মায়া। পলাশে রহিলা দারুপিপীলিকা হৈয়া।" সেই ফুল দিয়ে যখন ইন্দ্র শিবের পুজো করলেন তখন সেই কীট দংশন করল শিবকে—"কুসুম অঞ্জলি ইন্দ্র দিল হরশিরে।/ কন্টক ভুকিল দুঃখ পাইল অন্তরে॥/দারুপিপীলিকা তার প্রবেশে কুন্তলে।/মরমে দংশিলে হর হইল আকুলে॥"

শিব ক্রুদ্ধ হয়ে নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন। সে মর্ত্যে জন্ম নিল কালকেতু রূপে, তার স্ত্রী ছায়া হল ফুল্লরা। এরপর থেকে কাহিনি দেবী চণ্ডীর হাতে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকল। কালকেতু রূপে নীলাম্বরের জন্মকে ত্বরান্বিত করা ও সুস্থ স্বাভাবিক, বলশালী কালকেতুর জন্ম—এ সমস্তই চণ্ডীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হল।

দেবী বনের পশুদের কান্নায় সাড়া দিয়ে তাদের আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, কালকেতুর হাত থেকে তাদের তিনি রক্ষা করবেন। এরপর স্বর্ণগোধিকারূপে দেবী চণ্ডী কালকেতুর ধনুকের ছিলায় আবদ্ধ হয়ে তারই ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। এরপর ফুল্লরাকে ষোড়শী কন্যারূপে ছলনা করা, কালকেতুকে সপ্ত স্বর্ণমুদ্রা ও আংটি দেওয়া, গুজরাট নগর পত্তন, কলিঙ্গরাজের হাতে কালকেতুর শাস্তি, কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নদর্শনে আজ্ঞা দেওয়া ইত্যাদি করেছেন তিনি। আর কাহিনির এই অংশে ব্যাধ সমাজের প্রথম পুজক হিসেবে কালকেতুকে সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষাও করেছেন তিনি। আক্ষরিক অর্থেই কালকেতুর জীবনে তিনি 'অভয়া' হয়ে দেখা দিয়েছেন। মনসার ক্ষেত্রে এই মঙ্গলময়ী রূপটি আমরা দেখতেই পাইনি। এইখানেই চণ্ডীও মনসার মূলগত তফাত হয়ে গেছে। ধনপতি সওদাগরের কাহিনিতে বরঞ্চ চণ্ডী ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে দেখা দিয়েছেন। সেখানে বণিক ধনপতিকে সমুদ্রযাত্রার সময় কমলেকামিনী রূপে তিনি দেখা দিয়েছেন—

কালীদহের জলে কুমারী কমল দলে
গজ গিলে উগরে অঙ্গনা।
অতি কৃশোদরী বালা মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা
শশীমুখী খঞ্জন লোচনা॥

ধনপতি যখন সিংহলরাজকে এই মূর্তির কথা বললেন, স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিশ্বাস করলেন না। ধনপতি যদি তাঁকে এই মূর্তি দেখাতে না পারেন, তাহলে বারো বছর কারাগারে বন্দি থাকতে হবে—এই শর্ত মেনে ধনপতি যখন সেই দেবীর বিশেষ রূপটি দেখাতে গেলেন, দেবীরই মায়ায় সেই কমলেকামিনী মূর্তি দেখাতে পারলেন না। 'চণ্ডী' তাঁর পুজো করবার শর্তে ধনপতিকে তাঁর ডুবে যাওয়া সম্পদ ও বন্দিদশা ঘোচাবার কথা বললেও লাভ হল না। একগুঁয়ে শৈব উপাসক ধনপতি কোনোমতে রাজি হলেন না দেবীকে পুজো করতে। এদিকে খুল্লনা বনে ছাগল চড়াতে গিয়ে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট লুকিয়ে পুজো করাতে ও তার পুত্র শ্রীমন্তকে চণ্ডীর পুজো করতে শিখিয়ে চণ্ডীকে তুষ্ট করলেন। শ্রীমন্তই শেষে সিংহল রাজকে চণ্ডীর দয়ায় কমলেকামিনী রূপ দেখিয়ে ধনপতিকে মুক্ত করলেন ও শৈব ধনপতি

তারপর চণ্ডীর পুজো করতে রাজি হলেন। চণ্ডীমঙ্গালের দুটি কাহিনিতেই দেবী চণ্ডীর পুজোর আকাঙ্ক্ষা কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই দেবী বিপদে ফেলেছেন যেমন, বিপদ থেকে রক্ষাও করেছেন। তবে নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার মাপকাঠিতে মনসা চণ্ডীকে ছাপিয়ে গেছেন বলাই বাহুল্য। মনসা ও চণ্ডী এই দুই চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে আলাদা হয়ে গেল, মনসা যে প্রতিহিংসাপরায়না, হীন ও জটিল মনস্তত্ত্বের এক নারী হয়ে ধরা দিলেন, তার কারণ হয়তো অনেকাংশে লুকিয়ে আছে তাঁর নিজস্ব ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে। মনসা সুখী পরিবার পাননি। উলটোদিকে দেবী চণ্ডীর একটি পারিবারিক প্রেক্ষাপট আছে। তিনি পেয়েছেন স্বামীর ভালোবাসা ও সন্তানসুখ। তাঁর অশান্তি ছিল দারিদ্র্য নিয়ে। শিবের খামখেয়ালির জন্যে ভুগতে হয়েছে তাঁকে। মনসামঙ্গাল কাব্যের ঘটনাক্রমকে খেয়াল করলে যদিও আমরা দেখি যে, চণ্ডীর কারণেই মনসাকে কানি অপবাদ নিতে হয়েছিল কিন্তু চণ্ডীর সপক্ষে যুক্তিও সেখানে একেবারে ফেলে দেবার মতো নয়। মনসা শিবের অসংযমের ফসল। তবে চণ্ডীর আচরণের সঙ্গো গ্রাম্য গৃহবধূর আচরণের মিল অনেকটাই পরিলক্ষিত হয়। নিত্য অভাব ও নেশাগ্রস্ত স্বামীর স্বভাব যাদের চরিত্রের কোমলবৃত্তিগুলিকে ভোঁতা করে দেয়—

> পৌরাণিক দেবীর শাস্ত্রীয় মহিমা বিসর্জন দিয়ে তাঁকে রক্ত মাংসের মানবীতে পরিণত করতে চেয়েছেন। যিনি অন্নপূর্ণা হয়েও অন্নরিক্তা। যিনি রাজনন্দিনী হয়েও শ্মশানবাসিনী, তিনি দেবী হয়ে যে মানবোচিত গুণ ও দোষে বিভূষিতা হবেন এতে বিস্ময়ের কি আছে।[৫]

মানবোচিত গুণ ও দোষে বিভূষিতা দেবী চণ্ডীর 'অভয়া' নামটি কাহিনির শেষে সার্থক হয়ে ওঠে। আর মনসা তার দুর্ভাগ্যের মতো কাহিনির শেষে ভয়মিশ্রিত ভক্তিই পান শুধু। শ্রদ্ধা ও সম্মান, জননীর প্রতি সন্তানের যে আকর্ষণ ও ভালোবাসা, মমতাময়ী ও করুণাময়ী না হয়ে উঠতে পারার জন্য অধরাই থেকে যায়। তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় চাঁদ সওদাগরের বাঁ হাতে ছুঁড়ে দেওয়া ফুলটুকুতেই। এখানেই তাঁর ট্রাজেডি।

উৎসের সন্ধানে

১. 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রিত নতুন সংস্করণ—১৯৯৪, পৃ. ৫১

২. সনৎকুমার নস্কর : আলোচনা ও সম্পাদনা, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গাল, 'প্রজ্ঞাবিকাশ', পুনর্মুদ্রণ: জানুয়ারি, ২০১৭, পৃ. ৮৫

৩. তদেব : পৃ. ৮৭

৪. 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনমুদ্রিত নতুন সংস্করণ ১৯৯৪, পৃ: ৬৭-৬৮

৫. সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত : 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', রত্নাবলী, তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, পৃ. ৪৩৪

নাটকের প্রেক্ষিতে মনসামঙ্গল কাব্যের প্রসঙ্গ
বিশ শতকের চাঁদ সদাগরের নৌকা

মৌ চক্রবর্তী

প্রথমেই স্পষ্ট করে দেওয়া উচিত যে, সাহিত্যের এক অবিচ্ছিন্ন অংশ হল নাটক। বাংলা নাট্যচর্চার উৎপত্তি থেকেই সাহিত্যের কাহিনি বা বৃত্ত বা প্লট, তার অণুঘটকের কাজ করেছে। বাংলা নাট্যচর্চার ধারায় দেখা যায় কাব্যরূপময় ধারাটিকে আশ্রয় করেই চলমান। আবার, সাহিত্যের স্রষ্টাদের বইয়ের পাতা থেকে মঞ্চায়ন ঘটা কাহিনি, একুশ শতকীয় ডিজিটাল ভাষায় 'পপুলার' হয়ে উঠেছে। নাট্যচর্চার বিষয় হিসেবে সাহিত্যের ক্ষেত্রটি কাল, সময়, তারিখের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যেমন, যে লৌকিক বৃত্তের মধ্যে সীমায়িত বাংলা নাট্যকলার শুরুতেই ঋণাত্মক ভূমিকা দেখা যায় পৌরাণিক কাহিনির প্রতি; সেই কাহিনির একুশ শতকের ব্যাখ্যায়, মঞ্চায়নে ফিরে আসা যেন পৃথিবীর সাহিত্যের ঘূর্ণাবর্তটির প্রেক্ষিত সফল করে। এক্ষেত্রে বিষয় নিরিখে আলোচ্য মঙ্গলকাব্য এবং আলোচনার বিশেষত্বে মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত মনসামঙ্গল কাব্য, তার নাটকের প্রেক্ষিত, মনসামঙ্গল কাব্যের নাট্যরূপ প্রসঙ্গে বাংলা নাটকের বেশ কয়েকটি দর্শকচিত্ত জয়ী প্রযোজনা ঘটেছে। একদিক থেকে সাহিত্যের ভাষায় নাটকের কাহিনি, সংলাপ, চরিত্রের ভাব-রস-ভাষার সঙ্গে, দর্শকের যে রসাস্বাদন ঘটে তাই শিল্পের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। সাহিত্যের রূপ-শরীরটি তার অতি আবশ্যিক এক বাহক। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই আগে গল্প, উপন্যাসের সৃষ্টি। পরে সেটি নাট্যরূপ পেয়েছে। এক্ষেত্রে আলোচ্য মনসামঙ্গল-এর কাহিনি অবলম্বনে লেখা 'চাঁদ সদাগরের নৌকা' এক অঙ্গে দুই রূপ ধারণ করে বিদ্যমান। কীভাবে, তাঁর ব্যাখ্যাটি স্বয়ং রচনাকারের লেখায় মেলে। এটি যখন কেউ পড়ছেন, তখন তা পাঠ্যের এবং নাটক। আর যখন তা মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে, তা হয়ে যাচ্ছে নাট্য।

'চাঁদ সদাগরের নৌকা' বিশেষ এক মাইলস্টোন। যার একদিকে সাহিত্যের আদিকালের বস্তুগত কাহিনি ও চরিত্রেরা; আর অন্যদিকে, ভাষা, সময়কাল, সংলাপের গড়া আধুনিক ভাষার সঙ্গে অপ্রচলিত ভাষার প্রতিফলন—যা সাহিত্যের উপাদানে আদিকালের, আর নাটকের রূপের মধ্যে বিশ শতকের পরিভাষার। শম্ভু মিত্র-র ভাষায় লেখা হয় যে, তিনি জীবিতকালে এই নাট্যের মঞ্চায়ন নাও ঘটতে পারে। তবে, আগামি প্রজন্মের জন্যে রেখে

যাওয়া তাঁর এই নাটক। তিনি এ প্রসঙ্গো জানিয়েছেন যে, আগামীতে এই শ্রুতি নাটক থেকে অন্যান্য নাট্য নির্দেশক, অভিনেতা এবং নাট্যশিল্পচর্চায় যুক্তদের উপকার হতে পারবে। উল্লেখ করার যে, বিশিষ্ট মান্য নাট্যকার সচেতন নাট্যশিল্পী হিসেবে উল্লেখ্য নাটকের অভিনয় নিয়ে মত দিতে পারেননি। শেষে শিল্পী, অভিনেতা, নাট্যরূপকার শম্ভু মিত্রের দ্বারা নাটকটি রয়ে যায় কণ্ঠ-অভিনয়েই। উল্লেখ্য এও যে, নাটক লেখার আগে তিনি কবি শঙ্খ ঘোষের সঙ্গো আলাপ করেছিলেন এবং এই নাটক লিখেছিলেন প্রায় দশ বছর সময়কাল ধরে। নাটকটির বৈশিষ্ট্যে মেলে এর কাব্যগুণ, ভাষা ও ছন্দ। ১৯৬৫ সালে 'বটুক' ছদ্মনামে নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ফলে, অনুমান করা যায় যে, তিনি ১৯৬৫ সালের কিছু আগে এই নাটক রচনার কাজ শুরু করেছিলেন এবং ওই সময়ে তাঁর বয়স ছিল ৫০ বছর। তিনি সে সময়ে বিশ্বব্যাপী পরিচয় নিয়ে ফেলেছেন, রবীন্দ্র-নাট্যের সফল প্রযোজনা করেছেন এবং বহুরূপী দলগত প্রযোজনার জন্যে কাজ করছেন। পাশাপাশি এও আলোকপাতের যে, এক পরিণত শিল্পী গণনাট্যের ধারায় জারিত শিক্ষা, দর্শনের তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা শম্ভু মিত্র। তাঁর মতন নাট্য মূল্যায়ন করা শিল্পী কেন মনসামঙ্গাল কাব্যের নাট্যরূপ নিয়ে ভাবিত হলেন, এ প্রশ্ন ওঠে। আবার, এই নাটকের অভিনয় হতে পারছে না, তা নিয়েও তিনি ছিলেন সোচ্চার। শম্ভু মিত্র জানিয়েছিলেন যে, 'এ যে কোথায় বাদ দেওয়া সম্ভব আমি জানি না।'

একথা আলোচনা করলে অত্যুক্তি হয় না যে, যিনি অতি সচেতন সুনিপুণ নাট্যশিল্পী হয়েও সময়পাত করলেন মঙ্গালকাব্যের প্রতি। এর কারণ অনুসন্ধানই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আরও, বিশেষ করে প্রশ্ন ওঠে যে, মধ্যযুগে রচিত মঙ্গালকাব্য তথা আলোচ্য মনসামঙ্গাল কাব্যের কাহিনি বহুজনচর্চিত এবং জ্ঞাত। এরমধ্যে কাহিনির অলৌকিক, স্বর্গ, দেবী, দেবতার ঘটনা এবং এরমধ্যে নিহিত চরিত্রে মেলে পৌরাণিকতা; যা গ্রুপ থিয়েটারের সময়ের একমাত্র কাহিনিগত অবলম্বন নয়। ততদিনে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে বহু সাহিত্যিকের রচনা। বিশেষত, শম্ভু মিত্রের মূল নাট্যকর্মের অনেকগুলিই তখন মঞ্চস্থ হতে পারত। তিনি অনেকটাই নিযুক্ত থেকেছেন রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনা নিয়ে। গ্রুপ থিয়েটারের ঠিক আগের সময়কাল থেকেই নির্ধারিত হয়েছিল যে, বাংলা নাট্যচর্চার মূল উদ্দেশ্যের অনেকখানিই রাজনৈতিক ভিত্তিতে চালিত। এই দর্শনের ধারার সঙ্গো এক তাত্ত্বিক-শিল্পী হিসেবে তিনি সর্বজনবিদিত। তাঁর ভাবনায় মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনির কতটা ধারালো ও যুক্তিসম্পন্ন হতে পারে বিশ শতকের মধ্যভাগে, এও পর্যায়ক্রমে প্রশ্নের ও বিশ্লেষণের।

২

মনসামঙ্গাল কাব্যের কাহিনি বা প্লট অনুসারে একুশ শতক পর্যন্ত সময়কালে কত প্রযোজনা হয়েছে, তার পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ করা সহজ নয়। অগুণিত বাংলা প্রদেশের নাট্যদল এই বিষয় নিয়ে নাট্যাভিনয় করে চলেছে। যথা, মিনার্ভা রেপারেটরি প্রযোজিত একটি নাট্য—প্রযোজনা 'দেবী সর্পমস্তা'। এর কাহিনি ছিল মনসামঙ্গালের অবলম্বনে। অন্যদিকে, বাংলা সাহিত্যের এবং বাংলা নাট্যের জন্যে 'চাঁদবণিকের পালা'র সংক্ষিপ্ত ঘটনা হল যে, চাঁদবণিক শিব উপাসক। তার ভক্তির ঠিক বিপরীতে মনসা দেবীর পুজোয় আগ্রহ দেখান না তিনি।

সন্তানের মৃত্যু, ধন-সম্পদ, সপ্তডিঙা ডুবে গেলেও তিনি শিবের প্রতিই অবিচল থাকেন। শিবও চাঁদ সদাগরকে পরীক্ষা করতে থাকেন। নিঃস্ব রিক্ত চাঁদ সদাগরের একমাত্র সন্তান লখিন্দর, তাকে বিয়ে দিলে মনসার কোপে তার মৃত্যু। লখিন্দরের নববধূ বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফেরাতে কলার ভেলায় ভেসে যায়। শেষে, দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে নৃত্যের প্রদর্শন এবং লখিন্দরের প্রাণ ফেরানো; সঙ্গো, মনসার কোপ থেকে মুক্তির উপায়ও হয়। চাঁদ সব ফিরে পেতে, বেহুলার অনুরোধে পুজো করেন—তবে বামহাতে। কারণ, ডানহাতে তিনি শিবের পুজো করে থাকেন। উক্ত মূল কাহিনির সঙ্গো সময়ে সময়ে মিশেছে পরিচালক, প্রযোজক এবং অভিনেতাদের শিল্প ভাবনা। পৌরাণিক কাহিনিকে সময় উপযোগী করে ব্যাখ্যা করার জন্যে তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়োজন। কারণ, এক, কাহিনির মূল কাব্য মনসামঙ্গাল। নাটকের ক্ষেত্রে এর নাম দেখা যায়, ‘দেবী সর্পমস্তা’, চাঁদ বণিকের পালা’, ‘বেহুলা—লখিন্দর পালা’ প্রভৃতি নামে। মূল কাহিনির থেকে অংশত মূল চরিত্রের অবলম্বন। যেমন, শম্ভু মিত্র ‘চাঁদ বণিকের পালা’য় চাঁদ, সনকা, বেহুলা, লখিন্দর, মনসাসহ দেবতাদের সভায় নৃত্যরত বেহুলা এবং নেতা ধোপানীর ঘাট, কলার ভেলা ইত্যাদি বিষয়সমূহ একই থেকে যায়।

সময়ের বিবর্তনে পার্থক্য ঘটে সংলাপে, পরিবেশনায়, অভিনীত কলাকুশলীদের এবং অভিনেয় স্থানের। অভিনেয় স্থান বিষয়টিও নাটকের একটি বিশেষ উপাদান এবং সেকারণেই হয়তো আলোচ্য নাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে মঞ্চায়ন হয় শ্রুতিনাটক রূপে। ‘চাঁদ বণিকের পালা’র নামকরণ বিষয়টিই লক্ষ্যের নাট্যকার রচনার নাম রাখছেন পালা-শব্দের প্রয়োগে। রচনাকার এর শৈলী রাখছেন ছন্দে, যা আদিকালের নাট্যের মূল রস বলে জারিত এবং এর পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটে ১৯৭৮ সালে। তার আগে এটি ছদ্মনামের আশ্রয়ে থাকে। তিন পর্বে নাটকের কালক্রম হল—১৯৬৫, ১৯৬৬ ও ১৯৭৪ সাল। এর নাট্য-পরিচিতিতে বলা হয়, এটি মৌলিক নাটক। বিষয়ের নিরিখে নাটকের দিকটি তো আগেই উল্লিখিত যে, সর্বজনজ্ঞাত। তবে, এর মৌলিকত্ব ঠিক কী হিসেবে? অবশ্যই তা নির্ণয় করা যায় যে, এর মৌলিকত্ব রচনাকারের রচনার দৃষ্টিকোণ থেকে। নইলে, এমন অবলম্বনে লেখা কবিতা, গল্প, নাটক যে সাহিত্যের ধারাটিকে সজীব ও গবেষণার করে তুলত না। যেমন, জীবনানন্দ দাশের কবিতার পঙ্‌ক্তিতে ব্যবহৃত হয়ে যায় ‘বেহুলা’, ‘গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে’, “অমরায় গিয়ে” এবং “সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়”। এই রূপকল্পের উৎস যে বাংলাকাব্যের মনসামঙ্গাল কাব্য তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কারণ, পক্ষের অনুষঙ্গো বেহুলা নামক এক সাধারণ মেয়েকেই তিনি ছিন্ন খঞ্জনা, ভাঁটফুলের ঘুঙুরের ছবি এবং এরস্নগে রবীন্দ্র-উত্তর যুগের কবি জীবনানন্দ বাংলা শব্দটি যোগ করতে ভোলেননি। শব্দরূপকল্পে বাংলার মুখ কবিতার সারস্বস্বত রূপ এক অনুষঙ্গা হতে থাকে মধ্যযুগের কাব্যধর্মীতাযুক্ত মনসামঙ্গাল কাব্যের আলোচনায়।

‘বেহুলা-লখিন্দর পালা’ নামে একুশ শতকের গ্রুপ থিয়েটারে অভিনীত হয় মনসামঙ্গাল কাব্য। নাট্যরঙ্গা সংস্থার প্রযোজনার উল্লেখ করা যায়। কেননা, এটি মূল কাঠামোর সঙ্গো সঙ্গো পালা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ওঠে এবং পালা থেকে মঞ্চের জন্যে অভিনীত হয়। এ প্রসঙ্গো, একটি বইয়ে প্রবন্ধ আলোচনায় শাঁওলী মিত্র জানিয়েছেন যে, এটি অভিনীত হতে পারে

কিনা, তা নিয়ে যথেস্ট সংশয়। কেননা, এটি প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্যে লেখা নাটক। যার মধ্যে মঞ্চের বর্ণনা সুচারুরূপে রয়েছে এবং এটিই নাটকের বৈশিষ্ট্য, যেখানে নাটক একটি পালা, একটি উপন্যাস, একটি কাব্য উপন্যাসের থেকে পৃথক। এটি নাটক রচনার রীতি। আলোচ্যের যে, মনসামঙ্গাল যদি শুধু পাঠ্যের হয়েই থেকে যেত, শুধু যদি পরীক্ষা পাশ এবং গবেষণার হয়ে থেকে যেত, তবে এর চর্চা কি সঠিক অর্থে হতো।

৩

একুশ শতকের পর্যায়ে শুভ লক্ষণ এই যে, মঙ্গালকাব্যের বিষয়ে একুশ শতকের নিরিখে ফিরে দেখার জন্যে প্রবন্ধাবলী লেখা। নাটকের নিরিখে থেকে যাওয়া 'চাঁদ বণিকের পালা', 'বেহুলা-লখিন্দর পালা', 'দেবী সর্পমস্তা' উপরিউক্ত শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠল। কারণ, প্রাচীনকাল থেকেই কবিরাই নাট্যকার হয়েছেন, নিজেদের সাহিত্যের বিকাশে এবং প্রকাশে। যোগসূত্রের অনুষঙ্গো উল্লেখ করা যে, বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ অধ্যায় জুড়ে যে কাব্যগুলি পঠিত হয়, তা সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসৃত এবং আদি, মধ্য, আধুনিক কালভেদে সাহিত্যের পাঠক্রমে সাহিত্যের পরিবর্তন এবং নাটকের অবস্থানও পঠিত হয়। সেক্ষেত্রে মধ্যযুগের আদিকাব্যের অনুষঙ্গো মনসামঙ্গালও আলোচিত। এই অনুষঙ্গো জ্ঞাত করার যে, বাংলা মনসামঙ্গাল কাব্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে একুশ শতকেও গবেষণা চলছে। ফলে, এই নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত হয় যে, এটি আধুনিকতার পর্যায়ে উঠে এসেছে। এর সঙ্গো গবেষণার প্রথম উদেশ্যটির উত্তর মেলে যে, শম্ভু মিত্র মনসামঙ্গাল কাব্য অবলম্বন কেন করেছিলেন। শুধুমাত্রে নাট্যের রচনা নয়, তাঁর সঙ্গো সময়কালের কাব্যরসের মেলবন্ধ এই প্রসঙ্গো আলোচনার দাবি রাখে—

১. মনসামঙ্গাল কাব্য মূলত ছন্দবন্ধ পদে রচিত।
২. এর ঢং বা রকম ছিল, আটপৌরে পাঁচালির।
৩. এটি মঙ্গালবার থেকে শুরু করে আরেকটি মঙ্গালবারে শেষ হতো। অর্থাৎ, নাটকের ক্ষেত্রে এর সঙ্গো জুড়ে যায়, বহু পাঠ, সহজিয়া পাঠের জন্যে উচ্চারণ ও ছন্দের প্রয়োগ।
৪. শাসককালের বিবর্তনে বাংলার নিজ সংস্কৃতির রূপ, সাহিত্যের সঙ্গো নাট্যগুণে পাঠ্যের হয়ে ওঠে।

নাটকের যথাযথ গুণ থাকলেও, অনেকসময় তার মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে অসুবিধে থেকে যায়। তবে, প্রকৃত সাহিত্যের গুণ তাই, যা কয়েক যুগ পরেও আলোচিত হয়ে থাকে। রচনা সমীক্ষার গুণে, দেখা যায় সংস্কৃত এবং পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যে কবি, কাব্যের টিকে থাকা ঘটেছে। এক্ষেত্রে মনসামঙ্গাল কাব্যের রচনাকার হিসেবে অনুসৃত হয় আদিকবি হরি দত্ত। এর উল্লেখ মেলে, অন্যতম বঙ্গা কবিদ্বয়ের থেকে—১. কবি বিজয় গুপ্ত। ২. কবি পুরুষোত্তম-এর গবেষণার জন্যে সূচিত করার যে, একটি কাব্যের রচনাকার একারণেই হারিয়ে যেতে পারেননি। কেননা, পরবর্তীতে তাঁর রচনার গুরুত্ব স্বীকার করে চলেছেন পরবর্তী সময়ের কবিগণ। ঠিক এভাবেই, নাটকের পরিবর্তিত ক্ষেত্রে মধ্যযুগের মনসামঙ্গাল কাব্যের রূপান্তর ঘটে। এটি বিচ্ছিন্ন একটি

ঘটনা নয়। নাটকের বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ডিজিটাল সময়ে পৌঁছেও গবেষণার পাথেয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে মঙ্গালকাব্যের ভূমিকা। এক্ষেত্রে মনসামঙ্গালের প্রাচীনকাল থেকে আজকের জনজীবনের হয়ে ওঠায় একটি ব্যাখ্যায় মঙ্গাল শব্দটি তাৎপর্য। বাংলা সাহিত্যের মঙ্গাল-শব্দের প্রয়োগে সাধারণ মানুষের জনজীবনের এক ছায়াচিত্রে রচিত হয়েছে এই কাব্যটি; যা সাম্প্রতিক ডিজিটাল যুগের বই প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও আলোচ্যের হয়ে থাকে। গ্রাম তথা বাংলার মাটির গন্ধের কাব্যের সুষমায় রচিত এর পদ। একদিকে দেবী-মাহাত্ম্যের কথা, অন্যদিকে সমাজের কয়েকটি পেশার উল্লেখে এ যেন সমাজজীবনের রূপরেখা বর্ণিত এক দলিল।

'বহুরূপী' পত্রিকায় 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটক হিসেবে প্রকাশিত হলেও, একে সাহিত্যের তকমায় রাখা চলে। বিশেষত যখন রচনাকারের বিশেষ গুণাবলীর মধ্যে আবৃত্তি এবং অভিনয় চর্চা রয়ে যায়। একদিকে সাহিত্যের অলংকার, অন্যদিকে এই দীর্ঘ পদ স্মৃতিতে থাকা নাটকের দিকে ঝুঁকতে হয় অভিনয় কলাকুশলীদের। কারণ, উৎপল দত্তের নাট্যাভিনয়ের নির্দেশে তিনি বিশেষ করে, ভারস অর্থাৎ কাব্যনাট্যের প্রসঙ্গা ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রে, শেকস্‌পিয়রের নাটকের ধারাটিও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পারঙ্গাম করে তোলে। দীর্ঘপদ সংলাপ বলার মধ্যে দিয়ে, কলা-শিল্পীদের ক্ষেত্রে দম বাড়ানোর এক উপায় বলেই চর্চিত হয়। উনিশ শতকের বাংলা নাট্যমঞ্চে এই রীতি চালু থাকলেও পরে তা সরে যায়। কারণ, অত দীর্ঘ সংলাপে শিল্পীদের অসুবিধে দেখা যায়।

মঙ্গালকাব্য সম্পর্কে প্রবন্ধের আলোচনায় ব্যাখ্যা রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি 'লোকসাহিত্য', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'চিঠিপত্র', 'সাহিত্য' প্রবন্ধে আলোচনায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। সেক্ষেত্রে দুটি দিক মেলে—

১. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন যে, প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গালকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী। এ প্রসঙ্গো, উল্লেখযোগ্য আলোচনা মেলে 'গ্রাম্য সাহিত্য' (লোকসাহিত্য, ১৩০৫), 'বঙ্গাভাষা ও সাহিত্য' (সাহিত্য—১৩০৯), 'বাতায়নিকের পত্র' ও 'শক্তিপূজা' (কালান্তর, ১৩২৬) প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে। তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে একটি চিঠিতে লিখেছেন তার বিশেষ কটি লাইন তুলে দেওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন যে, 'সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গাল, অন্নদামঙ্গাল, মনসা ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চলতে থাকত তাহলে কি হত। পনেরো—আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত।' এরসঙ্গো উল্লেখ প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যচর্চার দিক থেকে মঙ্গালকাব্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

২. যদিও তথ্যের সাপেক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধের যুক্তিসম্মত কয়েকটি লাইন তুলে দেওয়া হল। তবে এর যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যাও এসে যায়। সময়ের সঙ্গো সঙ্গো মঙ্গালকাব্যের চর্বিতচর্বণে সাহিত্যের গুণাবলীর পাথেয় হয়ে ওঠে না। একইভাবে যদি কালানুক্রমে বছরের পর বছর এক রচনাকার নতুন দিক সংযোজন না করেই সাহিত্যের চর্চা করে থাকেন, তবে তা আগামির জন্যে পাঠকের রসাস্বাদন করবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের প্রবন্ধে প্রকাশের সময়কাল দেখলেই বোঝা যাবে যে, নাটক রচনার আগে যেমন শম্ভু মিত্র কবি শঙ্খ ঘোষ-এর সঙ্গে আলাপ করেছেন। তেমনই আলোচ্য প্রবন্ধগুলি নিঃসন্দেহে গোচরে এসেছিল রচনাকার শম্ভু মিত্রের। তা বোঝার অপেক্ষা রাখে না। তাই, তিনি কালবেত্তার নিগড়ে সাহিত্যের ভাঙচুরের মধ্যে দিয়ে একটি সক্রিয় সাহিত্য সত্তা সৃষ্টি করে রাখতে চাইলেন। যা সৃষ্টির জন্যে ব্যাকুল এবং মগন এক শিল্পীর স্বাধীনতা পূর্বের বাংলাদেশ এবং দেশভাগের বাংলাকে একত্রিত করে দেয় সাহিত্যে-কাব্যে আলোচনায়। কেননা, মঙ্গলকাব্য তো শুধু এপারের বাংলায় পড়া হয় না; কাঁটাতারের ওপারের যে ভূখণ্ড যেখানে একই মাটির ভাষা, একই মানুষের বাস, সেখানেও এর সার পৌঁছে যায় সহজেই।

রচনাকার শম্ভু মিত্রের, মধ্যযুগ থেকে বিশ শতকের মধ্যেকার সময়কালটির সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন করতে সফল হলেন। দশ বছরের সাধনায় খুঁজে আনলেন নাটকের ভাষা, যা একদিকে কথ্য, যা অন্যদিকে লেখ্য হয়ে রইল। নাটকের ক্ষেত্রে মনসামঙ্গাল কাব্যের প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হলেও, সূত্রধর হয়ে রইল আধুনিক বিশ শতকের সাহিত্য এবং সূত্রধর হিসেবে এক সফল বিশ্লেষক নাটক-রচনাকার হয়ে রইলেন শম্ভু মিত্র 'চাঁদ সদাগরের নৌকা'র মাধ্যমে। যা অধুনা, তাই আধুনিক। সেই মর্মে সাহিত্যের আধুনিকতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ, ধর্ম, ভাষা পালটে নেবে, এটাই রীতি। সেই বিষয়েই শম্ভু মিত্রের আলোচনা উঠে আসে। একদিকে, মনসামঙ্গালের মতন সবার চেনা-জানা একটি টেক্সট; আবার, সেটি রচনাকালের ভিত্তিতেও আধুনিকতার বিশেষণ ব্যাখ্যা করা যায়। সেই নিরিখে কাব্যময় নাট্যের কাহিনিতে কালের নৌকাটি সদর্থক ভূমিকা রাখে এবং সম-সাময়িককালের বৃত্তান্তে পুনঃপুন পাঠ করলে বোঝা যায় যে, এই প্রেক্ষাপটকে তিনি তাঁর চেনা সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পরিবেশে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। নইলে, তিনি নাটকের প্রকাশিত বইয়ের ভূমিকায় লিখতেন কীভাবে যে, তিনি তাঁর চেনা শহরের প্রসেনিয়াম মঞ্চের মধ্যেই সীমাবন্ধ রেখেছেন আধুনিক কালের আলোচ্য নাটকের আঙ্গিক।

এই সারবত্তা থেকে নদীটি গাঙুর হোক বা গঙ্গা, সেখানে চম্পকনগরীর পরিবর্তে কলকাতা শহরের প্রতিচ্ছবির কথা উল্লেখ ও ব্যাখ্যা রেখেছেন অভিনেত্রী, নাট্যকর্মী ও নাট্য-বিশ্লেষক শাঁওলী মিত্র। এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সহমত না হয়ে পারা যায় না। মঞ্চনাটকের প্রেক্ষিতে রচনা করা প্লটের ব্যাখ্যা মেলে ওই ভূমিকাতেই। রচনাকার জানাচ্ছেন যে, শহরের নাট্যমঞ্চের ত্রুটিপূর্ণ গঠনের মধ্যেই তিনি বা তাঁরা নাট্য প্রয়োগ করেছেন।

'চাঁদ সদাগরের নৌকা'-র প্রযোজনাটি একটি মঞ্চের অভ্যন্তরে কলাকুশলীসহ, সূত্রধর, বাদ্যযন্ত্রীদের দল নিয়েই হতে পারবে। এক্ষেত্রে মারিকালের একটি অনুষঙ্গ বাদ গেলে পরে কলকাতা এবং কলকাতা দূরবর্তী শহরতলীর উন্মুক্ত মঞ্চে হতেই পারবে। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি নাট্যদল হয়তো, আগামীতে এরূপ নাট্যের প্রযোজনা করে থাকবে এবং এই প্রবন্ধের আলোচনার সূত্রে, নাট্যকর্মীরা জারিত ও প্রাণিত হলেই, এই প্রবন্ধ লেখার মূল উদ্দেশ্য সাধিত হবে। আদিকালের আদিকবি হরি দত্ত , একুশ শতকের বাংলা কাব্যের সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূরক হয়ে ওঠেন। গণনাট্য সময়কালের নাটকের বাস্তববাদী, প্রতিবাদী, দেশাত্মক, স্বাধীনতাকেন্দ্রিক

এবং এর পরবর্তীতে রাজনৈতিক দর্শনের তত্ত্বে নাট্যরচনার রীতি ঘটেছে। এরসঙ্গো ২০২১ সালের সময় পর্যন্ত 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন'-এর একটি ভূমিকাও রয়ে যায় মঙ্গলকাব্যের চর্চার নিরিখে। বাংলার গ্যারিক নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, ইংরেজ- শাসকের কারণে, দর্শকের রুচির কারণে, এবং টিকিট বিক্রির কারণে সামাজিক ও ধর্মীয়রূপের নাটক লিখেছিলেন। তবে, রচনাকার শম্ভু মিত্রের কারণ অবশ্যই পৃথক। তিনি, একটি আদিকাব্যের সঙ্গো বাংলার আধুনিক সংস্কৃতির মিলনের পথ করে রেখে গেছেন 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে।

তথ্যের সন্ধানে

১. শম্ভু মিত্র : 'চাঁদ বণিকের পালা', এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৮৪, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪০৬, পৃষ্ঠা ভূমিকা

২. শাঁওলি মিত্র : 'শম্ভু মিত্র বিচিত্র জীবন পরিক্রমা', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়া দিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০১০, প্রথম পুনমুদ্রণ ২০১১, পৃ. ৩৪৮-৩৫৩

৩. তদেব

৪. তদেব

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'গ্রাম্য সাহিত্য', বিশ্বভারতী, ১৩০৫, লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৭১৭

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ' সাহিত্য সৃষ্টি', বিশ্বভারতী, আষাঢ়, ১৩১৪, সাহিত্য, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৭৮৬-৭৮৭

৭. উৎস-১

৮. উৎস-২

৯. উৎস-১

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে সৃষ্টিকথা

কল্পনা রায়

মানিক দত্তকে চণ্ডীমঙ্গালের আদি কবি বলা হয়। সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়েই মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের কাহিনি আরম্ভ করেছেন। সৃষ্টিকথা বাদ দিলে চণ্ডীমঙ্গালের অন্যান্য কবিদের মতো মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যেও দুটি কাহিনি—একটি কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনি বা আক্ষটিক খণ্ড, অন্যটি ধনপতি-লহনা-খুল্লনার কাহিনি বা বণিক খণ্ড। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের সৃষ্টিতত্ত্বের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—"বস্তুত মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গালের সৃষ্টিপালা বাদ দিলে কাব্য হিসেবে ইহা কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে।"[১] ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যও মন্তব্য করেছেন—"একমাত্র সৃষ্টিতত্ত্বের আখ্যান ব্যতীত মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে আর কোন বিষয়ে নুতনত্ব নাই। ইহাতেও দুটি কাহিনি কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ও ধনপতি সদাগরের কাহিনী।"[২]

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনি বৌদ্ধমতাশ্রিত ধর্মমঙ্গাল ও শূন্যপুরাণের কাহিনির অনুরূপ। বৌদ্ধমতাশ্রিত ধর্মমঙ্গাল কাব্যের প্রারম্ভে নিরঞ্জন ও আদ্যাদেবীর বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় যা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যেও রয়েছে। ধর্মমঙ্গাল কাব্যের অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দিয়ে মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের কাহিনি আরম্ভ করেছেন। এতে গতানুগতিক অন্য কোনো দেব-দেবীর বন্দনা প্রাধান্য পায়নি। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে পাওয়া যায়—

> বাপের বিজ্জ জন্ম নইল না ধরিল মাত্র।/শূন্যতে জন্মিল ধর্ম মাংস পিণ্ডকায়।।/কুস্মাণ্ডের ফল জেন ধর্ম্মেরে সৃজন।/শূন্যতে নাম্ভিল ধর্ম্ম অলক্ষ জোজন।।/হস্ত নাহি পদ নাহি কন্ধে নাহি মাথা।/জে রূপে জন্মিল ধর্ম তার শুন কথা।।/আচম্ভিতে ধর্ম গোলোক ধিআইল।/চক্ষু কান নাক আদি সকল হইল।।[৩]

মায়ারূপী ধর্ম নিরঞ্জনের জন্ম হয় শূন্য থেকে মাংসপিণ্ডরূপে। এরপর ধর্মের মুণ্ড, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ ইত্যাদি সৃষ্টির কথা পাওয়া যায়। জলের উপর ধর্ম চৌদ্দোযুগ যোগনিদ্রাবিভূত ছিল। নিদ্রা থেকে জেগে উঠে উলুককে দর্শন করে। উলুক ধর্মকে জগৎ-সংসার সৃষ্টি করার পরামর্শ দেয়। উলুকের পরামর্শে ধর্ম জগত-সংসার সৃষ্টি করতে মনস্থির করে। মন্ত্রের দ্বারা ধর্ম নিজের নাম জপ করলে পদ্মফুলের সৃষ্টি হয়। সেই পদ্মফুলের মধ্যে আদ্যামূলকে স্থাপন করে। এরপর পাতালে প্রবেশ করে ধর্মের মৃত্তিকা সৃজন করার কথা রয়েছে—

পাতালে জাইঞা ধর্ম্ম মৃত্তিকা সৃজিল।।/মৃত্তিকা সৃজিঞা ধর্ম্ম হস্ততে রাখিল।/নখের টিপনে মাটি তিন ভাগ কৈল।।/মৃত্তিকা সৃজিঞা ধর্ম্ম ভাবেন যুগতি।/কার পৃষ্টে স্থাপিব নির্ম্মল বসুমতি।।[৪]

মৃত্তিকা সৃজন করে হাতের উপর রেখে নখ দিয়ে সেই মাটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করে। কিন্তু কোথায় বা কার উপরে সেই মাটিকে স্থাপন করবে এই কথা চিন্তা করে ধর্ম বরাহরূপ ধারণ করে। বরাহরূপে ধর্ম পৃথিবীকে দন্তের উপর স্থাপন করে। এরপর গজরূপ ধারণ করে পৃথিবীকে পৃষ্ঠে স্থাপন করে। কিন্তু পৃথিবীর ওজন সহ্য করতে না পেরে ধর্ম গজরূপ ত্যাগ করে কুর্মরূপ ধারণ করে কুর্মরে পৃষ্ঠে পৃথিবীকে স্থাপন করে। শেষে কুর্মও পৃথিবীর ভার সইতে অক্ষম দেখে ধর্ম সপ্তমস্তক বিশিষ্ট বাসুকি সর্পের সৃষ্টি করে পৃথিবীকে বাসুকির মস্তকে অর্পণ করে। ধর্মের আশীর্বাদে বাসুকি সর্প পৃথিবীকে নিজের মস্তকে ধারণ করতে সক্ষম হয়। পৃথিবীকে বাসুকি সর্পের মস্তকে স্থাপন করে ধর্ম হাম্বি বা হাই তোলে। সেই হাই থেকেই আদ্যা জন্মলাভ করে—

মনতে ভাবিঞা ধর্ম হাম্বি ছারিল।/ধর্মরে হাম্বিতে আদ্যা তখনি জন্মিল।।/হাম্বিতে জন্মিয়া আদ্যা পড়িল ভূমিতে।/উঠিঞা ডাণ্ডাল্য আদ্যা ধর্মরে সাক্ষাতে।।[৫]

আদ্যা নারীরূপী। আদ্যাকে দেখে ধর্মের মনে হাসি আর ধরে না—

আদ্যাকে দেখিল ধর্ম মনের হরিষে।/স্তনে হস্ত দিতে আদ্যা রূপবতি হাসে।।/আদ্যার উরু ধরি ধর্ম নখের রেখ দিল।/সংসারের স্ত্রী পুরুষ সেই হৈতে হইল।।[৬]

ধর্ম আদ্যার উরুতে নখাঘাত করলে রক্ত, মাংসের সৃষ্টি হয়। সেই রক্ত, মাংস থেকে আকাশে চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, মেরু-মান্দারের সৃষ্টি হয়। কামাতুর ধর্ম আদ্যাকে দেখে ধরতে গেলে পূর্বদিকে অবস্থান করে আদ্যা ধর্মকে বুঝিয়ে বলে—"জন্ম দিঞা বল কৈলে ধর্ম নাশ হয়।" আদ্যার এই কথা শুনে লজ্জা পেয়ে ধর্ম পূর্বদিকে পূর্বরাজ্যখানি সৃষ্টি করে। একইভাবে পশ্চিম দিকে পশ্চিম রাজ্য, উত্তর দিকে উত্তর রাজ্য, দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

আদ্যাকে ধরার জন্য ধর্ম পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারদিকে ছুটে যায়। সেই থেকেই পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারটি দিকের সৃষ্টি। শেষপর্যন্ত আদ্যাকে ধরতে না পেরে কামে অচেতন ধর্মের বিজ্জ টলে পড়ে। ধর্ম বাম হস্তে সেই বিজ্জকে ধারণ করে। বিজ্জকে তিন ভাগে ভাগ করে তিনটি স্থানে রাখে। এই তিন ভাগ বিজ্জ থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিদেবের সৃষ্টি হয়। ধর্ম মায়া পেতে মড়ারূপ ধারণ করে জলে ভেসে যেতে থাকে। যে ঘাটে ব্রহ্মা তপস্যারত সেই ঘাটে গিয়ে মড়ারূপী ধর্ম হাজির হলে ব্রহ্মা মড়া দেখে কুশ আসন ছেড়ে ঘাটের উপরে উঠে আসে এবং নিরঞ্জনকে স্মরণ করে। কিন্তু এই মড়াই যে ধর্ম নিরঞ্জন তা বুঝতে পারে না। এরপর ধর্ম ভেসে যায় সেই ঘাটে যেখানে বিষ্ণু তপস্যারত। বিষ্ণুও ধর্মের ছলনা বুঝতে পারে না। ঘাট ছেড়ে ওপরে উঠে মড়ার গন্ধে নাক চেপে ধরে। এরপর ধর্ম ভেসে চলে মহেশ্বর যে ঘাটে তপস্যারত সেই ঘাটে। মহেশ্বর ধ্যানের দ্বারা ধর্মের মায়া সম্পর্কে অবগত হয়। পিতা ধর্মকে চিনতে পেরে ধর্মের মৃতদেহ শিব স্কন্ধে তুলে নেয়। ধর্ম নিরঞ্জন শূন্যে থেকে মহেশ্বরকে নির্দেশ দেন নিরামিষের ঘাটে তাকে দাহন করার জন্য। উলুক পক্ষরূপ ধারণ করে মহেশ্বরকে ধর্মের মৃতদেহ উরুর উপর রেখে দাহন করতে বলে।

ধর্ম শূন্য থেকে মহেশ্বরকে বলেছে রূপবতী আদ্যাকে বিবাহ করতে। কিন্তু মহেশ্বর এতে রাজি হয়নি। মহেশ্বর ধর্মকে জানিয়ে দেয় যে আদ্যা তাঁর মাতৃতুল্য, কেমন করে সে আদ্যাকে বিবাহ করবে। তবে আদ্যা যদি সাতবার জন্ম গ্রহণ করে তবে সপ্তম জন্মে আদ্যাকে বিবাহ করতে মহেশ্বরের কোনো আপত্তি নেই। মহেশ্বর বলেছে—

সাতবার মরিব সাতখান হার লব
হাড়মালা গালত্র পড়িব।
আদ্যা দেহা ছাড়িঞা পুনজন্ম লঅ গিঞা
তবে তাকে বিবাহ করিবো।।'৭

মায়ারূপী ধর্ম আদ্যাকে বলেছে—

কথা শুন আদ্যা দেবি বলিত্র তুমারে।
আদ্যা জনম তুমার সৃষ্টি রক্ষার তরে।।[৮]

ধর্মের নির্দেশে আদ্যা প্রথমে ভৃগু মুনির ঘরে জন্মগ্রহণ করে। এরপর যশোদার উদরে, কুম্ভকারের ঘরে, দক্ষের ঘরে, হরিব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু হরিব্রাহ্মণ আদ্যার ছলনা বুঝতে পারে। হাড়িতে করে আদ্যাকে জলে ভাসিয়ে দেয়। হিমালয় আদ্যাকে পেয়ে নিজের কন্যারূপে প্রতিপালন করে। হিমালয় আদ্যার নামকরণ করে গৌরী। পিতা হিমালয়ের উপদেশে গৌরী শিবের পূজা করে। পরে নারদের মধ্যস্থতায় হরগৌরীর মিলন হয়। একদিন দুর্গা তথা গৌরী নিজের শরীরের ময়লা দিয়ে একটি পুতুল নির্মাণ করে। সেই পুতুলে শিব জীবন দান করে। সেই পুতুলই হল—হরগৌরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেশ।

গণেশের সৃষ্টির কথা চারিদিকে প্রচারিত হলে দেবতারা সকলে মিলে গণেশকে দেখতে আসে। দেবতাদের মধ্যে শনিও ছিল। শনি গণেশকে দেখা মাত্র গণেশের মাথা ছিঁড়ে শূন্যে উড়ে যায়। শিবের পরামর্শে চণ্ড উত্তর দিকে যাত্রা করে। উত্তর দিকে দেবরাজ ইন্দ্রের হাতি শুয়ে ছিল। সেই হস্তির মুণ্ডচ্ছেদ করে কাটা মুণ্ড এনে চণ্ড শিবকে দেয়। শিব মন্ত্র জপ করে গণেশের ঘাড়ে সেই কাটা মুণ্ড জোড়া লাগিয়ে দেয়। ধড়ে মুণ্ড জোড়া লাগলে গণেশ উঠে বসে। গণেশের মাথার মধ্যে শুড় দেখে মাতা দুর্গা ক্রন্দন করতে শুরু করে। দুর্গার ক্রন্দন দেখে শিব দুর্গাকে প্রবোধ দান করে গণেশকে দেবতাদের রাজা বলে ঘোষণা করে। এরপর গণেশের মুসিকের পৃষ্ঠে চড়ে ঘুরে বেড়ানোর কথা রয়েছে।

এরপর রয়েছে কার্তিকের জন্মের কথা। কার্তিকের জন্ম কাহিনির বিবরণ মানিক দত্ত অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। রতিরঙ্গ কৌতুহলে শিবের বীর্য টলে পড়লে দুর্গা তাকে নিজের উদরে ধারণ করে। কিন্তু মাত্র তিন চার মাসের বেশি দুর্গা নিজের উদরে কার্তিককে ধারণ করতে না পেরে অগ্নিতে ফেলে দেয়। অগ্নিও তিন চার মাসের বেশি কার্তিককে ধরে রাখতে পারে না। গঙ্গায় ফেলে দেয়। গঙ্গাও তিন চার মাসের অধিক কার্তিককে সহ্য করতে না পেরে বনে গিয়ে রেখে আসে। বনের মধ্যে ছয় মুণ্ড বিশিষ্ট কার্তিকের জন্ম হয়। চন্দ্রের ছয় স্ত্রী কার্তিককে পালন করে দুর্গার কাছে রেখে আসে। দুর্গা আনন্দিত হয়ে কার্তিকের ছয় মুখে স্তনপান করিয়ে কার্তিকের নামকরণ করে। এইভাবেই কার্তিকের জন্ম হয়। সর্বদা ময়ূরের পৃষ্ঠে চড়ে কার্তিক ঘুরে বেড়ায়। এইভাবেই কার্তিকের বলবান হয়ে ওঠার কথা

বলেছেন মানিক দত্ত। বিষ্ণুর কর্ণমূল থেকে মধুকৈটভ অসুরের জন্মের কথা রয়েছে। ক্রমে অসুরের সংখ্যা দ্বিগুণ হলে ভয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকুণ্ডে লুকিয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে বিষ্ণু স্বয়ং অসুরদের সঙ্গো যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু যুদ্ধে অসুরদের বিনাশ করে পারে না। শেষে দেবতাদের অনুরোধে দুর্গা অসুরদের বধ করতে রাজি হয়। অসুরদের সঙ্গো যুদ্ধ করতে করতে দুর্গার শরীর ঘেমে যায়। দুর্গা নিজের ঘাম মুছে ভূমিতে ফেলে। দুর্গার এই ঘাম থেকে কালীর জন্ম হয়। কালী তখন চামুণ্ডা রূপ ধারণ করে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করে। শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরকে কেটে তাঁর মাংস ভক্ষণ করে। দিগম্বরী বেশে কালী যুদ্ধ করে অসুরগণকে সংহার করে। কালীর পরাক্রমে সৃষ্টি বিনাশ হয় দেখে শিব স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে এসে কালীর ক্রোধ শান্ত করে—

> পদভরে পৃথিবী কাপিছে টলমল।।/ভদ্রকালীর রণ দেখে দেবগণ ভাবে।/ব্রহ্মা বলে এতদিনে সৃষ্টি নাশ হবে।।/সৃষ্টি রক্ষার তরে শিব রণতে আইল।/দুর্গা হইয়া শিব রণতে শুইল।।/ হুহুঙ্কার ছাড়ি ক্রোধে দিঞা করতালি।/অসুর বুলিঞা শিবের বুকে চড়িলেন কালী।/পদ তলে শিবকে দেখি লজ্জা বড় পাল্য।/দন্তে জিহ্বা ধরি কালী ক্রোধ নিবারিল।।[৯]

এরপর পদ্মার পরামর্শে স্বর্গ-মর্ত্যে দেবীর পূজা প্রচারের কথা রয়েছে।

মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সৃষ্টিপালা দিয়ে কাহিনি শুরু করেছেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও মহাদেব বন্দনায় 'নিরঞ্জন নিরাকার' (বঙ্গাবাসী সংস্করণ) বলে উল্লেখ করেছেন। দিগবন্দনায়—"আদিদেব বন্দিব ঠাকুর নিরঞ্জন" বলে বন্দনা করেছেন। দ্বিজ মাধবও মঙ্গালচণ্ডীর গানে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়াও অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিরাও তাঁদের কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গালের আদি কবি হিসেবে যেমন মানিক দত্ত পরিচিতি লাভ করেছে তেমনি শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় কবির মর্যাদালাভ করেছেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দেবদেবীর বন্দনা অংশ দিয়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি শুরু করেছেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর সৃষ্টি প্রকরণে আদি দেবতা ধর্ম নিরঞ্জনের নামমাত্র উল্লেখ আছে। এই উল্লেখ আসলে পুরাণ ও সাংখ্যদর্শনের প্রভাবের ফল। কিন্তু মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল, শূন্যপুরাণ, ধর্মমঙ্গাল ও বৌদ্ধশাস্ত্র প্রভাবিত। রজনীকান্ত চক্রবর্তী, মানিক দত্ত ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> মানিকদত্ত মুকুন্দরাম অপেক্ষা প্রাচীন। মানিকদত্তের রচনা অপেক্ষা মুকুন্দরামের রচনা ও ভাব উৎকৃষ্ট। বরদর্শনে কামিনীগণের পতিনিন্দা, বিশ্বকর্মা কর্তৃক ভগবতীর কাঁচলি নির্মাণ, বারমাস্যা ও চৌত্রিশা রচনায় মুকুন্দরামের অধিকতর দক্ষতা দেখা যায়। মানিকদত্তের পদ্য, পদ্যের গন্ধযুক্ত গদ্য-রচনামাত্র। মুকুন্দরামের পৌরাণিক বর্ণনা, হিন্দু পুরাণের অনুযায়িনী; কিন্তু মানিকদত্তের পুরাণ অতি অদ্ভুত। উহাতে বর্ণিত আছে; ধর্ম হইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদির উদ্ভব হয়। শূন্যবাদেরও উল্লেখ আছে স্পষ্টই বোধ হয়, মানিকদত্তের পুস্তকের পৌরাণিক অংশ কোন বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে গৃহীত।[১০]

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে দেবী চণ্ডী হিমালয়ের গৃহে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। হিমালয়ের কন্যারূপে প্রতিপালিত। কিন্তু মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে দেবী চণ্ডী হরিব্রাহ্মণের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছে। হিমালয় গৌরীর পালক পিতা। এখানে হরিব্রাহ্মণ

একজন ব্যক্তিসাধারণ মাত্র। কোনো পৌরাণিক কাহিনি জাত বা কোনো পৌরাণিক চরিত্র নয়। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পর্যালোচনা করলে এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। মানিক দত্ত তাঁর কাব্যে অনেক স্থলেই পুরাণ কাহিনিকে অনুসরণ না করে লৌকিক কাহিনিকে অবলম্বন করে পুরাণকে নবরূপ দানের প্রয়াস করেছেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মেনকার সঙ্গে গৌরীর কলহ, গৌরীর কলঙ্ক, হরগৌরীর কলহ, শঙ্করের ভিক্ষা, গৌরীর খেদ ইত্যাদি বর্ণনা করে 'পদ্মার উপদেশ' অংশে তাঁর কাব্যের পরিকল্পনা পাঠককে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে ঘটস্থাপন করে গান আরম্ভের প্রার্থনাংশটি সংক্ষেপে আলোচিত হতে দেখা যায়। মানিক দত্তের কাব্যে দেখা যায় চণ্ডীপূজা প্রচলিত হবার পূর্ব থেকেই এদেশে মনসা-পূজা প্রচলিত ছিল। তাই দেবী চণ্ডী মনসার কাছে নিজের পূজা প্রচারের জন্য পরামর্শ চেয়েছে। এই ঐতিহাসিক প্রসঙ্গটি এখানে বর্তমান। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যে বিষয়টি অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে চণ্ডী দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে নিজের ভাগ্যের কথা পদ্মাকে বলেছে। পদ্মা ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করে চণ্ডীকে মর্ত্যে পূজা পাবার জন্য চেষ্টা করতে বলেছে।

মানিক দত্ত তাঁর কাব্যে মর্ত্যে দেবীর পূজা প্রচারের জন্য ধুম্রাসুরের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ ঘটিয়েছেন। এরপর কলিঙ্গারাজ কর্তৃক দেবীর পূজা প্রচার করিয়েছেন। এখানে পদ্মার উপদেশে মানিক দত্তকে আশ্রয় করে গীতপুথির মাধ্যমে চণ্ডী নিজের মাহাত্ম্য প্রচারে তৎপর হয়েছে। ঘটনা পরম্পরার এই যে কৌশল মানিক দত্ত অবলম্বন করেছেন এতে তাঁর নব্যপুরাণ সৃষ্টির চাতুরী ধরা পড়েছে। এখানে দেবী মাহাত্ম্য ও পুথি মাহাত্ম্য একই সাথে প্রকাশ পেয়েছে। পুথি রচনা করে মানিক দত্তের গান প্রচারের জন্য কলিঙ্গা যাত্রা, কলিঙ্গারাজ কর্তৃক বন্ধন, দেবী চণ্ডীর প্রভাবে মুক্তিলাভ এবং কলিঙ্গা রাজ্যের দেহরায় সম্প্রদা সহিত গান সমাপন বর্ণিত হয়েছে। এরপর কলিঙ্গারাজের অনুরোধে দেবীর দশভূজা এবং ত্রিনয়নের ব্যাখ্যা দান করেছেন। এছাড়াও আছে চণ্ডীর পশু সৃজন এবং শিবের বীজুবন সৃষ্টির কাহিনি। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যে এই সমস্ত বর্ণনা পাওয়া যায় না। মুকুন্দরামে আছে—

বিজুবন নিকটে ছিল যত পশুগণ।
পথে যাইতে চণ্ডীর পাইল দরশন।।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে সৃষ্টিকথা অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশটিই মানিক দত্তকে চণ্ডীমঙ্গালের অন্যান্য কবিদের থেকে স্বতন্ত্র কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে সহায়তা করেছে। অষ্টমঙ্গালা গানে মোট ষোলোটি পালা থাকে। যা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যেও রয়েছে। অষ্টমঙ্গালার প্রথম পালা অর্থাৎ প্রথম মঙ্গালবারের রাত্রির পালা যে পালা দিয়ে অষ্টমঙ্গালার শুভারম্ভ হয় সেখানে দেব-দেবীদের বন্দনার কথা প্রাধান্য পেতে দেখা যায়। কিন্তু মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে দেব-দেবীদের বন্দনাংশ দিয়ে কাহিনির সূত্রপাত করেননি। তিনি সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে কাহিনি আরম্ভ করেছেন। সৃষ্টিকথার মধ্যে দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে মূল কাহিনি বা বিষয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। বন্দনাংশ বলে আলাদা কোনো অংশের অবতারণা করেননি। কাহিনি অংশে দেব-দেবীদের কথা বলার সময়ই তিনি দেবমহিমা কীর্তন করেছেন। তাঁর এই নব নির্মাণকৌশল তাকে বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাসে স্বতন্ত্র কবি হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছে।

উৎসের সন্ধানে

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (দ্বিতীয় খণ্ড : চৈতন্যযুগ), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ. ১৪৩
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ. ৩৮৬
৩. সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত : 'মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গাল', উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, লিপিকা প্রেস, শিলিগুড়ি, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১
৪. তদেব : পৃ. ২
৫. তদেব : পৃ. ২
৬. তদেব : পৃ. ৩
৭. তদেব, পৃ. ৫
৮. তদেব : পৃ. ৬
৯. তদেব : পৃ. ২৩
১০. রজনীকান্ত চক্রবর্তী : 'মাণিক দত্তের মঙ্গালচণ্ডী', সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক, একাদশ ভাগ), সম্পাদক : বসু, নগেন্দ্রনাথ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ্যৎ, ১৩৭, কলকাতা, ১৩১১, পৃ. ৩৫

সহায়ক গ্রন্থ

১. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : 'মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য', পুস্তক বিপণি,কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪ নভেম্বর, ১৯৯৮
২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (দ্বিতীয় খণ্ড : চৈতন্যযুগ), মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০
৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' (প্রথম খণ্ড : আদি ও মধ্যযুগ), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, পরিবর্ধিত নব সংস্করণ, ১৯৯৯
৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস', এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০০
৫. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষ্টম মুদ্রণ : নভেম্বর ২০০৭।

পত্রিকা

১. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক, একাদশ ভাগ), সম্পাদক : বসু, নগেন্দ্রনাথ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ্যৎ, ১৩৭।১ কর্ণওয়ালিসস্ট্রীট, কলকাতা, ১৩১১
২. সাহিত্য-পরিষ্যৎ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক), সম্পাদক : বসু, নগেন্দ্রনাথ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষ্যৎ, কলিকাতা, ১৭ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৭
৩. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, পত্রিকাধ্যক্ষ : চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৪৫

মঙ্গলকাব্যের সপ্তডিঙার পালে ভ্রমণকথার রসাভাস

চন্দনা চক্রবর্তী

পথিকবৃত্তি মানুষের মনে সহজাতভাবেই প্রচ্ছন্ন। কারণ মানুষ মাত্রেই মনে কম-বেশি 'Spirit of Advernture' থাকে। সেই মনোবৃত্তির টানেই মানুষ প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সৌন্দর্যের টানে, কৌতূহল মনোবৃত্তির জন্য ভ্রমণ করে। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন তাকে ভৌগোলিক, সামাজিক জীবনবৃত্তের বাইরে ঠেলে দিয়েছে। ভ্রমণ যেই উদ্দেশ্যেই হোক—সেই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা যখন লিখে যান, তখন তার মধ্যে সামাজিক, রাষ্ট্রিক-আর্থিক প্রেক্ষিত উঠে আসে। সেই সকল অভিজ্ঞতা নিছক ভ্রমণ অভিজ্ঞতার বিবরণী না থেকে হয়ে যায় একটা সময়ের দলিল। ভ্রমণকাহিনি কালোত্তীর্ণ হয় তথ্য বা তত্ত্বের জন্য নয়, রূপ ও রসের জন্য, তার মধ্যে সুপ্ত প্রাণশক্তির জন্য।

ভ্রমণ অভিজ্ঞতালব্ধ বিচিত্র আলিম্পন মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্য ভাণ্ডার মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেও পাওয়া গিয়েছে। ভ্রমণসাহিত্য স্বতন্ত্র শাখা রূপে আত্মপ্রকাশের পূর্বে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকথা সেভাবে দানা বেঁধে ওঠেনি সেকথা সত্য, কিন্তু অনুসন্ধিৎসু পাঠক মঙ্গলকাব্যগুলির পাতায় এমন অনেক রসাভাস খুঁজে পান যার মধ্যে ভ্রমণপিপাসু সাহিত্যিকের মনন উদ্ভাসিত হয়েছে—

> বাঙ্গালি এই জল প্লাবিত শস্য শ্যামলা প্রদেশে খড়ের ঘরে কোনোরূপ দীর্ঘ জীবনটা কাটাইয়া দেয়, উত্তরে হিমাদ্রি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিন্ধ্য, নিকটবর্তী প্রকৃতির এই মহান আলেখ্য বাঙ্গালিকে মাতৃভূমির ক্রোড় হইতে বড়ো ভুলাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। গৃহস্থ বাঙ্গালী ভ্রমণকার্যে নিতান্ত অপারগ ছিল তাই প্রাচীন সাহিত্যে ভেরান্দার থাম ও জবা পুষ্প অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক চিত্রের অঙ্কন প্রায়ই দৃষ্টই হয় না।[১]

দীনেশচন্দ্র সেনের এই উক্তির বহু পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধে' আর্যবংশোদ্ভূত জাতির অলস, বীর্যহীন, কোমলতাময় হয়ে ওঠার কারণ দর্শিয়েছেন—

> ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া ছিলেন যে তথাকার জলবায়ুর গুণে তাহাদের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জল বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্না এবং উর্বরা এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্য তেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্য প্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবর্তিনী এবং গৃহসুখভিলাষিনী হইতে লাগিল।[২]

(বিদ্যাপতি ও জয়দেব) অথচ সেই বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয় অনুধ্যান করলে দেখা যাবে, সেখানে সদাগর দীর্ঘদিনের জন্য বাণিজ্য যাত্রা করে, বিদেশে গিয়ে বন্দি হলেও অহং অবদমন করে না। ধনপতি, চাঁদ সদাগর, কর্ণসেন বা লাউসেনদের কাহিনিতে দৈবীমাহাত্ম্য প্রচার মুখ্য বিষয় হলেও এদের উজ্জ্বল পৌরুষকার ও বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি কিন্তু কোনোভাবেই গুরুত্ব হারায় না। যাইহোক, বঙ্কিমচন্দ্র বা দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তিকে স্মরণে রেখে মঙ্গালকাব্যের বিপুলা সিন্ধু সেঁচে ভ্রমণ আলেখ্যের বেশ কিছু মণি-মুক্তো পাওয়া গেছে। জাতির আত্মচেতনার ভিত্তিমূল বরাবর প্রাচীন সাহিত্যে প্রোথিত থাকে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সনাতন স্বরূপটি আমাদের প্রাচীন সাহিত্য থেকেই আয়ত্ত করতে হয়। বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের ক্ষেত্রেও জয়যাত্রা উনিশ শতকে শুরু হলেও তার বীজমূল নিহিত প্রাগাধুনিক সাহিত্যের আঙিনায়।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত যে 'সাম্প্রদায়িক সাহিত্য' (আশুতোষ ভট্টাচার্য বক্তব্য অনুযায়ী) প্রচলিত ছিল—তাই মঙ্গালকাব্য। লৌকিক সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি একদেহে লীন হয়ে যে রূপ পরিগ্রহ করে তাই মঙ্গালকাব্য। রাষ্ট্র পোষিত মুসলমান শাসনে বঙ্গাদেশের হিন্দুদের ভীতি, অসহায়তার থেকে মঙ্গালকাব্য কিছুটা সান্ত্বনা দান করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য অনুযায়ী—"দুঃখ ক্লেশকে ভাঙ্গাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ কিছু সান্ত্বনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না।"[৩] বাংলার বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী থেকে উদ্ভূত সকল লৌকিক দেবতা মূলত স্ত্রী সমাজের বা নিম্নবর্গীয় সমাজে পূজিত হলেও যথাক্রমে পুরুষ দ্বারা পূজা আদায় বা উচ্চসমাজে আপন আসন প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু ধর্মের সমুচ্চ মন্দিরে সমাদর লাভ করে।

ষোড়শ শতক থেকে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত হয়ে মঙ্গালকাব্য একটি বিশিষ্ট সাহিত্য রচনার আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই—"বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী মঙ্গাল কাব্যগুলির একটা বিশেষ স্বতন্ত্র মূল্য আছে।"[৪] বলে মনে করেন আশুতোষ ভট্টাচার্য। বঙ্গাদেশে বৈষ্ণব সাহিত্য প্রতিষ্ঠার আগে থেকে বহুকাল পর পর্যন্ত মঙ্গালকাব্য ছিল কবিপ্রতিভার বিকাশের একমাত্র ক্ষেত্র। সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ পরিসর থেকে মুক্ত হয়ে সাহিত্যাকাশে মঙ্গালকাব্যগুলি যখন স্বাধীন বিচরণের সুযোগ লাভ করে, তখন বিচিত্রমুখী চিন্তাধারার স্ফুরণ ঘটতে থাকে। অধ্যাপক মোহনলাল মিত্রের বক্তব্য অনুযায়ী—

> মঙ্গাল আখ্যায়িকা কাব্যের অংশরূপে ভ্রমণবৃত্তান্তের সংযোজন আমাদের এইটুকু উপকার করেছে যে আমরা জানতে পারি পূর্বকালে বাঙ্গালীরা কম সে কম ১৪টি ডিঙা সাজিয়ে বানিজ্যের জন্য সমুদ্রে যেত এবং প্রতিটি ডিঙার মধুমাখা গালভরা নাম ছিল; যথা'মধুকর', 'আগল-পাগল', 'মাণিক্য মেড়য়া', 'খরসান' ইত্যাদি।[৫]

বাংলার নিজস্ব মঙ্গালকাব্যগুলির চরিত্র ধনপতি বা চাঁদ সওদাগরের কাহিনি বাঙালির অলস, বীর্যহীন স্বভাবের বিপরীত গাথা গায়। তাদের ভ্রমণের বর্ণনায় প্রাগাধুনিকযুগের কবিমনের ভ্রমণপিপাসু মননকেই উসকে দেয়। মনসামঙ্গাল কাব্য বা পদ্মাপুরাণ বাংলা, আসাম ও বিহারের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার কথা ও

কাহিনি এই অঞ্চলে তো বটেই, সারা ভারতবর্ষেই প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—

> চাঁদসদাগরের কাহিনির স্থান, নদনদী, গ্রাম জনপদের নাম, ভাগলপুর হইতে আরম্ভ করিয়া গোটা বাংলাদেশ ও আসামে এমনভাবে ছড়াইয়া আছে যে একদা ইহার কোন একটা বাস্তব লৌকিক ও ঐতিহাসিক অস্তিত্ব থাকিলেও এখন আর তাহার চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না।[৬]

চাঁদ সদাগরের কাহিনি যেমন বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, তেমনই বৈচিত্র্যময় চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনা। বরিশাল থেকে মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' ১৩০৩ সনে প্রকাশিত হয়। তাঁর পদ্মাপুরাণে চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রা, বদলবাণিজ্য, বেহুলার স্বামীসহ গারুড়ীর সন্ধানে যাত্রার বর্ণনার মধ্যে ভ্রমণের ইঙ্গিত মেলে। গোদারঘাট থেকে আপু ডোমের ঘাট, সেখান থেকে ধোনামোনার ঘাট, টেটনের ঘাট পৌঁছানো এবং প্রতি ঘাটের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ভ্রাম্যমান পথিকের বিবরণীকেই মনে করায়—

ভাসিতে ভাসিতে ভুরা গেল নন্দীপুরা।
আপুয়া ডোমের ঘাটে ঠেকে গিয়া ভুরা।।
বসিয়াছে আপু ডোম টুঙ্গি ঘরখানে।
ভুরখান দেখি বেটা মনে অনুমানে।।[৭]

চাঁদ সদাগর যখন সপ্ততরী ডিঙা নিয়ে সমুদ্রপথে যাত্রা করেন, তখন এক হিন্দু সওদাগরের অকুতোভয় মানসিকতা প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞ বাঙালি বেনে অসম সাহসিকতায় মালিমকে (প্রধান নাবিক) নির্দেশিকা দিয়ে যান—

গহন সমুদ্রে যাইয়া পাই সদাগর।
সমুদ্রের ঢেউ লাগে দেখি লাগে ডর।।
চান্দ বলে ভাইসব না কর বিষাদ।
সাহস করিয়া আজি তরিব প্রমাদ।।[৮]

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাদুরিয়া অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত আর একটি 'মনসামঙ্গল'-এর পুথি যেটি বিপ্রদাস পিপিলাই-এর রচিত, সেটি ১৪৯৫ সাল অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকের হলেও চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বিবরণ অতি বিস্তারিত এবং বাস্তবঘেঁষা। আমাদের তৎকালীন বঙ্গের নদীপথের যাত্রাকালীন বর্ণনা, তথ্যাদি, স্থানাদির বিবরণ—প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গবেষক পাঠকের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার ছবিতে ধর্মখাল নদী, অজয়, শিবানদী, সাড়াই প্রভৃতি নদীর নাম পাওয়া গেছে। উজানী, কাটোয়া, ইন্দ্রঘাট, ইন্দ্রানি, নদীয়া, আঁবুয়া, ফুলিয়া, হাতিকান্দা, মির্জাপুর, কুমারহট্ট, বেরো, মূলাজোড়, শ্রীপাট প্রভৃতি প্রাচীন নগরীর নাম পাওয়া যায়। এই সব নদনদী বা স্থানের আজ হয়তো কোনো অস্তিত্ব নেই, কিন্তু এককালে ছিল, নদী পথে এই স্থানাদি হয়তো পেরোতে হত। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, বিপ্রদাসের কাব্যে এই প্রাচীন নগরীগুলির পাশাপাশি বেশ কিছু অঞ্চলের আধুনিক নাম পাওয়া গেছে। যেমন—পাইকপাড়া, হুগলি, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, কামারহাটি ইত্যাদি। পঞ্চদশ শতকের কোনো পুথিতে এই আধুনিক নগরের নাম পাওয়া অসম্ভব। যাইহোক, এই আধুনিকতার দায় বিপ্রদাসের কাব্য খণ্ডের নয় বলে মনে করছেন অচিন্ত্য বিশ্বাস। যাত্রাপথে

চাঁদ সদাগর বেশ কিছু তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছেন, পুজো দিয়েছেন। যেমন কাটোয়ার নিকটবর্তী ইন্দ্রঘাটে গেছেন, ইন্দ্র পুজো করেছেন, দিগঙ্গাতে নিমগাছে জবাফুল ফুটতে দেখেছেন, চিৎপুরে সর্বমঙ্গালার পুজো করেছেন, কালিঘাটেও উত্তরণ করে কালিকা পুজো করেছেন—

> মূলাজোড় গাড়ুলিয়া বাহিল সত্বর।/পশ্চিমে পাইকপাড়া বাহে ভদ্রেশ্বর।।/চাপদানি ডাহিনে বামেতে ইছাপুর।/বাহ বাহ বলি রাজা ডাকিছে প্রচুর।।/বামে বাঁকি রাজার বাহিয়া যায় রঙ্গো।/চাপাদানি বাহিয়া রাজা প্রবেশে দিগঙ্গো।।[৯]

যাত্রাকালের বর্ণনার মধ্যে আনুপূর্বিক স্থানিক বর্ণনার ছবি পাওয়া যায়। তীর্থ করে ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি নগরে চাঁদ ভ্রমণ করেন। নতুন নগর, সেখানকার মানুষজন, জীবনযাত্রা লক্ষ করেন পর্যটকের বিস্ময়তার দৃষ্টিতেই—

> তীর্থকার্য সমাপিয়া অন্তরে হরিষ হয়্যা
> উঠে রাজা ভ্রমিতে নগর।।[১০]

বিপ্রদাসের কাব্যে শুধু চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা নয়, চাঁদ সদাগরের সিংহল রাজের থেকে মুক্ত হয়ে নদীর ধার ধরে পদব্রজে ফেরার অভিজ্ঞতা, বিবাহ উপলক্ষ্যে লখিন্দরের বরযাত্রা, বেহুলার ভাসানযাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে স্থানিক বিবরণের পাশাপাশি ভ্রমণকথার আভাস পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগরের বিস্ময় ভরা পর্যটকের দৃষ্টিতে গ্রাম-বাংলাকে আবিষ্কার করা পঞ্চদশ শতকের মঙ্গালকাব্যের মধ্যে এক আশ্চর্য নিদর্শন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসানগান সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। রাঢ়ের কবি ক্ষেমানন্দের কাব্যে নজরে পড়ে 'বেহুলার যাত্রাপথ' বর্ণনার অংশটি। যে যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়েছেন, কবি তাতে আধুনিককালে নদী পথে যাত্রার ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

> এদিন বেহুলা ভাসে দুবরাজপুর।/নবখণ্ড এড়াইয়া গেল বহুদূর।।/প্রাণহীন পতি তার কোলে লখিন্দর।/ভাসিয়া ভাসিয়া পাইল বাঁকা দামোদর।।/ওঝাটি গোবিন্দপুর বর্ধমান ভাসি।/আলো গঙ্গাপুরে বেহুলা উত্তরিল আসি।।[১১]

মোটকথা বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই থেকে শুরু করে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গালকাব্য ধারার বিভিন্ন কবির কলমে বাণিজ্যযাত্রা, তীর্থ ভ্রমণ, ভাসান যাত্রার বর্ণনার মধ্য দিয়ে যাত্রাপথের বর্ণনা, নতুন নতুন জায়গা দেখে বিস্ময় প্রকাশ, ধারাবাহিক ভ্রমণের বিবরণ আমাদের মঙ্গাল গাথার মাঝেই ভ্রাম্যমান কবিমনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। এই যাত্রাপথের বিবরণ মনসামঙ্গালের মূল কাহিনির মাঝে একেবারেই সংক্ষিপ্ত স্থান নিয়ে থাকে কিন্তু ভ্রমণবিলাসী কবিমনের ইঙ্গিত বহন করে।

এমনই প্রতিচ্ছবি চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যধারার অন্যতম কবি চণ্ডীদাসের 'অভয়ামঙ্গাল'-এও পাই। বিশেষ করে মনে পড়ে কবির 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশটি। দামুন্যা থেকে পালিয়ে যে যাত্রাপথ ধরে আরড়া ব্রাহ্মণ ভুমে এসে উপস্থিত হন সেই কবি। নির্দেশিত পথ বিবরণ এতো নিখুঁত ছিল যে পরবর্তীকালে গবেষক ক্ষুদিরাম দাস অনুসন্ধানে সেই সব পথ, সেই সকল গ্রামে গেলে কবির বর্ণনার সঙ্গো সম্পূর্ণ মিল পান। গ্রামে ডিহিদারদের রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা এবং কঠিন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সমস্যার সম্মুখীন হয়েই কবি দামুন্যা

ত্যাগ করেন সম্ভবত ১৫৯৬ সাল নাগাদ। প্রথমে ভালিয়া তারপর মুড়াই নদীতে গিয়ে নৌকায় উজান পথে এসে দ্বারকেশ্বরে পৌছোন। দ্বারকেশ্বরের পূর্বতীরে অবস্থিত তেউট্রা গ্রামে আসেন। সেখান থেকে আরড়া গ্রাম। এখানকার জমিদার বাঁকুড়া রায়ের কাছে আশ্রয় প্রাপ্তির ইতিহাস সকলেরই জানা। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় কবির যাত্রাপথের অনুপুঙ্খ বিবরণ এই অংশকে আরও মনোগ্রাহী করে তুলেছে।

চণ্ডীমঙ্গালের 'বণিক খণ্ডে' ধনপতির সিংহলযাত্রা অংশ যেমন মনসামঙ্গালের কাব্যে দেখা গিয়েছিল তেমনভাবে বাংলার নদীপথ, নদী তীরস্থ নগর, সেখানে উত্তরণ করে নতুন নগর দেখে বিস্ময় বিহ্বল সদাগরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভ্রমণ পিপাসু পাঠককে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাংলার নদীপথের এক বিস্তারিত বিবরণ যেমন পাওয়া যায়, তেমন বঙ্গাদেশীয় বেনের নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব গৃহসুখ ছেড়ে সুদূর পথে পাড়ি দেওয়ার অভিলাষ যেমন চাঁদ সদাগরের কাহিনিতে ছিল, তেমনি ধনপতি সদাগরের কাহিনিতেও পাওয়া যায়—

> পাড়পুর সমুদ্র গড়ি বাহিল মেলান।/মীর্জাপুর ঘাটে ডিঙা করিল চাপান।।/নায়ের পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক।/ডাহিনে রহিল পুরী আস্থুয়া মুলুক।/বাহ বাহ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।/শান্তিপুর বামেতে দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া।।[১২]

ধনপতি, চাঁদ সদাগর, লাউসেন, ভবানন্দ মজুমদারেরা মধ্যযুগের বাঙালির একান্ত আপনার সাহিত্যের চরিত্র হলেও গৃহসুখাভিমুখী বাঙালি চরিত্রের থেকে আলাদা হয়ে নতুন মাইলফলক তৈরি করেছে। তাদের বীরত্ব, অহং, পৌরুষ, হার না মানা মনোবল, পরিব্রাজকের জীবন এক নতুন দিক্‌নির্দেশ করে। মধ্যযুগের দেবমাহাত্ম্য কীর্তনের মাঝে কিছুটা আবছা হয়ে এলেও মনসা-চণ্ডীর পাশাপাশি চাঁদ সদাগর, লাউসেন বা ধনপতি সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাঢ় বঙ্গাভূমির জনজীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে ধর্মমঙ্গাল কাব্য। রাঢ় অঞ্চলের সাধারণ মানুষের পরিচয়, আচার-বিশ্বাস, সংস্কার যেমন নিপুণ তুলির টানে অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি কর্ণসেন, লাউসেনের বীরত্ব, দিগ্‌বিজয়ের কাহিনি অঙ্কিত হয়েছে। এই চরিত্রগুলি আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আলোকে নির্মিত। এই চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করেই নানা অ্যাডভেঞ্চারধর্মী ঘটনা, নতুন নতুন দেশ পাড়ি দেওয়া, যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনিতে ভরপুর ধর্মমঙ্গাল। তারই আবডালে কবির অপ্রযত্ন লালিত স্থানিক বিবরণ, যাত্রাকালীন বিবরণ ভ্রমণের রসাভাস দেয়। যেমন 'ঢেকুর পালায়' কর্ণসেনের শিকার যাত্রার বর্ণনায় যাত্রাকালীন যে বিবরণ পাই—

> সাজিয়া ঘোষের সঙ্গে চলে শতাধিক।।/রাখিল সহর গড় গৌড় থাকে দূর।/বড় গঙ্গা পার হল সম্মুখে সন্দিপুর।।/কত কব যত গ্রাম থাকে ডান বামে।/বীরভূমি উত্তরিল মোকামে মোকামে।।[১৩]

পিতা কর্ণসেনের মতো পুত্র লাউসেনও বীর। তার 'গৌড় যাত্রা'-র (পালা) বর্ণনায় দীর্ঘ ভ্রমণের বিবরণ পাওয়া যায়। তেমন কিছু অংশ তুলে ধরব—

> দ্বারকেশ্বর পার হয়ে পীরের চরণে।/সেলাম করিয়া প্রবেশিল উচালনে।।/রাখিয়া মগলমারী পশ্চাতে আমিলা।/সৈয়দ মোকামে আসি যেন উত্তরিলা।।/বরাকপুরের খাল পশ্চাতে রাখিয়া।/উত্তরে উলার গড়ে শ্রমযুক্ত হইয়া।।[১৪]

এইভাবে তৎকালীন নদীপথের বর্ণনা দিয়ে দীর্ঘ পদ রচনা হয়েছে ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গাল কাব্যে। একটা ভৌগোলিক চিত্র পরিষ্কার হয় পাঠকের চোখে, সেই সঙ্গো যাত্রাপথের দীর্ঘ বিবরণ দেওয়ার কল্পে আসলে কবির ভ্রমণপ্রবণ মনের অভিমুখ কাব্যের দর্পণে ভেসে ওঠে।

আরও কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়ে ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নপূর্ণা মঙ্গাল'-এর বিশেষ অন্তরঙ্গা পাঠে মানসিংহ ও ভবানন্দ মজুমদারের যশোর যাত্রা, দিল্লি যাত্রা, দেশ-বিদেশ বর্ণন অংশগুলিতে ভ্রমণের ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট। মানসিংহের সঙ্গো ভবানন্দ বিশেষ উদ্দেশ্যে দিল্লি যাত্রা করেছিলেন বটে, কিন্তু পথিমধ্যে বিভিন্ন তীর্থস্থানে ভ্রমণ ও পূজাদান করতে দেখা যায়। যেমন 'দেশ-বিদেশ বর্ণন' অংশে পাই নীলাচল ধামে যাত্রার কথা—

চল চল যাই নীলাচলে রে অরে ভাই
ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে।।
মহাপ্রভু জগন্নাথ, সুভদ্রা বলাই সাথ
দেখিব অক্ষয়বটতলে।...
দেখিয়া সে চাঁদমুখ পাইব কৈবল্য সুখ,
সুধন্যা ভারত ভূমণ্ডলে।।[১৫]

তীর্থস্থান ভ্রমণ সেই সময় অন্যতম আকর্ষণ ছিল যাত্রী সকলের মনে। পূর্বের মঙ্গালকাব্যেও যেমন এর ইঙ্গিত মিলেছিল, 'অন্নপূর্ণা মঙ্গাল'-এ ভারতচন্দ্র তার অন্যথা করেননি। বর্ধমান থেকে দামোদর নদী ধরে মেদিনীপুর পৌঁছান তাঁরা। চাঁদ বেনে এবং ধনপতি এই পথেই এসেছিলেন, তা উল্লেখ করতে ভোলেননি ভারতচন্দ্র, এ যেন একই পদাঙ্ক অনুসরণ। মুকুন্দ চক্রবর্তী বা বিপ্রদাস পিপলাইরা যেমন যাত্রাকালীন পথের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন, ভারতচন্দ্রের 'অন্নপূর্ণা মঙ্গাল'-এ তেমন বিবরণ আছে। এছাড়া কিছু আধুনিক স্থানের নাম যেমননারায়ণগড়, দাঁতন, জলেশ্বর ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। কটক, ভুবনেশ্বর, বালেশ্বর পেরিয়ে তাঁরা নীলাচলে পৌঁছান। দিন দশেক সেখানে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে মানসিংহ ও ভবানন্দ দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন—

দিন দশ বার তথা করিয়া বিশ্রাম।
দেখিল সকল স্থান কত কত নাম।।[১৬]

আবার দিল্লিতে দীর্ঘ যাত্রাকালীন পথের বর্ণনাও রয়েছে—

> কৃষ্ণা আদি নদী নদ কাঞ্চী আদি দেশ।/এড়াইয়া কৌতুক দেখিয়া সবিশেষ।।/মারহট্ট বরগির দেশ এড়াইয়া।/কত গিরি বন নদ নদী ছাড়াইয়া।।/কতদূরে রহিল মথুরা বৃন্দাবন।/নানা স্থানে নানা দেব করিয়া দরশন।।[১৭]

এই সকল দীর্ঘ বর্ণনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট দেশ দেখার বাসনা, ভ্রমণের আনন্দ ভবানন্দ এবং মানসিংহের ঘটেছিল। নিছক ভ্রমণের যে আনন্দ, নতুন স্থান দর্শন আকাঙ্ক্ষায় কৌতূহলী দৃষ্টি এক অভিনব বহির্জগতের দ্বার উন্মোচন করে। সেখান থেকে আনন্দলাভ করাই ভ্রমণকারীর উপজীব্য।

কবি ভারতচন্দ্রের প্রয়াণকাল (১৭৬০ খ্রি.)-কেই মধ্যযুগের অবসান কাল বলা হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনের হাত ধরে বাংলা গদ্যের উন্মেষ কালের সূচনা হওয়ার

আগেই বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য পাঠক দু'টি কাব্যাকারে লেখা পূর্ণ রূপে ভ্রমণ কথা হিসেবে চিহ্নিত রচনা পেয়ে যায়। একটি হল বিজয়রাম সেনের লেখা 'তীর্থমঙ্গাল' (১৭৭০ খ্রি.) এবং দ্বিতীয়টি হল জয়নারায়ণ ঘোষালের লেখা 'কাশী পরিক্রমা' (১৩১৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়)। ভূ কৈলাশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের শুভদৃষ্টিতে পড়েছিলেন বিজয়রাম। 'দীন যথা যায় রাজেন্দ্র সঙ্গামে দূর তীর্থবাসে'- সেই ভাবেই 'তীর্থমঙ্গাল'-এর কবি বিজয়রাম কৃষ্ণচন্দ্রের অনুবর্তী হয়েছিলেন। বিজয়রাম তাঁর সম্পূর্ণ কাব্য জুড়ে তীর্থ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবন্ধ করেছেন। গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বিন্ধ্যগিরি বিভিন্ন স্থান কেবল ভ্রমণের আনন্দ লাভের জন্যই ভ্রমণ করেন।

এই কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষাল বৃদ্ধ বয়সে কাশীধামে যাত্রা করেন। সেই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখেন 'কাশী পরিক্রমা'। দীনেশচন্দ্র সেন এই গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখেছেন—

> রাজা বাহাদুরের লিপি কৌশল তাঁহার সত্যপ্রিয়তা। তৎকালীন কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহা একশত বৎসরের যবনিকা তুলিয়া অবিকল কাশীর মূর্তিটি আমাদের চক্ষে অঙ্কিত করিয়া দিতেছে।[১৮]

তাহলে এই দুটি গ্রন্থের পাঠের মাধ্যমে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গদ্য সাহিত্যের পথ চলা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই কাব্যাকারে ভ্রমণসাহিত্যের পথ চলা শুরু। আর প্রদীপ জ্বালার আগে সলতে পাকানোর কাজটি হতে থাকে মঙ্গালকাব্য রচনাকালেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যদিও বলেছিলেন মঙ্গালকাব্য মানুষকে ভীতির কারাগারের মধ্যে কিছু সান্ত্বনা এনে দিতে পেরেছিল মাত্র, প্রাসাদ গড়ে দিতে পারেনি। মানুষের জয়গান ব্যতিরেকে বিশেষত যেখানে দৈবী মাহাত্ম্য প্রচারই প্রধান, সেখানে ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা রচিত হতে পারে, মানবতার জীবন দর্পণ প্রতিষ্ঠা পায় না। তথাপি একথা সত্যসাহিত্যে সমাজের প্রতিবিম্বন কোনো না কোনোভাবে হবেই। মঙ্গালকাব্যেও হয়েছে। আর তারই মধ্যে ভ্রমণপ্রিয় মানুষের তীর্থ ভ্রমণ, নতুন নতুন নগরে পদার্পণ করার আনন্দ ব্যক্ত হয়েছে। মঙ্গালকাব্যে ভ্রমণের যতটুকু আভাস পাওয়া গেছে, তারই স্পষ্ট প্রকাশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের কাব্যে বা বিজয়রামের 'তীর্থমঙ্গাল' বা জয়নারায়ণ ঘোষালের 'কাশী পরিক্রমা'-য় হয়েছে। আর উনিশ শতকে আরও সুসজ্জিত রূপ রসের ডালি নিয়ে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ভ্রমণসাহিত্যও গদ্যের পালকিতে মৃদু-মন্দ গতিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

উৎসের সন্ধানে

১. দীনেশচন্দ্র সেন : 'বঙ্গাভাষা ও সাহিত্য' (হেমচন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এ সংরক্ষিত গ্রন্থে প্রকাশ স্থানের নাম ও সাল পাওয়া যায়নি, প্রথম ভাগ, পৃ. ৩১২
২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'বিবিধ প্রবন্ধ' বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১
৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস' কলকাতা বুক হাউজ, কলকাতা, ১৩৪৬, পৃ. ১০

৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস' কলকাতা বুক হাউজ, কলকাতা, ১৩৪৬, পৃ. ১৪
৫. মোহনলাল মিত্র : 'ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র : ঈশ্বর গুপ্ত', নবভারতী, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ৪
৬. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (দ্বিতীয় খণ্ড) মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০০
৭. বিজয় গুপ্ত : 'পদ্মাপুরাণ' (সম্পাদিত শ্রী বসন্তকুমার ভট্টাচার্য) সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ২১৬
৮. তদেব : পৃ. ২২০
৯. অচিন্ত্য বিশ্বাস : 'বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসা মঙ্গল', রত্নাবলী, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০৯, পৃ. ১৩৫
১০. তদেব : পৃ. ১৩৪
১১. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : 'মনসা মঙ্গল' বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ ২০১৮, পৃ. ৬২
১২. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' ড. ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, জুলাই ২০১৯, পৃ. ২০০-২০১
১৩. ভবেশ মজুমদার : 'রাঢ়ের ধর্ম ঠাকুর ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গাল' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ৩২
১৪. তদেব : পৃ. ১০৯
১৫. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র : 'ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের গ্রন্থাবলী', 'অন্নপূর্ণা মঙ্গাল', দে ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪২৫-৪২৬
১৬. তদেব : পৃ. ৪২৭
১৮. তদেব : পৃ. ৪৩০
১৯. দীনেশচন্দ্র সেন : 'বঙ্গাভাষা ও সাহিত্য' (হেমচন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এ সংরক্ষিত গ্রন্থে প্রকাশ স্থানের নাম ও সাল পাওয়া যায়নি, প্রথম ভাগ, পৃ. ৩৪২

ত্রিদোষ তত্ত্ব ও হিউমোর‍্যাল থিয়োরির প্রেক্ষিতে গোসানী-মঙ্গাল

নীতীশ ঘোষ

উত্তরবঙ্গো বিশেষত কোচবিহার অঞ্চলে সাহিত্য সাধনার যে প্রবাহ শুরু হয়, তার প্রধান কেন্দ্র ছিল রাজদরবার। কিন্তু তার পাশাপাশি রাজ আনুকূল্য নিরপেক্ষ একটি সাহিত্যধারা গড়ে উঠতে থাকে। এই ধারার অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত 'গোসানী-মঙ্গাল' কাব্য। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশক ব্রজচন্দ্র মজুমদার বিজ্ঞাপনে 'গোসানী-মঙ্গাল'কে কোচবিহারের আদিকাব্য বলে দাবি করেছিলেন। গোসানী-নামধেয় লৌকিক দেবী চণ্ডীকে কেন্দ্র করে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে কাব্যখানি রচিত হয়। ঐতিহাসিক ও লৌকিক তথ্যে পরিপুষ্ট এই কাব্যখানি কোচবিহারের সাহিত্যসাধনার সোনালি ফসল। এই কাব্যের শিরায় শিরায় কোচবিহারের আঞ্চলিক মানুষের রীতি-নীতি ও ভাবচেতনার প্রাণস্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে। এই 'গোসানীমঙ্গাল' কাব্য থেকে আমরা তৎকালীন সমাজচিত্রের একটি পরিষ্কার রূপরেখা অঙ্কন করতে পারি। কাব্যে উল্লিখিত কোচবিহার অঞ্চলের তৎকালীন মানুষের স্বাস্থ্যভাবনা ও লোকচিকিৎসা পন্ধতিকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ত্রিদোষ তত্ত্ব ও পাশ্চাত্যের Humoral Theory-র আলোকে প্রাপ্ত লোকচিকিৎসা পন্ধতিকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। উক্ত বিষয়গুলিই এই প্রবন্ধটির মূল ভরকেন্দ্র।

মানব শরীর ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ উপাদানের সমবায়ে গঠিত। আমাদের দেহের গঠন, বৃন্ধি, পরিণমন এমনকী বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের সব স্তরেই এই পঞ্চ উপাদানের প্রভাব প্রত্যক্ষগোচর। একটি বীজের মহিরুহে পরিণতিতে যেমন মাটি, জল, উষ্ণতা, বায়ু ও মুক্ত পরিবেশ দরকার, ঠিক তেমনি এই একই কথা মানব শরীরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রকৃতি আমাদের দেহকে এমনভাবে নির্মাণ করেছে যে, এর ভিতরেই রয়েছে আত্মরক্ষা ও রোগ থেকে আরোগ্যলাভের উপায় ও কৌশল। প্রকৃতির সঙ্গো সম্পর্ক ছিন্ন করে, প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন করার ফলেই আমাদের স্বাস্থ্যাবনতি ঘটে এবং রোগ-ব্যাধি আক্রমণ করে। পরিবেশের বাহ্যিক উপাদানের গ্রহণ ও বর্জনের ওপর ভিত্তি করে দেহের সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণই সুস্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম কৌশল। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যেমন পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানকে গ্রহণ করি, তেমনি শরীর অভ্যন্তরস্থ অবাঞ্ছিত উপাদানকে

শরীরের বাইরে বর্জন করার নিমিত্ত প্রকৃতি মানব শরীরে সৃষ্টি করেছে মলদ্বার, মূত্রদ্বার ও ত্বকের ছিদ্রের মতো বেশ কিছু উপায়। প্রকৃতির অনন্ত বিস্তারিত ক্ষেত্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে সুস্থ থাকার কৌশল ও আরোগ্য লাভের উপায়। সৃষ্টির অনাদিকাল থেকেই মানুষ জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে রোগ মুক্তির কৌশল আবিষ্কার করেছে। প্রাচীনকাল থেকে সংগৃহীত মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছেন ভারতীয় মুনিঋষিগণ। বৈদিক ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যার নিদর্শন মেলে। কিন্তু এর শিকড় লোকায়ত সমাজ। কোচবিহারের আঞ্চলিক সাহিত্য গোসানী-মঙ্গল কাব্যে উঠে এসেছে এমনই কিছু লোকায়ত চিকিৎসাপদ্ধতি ও তৎকালীন মানুষের স্বাস্থ্যসম্পর্কিয় ভাবনা। যেগুলির নিরাময়গুণ একেবারে নস্যাৎ করা যায় না।

● **ত্রিদোষ তত্ত্ব ও হিউমোর‍্যাল থিয়োরি** : আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতিতে রোগ উৎপত্তির কারণ হিসেবে বিভিন্ন প্রকার অণুজীব যেমন—ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, মাইক্রোপ্লজমা ইত্যাদিকে গণ্য করা হয়। লোকচিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ উৎপত্তিতে অণুজীবের ভূমিকা গৌণ, ত্রিদোষের ভূমিকাই মুখ্য। কারণ বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনটি উপাদান শরীরে স্বাভাবিক বা অবিকৃত অবস্থায় থাকলে তখন দেহের যাবতীয় কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। কিন্তু অহিত আহার, বিহার বা অস্বাভাবিক আচরণের ফলে ধাতু কুপিত হলে শরীরে বিভিন্ন প্রকারের রোগ দেখা দেয়। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগের কারণ হিসেবে শরীরের রোগ প্রতিরোধ করার অক্ষমতাকে বোঝানো হয়। আর এই প্রতিরোধ শক্তিই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে 'ধাতু' বলে গণ্য। অর্থাৎ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে তিন ধাতু—বায়ু, পিত্ত, কফ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন ব্যক্তি সুস্থ থাকে। এই তিন ধাতু সাম্যে থাকাকালীন শরীরে কোনো ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস প্রবেশ করলে তারা প্রভাব বিস্তার করতে বাধা পায়। কেননা, এই তিন ধাতুর সাম্যাবস্থার নিরিখে তাদের শক্তি নগণ্য। যেমন একই স্থান থেকে আহরিত জল বহু মানুষ পান করে। দেখা যায়, সেই জল পান করে কিছু জন টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়, বাকিরা সুস্থ থাকে। অর্থাৎ সেই জলের মধ্যে টাইফয়েডের জীবাণু থাকলেও সকলেই আক্রান্ত হয়নি। যাদের শরীরে উক্ত তিন ধাতুর সাম্যাবস্থা আছে, তাদের রোগ প্রতিরোধ শক্তিও বেশি, ফলে তারা রোগাক্রান্ত হয়নি। আর যাদের শরীরে বায়ু, পিত্ত, কফের সাম্যাবস্থা নেই, তাদের রোগ প্রতিরোধ শক্তিও কম। তাই তারা টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মতে মানবদেহ হল একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। যার পাঁচটি উপাদান আছে—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—আর একটি সূক্ষ্ম উপাদান, যাকে বলা হয় চেতনা বা আত্মা। এই মহাবিশ্ব ও মানবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য ও আন্তর্সম্পর্ক বিদ্যমান, যাকে বলা হয় প্রকৃতির নিয়ম। দেহতন্ত্রের মধ্যে তার প্রাকৃতিক উপাদানগুলির বিভিন্ন অনুপাতে ক্রিয়াকলাপের ফলে যে কার্যগত অবস্থা সৃষ্টি হয় সেগুলি হলো 'ত্রিদোষ' অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফ। আর এগুলি গতিশীল সাম্য অবস্থায় বিরাজ করলে সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে আর এদের মধ্যে অসাম্য দেখা দিলে তখনই শরীরে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ত্রিদোষ তত্ত্বের ন্যায় পাশ্চাত্যের একটি তত্ত্ব হল 'Humoral Theory', যার সূচনা ঘটেছিলো প্রাচীন গ্রিস দেশে। এই তত্ত্বে বিশ্বাসী মানুষজন সামান্য ঠান্ডা, জ্বর বা কাশিতে আক্রান্ত হলে অঙ্গাছেদনের দ্বারা দেহের দূষিত রক্তকে শরীরের বাইরে নির্গত করতেন। তাদের কাছে রক্তক্ষরণের এই

পদ্ধতি আরোগ্যলাভের ক্ষেত্রে মহৌষধস্বরূপ। এমনকী প্রাচীন গ্রিসে আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে এই রক্তক্ষরণের দ্বারা চিকিৎসাপদ্ধতিটি ছিল একটি সাধারণ বিষয়। এই চিকিৎসাপদ্ধতির মূল ভিত্তি এই রক্তক্ষরণের দ্বারা দেহস্থ ধাতু সকল সাম্যাবস্থা ফিরে পায় এবং রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে।

'Humorl Theory'-র মূল ভিত্তি শরীরস্থ চার প্রকার ধাতু। এগুলি হলো— রক্ত(Blood), হলুদ পিত্ত (Yellow bile), কালো পিত্ত (Black bile), কফ (Phlegm)। প্রত্যেকটি ধাতুই দেহের আলাদা আলাদা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং প্রাকৃতিক ঋতুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কালো পিত্ত প্লীহা ও শরৎকালের সঙ্গে, হলুদ পিত্ত লিভার ও গ্রীষ্মকালের সঙ্গে, কফ মস্তিষ্ক ও শীতকালের সঙ্গে এবং রক্ত হৃৎপিণ্ড ও বসন্ত ঋতুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এছাড়াও এই তত্ত্ব অনুযায়ী মনে করা হয়, মানব শরীরে দুটি বিপরীতধর্মী গুণের সমাবেশ ঘটেছে উষ্ণ-শুষ্ক এবং আর্দ্র-শীতল। মানব শরীরে দেহস্থ উষ্ণতার দ্বারাই ধাতুর অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব। শরীরস্থ ধাতুর বহির্গমন ও সঞ্চয়ের জন্য বিভিন্ন উপায়ের কথা Humoral theory তত্ত্বে উল্লিখিত হয়েছে। তার মধ্যে বমন, রক্তক্ষরণ, খাদ্যাভাসের পরিবর্তন অন্যতম। Donald Bockler তাঁর 'Let's Play Doctor : Medical Rounds in Ancient Greece' গ্রন্থে লিখেছেন—

> The physician used his five senses to study all of the patient's secretions and excretions to determine the balance of the humors. The prognosis of a disease from the signs and symptoms aided the proper treatment to restore the humoral balance...prognosis of disease was made using information about the environment and individual symptoms of the patient.[১]

● গোসানী-মঙ্গালে উল্লিখিত লোকচিকিৎসা পদ্ধতি : রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী রচিত গোসানী-মঙ্গালের পুথিখানি খুব প্রাচীন নয়, ১২৩১ বঙ্গাব্দে (১৮২৫ খ্রি.) লিখিত নষ্টপ্রায় একখণ্ড হস্তলিপি থেকে নাকি এটি মুদ্রিত হয়। গোসানী নামধেয় লৌকিকদেবী চণ্ডীকে কেন্দ্র করে যে কাব্যকাহিনি কোচবিহার অঞ্চলে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে রচিত হয়েছিল, তা আসলে সম্ভাবনাপূর্ণ একটি মঙ্গলকাব্যের খসড়া। এই কাব্যটির দ্বারা সেই সময়ের সমাজচিত্র, ধর্ম, সংস্কার, অলৌকিকতা, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং ইতিহাসের কথা যেমন জানা যায় তেমনি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকচিকিৎসা পদ্ধতির কথাও জানা যায়। যেমন এই কাব্যের অন্যতম চরিত্র ভক্তীশ্বর জ্বরাক্রান্ত হলে, তার চিকিৎসা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

> ভোজন করিয়া সুখে আছে ভক্তীশ্বর।/হেন কালে আচম্বিতে হ'ল তার জ্বর।।/ওঝা আনি তন্ত্র-মন্ত্র অনেক করিল।/মস্তকে ভরণ দিয়া পাতি বসাইল।।/কেহ বলে দৃষ্টি রোগ কেহ বা বাসুলী।/এই রূপে নানা ওঝা নানা রূপ বলি।।/কিছুই নির্ণয় কেহ করিতে নারিল।/তিন দিনে ভক্তীশ্বর জীবন ত্যজিল।।[২]

'গোসানী-মঙ্গাল' কাব্যের কাহিনি বয়নে দেখা যায়, ভক্তীশ্বরের জ্বর হলে চিকিৎসাহেতু ওঝা বা গুণিন সম্প্রদায়ের কাছে শরণাপন্ন হতে। কেননা, তৎকালীন চিকিৎসক বলতে প্রথমেই গুণিন বা ওঝার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ভক্তীশ্বরের রোগের বাহ্যিক লক্ষণ দেখে সমাজের মানুষজন বিভিন্ন ধরনের রোগের অনুমান করেছেন। অনেকে দেহের বাহ্যিক

লক্ষণ দেখে অনুমান করেছেন ভক্তীশ্বর 'দৃষ্টিরোগে' আক্রান্ত। লোকায়ত সমাজে এই রোগ 'চোখ দেওয়া' নামে পরিচিত। অর্থাৎ লোকবিশ্বাস এই যে কোনো প্রেতাত্মা তার উপর ভর করেছে। কিংবা কোনো ওঝা বা গুণিন মন্ত্র প্রয়োগের দ্বারা তার শরীরে রোগ সৃষ্টি করেছেন। অনেক অঞ্চলে এই দৃষ্টিরোগ 'দেবতার ছটা' নামে পরিচিত। আবার কেউ কেউ ভক্তীশ্বরের শারীরিক লক্ষণ দেখে, তার 'বাসুলী' রোগে অক্রান্ত হওয়ার কথা অনুমান করেছেন। এই বাসুলী রোগকে 'সান্নিপাত' রোগ বলা হয়। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে কফ, পিত্ত, বায়ু একত্র কুপিত হলে বাসুলী অর্থাৎ সান্নিপাত রোগ হয়ে থাকে।

ভক্তীশ্বরের 'দৃষ্টিরোগ' বা 'বাসুলী' নামধেয় যে রোগই হোক না কেন, কবি ভক্তীশ্বরের জ্বর হওয়ার কথা জানিয়েছেন। আর এই ধরনের রোগের চিকিৎসাহেতু 'ভরণ' ও 'পাতি' নামক লোকচিকিৎসা পদ্ধতির কথা জানা যায়। নানা প্রকার ঔষধি দ্রব্যকে একত্রে বেঁটে ঔষধ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। সেই ঔষধের মিশ্রণটিকে ব্রহ্মতালুতে স্থাপন করলে, ঔষধের গুণে দেহের তাপমাত্রা কমে স্বাভাবিক হওয়ার কথা জানা যায়। যা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ত্রিদোষ তত্ত্ব ও 'Humoral Theory'-র সঙ্গে যথেষ্টরূপেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই চিকিৎসা পদ্ধতিই 'ভরণ' নামে পরিচিত। ভরণ চিকিৎসাপদ্ধতিতে কোন্ কোন্ লোকঔষধ ব্যবহার করা হয়— সে বিষয়ে কবি কোনোরূপ তথ্য সংযোজন করেননি। আর ঔষধ প্রয়োগ হেতু রোগী আরোগ্যলাভে অসমর্থ হলে রোগীকে অপদেবতা আশ্রয় করেছে বলে অনুমান করা হতো। তার প্রতিকার হেতু রোগীর আরোগ্যলাভের জন্য অপদেবতার উদ্দেশ্যে নানাভাবে পূজা নিবেদনের সংবাদ মেলে। এই যে রোগীর আরোগ্যলাভ হেতু অপদেবতার উদ্দেশ্যে বিবিধ উপাচারে পূজার আড়ালে লোকচিকিৎসা পদ্ধতি, তাই 'পাতি' চিকিৎসা নামে পরিচিত।

● **শির-ঘ্রাণ গ্রহণ :** প্রকৃতিলালিত মানুষ দেখেছে পাখিরা পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হলে সরু সরু ডালপালা, পাতাপুতি পায়ে জড়িয়ে রাখে। পশুরা ক্ষত জিভ দিয়ে চাটে, মানুষও তাই করেছে। পরিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হলে কুকুর ঘাস খায়, বমন ক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরকে সুস্থ করে। মানুষও বমন ক্রিয়াকে চিকিৎসার অঙ্গ করে তুলেছে। এমনই একটি পদ্ধতি হল শির-ঘ্রাণ পদ্ধতি। পশুকূলের গাত্র কণ্ডুয়ন, স্বজাতির প্রতি ঘ্রাণ নিক্ষেপ ও ঘ্রাণ গ্রহণ স্বাস্থ্য মজবুতের একটি কৌশল। এক্ষেত্রে মানসিক প্রশান্তি শরীর ও মন উভয়কেই চাঙ্গা করে তোলে। মানুষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। 'গোসানী-মঙ্গল' কাব্যে দেখি—

> ঘরে আসি কান্তনাথ জননীর পাশ।/গাভীহারা যতকথা করিল প্রকাশ।।/শুনিয়া অঙ্গানা হ'ল চিন্তাকুল মন।/শিরে ঘ্রাণ লয়ে কৈল আশীস বচন।।[৩]

কাব্যের নায়ক কান্তনাথ বিপদগ্রস্ত ও উদ্‌বিগ্ন। স্নায়ুর উত্তেজনাবশত তার শারীরিক ক্রিয়া কিছুটা হলেও ব্যাহত। এক্ষেত্রে মাতার শির-ঘ্রাণ গ্রহণ একপ্রকার চিকিৎসাপদ্ধতি। কেননা, এই শির-ঘ্রাণ শারীরিক স্থিতিশীলতা আনয়নে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। যা ওই মুহূর্তে সন্তানের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর ও কার্যকরী একটি পদ্ধতি।

● **গর্ভ সঞ্চারের লক্ষণ ও পোড়া মাটি ভক্ষণের তাৎপর্য :** রোগ উপশমের আবশ্যিক শর্ত রোগ নির্দিষ্টকরণ। রোগ চিহ্নিতকরণে বিভিন্ন শারীরিক লক্ষণ (Symptom)-এর ভূমিকা

অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। লোকায়ত সমাজে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শারীরিক লক্ষণ সমূহের প্রতি গভীর নিরীক্ষণের কথা জানা যায়। পরবর্তীকালে এই গভীর পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভান্ডারকে ভর করেই চিকিৎসাশাস্ত্রের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। শুধুমাত্র রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেই নয়, প্রাথমিক পর্যায়ে নারী গর্ভবতী কিনা তা জানা লোকসমাজে আবশ্যক ছিল। এই আবশ্যকতা মূলত গর্ভবতী নারীর হিতার্থেই। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, তৎকালীন নারীগণ ছিলেন অধিক পরিমাণে লজ্জাশীলা। সাধারণত গর্ভবতী হওয়ার প্রাথমিক সংবাদ তারা নিজ মুখে প্রকাশ করতে পারতেন না। অথচ গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে বিশেষত গর্ভস্থ ভ্রূণের সুরক্ষায় প্রথম তিনমাস সময়পর্বটুকু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় পর্বে গর্ভবতী নারীদের চলনে, বলনে, কথনে, শয়নে, জাগরণে, চিন্তনে ও খাদ্য গ্রহণে পূর্বের তুলনায় কিছুটা হলেও পরিশীলিত জীবনাচরণ আবশ্যক। অন্যথায় গর্ভপাতের আশু সম্ভাবনা যেমন থেকে যায়, ঠিক তেমনি গর্ভস্থ ভ্রূণের অবাঞ্ছিত গঠনের আশঙ্কাও থেকে যায়। লোকায়ত সমাজের মানুষ উক্ত বিষয়গুলির প্রতি যথেষ্টই সচেতন ছিলেন। এই সম্পর্কিত সচেতনতার পরিচয় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের কবিদের কলমে নানা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী তাঁর 'গোসানী-মঙ্গল' কাব্যে গর্ভবতী নারীর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> তিনমাসে গর্ভ চিহ্ন হইল উদয়।/মনে ভাবে চণ্ডী বুঝি হইল সদয়।।/চতুর্থ মাসেতে তার দেহ হল ভার।/চলিতে সামর্থ্য নাহি আলস্য অপার/পঞ্চমাসে পঞ্চগব্য করিল ভক্ষণ।।/ নবম মাসেতে ধনী অতীব দুর্বল।/মাটিতে শুইতে বাঞ্ছা হইল কেবল।।[৪]

লোকচিকিৎসায় অনুপান এবং বিধিনিষেধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ গর্ভবতী জননীর শয়ন পদ্ধতির কথা বলা যেতে পারে। গর্ভবতী জননীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত শয়ন পদ্ধতি সুস্থ সন্তান প্রসবে কতটা কার্যকারী, তা আজ সমীক্ষায় প্রমাণিত। শয়ন পদ্ধতির ব্যাঘাত হেতু মৃত সন্তান প্রসবের আশু সম্ভাবনা থাকে। লোকায়ত সমাজ যে এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিল—তার ইঙ্গিত আমরা বিজয় গুপ্তের 'অষ্ট নাগের জন্ম পালা' অংশে গর্ভবতী মনসার শয়ন পদ্ধতি থেকে জানতে পারি—

> মনসা প্রথম গর্ভবতী আনন্দিত পশুপতি
> নাচন্তি অতি কুতূহলে।
> ভূমিতে আঁচল পাতি নিদ্রা যায় পদ্মাবতী
> উঠে বসে অতি কুতূহলে।।[৫]

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে চিকিৎসকগণও গর্ভবতী জননীকে, গর্ভস্থ সন্তানের নির্দিষ্ট বয়স সীমার পর, নরম বিছানা পরিত্যাগ করে শক্ত বিছানা গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। এই একই বিষয়ের সমর্থন মেলে কবি মুকুন্দের কাব্যে—

> তিন মাসে করে রামা ভূতলে শয়ন
> চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ।।[৬]

এখন গর্ভবতী জননীর পোড়া মৃত্তিকা ভক্ষণ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা যেতে পারে। কবি কৃষ্ণরাম দাসও গর্ভবতী জননীদের 'পোড়া মাটি' ভক্ষণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। নারীদের বিভিন্ন প্রকারের গর্ভ লক্ষণ ছাড়াও পোড়া মাটি ভক্ষণের কথা মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন

কবি নানা প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন, কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন—

দেখিয়া আইলাম সব গর্ভের লক্ষণ।
শয়ন সদত ভূমে মৃত্তিকা ভক্ষণ।।[৭]

গোসানী মঙ্গল কাব্যেও গর্ভবতী নারীদের পোড়ামাটি ভক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

ষষ্ঠ মাসে নানা বস্তু খেতে গেল মন।
পোড়া মাটী সোন্ধ্যা দ্রব্য খায় অনুক্ষণ।।[৮]

এই প্রসঙ্গে যে পোড়া মাটির কথা বলা হয়েছে তা আসলে পোড়া মৃৎ পাত্রের ভগ্নাংশ। পোড়া মৃৎ পাত্রের অন্যতম উপাদান Charcoal—এই Charcoal মূলত Active Charcoal, যা জিহ্বার জড়তা দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। গর্ভবতী মহিলার জিহ্বায় ক্রমাগত জলের সঞ্চার—'জিহ্বায় বিরতি নাই মুখে উঠে জল' পরিলক্ষিত হয়। ফলত জিহ্বার উপরিদেশে একধরনের প্রলেপের সঞ্চার ঘটে। পোড়া মাটির মধ্যে নিহিত থাকা Active Charcoal এই প্রলেপ দূরীকরণে সহায়তা করে, মুখের স্বাদ ফিরে পায়, হজম ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়।

সিদ্ধান্ত

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের 'ত্রিদোষ তত্ত্ব' ও পাশ্চাত্যের Humoral Theory বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক। শরীর মধ্যস্থ ধাতু ও উষ্ণতার সমতা বিধানই এই দুই তত্ত্বের মূল ভিত্তি। এই দুই তত্ত্বে বিশ্বাসী চিকিৎসকগণ বহু দিন আগেই বলেছিলেন, শ্বাসকষ্টজনিত রোগের অন্যতম কারণ মানসিক দুশ্চিন্তা। বর্তমানে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মানসিক উদ্‌বিগ্নতা শ্বাসকষ্টের ক্ষেত্রে Risk facrors হিসেবে কাজ করে। তাই এটা প্রমাণিত হয় যে, আয়ুর্বেদশাস্ত্রের 'ত্রিদোষ তত্ব' এবং পাশ্চাত্যের humoral Theory -কে অতি সহজেই নস্যাৎ করা যুক্তিসংগত হবে না। কেননা, এই দুই তত্ত্ব প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখনও এই দুই তত্ত্বে চিকিৎসাশাস্ত্রের অনেককিছু শিক্ষণীয় বিষয় লুকিয়ে রয়েছে—যার আবিষ্কার আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত্তিকে আরও মজবুত করবে বলে আমাদের অনুমান। আর গোসানী-মঙ্গল কাব্য থেকে প্রাপ্ত তৎকালীন মানুষের স্বাস্থ্যভাবনা ও লোকচিকিৎসার অনুষঙ্গ থেকে স্থির করা যায় যে, সেযুগের মানুষজন রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে যেমন লোকঔষধকে ব্যবহার করেছেন, ঠিক তেমনি দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে বিভিন্ন দেব-দেবীরও শরণাপন্ন হয়েছেন। দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ কিছু রীতি-নীতি পালন করতেন, যার আড়ালে রয়েছে আরোগ্যলাভের প্রচেষ্টা। যার ভিত্তি মানসিক শক্তি সঞ্চয় বা আত্মবিশ্বাস অর্জন। যা আরোগ্যলাভে পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

উৎসের সন্ধানে

১. Riley Sebers : 'What's Your Temperment : the Humoral theory's influence on Medicine in Ancient Greece, Young Historian Conference, 10 March 2016, P. 2

২. রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত, শ্রীব্রজচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত, গোসানী-মঙ্গাল, সান্যাল এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ভারত মিহির যন্ত্র, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০
৩. তদেব : পৃ. ১৫
৪. তদেব : পৃ. ৭
৫. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত : 'বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গাল', অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ১১৩
৬. দেবেশকুমার আচার্য সম্পাদিত : 'কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গাল', সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ১ বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ২
৭. শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত : 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, পৃ. ৭১
৮. রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত, শ্রীব্রজচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত : 'গোসানী-মঙ্গাল', সান্যাল এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ভারত মিহির যন্ত্র, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭

বেহুলা-কথা: মধ্যযুগের কাব্যধারা আধুনিক যুগের ছোটোগল্পে

রুদ্রজিৎ দাস ঠাকুর

> একদিন অমরায় গিয়ে
> ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
> বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।[১]

নদীমাতৃক দেশ বাংলা। সাপ-কোপে ভরা। সাপের ভয়ে ত্রস্ত বঙ্গজীবন। ফি-বছর কত যে মানুষ সাপের ছোবলে প্রাণ হারায় তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তা সত্ত্বেও গ্রামবাংলার মানুষেরা সাপকে নিজের বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম একক বলে মেনে নিয়েছে। সাপকে কেন্দ্র করে রচনা করেছে লোককথা, পালাগান, কথকতা। সাপের প্রতি ভয় থেকে তাদের মধ্যে যে ভক্তি জন্ম নিয়েছে, তা থেকেই গড়ে উঠেছে—সাপের দেবীর ধারণা। বাংলায় সাপের দেবী রূপে পরিচিত দেবী মনসা। শিবের মানসকন্যা। মনসা সর্পের আভূষণে সজ্জিতা, অষ্টনাগ, অনন্ত-বাসুকি-পদ্ম-মহাপদ্ম-তক্ষক-কুলীর-কর্কট-শঙ্খ তার সঙ্গী। তিনি হংস অধিষ্ঠাত্রী। অনুমান করা হয় ইনি পূর্বে কোনো অনার্য দেবী ছিলেন। পরবর্তীকালে দেবী মনসার পৌরাণিকীকরণ ঘটেছে।

সাধারণত শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে মনসাপূজা হয়। পুজোর আগে এক মাস যাবৎ নিয়ম করে পাঠ হয় মনসামঙ্গল। চাঁদ সদাগর-বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি। চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্ব, বেহুলার সতীত্ব বাংলা জনজীবনের সাথে অঙ্গীভূত হয়ে আছে। ভয়কে আশ্রয় করে যেহেতু পালাগান রচিত, তাই মঙ্গলকাব্যে আজও বাংলার সমাজে সদর্পে বিরাজমান। অন্তত দেড়শো জন কবি মনসামঙ্গল রচনা করেছেন। আর অসংখ্য গায়েন ও লিপিকাররা বাংলার এই ঐতিহ্যকে নিজের হাতে লালন-পালন করেছেন। কানা হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিপ্রদাস পিপিলাই, নারায়ণ দেব, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র কয়েকজন জনপ্রিয় মনসামঙ্গল কাব্য রচয়িতা। যাদের কলমের জোর ও কাব্যপ্রতিভা মনসামঙ্গলকে আধুনিক যুগের পাঠকের কাছেও চরম আকর্ষণীয় করে রেখেছে। আধুনিক গল্প-কবিতা-উপন্যাসে ঘটেছে মনসামঙ্গলের বিনির্মাণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে সুরমার গবেষণার বিষয়ের উল্লেখ, 'বাংলা মঙ্গলকাব্য ও চসারের কাব্যের তুলনা'—এ থেকেই বোঝা যায় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কারিগরের মঙ্গলকাব্য-প্রীতি নেহাতই কম ছিল না।

এই বিশ্বায়নের যুগেও বাংলার জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আধুনিক লেখক সম্প্রদায়ের ঝোঁক কম নয়। তাঁরা যে মনসামঙ্গাল কাব্যের প্রতি শুধুমাত্র আকৃষ্ট হয়েছেন তাই নয়, মনসামঙ্গাল হয়ে উঠেছে আধুনিক সাহিত্য সংরূপের অন্যতম মূলধন। বিনির্মাণের ধারায় মধ্যযুগের কাব্যগুলি যেন আধুনিক যুগের সম্পদ। বহু প্রসিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত লেখকের রচনায় আবর্তিত হয়েছে মনসামঙ্গালের অনুষঙ্গ। মনসা-কথার, বেহুলা-কথার বিনির্মাণ ঘটেছে এমন কিছু বাংলা ছোটোগল্প হল—

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রত্যাবর্তন', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'পরাজয়', মহাশ্বেতা দেবীর 'বেহুলা', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'সাজ ভেসে গেল', মতি নন্দীর 'বেহুলার ভেলা'

আল মাহমুদের 'জলবেশ্যা', বাণী বসুর 'বেহুলার ভেলা', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'সতত বেহুলা'।

মানুষের জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটে যা কাকতালীয়। কিন্তু মানুষ দৈবচালিত—এমন নয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রত্যাবর্তন' গল্পে রমাদাসী বিবাহিত জীবনের কাছে তিন তিনবার ঠকে গিয়েও স্বপ্ন দেখে। লোকে তাকে 'বেহুলা রাড়ী'[২] বললে স্বাভাবিকভাবেই সে কষ্ট পায়। কিন্তু ভাগ্যের প্রতি অগাধ বিশ্বাস থেকে হোক কিংবা পুরুষতন্ত্রের ভর্ৎসনার ভয়েই হোক, সে মুখ বুজে থাকে। মেনে নেয় সমাজের দেওয়া অন্যায্য নামটিকে। রুখে দাঁড়ানোর মতো আত্মবিশ্বাস তার নেই। তিন স্বামীর অকালমৃত্যু তাকে ভেতর থেকে ভেঙে দিলেও, মেয়ে হিসেবে জন্ম নেওয়ায় কারণে তার মনের অবস্থা জানতে কারোর আগ্রহ নেই বললেই চলে। যা ছিল বেহুলার কাছে গর্ব তাই হয়ে ওঠে রমাদাসীর অপমান। বেহুলার ভাগ্যের সাথে রমাদাসীর ভাগ্যকে তুলনা সচেতনভাবেই জন্ম দেয় ঘৃণ্য আনন্দের—

> জাগরণে যদিকে তাকাই/ভেসে যায়/সিঁদুরের টিপ আর বেহুলার ভেলা/স্বপ্নের ভিতর, জাগরণে/ছিঁড়ে ফেলে তীক্ষ্ণ নখে কারা/অবেলার তীব্র হোলিখেলা?[৩]

গল্পে পশুপতি যখন রমাদাসীকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন গ্রামের সকলেই চায় পশুপতি যেন নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ায়। অন্যদিকে রমাদাসী তৎপর হয়ে ওঠে চতুর্থ স্বামীর যাতে মৃত্যু না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে। 'লাল সুতোয় বাঁধা একটি কবচ'[৪] সে পশুপতিকে পরিয়ে দেয়। এ যেন সতী বেহুলারই স্বামীর প্রতি আনুগত্য। কিন্তু পশুপতিই বিবাহ ভেঙে দেয়! কারণ, 'ছোট একটি নীড়, রমার মধ্যেকার নারীত্বের শান্ত বিকাশ তাহাকে ভুলাইতে পারিবার তো কথা নয়, সুতরাং তাহার দোষ কী প্রেম তো তাহার মধ্যে সম্ভব নয়। তাহার জন্য প্রয়োজন ছিল অপরিমেয় আনন্দের'[৫] এই আনন্দ পাওয়ার লোভ, রমার রক্ষাকবচ তাকে মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ করলেও, নারীত্বের অভিমানে-বেদনায়-যন্ত্রণায় ও সমাজসিদ্ধ নিন্দার ভয়ে রমাকে বেচে নিতে হয় আত্মহত্যার পথ। এ যেন মনসামঙ্গাল কাব্যের এক উলটপুরাণ—

> অয়ি পদ্মপলাশলোচনা
> তোর চোখে কি পড়লো ধুলো
> যেন নীলাকাশ জুড়ে লাল মেঘ

আর মেঘে মেঘে ঝড় এলো
তোর কী হ'লো আজকে ললনা?
কোন কুটিল ঐরাবত
দিল নীলোৎপলেও বেদনা
আহা, রাঙা হ'লো কোকনদ।[৬]

বেহুলা মৃত লখিন্দরের দেহ নিয়ে গাঙুরের জলে ভেসেছিল। যুবতী বেহুলাকে নদী পথে একা পেয়ে গোঁদা, ট্যাঁকনা কামনা করেছিল। আবার ইন্দ্রসভায় স্বামীর প্রাণ ফেরাতে বেহুলার লাস্যময়ী নৃত্যে দেবতাদের অবলোকন কাম চরিতার্থ হয়েছিল। পরোক্ষভাবে নিজের শরীরের বিনিময়েই সে হয়ে উঠেছিল সতী! আসলে পুরুষচালিত সমাজের বেহুলাকে সতী হিসেবে দেখার পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল এক প্রকার রাজনীতি। তারা বেহুলার নিজস্ব চাহিদা বা যৌন-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে নিয়ে সোচ্চার নয়; কারণ মনসামঙ্গাল নারী-আখ্যান হলেও পুরুষের তথা পুরুষতন্ত্রের কলমে লিখিত। কিন্তু আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে একথা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না যে, বেহুলার শারীরিক অনুভূতিগুলি স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে বাসররাতেই উবে গেছে। এ আসলে ছিল পুরুষতন্ত্রের মুখোশাবৃত ষড়যন্ত্র। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'পরাজয়' গল্পে কুলসুম যেমন মানবিক চাহিদা সম্বলিত একজন পূর্ণমানুষ, বেহুলাও তেমনি একটি রক্তমাংসের মানব অস্তিত্ব। বেহুলার মতোই কুলসুমও সাপে কাটা মৃত স্বামী ছমিরের দেহ নিয়ে ভেসে যেতে দ্বিতীয়বার ভাবেনি। তবে কুলসুম গল্পের শেষপর্বে নিজের শারীরিক উত্তেজনা মেটাতে মজনুকে কাছে পেতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধও করেনি। এতে সতীত্ব নামক আরোপিত ধারণার পরাজয় ঘটলেও, নারী কুলসুমের নারীত্ব আশ্রয় খুঁজে পায়। গল্পে মজনু-কালুর আকাঙ্ক্ষা ও কাব্যে গোঁদা-ট্যাঁকনার অভিপ্রায়ের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই, শুধু বেহুলার সংযমের বাতাবরণ তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে প্রশ্রয় দেয়নি আর কুলসুমের হঠকারী সিদ্ধান্ত তার অন্তরের দহনজ্বালার নিবারণ ঘটিয়েছে। হাজার হোক, আজরাইল যেমন কুলসুমের রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে কোনো শাস্তি দেবে না তর যা রূপ, আজরাইল পর্যন্ত দেইখা পাগল হইব রে। হগ্গলেই তর লাইগা পাগল'[৭]; তেমনি স্বর্গের দেবতারাও বেহুলাকে কোনো শাস্তি দেয়নি—শুধু সতীত্বের প্রশ্নে মানহানি করতে করতে অতিক্রম করে গেছে শালীনতার সকল মাত্রা—

এসো দেবতারা, দেখো, এই আমার দেহ দুলে উঠেছে
নাচের ছন্দে, দুলে উঠেছে বিসর্জনের প্রান্ত থেকে বোধনের সীমানায়;
দুলে উঠেছে জীবনের নেশায়;
এসো, দেবতারা, তোমাদের দৃষ্টি লেহন করুক
আমার নগ্নতা, আমার নারীত্ব
আমার কামনীয় নেই কিছুই, প্রাণ ছাড়া।[৮]

মহাশ্বেতা দেবীর গল্প 'বেহুলা' মনসামঙ্গালের একটি অভিনব ও সার্থক বিনির্মাণ। গল্পটির পটভূমি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইরফানপুর ব্লকের একটি গ্রাম। গ্রামটির নাম বেহুলা। ও গ্রামের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটির নামও বেহুলা। কালাজ সাপের উপদ্রবে গ্রামের মানুষ

অসহায়। মড়া বইতে বইতে বেহুলা নদীও প্রায় মজে গেছে। সাপের প্রতি ভয় থেকেই গ্রামবাসীরা মনসা—ভক্ত। মনসামঙ্গাল পালাগান তাদের জীবন ও সংস্কৃতির অঙ্গ। কিন্তু এদের পালাগান প্রচলিত মনসামঙ্গালের কাহিনির থেকে আলাদা—

> শ্রীপদ, গ্রামীণ ওঝা, এই পালাগানের গায়ক। সে ওঝা হলেও, বুজরুকি তার পেশার ভিত্তি নয়। বরং বৈজ্ঞানিক রীতিতে চিকিৎসা করার প্রতিই তার বিশ্বাস। 'শ্রীপদর গানে, বেহুলা ও লখিন্দর সংসার করতে থাকে। শেষে লখিন্দর স্বর্গে যায়। বেহুলার ওপর অভিশাপ নামে। দেবতারা বলেন, দেবসভায় লাস্য দেখিয়ে নেচেছিল বেহুলা। তার ফলে যে পাপ হয়, সে পাপ খন্ডাতে বেহুলাকে, কলিকালে বেহুলা নদী হয়ে বয়ে যেতে হবে। সর্পদষ্ট শব ওর জলে ভাসলে সদ্গতি পাবে। বেহুলা বলে কবে সদ্গতি হবে আমার দেবতারা তার উত্তর দেয় না। সেই থেকে বেহুলা নদী হয়ে বইছে। গানের শেষে মনসা বন্দনা হয় ও উঠোনে ধ্বজা পোঁতা হয়।[৯]

বেহুলা গ্রামের এই রীতি অরুণ মিত্রের কবিতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়, যদি কালনাগিনী লখিন্দরকে না কেটে বেহুলাকে কাটত, তাহলে—

> তোমার বিরহে সে দিনরাত
> ধিকি ধিকি আগুণে পুড়তো। দাঁতে দাঁত চেপে কোনো রকমে সংসারে টিকে থাকা।
> কিন্তু মাস দুই বাদে তোমার বিরহ এমন অসহ্য হয়ে উঠলো লখিন্দরের কাছে
> যে আর একটি মেয়েকে বিয়ে তার করতেই হলো। অবশ্য তোমার মতো
> অপরূপ সুন্দরী সে নয়। কিন্তু তাতে কি আর এমন অসুবিধে![১০]

এ গল্প বেহুলা-লখিন্দর সম্পর্কের আবর্তনে আবর্তিত নয়। এখানে বেহুলা এসেছে রূপক অর্থে। কোথাও যেন গল্পটির গড়নের মধ্যে সন্নিহিত হয়ে আছে লেখিকার মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। পঞ্চায়েত প্রধান হেঁদো নস্কর, তার অত্যাচারে পর্যুদস্ত বেহুলা গ্রাম এবং মৃতপ্রায় অভিশপ্ত নদী বেহুলা এই গল্পের মূল ভিত্তি। যে নদীতে যাতে মরা না আর ভাসাতে নয় তার জন্য সর্পবিশেষজ্ঞ বসন্ত ও ওঝা শ্রীপদ তৎপর। অন্যদিকে স্বার্থানুসন্ধানী হেঁদো নস্কর নিজের ইটের গাদায় সাপের চাষ করলেও সকলকে সাহায্য করতে, সমস্যা মেটাতে তার কোনো আগ্রহ নেই। সেক্ষেত্রে সে কেবলই নীরব দর্শক। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস যাকে বলে, গল্পের ক্লাইম্যাক্সে ঠিক তেমনি একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যায়। মাঝ রাত্তিরে ঘুমের মধ্যে কালাজ সাপের ছোবলে প্রাণ হারায় শ্রীপদ। আর সেই পরিস্থিতিতেও হেঁদো নস্কর ব্যস্ত থাকে নিজের আখের গোছাতে—

> আমার বিছানায় মাঝ রাত্তিরের ঢেউ লাগলে আমি বেহুলাকে
> ডাকি : ও বেহুলা, তোমাকে বলবার কিছু কথা আছে আমার, শোনো!
> লোহার বাসর ঘর থেকে সাপেকাটা লখিন্দর নিয়ে তুমি গেলে
> জলে ভাসিয়ে দিতে। তাইতো বিধান। কলার ভেলায় তুমি তাকে শোয়ালে
> ঠিকই, কিন্তু একলা ভেসে যেতে দিলে না, তুমিও ভাসলে তার সঙ্গে।[১১]

বেহুলার জলে যখন ভেসে যায়, শ্রীপদর দেহ তখন বেহুলা গ্রামের সাধারণ মানুষের টনক নড়ে। কিন্তু বাঁধা সেই হেঁদো নস্কর। তার বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো গ্রামবাসী এগিয়ে না এলেও, বসন্ত হয় সোচ্চার। একপ্রকার জোর করেই, বসন্তের সহোযোগিতায় হেঁদো নস্করের

কুক্ষিগত কেরোসিন কেড়ে নিয়ে সর্পসংহার করে বেহুলা গ্রামের বাসিন্দারা। সাপের দেবী মনসার সাথে লড়াই করে বেহুলা ফিরিয়ে এনেছিল লখিন্দরের প্রাণ, আর সর্পদংশনের হাত থেকে রেহাই পেতে হেঁদো নস্করের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে বেহুলার বাসিন্দারা বেহুলা নদীকে অভিশাপ মুক্ত করে। গল্পে কালাজের বংশ নির্বংশ হয় ঠিকই, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে যতদিন হেঁদো নস্করের মতো ধান্দাবাজ রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী মানুষেরা টিকে থাকবে, ততদিন বেহুলার মতো নদীগুলি অভিশপ্তই থেকে যাবে—

গাঙুরের জলে ভাসে বেহুলার ভেলা
দেখি তাই, শূণ্য বুকে সারারাত জেগে থাকি
আমার স্বদেশ করে কাগজের নৌকা নিয়ে খেলা।[১২]

নদীতে যখন বান ডাকে, তখন একের পর এক ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা তলিয়ে যায়। ভেসে যায় অর্থ উপাজর্নের প্রাথমিক সম্বলটুকুও—ঠিক যেমন করে ডুবে গিয়েছিল চাঁদ সদাগরের মধুকর ডিঙা, ঠিক তেমন করেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পে বেউলা দলের ‘সাজ ভেসে গেছে’। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ত্রাণের টাকা যতটা না সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পিছনে ব্যয় হবে, তার থেকে অধিক ব্যয় হবে জনসেবায়, অর্থাৎ যা যা মানুষের মৌলিক চাহিদা—খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের জোগান দিতে। এখন প্রশ্ন উঠেছে যারা পালাগান গায় তাদের দিক থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত! গল্পে মওলা বশখ সাত বছর ধরে বেউলা দল চালাচ্ছে। সে এই দলের চাঁদ সওদাগর। তার জীবনের এই সাত বছর চাঁদ সদাগরের সাত সন্তানের প্রতীকবাহী। বর্তমানে আকাশ আলি এই দলের সম্বল। সে এই বেউলা দলের নায়ক, লখিন্দর। মওলা বশখ নিজের কাছে দলের সমস্ত সরঞ্জাম কুক্ষিগত রেখে, বাণবন্যায় সব হারিয়েছে। সব হারিয়ে তার মনের জোরও কোথাও যেন অস্তমিত। সে বুঝতে পারছে তার দম্ভ, অংহ দলটাকে পথে বসিয়ে দিয়েছে। ঠিক যেমন করে চাঁদ সওদাগর মনসার বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে নিজের পরিবার-পরিজনের অনুভূতির তোয়াক্কা করেনি, ঠিক তেমন করেই মওলা বশখ নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করে দলকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। সে জানে লখিন্দরের চরিত্রাভিনেতা, আকাশ আলিই পারে বেউলো দলের প্রাণ ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু মুখ ফুটে তা বলার ক্ষমতা মওলা বশখের নেই। গল্পের শেষে মওলা বশখ স্যাঁতস্যাঁতে জলকাদা মাখানো খালে পড়ে গেলে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে সকলে ঠিক যেমন করে চমকে ওঠে, সেই একই চমক বোধহয় দেখা গিয়েছিল যখন লখিন্দর চাঁদ সদাগরকে দেখেছিল নদীর পাড়ে, অচৈতন্য অবস্থায়—

> তিনজনে ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে চলে চাঁদ সওদাগরকে। পাঁজরভাঙা, কলজেয় দাগধরা শরীর থেকে গভীরতর দুঃখের মতো রক্ত গড়ায় কষ বেয়ে। এবার প্রকৃতি নিজের হাতে তাকে শেষবার লাল পোশাক পরিয়ে দিচ্ছেন। তবু সে বিড়বিড় করে বার বার ‘সাজের বাকসোটা ভেসে গেল হে! সাজের বাকসোটা।[১৩]

মতি নন্দীর ‘বেহুলার ভেলা’ গল্পটি স্বামী-স্ত্রী প্রমথ-অমিয়ার জটিল সম্পর্কের আবর্তে যেন এটাই বলতে চেয়েছে, প্রত্যেকটা মানুষের বেঁচে থাকা আসলে কিছু মড়া আগলে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেওয়া। আমাদের এই সংসারটাই একটা বেহুলার ভেলা। সেখানে কত

লোক, কত আপনজন কিন্তু হৃদয় তাদের মধ্যে কাউকে আপন বলে মেনে নিতে পারে না। নিজেকে নিয়ে মেতে থাকার লালসায় আমরা ভুলেই যাই একা একা বাঁচা যায় না। সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রথম দিনগুলোতে সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা থাকলেও, সময়ের সাথে সাথে তা কেবলই হয়ে দাঁড়ায় অভ্যেসে। সবসময় সুযোগ থাকে না তার থেকে ভেঙে বেড়োনোর; সব জেনে বুঝে কেবলই মানিয়ে চলতে হয়। বিরোধিতা করলেই ঘটে বিচ্ছেদ। বেহুলা প্রেমের অভিজাত্যে নদীতে ভেসেছিল, কিন্তু দিনের পর দিন একটা মড়া আগলে সঙ্গীহীনভাবে বেঁচে থাকতে তার কী মন চেয়েছিল আধুনিক সময়ে আর মড়া দেহ আগলাতে হয় না, কিন্তু মরা সম্পর্ক নিয়েই বাঁচতে হয়—

> আমি এক মৃত প্রাণ ফুল্ল নগরের/সুরভিমদির নাগিনীরা/বর্ষণ উৎসবে নাচে, শরবিদ্ধ প্রাণ/তোমার ভেলায় যদি নিলে/নাচো জল, নাচো রক্ত, বেহুলা আমার।[১৪]

'জানো অমি, মনে হচ্ছে আমি আর ভালোবাসি না, বোধহয় তুমিও বাস না।...এখন একটা মড়া আগলে বসে থাকা ছাড়া আমাদের আর কাজ নেই।' মড়া আগলে বেঁচে থাকার মধ্যে শোক আছে, দুঃখ আছে, অসুখ আছে কিন্তু আক্ষরিক অর্থে বিচ্ছেদ নেই। অন্যদিকে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে রুগ্ন সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসলেই পরিচয় ঘটে বিচ্ছেদ নামক অযাচিত সত্যের সাথে। এখন প্রশ্ন ওঠে বেহুলার লখিন্দরের দেহ নিয়ে ভাসার মধ্যে কি কেবলই পতিভক্তি ছিল নাকি বৈধব্যের যন্ত্রণা থেকে বাঁচারও একটা উপায় ছিল? এই পথাবলম্বন। গল্পের মুখ্য চরিত্র অমিয়া আর প্রমথর সম্পর্কটা বাইরে থেকে প্রাণবন্ত হলেও, ভিতর থেকে সম্পর্কটা মরে গেছে। তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক থাকলেও, তাদের মধ্যেকার আত্মিক সম্পর্ক মৃত, স্থবির তা আর পাঁচটা মানুষের সামনে হাসিমুখে বেঁচে থাকা ছাড়া কিছুই নয়। বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে এই মড়া সম্পর্ক আসলে চলমানতার স্রোতে নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়ে চুপ করে থাকা। বেহুলার মৃত স্বামী নিয়ে বেঁচে থাকা আর গল্পে অমিয়া-প্রমথর মৃত সম্পর্ক নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে আদতে কোনো পার্থক্যই নেই।

অগ্নির বরে বেহুলা ছিল জাতিস্মর। কী উদ্দেশ্যে তার এই মর্ত্যপৃথিবীতে জন্মলাভ তা সে আগে থাকেই জানত। আবার কাব্যে বিয়ের কয়েকদিন আগে বেহুলা যখন মুক্তসায়রে স্নান করতে যায় তখন ছদ্মবেশী মনসা তাকে অভিশাপ দেয়, 'বিবাহের রাত্রিতে খাইও নিজ পতি।'[১৬] অতএব মনসামঙ্গালের বেহুলা জেনে বুঝে নিজের ভবিতব্যকে স্বীকার করে নিয়েছিল। আর 'জলবেশ্যা' গল্পের বেউলা স্বেচ্ছায় নিজের শরীরকে পণ্য করে তুলেছে, মেতে উঠেছে বাসরখেলায়। বেহুলা কালনাগিনীর ছোবলে মৃত স্বামী লখিন্দরের প্রাণ ফেরাতে ছিল বদ্ধপরিকর, অন্যদিকে বেউলা মহাজন আবিদ বেপারিকে নিজের শরীর দিয়েছে কেবল খদ্দের হিসেবে এবং নিজেই প্রকারান্তরে কালনাগিনীকে ব্যবহার করেছে তাকে খুন করতে। যে বেহুলা সতী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, 'জলবেশ্যা' গল্পের লেখক আল মাহমুদ তাকেই যখন সরাসরি বেশ্যা হিসেবে গড়েন, তখন একথা বলতেই হয় যে, বেহুলা-কথার বিনির্মাণে তিনি বেশ সাহসীকতার পরিচয় দিয়েছেন। মনসামঙ্গালে বেহুলার প্রতি সমাজের ও দেবতাদের যে কুনজর তা কোথাও যেন বেউলার সাথে একসূত্রেই গাঁথা। বেউলা বেদে। আবিদ বেপারিও লখিন্দরের মতো বণিক সম্প্রদায়ের। আসলে যুগের পর যুগ ধরে বেউলা কিংবা বেহুলারা ভোগের উপাদানই হয়ে

আছে শুধু পুরুষতন্ত্রের মুখোশটা সময়ের সাথে সাথে তার ভোল বদলিয়েছে। আবিদ বেপারিকে খুন, অবশ্যই একটি অসামাজিক অন্যায় কাজ, কিন্তু নারীকে একা পেয়ে ভোগ করার লালসাও অন্যায়। বলাবাহুল্য, গল্পে বেউলা নিজেকে বিকিয়ে দিতে প্রস্তুতই ছিল। আবিদ বেপারি তাকে জোর করেছে এমন নয়। নারীবাদের পক্ষেও বেউলার এই কাণ্ডকারখানাকে সঠিক বলে প্রতিষ্ঠা করা দুঃসাধ্য। তবে পেটের দায়ে সে এই কাজ করেছে এমন বললে ভুল হবে না। আবিদ বেপারির নারী লোভ যেমন অসহনীয় তেমনি বেউলারও শরীরকে ব্যবহার করে ও ঠকিয়ে অর্থ লুণ্ঠনও পৌরুষের অমর্যাদা। এখন প্রশ্ন ওঠে, বেহুলাও তো জেনে বুঝে লখিন্দরকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে গিয়েছিল সেটা কি পরোক্ষভাবে খুন নয়! যদি খুনই হয়ে থাকে তবে তা সে তা কেন করেছিল পুরুষতন্ত্রের চাপে না সতী হওয়ার তাগিদে! বেহুলার আচরণ দেখে এই কথাই মনে হয়—

> হৃদয় তোমাকে পেয়েছি, স্রোতস্বিনী!/তুমি থেকে থেকে উত্তাল হয়ে ছোটো,/কখনও জোয়ারে আকণ্ঠ বেয়ে ওঠো,/তোমার সে-রূপ বেহুলার মতো চিনি।/তোমার উৎসে স্মৃতি করে যাওয়া-আসা,/মনে মনে চলি চঞ্চল অভিযানে,/সাহচর্যে চলি, নয় অভিমানে,/আমার কথায় তোমারই তো পাওয়া ভাষা।[১৭]

মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলাকে স্বীকার হতে হয়েছিল নোংরা রাজনীতির। সে বুঝতে পেরে কিংবা না পেরে সব মেনে নিয়েছিল। সমাজের যারা মাথা, তাদের ষড়যন্ত্রের স্বীকার সেই যুগে যেমন বহাল ছিল, তেমনি তার ধারা আজও চলমান। বাণী বসুর 'বেহুলার ভেলা' এ যুগের আখ্যান হলেও, তার মধ্যে নিহিত আছে মধ্যযুগীয় দ্যোতনা। চাঁদ সদাগর কিংবা মনসা কি পারত না, তাদের দম্ভ, অহংকারকে পরিত্যাগ করে বেহুলার জীবনকে বিষিয়ে না দিতে। পারত, কিন্তু তারা তা করেনি। কারণ এতে তাদের আত্মসম্মানে ঘা লাগে। আসলে যুগের পর যুগ আসে আর যায়। কোনো যুগে বেহুলা তো কোনো যুগে সংহিতা হয় তার স্বীকার। সংহিতা 'বেহুলার ভেলা' গল্পের নায়িকা। জৌলুসে পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান স্বার্থের তাগিদে চুপ করে থেকে মজা দেখলেও বেহুলারা, সংহিতারা ঘুরে দাঁড়ায়। সমাজের চোখরাঙানীকে উপেক্ষা করেই তারা নিজের নিজের সংকল্পে থাকে অনড়। বেহুলা লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে নিয়ে আসে। অমিতেশের জন্য সংহিতা দেয় আত্মবলিদান। সমাজ দেখে, উল্লাস করে, নারীর স্পর্ধা পায় সংবর্ধনা; কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কাছে নারী যে তার সম্মানকে বিসর্জন দিয়েছে, তার হদিসও রাখে না। নারীর কী দায় পরেছে যে যুগের পর যুগ ধরে সমাজ যে কালিমা তাকে ছুড়ে দেবে তা বরণ করে নেবে! অমিতেশ যখন বলে—

> একটা মহৎ স্বপ্ন সত্য করতে গেলে ওরকম অনেক মেয়ের আত্মত্যাগের দরকার হয় রজতদা। যারা কোম্পানি এগজিকিউটিভের বউ হয়ে শেষ দুপুরের কফি পার্টিতে স্যোসাল ওয়ার্ক করতে যায় সেরকম শৌখিন মজদুরির ধাত সংহিতার নয়।[১৮]

তখন এ যুগের প্রতিষ্ঠান রজতদা, যিনি একসময় বিপ্লবের অঙ্গীকারকে মানতে নারাজ ছিলেন, তিনি ভাবেন—

> হেতালের লাঠি নিয়ে বসে আছি লোহার সিঁড়িতে/কালরাত্রি কেটে যাবে ভাবি, ওরা বাসর জাগুক/এমন রাত্রিতে কোনো ফণা এসে যেন না ওদের/শিয়রে কুণ্ডল করে, কেটে যাক

> প্রেমের প্রহর।/কিন্তু বড়ো ঘুম, এক কালঘুম মায়াঘুম কেন/কেবলই জড়ায় চোখ, অবসাদে ভরে দেয় শিরা/সমস্ত চেতনাঘেরা নাগিনীপিচ্ছিল অন্ধকারে/ঢিল হয়ে আসে মুঠি, খসে আসে হেতালের লাঠি।[১৯]

গল্পে পুলিশের অত্যাচারে নষ্ট হয়ে যায় সংহিতা ভ্রূণ অমিতেশ সংহিতা ভবিষ্যৎ আশ্রয়, সম্বল। শত বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে, নিজের সমস্ত দৈন্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে বেহুলা ফিরিয়ে আনে লখিন্দরের জীবন আর সংহিতা পঙ্গু স্বামীকে সুস্থ করে তুলতে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে নস্যাৎ করে দিয়ে রঙ্গমঞ্চের লাস্যময়ী অভিনেত্রী হয়ে ছলাকলায় চিত্তবিনোদন করে চলে সমাজবন্দিত পুরুষতন্ত্রের। যেন, 'লম্পট সভায় ছিন্ন খঞ্জনার মতো নেচে নেচে বেহুলা নাচনি একদিন না একদিন আদায় করে আনবেই মুক্তিপণ। বিপ্লব জানতে চাইবে না কীসের মূল্যে মুক্তি খারিদ হল।'[২০]

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'সতত বেহুলা' গল্পটি একটি লিঙ্গ নিরপেক্ষ গল্প। প্রৌঢ় শান্তিনাথ ও তার একাকিত্বকে লেখক এখানে বেহুলার সূত্রে সাজিয়েছেন। শান্তিনাথ এই দমবন্ধ করে দেওয়া পার্থিব পরিবেশ থেকে মুক্তি চাইছেন। মৃত্যু তার কাম্য নয়, তিনি চান পরিতৃপ্তি, শান্তি। সংসারজীবনটা তার কাছে সারবত্তাহীন অস্থিমজ্জাবিহীন কঙ্কাল মাত্র। সে অপেক্ষা করে যদি কেউ হাত বাড়ায়, ফিরিয়ে দেয় জীবনের উচ্ছ্বাস। কিন্তু প্রতি পদে পদে তাকে হতে হয় হতাশ। আসলে সে নিজেকে নিয়ে নিজের দুঃখ নিয়ে এত ব্যস্ত যে সে বুঝে উঠতে পারে না, 'জী-ব-ন থেমে থা-কে-না।'[২১] সংসারের পূতিগন্ধে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে— বেহুলা যেভাবে মৃত লখিন্দরের দেহ আগলে কলার ভেলায় ভেসে গিয়েছিল, শান্তিনাথও ঠিক সেভাবেই শূন্য ফাঁপা সংসার জীবনের মধ্যে কোনোক্রমে দিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছে। তার বিশ্বাস আবার সুদিন আসবে, আসবেই—

> সে জাগবেই। জাগবেই। আমি তাকে কোলে নিয়ে
> ব'সে আছি রক্ত পুঁজে মাখামাখি রাত্রি
> ভেলায় ভাসিয়ে। আমি কান্নার যন্ত্রণা
> গঙ্গায় সাগরে রেখে কাক তাড়াই। যাত্রী
> যারা ভিড় করে, হায়না, শকুন, শেয়াল
> কেউ বন্ধু নয়। লুব্ধ শিকারীর থাবা
> ধারালো দাঁতের কশা দ্বিপ্রহরকেও
> ছিঁড়ে ফেলে। তবু আমি বাংলার বিধবা
> সতী, তাকে ফিরে পাব, হয়েছি সাবিত্রী![২২]

বেহুলা গাঙুরের জলে ভাসলেও তার জীবনের থেকে কিছু পাওয়ার ছিল। সে তখন নেহাতই যুবতী। অন্যদিকে শান্তিনাথ প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁছিয়েছে। জীবনের থেকে তার তেমন চাওয়ার বা পাওয়ার নেই! বাঁচার ইচ্ছে থাকলেও, তিনি কী উদ্দেশ্যে বেঁচে আছেন জানেন না। মানুষের পরিবর্তনশীল অবস্থানের সাপেক্ষে ঘটেছে গল্পকথন। মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার প্রার্থনা নিয়ে বেহুলার অমরাবতী যাত্রা। আর গল্পে শান্তিনাথ মৃত সংসারের সাথে লড়তে লড়তে যখন হাঁপিয়ে উঠেছেন, তখন তিনি মুক্তির আশায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেহুলা

সাজার। 'তিনি বেহুলা সাজবেন 'একান্ত স্বাধীনতা' নামক দেবতার কাছে। সাজবার খেলায় মাতবেন।'[২৩] কারণ, বেহুলার অবস্থার সাথে শান্তিনাথের অবস্থার কোন পার্থক্য নেই, শুধু জীবনের তাৎপর্যে তাদের অবস্থান ভিন্ন।

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গালকাব্যের কথনশৈলীর মধ্যে মহাকাব্যিক বিকাশ না ঘটলেও, তার একটি ঔপন্যাসিক চলন রয়েছে। নানা টুকরো টুকরো ঘটনা এতে সমাহিত এবং তারা স্বতন্ত্র, কিন্তু একে অপরের সাথে সুনির্দিষ্ট ঐক্যসূত্রে গাথা। এতে যুক্তি-প্রতিযুক্তির বিচ্যুতি ঘটলেও, তা কাব্য-কাহিনির ছন্দময় চলনকে ব্যাহত করে না। চরিত্রদের ক্রিয়াকলাপ অলৌকিক, তা সত্ত্বেও তাদের চরিত্রায়ণ কোনো ঔপন্যাসিকের চরিত্রচিত্রণ অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়। আধুনিক গল্প-উপন্যাসকে সমানে সমানে টক্কর দেওয়ার ক্ষমতা বঙ্গা-ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ মঙ্গালকাব্যগুলির মধ্যে বর্তমান। তাই মঙ্গালকাব্যচর্চা ও মঙ্গালকাব্যের বিনির্মাণ দুটিই সমান তালে হয়ে চলেছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতেও এই ধারা সচল থাকবে এবং পাঠক সুযোগ পাবে মঙ্গালকাব্য পাঠের নতুন আঙ্গিকের সাথে পরিচিত হতে।

উৎসের সন্ধানে

১. জীবনানন্দ দাশ : 'প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র', 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি', অবসর, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ২০০৫, পৃ. ১২০
২. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : 'গল্প পঞ্চাশৎ', 'প্রত্যাবর্তন', মুকুন্দ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৭০০
৩. শংকর দাশগুপ্ত : 'স্বপ্নে জাগরণে', তুলসী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, অনুভব, কবিতা পত্র, শারদ সংকলন ১৩৯৪, পৃ. ১৬
৪. উৎস-২, পৃ. ৭০১
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০২
৬. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : "শ্রেষ্ঠ কবিতা", 'বেহুলা নাচানো স্বর্গ', ভারবি, কলকাতা, প্রথম ভারবি সংস্করণ মার্চ ১৯৬০, পৃ. ৩০
৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : "গল্প সমগ্র", 'পরাজয়', প্রতীক, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ১৯
৮. ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় : 'শুধু আবৃত্তির জন্য', সব্যসাচী দেব, 'বেহুলা ভাসান', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, দ্বাদশ প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২১৮
৯. মহাশ্বেতা দেবী : "ছোটগল্প সঙ্কলন", 'বেহুলা', ন্যাশানল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, দিল্লি, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ১০১
১০. অরুণ মিত্র : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'ও বেহুলা', দে'জ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ নববর্ষ ১৪০৬, পৃ. ২০৬
১১. প্রাগুক্ত
১২. উৎস-৬, ৯২
১৩. সাহিত্য সঞ্চয়ন, বাংলা (প্রথম ভাষা), দশম শ্রেণি, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, 'সাজ ভেসে গেছে', পশ্চিমবঙ্গা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৭, পৃ. ৭১

১৪. সঞ্জয় ভট্টাচার্য : "শ্রেষ্ঠ কবিতা", 'বেহুলা', ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ. ১৭৬-১৭৭
১৫. মতি নন্দী : "গল্প সংগ্রহ", 'বেহুলার ভেলা', বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২, পৃ. ২৯৯
১৬. বিজয় গুপ্ত : 'পদ্মাপুরাণ' বা 'মনসামঙ্গল', শ্রী বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সঙ্কলিত, সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৪২, পৃ. ১৬৪
১৭. বিষ্ণু দে : আলেখ্য, 'এবং লখিন্দর', এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৬৫, পৃ. ৪৭
১৮. https://www.ebanglalibrary.com/১৫২৪৩/বেহুলার-ভেলা-২/
১৯. শঙ্খ ঘোষ : "শ্রেষ্ঠ কবিতা", 'হেতালের লাঠি', দে'জ পাবলিকেশন, বৈশাখ ১৪১৫, পৃ. ১২৫
২০. উৎস-১৮
২১. সাধন চট্টোপাধ্যায় : "গল্প সমগ্র", তৃতীয় খণ্ড, 'সতত বেহুলা', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, বৈশাখ ১৪২৫, পৃ. ১৫৫
২২. উৎস-৬, পৃ. ১২
২৩. সাধন চট্টোপাধ্যায় : "গল্প সমগ্র", তৃতীয় খণ্ড, 'সতত বেহুলা', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, বৈশাখ ১৪২৫, পৃ. ১৫৭

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

সঙ্গীত বর্মন

চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের কথা এলে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর নামটি সবার আগে ভেসে ওঠে। রচনাকৌশলের মুন্সিয়ানা ও জনপ্রিয়তায় তিনি যে উচ্চতা ছুঁইয়েছেন তা অন্য কোনো চণ্ডীমঙ্গালের কবি পারেননি। চণ্ডীমঙ্গালের শ্রেষ্ঠ কবি কে? এ নিয়ে কারও মনে সংশয় নেই। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গালের আদি কবির স্থান নিয়ে গবেষক মহলে সংশয় রয়েছে। মানিক দত্তকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীমঙ্গালের আদি কবির স্থান দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গো বলা যায় মানিক দত্তের অস্তিত্ব ও তাঁর কাব্যের গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করেছেন খুব অল্পসংখ্যক বিশিষ্ট গবেষক ও সাহিত্যিক। তাদের যুক্তি ও ভাবনাকে মাথায় রেখে কবি মানিক দত্তকে আবিষ্কার করব এই প্রবন্ধে।

কবি মানিক দত্ত সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত ধারণার অভাব আছে। এ পর্যন্ত মানিক দত্তের যা পুথি পাওয়া গেছে তা কবি ও কাব্য সম্পর্কে জানার জন্য যথেষ্ট নয়। আরও প্রাচীনতর কোনো পুথির আবিষ্কার হলে কবির সঙ্গো জড়িত অনেক ঐতিহাসিক সত্যের প্রকাশ ঘটবে বলে আশা করা যায়। মানিক দত্ত এবং তাঁর কাব্যের প্রাচীনত্ব নিয়ে মতান্তর রয়েছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল নিয়ে প্রথম প্রবন্ধ লিখেছেন রজনীকান্ত চক্রবর্তী। তিনি বলেছেন—

> মাণিকদত্তের মঙ্গালচণ্ডী অতি প্রাচীন। গ্রন্থকার কোন্ সময়ের ও কোন্ দেশের লোক তাহা জানিতে পারি নাই।... মানিকদত্ত মুকুন্দরাম অপেক্ষা প্রাচীন, মানিকদত্তের রচনা অপেক্ষা মুকুন্দরামের রচনা ও ভাব উৎকৃষ্ট।[১]

আশুতোষ ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গো বলেছেন—"মানিক দত্ত মুকুন্দরামের অগ্রবর্তী, তবে একেবারে তিনশত বৎসরের অগ্রবর্তী কিনা, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।"[২]

মানিক দত্তের প্রাচীনত্ব নিয়ে একাধিক মানিক দত্তের প্রসঙ্গা এনেছেন অনেকেই। সুকুমার সেনের বক্তব্যে প্রাচীন ও নবীন মানিক দত্তের কথা উল্লেখ আছে। তিনি বলেছেন—

> উত্তরবঙ্গো মানিকদত্তের পাঞ্চালী বলিয়া যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মানিকদত্তের ভণিতা থাকিলেও কাহিনী মোটেই প্রাচীন নয় এবং তাহা চণ্ডীমঙ্গালের কোন আদি কবি মানিকদত্তের রচনা নয়। কেননা পুথিরর মধ্যেই প্রাচীন ও নবীন দুইজন মানিকদত্তের উল্লেখ রহিয়াছে।[৩]

আশুতোষ ভট্টাচার্য একইভাবে একাধিক মানিক দত্তের কথা বলেছেন—

> বরং মুকুন্দরামের অনুকরণেই মানিক দত্তের নামে পরবর্তীকালে কোন কবি কর্তৃক ইহা রচিত

হইয়াছে, ইহাই মনে করা যুক্তিসঙ্গত হইবে। অতএব মনে হয়, মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবি মানিক দত্তের কোন জীর্ণ ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই বর্তমান কাব্যখানি রচিত হইয়াছিল।[৪]

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দুই কবির প্রসঙ্গে একাধিক পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি পেশ করেছেন। পরবর্তীকালে শ্রী সুনীলকুমার ওঝা কয়েকটি পালার ভিন্ন ভিন্ন পুথি এবং চণ্ডীমঙ্গাল গায়কদের সহযোগিতায় মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গালের পালা সংগ্রহ করেছেন। চণ্ডীমঙ্গাল বিষয়ক গ্রন্থটিও প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি বলেছেন—

আমরা যে পুঁথি পাইয়াছি তাহাতে ড. ভট্টাচার্য এবং ড. বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্ধৃতির কোন অংশই নাই। সুতরাং আমাদের পুঁথির ভিত্তিতে আমরা বলিতে পারি যে ঐগুলি পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ।...এই সমস্ত উদ্ধৃতি এবং অনুরূপ আরও অনেক ভণিতা আলোচনা করিলে ইহাই বরং প্রকট হইয়া উঠে যে যিনি গায়ক তিনিই মূলতঃ রচনাকারী। অধিকন্তু কাব্য-সৃষ্টির যে কাহিনি তাহাতে দুই মানিকদত্তের প্রশ্ন আনয়ন করা, আমাদের মনে হয়, চলে না।[৫]

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে একাধিক জায়গায় মানিক দত্তের প্রসঙ্গ আছে। মুকুন্দরাম মানিক দত্তকে অগ্রবর্তী কবি হিসেবে সম্মান জানিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ একটি লাইনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম—

মানিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈলো গীত-পথ পরিচয়।।

সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে এই ধরনের লাইনের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—"এ উক্তি কোন গায়কের প্রক্ষেপ হইতে পারে।"[৬] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে মানিক দত্ত সম্পর্কে মুকুন্দরামের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন লাইনের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—

অবশ্য সমস্ত পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থে এই শ্লোক পাওয়া যাইতেছে না। সে যাহা হোক, মানিকদত্তের এই উল্লেখ হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, এই নামীয় কোন কবি মুকুন্দরামের পূর্বে চণ্ডীমঙ্গাল রচনা করিয়াছিলেন এবং মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।[৭]

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মানিক দত্তের সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য মন্তব্য করেছেন। বক্তব্যটি হল—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় সম্প্রতি মানিক দত্তকৃত একখানি চণ্ডীমঙ্গালের খণ্ডিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে এমন একটি অংশ পাওয়া যাইতেছে, যাহা দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আলোচ্য মাণিক দত্তের প্রতিই মুকুন্দরাম বিনয় প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। এমন কি, হয়ত বা মাণিক দত্ত রচিত চণ্ডীমঙ্গাল দেখিয়া ও পাঠ করিয়াই মুকুন্দরাম তাঁহার বিখ্যাত কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই বর্ণনাটি যথার্থ হইলে বলিতে হয় যে, মাণিক দত্ত মুকুন্দের পূর্ব চণ্ডীর গান রচনা করেন এবং তাহা দেখিয়া মুকুন্দ স্বীয় গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্তি লাভ করেন বলিয়া মানিক দত্তের প্রতি তাঁহার বিনয় প্রকাশ স্বাভাবিক।[৮]

কবির আত্মপরিচয় অংশে বাসস্থান সম্পর্কে ফুল-ফুল্যানগরের নাম করেছেন। ফুল-ফুল্যানগর যে মালদহে অবস্থিত তা অনেকেই বলেছেন। রজনীকান্ত চক্রবর্তী ও হরিদাস

পালিত তাঁদের প্রবন্ধে মানিক দত্তকে মালদহের কবি বলে জানিয়েছেন। মালদহের ভাষার সঙ্গো কবির কাব্যের ভাষার মিল আছে বলেই এই যুক্তি পরিবেশিত হয়েছে। সেই ধারণার কথাও আশুতোষ ভট্টাচার্যের কথাতে ধরা পড়ে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের এ বিষয়ে বক্তব্যটি হল—

> মানিক দত্তের রচনা পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, তিনি প্রাচীন গৌড়ে বা মালদহ অঞ্চলের লোক। তাঁহার কাব্য এখনও মালদহ অঞ্চলেই প্রচলিত আছে। তাহাতে যে সমস্ত স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা সমস্তই মালদহ বা গৌড়ের সন্নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত।[৯]

মানিক দত্তের বাড়ি মালদহে ছিল কিনা, তার সঠিক ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। আবার সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত যুক্তিগুলোকেও নসাৎ করা যায় না। তবে যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে, তার ভিত্তিতে অনুমান সাপেক্ষে বলাই যায়, মানিক দত্ত মালদহের অধিবাসী ছিলেন।

মানিক দত্ত সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর—'History of Bengali Language and Literature' গ্রন্থে বলেছেন—"Manik Datta and Dviga Janardan lived probably towards the end of the 13th Century."[১০] মানিক দত্তের জীবনকালের সময়সীমা সঠিক নির্ধারণ করতে না পারলেও, মানিক দত্ত কোন্ শতাব্দীর ছিলেন তার অনুমান করে বলেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গোপীচন্দ্রের গান, বেহুলা, লখিন্দর, কালকেতু এবং লাউসেনের কাহিনি সম্পর্কে বলেছেন—

> But the national legends of Bengal, the Stories of Gopi-canda, of Behula and Lakhindar, of Khullana and Dhana-pati, of Phullara and Kala-Ketu and of Lausena which were treated in great poems in the following centuries, were probably taking shape during this Century.[১১]

অর্থাৎ উল্লেখিত কাহিনিগুলো একশত বৎসরের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। এইসব জাতীয় কাহিনিগুলির প্রাচীনত্ব প্রায় একই শতাব্দীর। বলাই বাহুল্য এই জাতীয় কাহিনির মধ্যে রয়েছে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করে বলেছেন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল কাহিনির উত্থান হয়েছে। তাঁর লিখিত গ্রন্থে সেই কথাই ধ্বনিত হয়েছে—

> But there was some literary activity and kana Hari-dutta, Mayura-Bhatta and Manika Dutta, Who are mentioned by later poets as being the first to take up respectively the Behula legend, the lau-sena romance and the Candi legends and treat then in long narrative poems to be chanted before a gathering of people at a number of sittings, seem to have flourshied before 1300.[১২]

মানিক দত্তের কাব্যের প্রসঙ্গা এলে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গালের সঙ্গো তুলনা চলে আসে। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মানিক দত্তের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন ও মার্জিত শিল্পী। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গাল কাহিনিতে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত পুরাণের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মুকুন্দরামের কাহিনি থেকে মানিক দত্তের কাহিনি একটু আলাদা। মানিক দত্তের পৌরাণিক

অংশে শূন্যবাদ ও বৌদ্ধশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গালের গীতের প্রভাবের সময় এদেশে বৌদ্ধভাবের সৃষ্টি ও চণ্ডিকার উৎপত্তি হয়েছে বলে হরিদাস পালিত মনে করেন। মঙ্গালচণ্ডী দেবী এই বৌদ্ধধর্ম থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বলে ধরা হয়। চণ্ডীমঙ্গালে তাই বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বের আখ্যান পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে হিন্দু পুরাণ ও বৌদ্ধভাবের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে। আর এই সমন্বয় সাধনের পালার বীজ মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে লক্ষ করা যায়। দীনেশচন্দ্র সেন মানিক দত্তের কাব্যে শূন্যপুরাণ ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেখেছেন—"His poem also gives an account on creation on the lines of the Sunya Purana, with obvious traces of Buddhism."[১৩] পরবর্তীকালের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে এই প্রভাব পড়েছে তার বলাই বাহুল্য। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গালের এই দিকটি (বৌদ্ধপ্রভাব) গবেষণা করলে আরও নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলে আশা করা যায়।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গালের কাহিনি বিন্যাসে আছে বৈচিত্র্য। প্রচলিত কাহিনির মধ্যে রয়েছে লৌকিক কাহিনি ও ঐতিহ্য, সংস্কার-বিশ্বাস এবং বাস্তবিক জ্ঞানের প্রভাব। কিন্তু অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গালে সংস্কৃত পুরাণ ও মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল কাহিনির বিস্তার ও সামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়। আদি চণ্ডীমঙ্গাল বলেই হয়তো তার চণ্ডীমঙ্গাল অনেক বেশি লৌকিক ও জাঁকজমকপূর্ণ নয়। কাহিনিতে কিছু কিছু অসঙ্গাতি দেখা যায়। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

> একমাত্র সৃষ্টিতত্ত্বের আখ্যান ব্যতীত মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে আর কোনও বিষয়ে নূতনত্ব নাই। ইহাতেও দুইটি কাহিনি, কালকেতু ব্যাধের কাহিনি ও ধনপতি সদাগরের কাহিনি অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, পরবর্তীকালে মুকুন্দরামের ব্যাপক প্রভাবের ফলে এই কাহিনীগত সমগ্র অনৈক্য একপ্রকার বিদুরিত হইয়া গিয়াছিল। অতএব মাণিক দত্তের মূল গ্রন্থের সন্ধান যতদিন না পাওয়া যায়, ততদিন এই সম্পর্কে তাঁহার বৈশিষ্ট্যের কথা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। একমাত্র তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্ব রচনাটিই কালের দুর্জয় পরীক্ষা উপেক্ষা করিয়াই বর্তমান রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।[১৪]

চরিত্রসৃষ্টির শিল্পকৌশলে মানিক দত্ত সময় দেননি। প্রত্যেকটি চরিত্র আপন চরিত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। প্রধান চরিত্রগুলি (চণ্ডী, কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি ইত্যাদি) মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গালের থেকে অনেকটাই নিষ্প্রভ। তবে এ বিষয়ে একটু ভেবে বলা যায় চরিত্রগুলি সৃজনে মানিক দত্ত আপন জীবন অভিজ্ঞতার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। খুব সহজ কথা সহজভাবে, ছলাকলাহীনভাবে সৃজন করেছেন। শিল্পসৃষ্টির সচেতন প্রয়াসে তিনি কাব্যটি লেখেননি। সহজাত ক্ষমতা ও ভক্তিভাব নিয়ে আন্তরিকভাবে নিজের ঘরের কথা প্রকাশ করেছেন। আর তাই মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গালের চরিত্র ও কাহিনি মুকুন্দরামের মতো জনপ্রিয়তা পায়নি। কিন্তু কবির কাব্য গোটা পশ্চিমবঙ্গো বহুল প্রচারিত না হলেও নিজের অঞ্চলে প্রচার পেয়েছিল। যার ফলে মানিক দত্তের 'মঙ্গালচণ্ডীর গীত' কালের করালগ্রাসে অক্ষয় হয়ে আজও অনুভব করা যায়।

মানিক দত্তের কাব্যটি ১৬টি পালার একত্রীকরণে নির্মিত। মঙ্গালবার রাত্রির পালা থেকে শুরু করে পরের মঙ্গালবার রাত্রির পালার শেষ। কাব্যে তিনটি ভাগ বা খণ্ড রয়েছে। খণ্ডগুলি হল দেবখণ্ড বা সৃষ্টিকথা, আখেটিক খণ্ড বা ফুল্লরা-কালকেতুর কথা এবং বণিকখণ্ডের মধ্যে

ধনপতি-লহনা-খুল্লনার কাহিনি। প্রচলিত চণ্ডীমঙ্গালের মতো এখানেও চৌতিশা, বারমাশিয়া, কাঁচুলি নির্মাণ, আত্মপরিচয় ও গ্রন্থ-উৎপত্তির কারণ ইত্যাদি অংশগুলি আছে। কবির আত্মপরিচয় ও গ্রন্থ-উৎপত্তির কারণ বিস্তৃতভাবে কবি আলোচনা করেননি। বারোমাস্যার সংখ্যাও কম। ফুল্লরা, খুল্লনা ও সুশীলা প্রত্যেকের একটি করে বারোমাস্যা আছে। দেবীর শতনাম কথনের কথা আছে। চৌত্রিশ অক্ষরে নির্মিত তিনটি চৌতিশা স্তুতির পরিচয় মেলে। কালকেতু ও শ্রীমন্তের মুখেই চৌতিশা স্তুতিগুলি শোনা যায়। চার রকমের কাঁচুলি নির্মাণ করেছেন মানিক দত্ত। এই চার রকমের কাঁচুলি হল—পক্ষ কাঁচুলি, দেব কাঁচুলি, পুষ্প কাঁচুলি ও মৎস্য কাঁচুলি।

কাব্যের ছন্দ-কুশলতায় কবি বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি। ছন্দের কারুকার্যতা বা রকমফের সীমিত। ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দের অধিক ব্যবহার করেছেন। পাঁচালি ও লাচারির ছন্দের তানে পরিবেশিত হয়েছে তার কাব্য। আশুতোষ ভট্টাচার্য ছন্দ সম্পর্কে যা বলেছেন তার হল—

> অধিকাংশ রচনা তাঁহার ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত।...রচনার দিক দিয়া প্রাচীন ছড়ার আদর্শ হইতে ইহা মুক্ত না হইলেও বিষয়-বস্তুর দৃষ্টিভঙ্গিতে কবি এখানে সামান্য স্বকীয়তার দাবি করিতে পারেন মাত্র।[১৫]

মানিক দত্তের কাব্যে ছন্দ সুষমা ধ্বনিত হয়েছে লাচাড়ি, ত্রিপদী, পদ, দিশা, ফোরাম, কথায়—

১. মা মোরে দয়া কর নারায়ণী। (দিশা)[১৬]

২. দুর্গা বোলে শুন বাছা আমার উত্তর।
আজি ছলিব আমি ইন্দ্র পুরন্দর।। (পদ)[১৭]

৩. ওহে ইন্দ্র সেবা কর কার তরে।
তুমি হঞা ইন্দ্র রাজা কার তরে কর পূজা
কেনে ভাস জলের উপরে।। (নাচাড়ি)[১৮]

৪. য়হে মাতা প্রভূ আমার জগতের দাতা।
শিবের আর্শীবাদে ইন্দ্র পদ মোর
পুত্র হবে কোনমন কথা।। (বোলাম)[১৯]

৫. ইন্দ্র বলেন মাতা প্রত্তয় না পাই আমি।
আপনার মূর্ত্তি তবে ধর দেখি তুমি।। (কথা)[২০]

মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে সমকালীন সমাজচিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের নাম করেছেন। প্রাচীন জনজাতিগুলি হল ডোম, কোচ, হাঁড়ি, চাঁড়াল, কায়স্থ, বৈদ্য, ব্যাধ, কৈবর্ত, বারুই, কুড়ি, পরি ইত্যাদি। পেশাভিত্তিক বৃত্তিগুলি হল—গোপ, জোলা, নাপিত, মালী, কুমার, কামার, বৈদ্য, গোয়ালা, নাটুয়া, কাহার, চাষা, ভান্ডারিয়া, মোল্লা, ফকির ইত্যাদি। এইসমস্ত নামগুলি থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, সমাজের শ্রেণিবিন্যাসে বৈষম্য ও বৈচিত্র্য ছিল। জীবনধারণের জন্য প্রত্যেক জনজাতি ও পেশার মানুষেরা একে উপরের উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র যেমন—সারিন্দা, মন্দিরা, ঘুঘুরা, খঞ্জরি, দোতারা, তাম্বুর, রণকাড়া, বাঁশি, বেণু, করতাল ইত্যাদির উল্লেখ আছে কাব্যে। সমাজের মানুষের

জীবনের সঙ্গো বাদ্যযন্ত্র ও সংগীত চর্চা একে অপরের পরিপূরক তার আভাস রয়েছে মানিক দত্তের কাব্যে। লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের নমুনা রয়েছে গোটা কাব্য জুড়ে। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, সাধভক্ষণ, অতিথি আপ্যায়ন—সবক্ষেত্রেই লোকঐতিহ্যের সংস্পর্শ রয়েছে। মানিক দত্ত এই কাব্যের মধ্যে লোকজীবনের বাস্তবচিত্রকে তুলে ধরেছেন। মানিক দত্ত সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> কবির আত্মজীবনী-জ্ঞাপক পয়ার হইতে মনে হয়, তিনি শিক্ষায় অধিক দূর অগ্রসর হন নাই। মঙ্গালচণ্ডীর গীত গাহিয়াই বোধহয় কবি জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং দোহার ও বাজনাদার সঙ্গো লইয়া গ্রামে-গ্রামান্তরে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। কাজেই গীতিকাটিতে সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও শিল্পকৌশলের বিশেষ কোন পরিচয় নাই।[২১]

মানিক দত্তের কাব্যের শিল্পমূল্য সম্পর্কে একাধিক সমালোচক মনে করেন সৃষ্টিপালা বাদ দিলে কাব্য হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গো আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করেন—

> এত প্রাচীন একজন কবির একেবারে খাঁটি রচনার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা দুষ্কর। এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীর বহুল প্রচারের জন্য পরবর্তীকালে মানিক দত্তের কাব্যেও মুকুন্দরামের অনেক পদ আসিয়া প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। পরবর্তী গায়েনগণ মানিক দত্তের পদের মধ্যে মুকুন্দরামের পদেরও যোজনা করিয়া লইত, তাহাতেই মানিক দত্তের পুঁথির মধ্যে অনেক স্থলেই মুকুন্দরামের পদের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে।[২২]

মানিক দত্তের কাব্য সম্পর্কে নেতিবাচক যে মূল্যায়ন করা হয় তার কারণ এটাও হতে পারে। চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যধারায় মানিক দত্তের কাব্যের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হলে আরো প্রাচীন পুথির যেমন দরকার আছে, তেমনি দরকার আরো বেশি গবেষণার। তবে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল সম্পর্কে শ্রী হরিপদ চক্রবর্তী যা বলেছেন সে বিষয়ে একমত হতে আপত্তি থাকার কথা নয়। তিনি বলেছেন—

> কাহিনি বিন্যাসে প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে যে রূপকথা, লৌকিক কাহিনি, লোকায়ত প্রত্যয়ের মিশ্র প্রকাশ আছে তা অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গালে বিরল। অর্থাৎ মঙ্গালকাব্য-ধারায় প্রাচীন রূপটি ইহার মধ্যে অধিকতরভাবে বিদ্যমান।[২৩]

উৎসের সন্ধানে

১. রজনীকান্ত চক্রবর্তী : 'মাণিক দত্তের মঙ্গালচণ্ডী', সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক, একাদশ ভাগ), সম্পাদক : বসু, নগেন্দ্রনাথ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ্যৎ, কলকাতা, ১৩১১, পৃ. ৩৪-৩৫
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস', এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ. ৩৮০
৩. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ : নভেম্বর ২০০৭, পৃ. ৪৪৯
৪. উৎস-২, পৃ. ৩৮১
৫. সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত : 'মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গাল', উত্তরবঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়, লিপিকা প্রেস, শিলিগুড়ি, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ.৬১

৬. উৎস-৩, পৃ. ৪৪৯

৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (দ্বিতীয় খণ্ড : চৈতন্যযুগ), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ. ১৩৬

৮. তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য : 'মাণিক দত্ত ও মুকুন্দরাম', সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, পত্রিকাধ্যক্ষ : চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৪৫, পৃ. ১১৪

৯. উৎস-২, পৃ. ৩৮৪

১০. Dinesh Sen : 'History of Bengali Language and Literature', University of Calcutta, 1954, P. no. 296

১১. Suniti Kumar Chatterji : 'The Origin and Development of the Bengali Language' (Part-1) Calcutta University Press, 1926, P. no. 131

১২. তদেব : পৃ. ১৩১

১৩. Dinesh Sen : 'History of Bengali Language and Literature' University of Calcutta, 1954, P. no. 296

১৪. উৎস-২, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭

১৫. তদেব : পৃ. ৩৮৪

১৬. সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত : 'মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল', উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, লিপিকা প্রেস, শিলিগুড়ি, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ.৪৮

১৭. তদেব, পৃ. ৪৮

১৮. তদেব, পৃ. ৪৮

১৯. তদেব, পৃ. ৪৯

২০. তদেব, পৃ. ৪৯

২১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (দ্বিতীয় খণ্ড : চৈতন্যযুগ), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ. ১৪৪

২২. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ. ৩৮৬

২৩. হরিপদ চক্রবর্তী : 'কবি মানিকদত্ত প্রসঙ্গো', মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, সম্পাদক : ওঝা, সুনীলকুমার, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, লিপিকা প্রেস, শিলিগুড়ি, পৃ. ভূমিকাংশ।

ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গাল' কাব্যে পুরাণ প্রসঙ্গ

রত্নজ্যোতি নায়েক

ঘনরাম চক্রবর্তী বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কইয়র (বর্তমানে কোয়োড়) পরগণার কৃষ্ণপুর গ্রামে (বর্তমানে খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর কুকুড়া গ্রামে) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গৌরীকান্ত ও মাতা সীতার কথা লিখেছেন তিনি 'ঢেকুর পালা'য়—

মাতা যার মহাদেবী সতী সাধী সীতা।
কবি কান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥

এছাড়াও পিতা-মাতার কথা উল্লেখ করেছেন হরিশচন্দ্র পালা, গৌড়যাত্রা পালা, জাগরণ পালা ও পশ্চিম উদয় পালায়। তাঁর কাব্যের নাম হিসেবে ভণিতায় আমরা যে নামগুলি পাই তা হল—'ধর্ম্মসঙ্গীত', 'অনাদিসঙ্গীত', 'ধর্ম্মকীর্তন', 'ধর্ম্মমঙ্গাল', 'অনাদিমঙ্গাল', 'অভিনব ধর্ম্মমঙ্গাল', 'মধুরভারতী' ও 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গাল'। ভণিতায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি 'ধর্মসঙ্গীত' নামটিই ব্যবহার করেছেন। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের রাজত্বকালে তিনি কাব্যরচনা করেন। কবির কাব্যরচনার আরম্ভকাল স্মরণে নেই সে কথা জানিয়েছেন—'সঙ্গীত আরম্ভকাল নাহিক স্মরণ।'[১] সমাপন কালের উল্লেখ করেছেন—

শুন সবে যে কালে হইল সমাপণ।।/শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর।/মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।।/সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াক্ষ্য তিথি।/যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি।।[২]

তিনি কাব্যরচনা করেছিলেন ৮ অগ্রহায়ণ ১৬৩৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭১১ খ্রিস্টাব্দ[৩]। ধর্ম্মঙ্গালের আদি কবি ময়ূরভট্টকে সম্মান জানিয়েছেন ঘনরাম—

ময়ূরভট্ট বন্দিব সংগীত আদ্য কবি।
ময়ূরভট্ট বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়।।

ময়ূরভট্ট কাব্য তার পরিচিত ছিল বলে মনে হয় না। পূর্ববর্তী কবিদের অনুসরণেই কবি ময়ূরভট্টের নাম করেছেন। ঘনরাম রামবাটীতে তাঁর গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ঘনরাম সংস্কৃততে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং শাস্ত্র, পুরাণ ও পৌরাণিক কাব্যে তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল। ঘনরামের 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গাল' কাব্য পাঠ করলে দেখা যায় এই কাব্যের উপর 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ও 'শ্রীমদ্ভাগবত' নামক তিনটি কাব্যের প্রভাব গভীরভাবে রয়েছে। এই তিনটি কাব্যের প্রভাব বিশেষত 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গাল' কাব্যের তুলনামূলক কাহিনি বর্ণনায়, পরিবেশ সৃষ্টিতে, চরিত্র চিত্রণে, কলা এবং কাঁচলির চিত্র বর্ণনায় লক্ষ করা যায়।

● **রামায়ণ প্রসঙ্গ :** ঘনরাম নিজে এবং তাঁর পিতৃপুরুষেরাও রামভক্ত ছিলেন। তিনি যে রামভক্ত ছিলেন তার প্রমাণ কাব্যের ভণিতাগুলি হতে বুঝতে পারা যায়। 'আশীর্বাদ কর যে রাঘবে রয় মতি' কিংবা 'ঘনরাম ভনে যার নাথ রঘুবীর' অথবা 'প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান' ইত্যাদি ভণিতা হতে তাঁর রামভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল রামনাম করলে যে সকল পাতক নষ্ট হবে তা তিনি বর্ণনা করেছেন—

> পাতক পালায় দূরে রা শব্দ করিতে।/ম-কারে কপাট পড়ে পুনঃ প্রবেশিতে॥/এমন রামের নাম থাকিতে নিগূঢ়।/কেন ঘোর নরকে নিবাস করে মূঢ়।।/দুস্পার সংসার ঘোর বিস্তার সাগর।/ নিস্তার পাইবে সুখে ভজ রঘুবর।।

এই রামভক্তির পরিচয় ঘনরামের কাব্যের সর্বত্রই রয়েছে। কবি বলেছেন ধর্মঠাকুরই রামচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—"কালে কালে করেছ যতেক উপকার/যখন জগতে জন্ম রাম অবতার।"[৪] দেখা যায় রামচন্দ্রের বাহন হনুমানই ধর্মঠাকুরের বাহন উলুক বা হনুমান। ধর্মঠাকুর হনুমানকে কোনো কাজ করতে বললে রাম অবতারের নানা প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন—

১. ষষ্ঠ সর্গ 'লাউসেনের জন্ম পালা'য়

ক. রানি রঞ্জাবতীর অনুরোধে কর্ণসেন কর্তৃক প্রেরিত নাপিত নৃসিংহ দাস ও রজক রাজীব গৌড়ে যখন লাউসেনের জন্মানোর সংবাদ আনেন তখন গৌড়েশ্বর, পন্ডিতের কাছে রামায়ণে রামের জন্মবৃত্তান্ত শুনছিলেন—

> কি জানি কৌশল্যা রাণী কত পুণ্যফলে।/ত্রিলোকের নাথ রাম পুত্র পাইল কোলে।।/শুনিয়া রামের জন্ম পুলকিত প্রেমে।/পণ্ডিত পুজিল রাজা সহস্রেক হেমে।।/হর্ষ হয়ে তখন পণ্ডিত বান্ধে পুঁথি।/হেন কালে আসি দোঁহে করিল প্রণতি।।/এত কালে ঠাকুর হলেন পরতেক।/কর্ণসেন রায়ের বালক হল এক।।[৫]

খ. মহামদের আদেশে কোটাল ইন্দ্রজাল মেটে কর্তৃক লাউসেন অপহৃত হওয়ার সময়ে মহীরাবণ কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণকে চুরির প্রসঙ্গ এসেছে। হনুমানকে ধর্মরাজ বলেছেন—

> মায়াবলে মহীরাজ করিয়া চাতুরী।/শ্রীরাম লক্ষ্মণে যবে করে নিল চুরি।।/পাতালে রাখিল দুস্ট দিতে বলিদান।/সেকথা তোমার মনে পড়ে হনুমান।।/আপনি পাতালভূমি করিলে প্রবেশ।/সবংশে বধিলে তারে না রাখিতে শেষ।।/কান্ধে করি দুভায়ে রাখিলে সিন্ধুতটে।/সীতা উদ্ধারিলে তুমি বিষম সঙ্কটে।।/শক্তিশেলে লক্ষ্মণে আপনি দিলে প্রাণ।/তোমার তুলনা কিবা বীর হনুমান।।/এবার তোমার ভার লাউসেন রাখা।/আপনি চোরের ঘরে দিয়ে এস ডাকা।।[৬]

২. নবম সর্গ 'গৌড়যাত্রা পালা'য়

ক. লাউসেন ও কর্পূরের গৌড়যাত্রায় কর্ণসেনের সমর্থন আছে জেনে রঞ্জাবতী বলছেন—

> শ্রীরামে পাঠায়ে বনে রাজা দশরথ।
> পুত্রশোকে প্রাণ ত্যজি পেলে স্বর্গপথ।।[৭]

খ. রঞ্জাবতী যখন লাউসেন এবং কর্পূরকে গৌড়যাত্রার উদ্দেশ্যে যেতে দিতে ভয় পাচ্ছেন তখন মায়ের আশীষে জগৎজয়ের বৃত্তান্ত রঞ্জাবতীকে শোনাচ্ছেন। এইপ্রসঙ্গে লাউসেন রঞ্জাবতীকে বলেন রামায়ণের কৌশল্যার আশীর্বাদধন্য রামের রাবণ বংশকে নিপাত করার কাহিনি—"লাউসেন বলে মাতা না ভাবিও ভয়।/জননীর আশীষে জগতে হয় জয়।।/কৌশল্যার

আশীষে ঠাকুর রঘুনাথ।/সবংশ রাবণরাজে করিল নিপাত।।"[৮] এছাড়াও সীতার আশীর্বাদধন্য লব-কুশের রামকে জয় করার কাহিনি—

লবকুশে আনন্দে আশীষ কৈল সীতা
সেই তেজে জিনে তারা রাম হেন পিতা।।[৯]

৩. দশম সর্গ 'কামদলবধ পালা'য়

সত্য রক্ষা করবার দৃষ্টান্ত দিয়ে কর্পূর লাউসেনকে বলছেন রামায়ণের প্রসঙ্গ—"মহারাজ দশরথ সত্যের কারণে।/ত্রিলোকের নাম রামে পাঠাইলে বনে।।/বিভীষণ সুগ্রীবের রাজত্ব সত্য পালি।/কোথা গেল দুর্জয় বানররাজ বালী।।[১০]

৪. দ্বাদশ সর্গ 'গোলাহাট পালা'য়

ক. হনুমানের অনুরোধে সূর্য অকাল উদয়ে অসম্মত হলে হনুমান রামায়ণের ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন—

> পড়ে কিনা পড়ে মনে রাবণের রণে।/শক্তিশেলে যখন লক্ষ্মণ অচেতনে।।/ঔষধ আনিতে যেতে পথে মোর সঙ্গ।/মনে বুঝে দেখ দেখি হৈল কোন রঙ্গ।।/সেই হনুমান আমি এখন বাঁচাই।/সূর্য বলে কার্য নাই চল বাপু যাই।।[১১]

এর ফলে সূর্যের পূর্বস্মৃতি স্মরণ হয় ও সূর্য অকালে উদয় হতে সম্মত হয়।

খ. কর্পূরের নিকট অপমানিত হয়ে সুরিক্ষা 'সুর্পনখা সমান মলিন হয়ে রয়।'[১২]

৫. ত্রয়োদশ সর্গ 'হস্তীবধ পালা'য়

লাউদত্ত কর্মকার ও লাউসেনের সম্পর্ক অনেকটা গুহক চণ্ডাল ও রামচন্দ্রের সম্পর্কের মতো।

রমতি নগরে লাউদত্ত কর্মকারের কাছে মহামদ খবর পাঠান ভিনদেশি পুরুষকে আশ্রয় দিলে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হবে। একথা শুনে লাউসেন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাছতলায় রাত কাটান। মহামদ ষড়যন্ত্র করে কোটালকে দিয়ে লাউসেনের কাছে একটি হাতি বেঁধে রাখলেন। কোটাল ইন্দ্রজাল মেটে লাউসেনকে হাতি চুরির দায়ে ধরলেন। লাউসেন ইন্দ্রজাল মেটেকে বোঝাতে লাগলেন যে তিনি হাতি চুরি করেননি। কিন্তু নির্দয় কোটাল ইন্দ্রজাল মেটে, লাউসেনকে বন্দি করে অকথ্য অত্যাচার করেন। বুকে শিলা, দুপাশে করাত শেল ও মুখে বিষ দেন এবং চুল চালের টঙ্গে বেঁধে দেন। লাউসেন ঠাকুরের কাছে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। ধর্মঠাকুর হনুমানকে দায়িত্ব দিলেন লাউসেনকে মুক্তি দেবার জন্য। হনুমান রাত্রিতে রাজাকে স্বপ্ন দিলেন—

> অবিচারে কারাগারে ধর্ম্মের কিঙ্কর।/অপরাধ বিনা বান্ধ বুকে নাই ডর।।/সাধ করে সাক্ষাৎ করিতে এল তোর।/রাজার নন্দন দুই নয় হাতী চোর।।/ভাল চাও ছাড়ি দেও ভক্ত লাউসেনে।/নতুবা ইহার ফল দিব এইক্ষণে।।/মহোদবি মহী অহি অক্ষয় কুমার।/রাবণ তখন তেজ জেনেছে আমার।।/বলে যাই বিশেষ আমার নাম হনু। স্বপন শুনিতে কাঁপে ভূপতির তনু।।[১৩]

রাজা হনুমানের স্বপ্নাদেশ পেয়ে লাউসেনকে মুক্তি দিলেন।

৬. চতুর্দশ সর্গ 'কাঙুর যাত্রা পালা'য়

ক. লাউসেন যুদ্ধযাত্রার জন্য কামরূপের উদ্দেশ্যে বের হয়ে সিন্ধুনদ পার হতে না পেরে রামায়ণের প্রসঙ্গের অবতারণা করে ধর্মরাজকে বলেছেন—রামের ভক্ত হনুমান দুর্জয় রাবণকে বধ করার জন্য দুর্লঙ্ঘ্য সাগর পেরিয়ে ফেলল আর তোমার ভক্ত সামান্য সিন্ধুনদ পার হতে ব্যর্থ—"শতেক যোজন সিন্ধু বান্ধা গেল কিসে।/দুর্জ্জয় রাবণ বধে সীতার উদ্দেশে।।/অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘে রামের কিঙ্কর।/এ নদ লঙ্ঘিতে নারে তোমার নফর।।[১৪] এরপর ধর্মঠাকুর হনুমানকে পাঠান ও হনুমান বিপ্রবেশ ধারণ করে লাউসেনকে সিন্ধুনদ পার হবার পন্থা বলে দেন। পন্থাটি হল এরকম—ধর্মপাল রাজার রমণীর কাছে যে কাটারি আছে সেই কাটারীর স্পর্শে জল স্থল হবে।

খ. অরণ্যে নির্বাসিত বল্লভার প্রস্তুত অন্ন খেতে রাজা ধর্মপাল সম্মত হলেন না, কারণ দীর্ঘদিন বনবাসে থাকায় তাঁর অন্নগ্রহণে প্রজাগণ নানা কথা বলতে পারে। কবি সেই বর্ণনা দিয়েছেন রামায়ণের কাহিনির মাধ্যমে—

> ত্রিলোকের জননী জানকী যবে বনে।/সহসা শ্রীরাম তারে না নিলা ভবনে।।/মহাপাপী তরি যার নাম করে দীক্ষা।/হেন সীতা নিলা প্রভু করিয়া পরীক্ষা।।[১৫]

৭. পঞ্চদশ সর্গ 'কামরূপ যুদ্ধ পালা'য়

ব্রহ্মপুত্র বেষ্টিত কামরূপ দেখে কালুর মনের ভাব—"লঙ্কার সমান দেখি দুর্জ্জয় কাঙুর।।"[১৬]

৮. সপ্তদশ সর্গ 'কানাড়ার বিবাহ পালা'য়

ক. কানাড়ার দাসী ধূমসী গৌড়েশ্বরকে বলেছেন—"একচোটে হানি গণ্ডা লহ বরমালা।"[১৭]

এই কথা শুনে গৌড়েশ্বর লজ্জিত হলে ধূমসী দাসী রামায়ণের প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলেন—"ধনুর্ভঙ্গ পণ কৈল জানকীর পিতা।/ধনুর্ভঙ্গ করি রাম বিভা কৈল সীতা।।/ত্রিলোকের গুরু তিনি তাঁর এই কাজ।/তুমি মাত্র হেনে গণ্ডা পাবে মহালাজ।।"[১৮]

খ. লাউসেনের প্রতি কানাড়ার আকর্ষণ শ্রীরামের প্রতি সীতার আকর্ষণতুল্য—"শ্রীরামে যেমন মন মজাইল সীতা।"[১৯]

৯. অষ্টাদশ সর্গ 'মায়ামুণ্ড পালা'য়

ক. ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গৌড়রাজের আহ্বানে লাউসেন যখন গৌড় গমন করলেন কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর অবস্থার বর্ণনায় কবি বলছেন—

> শ্রীরামে পাঠায়ে বনে রাজা দশরথ।
> কান্দিয়া কৌশল্যা রাণী নাহি দেখে পথ।[২০]

খ. ময়নাগড়ে বৃদ্ধ নরপতি কর্ণসেন, রানি রঞ্জাবতী এবং তাঁর চার পুত্রবধূ একত্রিত হয়ে পণ্ডিতের মুখে যখন বাল্মীকি রচিত রামায়ণে রাবণ কর্তৃক সীতার রাম-লক্ষ্মণের মায়ামুণ্ড দৃষ্ট হওয়ার কাহিনি শুনেছেন তখন তারা ভেঙে পড়েছেন, পরে তা মিথ্যা জানলে তাঁরা আনন্দিত হয়েছেন। ঠিক এরকম সময়ে মহামদের ষড়যন্ত্রের দ্বারা তাড়িত হয়ে ইন্দ্রজাল মেটে লাউসেনের মায়ামুণ্ড ময়নাগড়ে আনেন এবং সেই মায়ামুণ্ড দেখে কর্ণসেন, রঞ্জাবতী ও চার পুত্রবধূর হাহাকার রবে ময়নাগড়ের আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হয়ে ওঠে। চার রানি সহমৃতা

হবার জন্য প্রস্তুত হলে ধর্মদেবতা তাদের পুত্রবতী হওয়ার আশীর্বাদ করে সত্য ঘটনা উন্মোচন করেন যে লাউসেন জীবিত আছেন। ইন্দ্রজাল তাঁদের লাউসেনের মায়ামুণ্ড দেখিয়ে প্রতারিত করেছেন। এই ঘটনাটা রামায়ণে রাম-লক্ষ্মণের জীবিত থাকা এবং রাবণ কর্তৃক সীতার রাম-লক্ষ্মণের মায়ামুণ্ড দৃষ্ট হওয়ার অনুরূপ—"গৌড়েতে পাঠাল মুণ্ড সমর সংবাদ।/সেই মুণ্ড লয়ে পাত্র পেড়েছে প্রমাদ।।/মায়ামুণ্ড পাঠাইল করিয়ে রচনা।/কাননে সীতারে যেন কান্দাল রাবণা।।"[২১]

গ. অজয় নদের তীরে কালু ও লাউসেন উপস্থিত হওয়ার পর অজয় নদকে তুচ্ছ জ্ঞান করলে অজয় নদের ক্রোধ প্রকাশ পায় ও লাউসেনকে পাতালে বেঁধে রাখেন। শেষ পর্যন্ত হনুমানের বীরত্বে লাউসেন রক্ষা পান। হনুমানের অতুল বিক্রমে অজয়ের জল শুকিয়ে যায়। অজয় তাঁর জল পুনরায় ফিরিয়ে দেবার জন্য হনুমানের কাছে যখন প্রার্থনা করেন তখন রামায়ণের প্রসঙ্গ এসেছে—

> অতুল বিক্রম তব ধর মহাবল।/কোন ধর্ম্ম কানে ভরা অজয়ের জল।।/হেলায় লঙ্ঘেছ শতযোজন সাগর।/তোমা হৈতে সবংশে মজিল লঙ্কেশ্বর।/আপনি মহিমা গান অখিলের পিতা।/লক্ষ্মণে জীবন দিলে উদ্ধারিয়া সীতা।।/না জানি করেছি দোষ দিলা প্রতিফল।/উলঙ্গ হয়েছি বীর ছাড়ি দেহ জল।।[২২]

১০. উনবিংশ সর্গ 'ইছাইবধ পালা'য়

লাউসেন কর্তৃক ইছাই হত হবার পর দেবী যখন তাঁকে বাঁচান তখন সেই ইছাইকে কৌশলে বধ করার ভার ধর্মঠাকুর হনুমানকে দেন এবং লাউসেনকে রক্ষা করতে বলেন। এ প্রসঙ্গে রামায়ণের ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে—

> উপকার কালে কালে করেছ যতেক।/রাম অবতারে যত পাষাণের রেখ।।/উদ্ধার করিলে সীতা সংহারিয়া অহি।/তোমা হতে মৈল পাতালে দুর্জ্জয় মহি।।/সিন্ধুবন্ধ করি দ্বন্দ্ব দশস্কন্ধে মেলে।/লক্ষ্মণের প্রাণ শক্তিশেলে বাঁচাইলে।।/সব ঠাঁই জয়যুক্ত যেখানে পাঠাই।/লাউসেনে রাখ অদ্য বধিয়া ইছাই।।[২৩]

এইভাবে কাহিনি সারূপ্য এবং চরিত্রচিত্রণে রামায়ণের প্রভাব এসে গেছে।

মহাভারত প্রসঙ্গ : 'মহাভারতের কথা অমৃতসমান'-একথা কবি ঘনরাম জানতেন। কবি এই কাব্যের নানা পালায় মহাভারতের প্রসঙ্গ এনেছেন—

১. ষষ্ঠ সর্গ 'লাউসেনের জন্ম পালা'য় : মহামদ যখন কোটাল ইন্দ্রজাল মেটেকে লাউসেন বধের নির্দেশ দিয়েছেন তখন কবির মনে পড়েছে অশ্বত্থামা কর্তৃক পাণ্ডবপুত্রদের হত হবার প্রসঙ্গ—

> পাণ্ডবনন্দন যেন মেলে অশ্বত্থামা।
> সেই রূপ রঞ্জাকে করিবে হতকামা।।[২৪]

২. নবম সর্গ 'গৌড়যাত্রা পালা'য় : রঞ্জাবতী যখন লাউসেন এবং কর্পূরকে গৌড়যাত্রার উদ্দেশ্যে যেতে দিতে ভয় পাচ্ছেন তখন মায়ের আশীষে জগৎজয়ের বৃত্তান্ত লাউসেন রঞ্জাবতীকে শোনাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে লাউসেন রঞ্জাবতীকে বলেন মহাভারতে কুন্তীর আশীর্বাদধন্য অর্জুনের কাহিনি—

লাউসেন বলে মাতা না ভাবিও ভয়।/জননীর আশীষে জগতে হয় জয়॥/কুন্তীর আশীষে দেখ অর্জ্জুন অজয়।/আজ্ঞা দেও বিদেশে গমনে নাই ভয়।।[২৫]

৩. দশম সর্গ 'কামদল বধ পালা'য় :

ক. নিদ্রাঘোরে থাকা কামদলকে মারতে গিয়ে লাউসেনের মহাভারতের ঘটনার কথা মনে পড়েছে—

এ বড় প্রবল পাপ পাছে ঘটে আমা।/এই ঠেকে ঠেকিল ঠাকুর অশ্বত্থামা।।/দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ছিল নিদ্রাগত।/কুরুবংশে কার্য সাধে তারে করি হত।।/এই পাপে ঠেকে গেল অর্জ্জুনের হাতে/হাতে গেলে বান্ধি দিল দ্রৌপদী সাক্ষাতে।।[২৬]

খ. পার্বতীর ভক্ত কামদলের কাছে লাউসেন যখন পরাজিত হয় তখন সেই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য লাউসেন ধর্মঠাকুরকে রক্ষা করতে বলে। এ প্রসঙ্গে মহাভারতের প্রসঙ্গ এসেছে। ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অসীম স্নেহের নিদর্শন দেখাতে কবি মহাভারতের উল্লেখ করেছেন—"ভকতবৎসল প্রভু পেয়েছি প্রমাণ।/কুন্তীসঙ্গে জৌঘরে পাণ্ডবে দিলে প্রাণ।।[২৭] কেবল তাই নয়, কৌরবসভায় দ্রৌপদীর লজ্জা তিনি রক্ষা করেছেন। দুর্বাসার নিকট লাঞ্ছিত পাণ্ডবদিগকে তিনি রক্ষা করেছেন—"যুধিষ্ঠির পাশায় হারায়ে দুর্যোধন।/দ্রৌপদীরে সভামাঝে করে বিবসন।।/বস্ত্ররূপী হয়ে লজ্জা রেখেছে হে তাতে।/পুণরপি বনবাসে দুর্বাসার হাতে।।"[২৮]

৪. একাদশ সর্গ 'জামতি পালা'য় :

ক. নয়ানীর পুত্রকে সত্য কথা বলতে নির্দেশ দিয়ে মহাভারতের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে যে কেবল মিথ্যাভাষণ নয়, একটু ছলনা করলেই মহাপাতক হয়। কৃষ্ণের আদেশে একটু ছলনা করে দ্রোণকে বধ করলেন, তাতে স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও নরক দর্শন করতে হয়েছিল—

সভামাঝে বল মিথ্যা হবে কুলধ্বংস।।/যুধিষ্ঠির মহারাজ কৃষ্ণের আজ্ঞায়।/প্রকারে প্রকাশি মিথ্যা মনস্তাপ পায়।।/অশ্বত্থামা হত ইতি গজ বলে শেষে।/ধর্মপুত্র তথাপি ঠেকিল কার্য্যদোষে।।[২৯]

খ. সুপুত্র হতে যে কূলের উদ্ধার হয় তার দৃষ্টান্ত স্থাপনে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের উল্লেখ করা হয়েছে—

সপ্ত পিতৃ তোর ভয়ে আছে ভাব্য মতি।/আজি বা অক্ষয় স্বর্গ কিংবা অধোগতি।।/সুপুত্র হইলে হয় গোত্রের উদ্ধার।/সূর্য্যবংশ ভগীরথ প্রমাণ ইহার।।"[৩০]

৫. দ্বাদশ সর্গ 'গোলাহাট পালা'য়

ক. ছলনার পাপ সম্পর্কে মহাভারত থেকে ঘটনা উদ্ধার করা হয়েছে। যেমন—

শঠে শাঠ্য করিতে অধর্ম্ম নাই তায়।/জরাসন্ধ বধে তার সাক্ষী পাওয়া যায়।।/শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন ভীম ব্রাহ্মণের বেশে।/রাজাকে মাগিল ভিক্ষা চাতুরী বিশেষে।।/অস্বীকার করিতে মাগিল মহাযুদ্ধ।/অস্বীকার অপালনে স্বর্গ হয় রুদ্ধ।।/এই হেতু ভীমের সহিত কৈল রণ।/কৃষ্ণের মন্ত্রণা বশে হয়েছে নিধন।।[৩১]

খ. সারথি কৃষ্ণের মন্ত্রণায় অর্জুনের যুদ্ধে জয়লাভ প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে—"মন্ত্রণায় অর্জ্জুন জিনিল কুরুসৈন্য।"[৩২]

গ. লাউসেন ও কর্পূরকে দেখে লাউদত্ত কর্মকারের মনে যে ভাবনার উদয় হয়েছে তাতে মহাভারতের প্রসঙ্গ এসেছে—"পাঁচ ভাই পাণ্ডব ছাড়িয়া নিজ দেশ।/বঞ্চিলা বিরাটবাসে লুকাইয়া বেশ।।/সেইরূপ এই দুই দেবতাতনয়।/ভূতলে ভ্রমেণ দোঁহে ভাবি দৈত্যভয়।।"[৩৩]

৬. ত্রয়োদশ সর্গ 'হস্তীবধ পালা'য় : ভক্তকে রক্ষা করবার মানসে ধর্মঠাকুর তুলনীয় ঘটনার উল্লেখ করেছেন—

সুধন্বা রেখেছি তৈলে প্রহ্লাদ সাগরে।
সেইরূপ সেজে যাব সেনের উদ্ধারে।

লাউসেনকে জব্দ করবার জন্য মহামদ লাউসেনকে মৃত হাতিটি বাঁচাতে নির্দেশ দেবার জন্য গৌড়রাজকে যখন যুক্তি দিয়েছেন তখন মহাভারতের প্রসঙ্গ এনেছেন এভাবে—"অশ্বত্থামা হাতী ম'ল ভারতের রণে।/কোথা গেল কুরুবংশ বুঝে দেখ মনে।।"[৩৪]

৭. পঞ্চদশ সর্গ 'কামরূপ যুদ্ধ পালা'য় : বন্দি কর্পূর ধবলের গৌরব বর্ণনা করতে গিয়ে লাউসেন বলছেন—"দুর্যোধন সম কে সংসারে ধরে গর্ব্ব।/তবে কেন তারে বেন্ধে লইল গন্ধর্ব।।"[৩৫] দেবগতি এবং দশাদোষে রাজাদিগেরও দুর্দশা উপস্থিত হয় জরাসন্ধের কারাগারে রাজগণের বন্দিত্বই তার প্রমাণ—"দৈবগতি দশাদোষে নিদারুণ দুঃখ।/জরাসন্ধ কারাগারে কতেক ভূভুখ।।"[৩৬]

৮. ষোড়শ সর্গ 'কানাড়ার স্বয়ম্বর পালা'য় : কানাড়ার স্বয়ম্বর পালা মহাভারতের স্বয়ম্বরের বর্ণনা অনুযায়ী রচিত হয়েছে।

৯. সপ্তদশ সর্গ 'কানাড়ার বিবাহ পালা'য় : কানাড়ার দাসী ধুমসী গৌড়েশ্বরকে বলেছেন—"একচোটে হানি গণ্ডা লহ বরমালা।"[৩৭] এবং এই কথা শুনে গৌড়েশ্বর লজ্জিত হলে ধুমসী দাসী মহাভারতের প্রসঙ্গে অবতারণা করে বলেন—

> কখনো শুনেছ মহাভারতের কথা।/কিরূপ প্রতিজ্ঞা কৈল দ্রৌপদীর পিতা।।/বল বুদ্ধি বিক্রম বুঝিতে দৈবধীন।/আরোপিলা রাধাচক্র আড়ে তার মীন।।/চক্র ভেদি যে জন বিন্ধিবে এক শরে।/ভুবনমোহিনী কন্যা দিব সেই বরে।/পূরিতে নারিল কেহ প্রতিজ্ঞা দারুণ।/এক বারে রাধাচক্র বিন্ধিল অর্জ্জুন।।[৩৮]

খ. লোহার গন্ডার না কেটে বিবাহ করতে পারবেন না বলে গৌড়রাজ যখন হতাশ হয়েছেন তখন মহামদের কথায় দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীকে অপমান করার প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে—"ইচ্ছায় না হল যদি ভূপতির দারা।/এখনি করি তারে দ্রৌপদীর পারা।।/চুলে ধরি সভায় আনিল দুঃশাসন।/অপমান করিল বলিল কুবচন।।"[৩৯]

গ. কানাড়া লাউসেনের প্রতি আসক্ত অথচ গৌড়রাজ তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, এই ঘটনাকে কবি রুক্মিনী, শিশুপাল ও শ্রীকৃষ্ণের কাহিনির আধারে বর্ণনা করেছেন।

ঘ. গৌড়রাজের বাহিনী যুদ্ধে ধ্বংস হতে লাউসেন অনুমান করছেন যে দৈবশক্তি সম্পন্ন একজন কেউ আছেন। এই ঘটনা প্রসঙ্গে মহাভারতের অবতারণা করা হয়েছে—

> যেমন শুনেছি মহাভারতের রণ।/যুধিষ্ঠির সমরে সাজিল দুর্যোধন।।/কুরুসৈন্য সাজিল এগারো অক্ষৌহিনী।/পান্ডবের পক্ষ প্রভু গোবিন্দ আপনি।।/কুরুসৈন্য তথাপি সমরে হইল পাত।/জয় হল যার সখা ত্রিলোকের নাথ।।[৪০]

১০. অষ্টাদশ সর্গ মায়ামুণ্ড পালা

ক. যুদ্ধে যেতে পিতার সমর্থন নাই শুনে লাউসেনের মুখে সুধন্বার কাহিনি স্থান পেয়েছে—"আমার সংসার সার ধর্ম যেই পথ।/অদ্যাবধি ঘোষে লোকে সুধন্বা সুরথ।।" যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে কলিঙ্গা লাউসেনকে যখন কামনা করলেন। লাউসেন যুদ্ধযাত্রার জন্য তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলেন না তখন কলিঙ্গা বলছেন—"জায়া পরশনে যদি যাত্রা হয় ভঙ্গ।/বেদ বলে বিশেষ বণিতা অর্দ্ধ অঙ্গ।।" তারপর তিনি (কলিঙ্গা) মহাভারতের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন যে যখন অজ্ঞাতবাসে পঞ্চপাণ্ডব ছিলেন তখনও দ্রৌপদী তাঁদের সঙ্গে ছিলেন।

হংসধ্বজ রাজার আদেশে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে বিলম্ব করলে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করা হবে জেনেও পত্নী প্রভাবতীকে সুধন্বা বঞ্চিত করেননি। শ্রীহরি সুধান্বাকে রক্ষা করেছিলেন। কলিঙ্গার যুক্তি—"নিজ নারী পরশে পাতক হইল রায়।/তবে কেন সুধন্বা সঙ্কটে রক্ষা পায়।।"

গ. রঞ্জাবতীর শোকে কর্পূর তাকে মহাভারতের ঘটনা উল্লেখ করে প্রবোধ দিয়েছেন। সপ্তরথী মিলে অভিমন্যুকে যখন বধ করেছিলেন তখন সুভদ্রা কীভাবে প্রাণধারণ করেছিলেন আর কুন্তীই বা কীভাবে কর্ণের শোকে প্রাণরক্ষা করেছিলেন—"কৃষ্ণ যার মাতুল অর্জুন যার পিতা।/হেন মহারথী দেখ অভিমন্যু কোথা।।/কেমনে ধরিল প্রাণ সুভদ্রা জননী।/কেমনে কর্ণের শোকে কুন্তী ঠাকুরাণী।।"[৪১]

১১. উনবিংশ সর্গ 'ইছাই বধ পালা'য় : ইছাই লাউসেনের যুদ্ধকে মহাভারতে কীচক-ভীমের যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

১২. একবিংশ সর্গ 'পশ্চিম উদয় আরম্ভ পালা'য় : ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

এইভাবে দেখা যাবে কাহিনি বয়নে ও চরিত্র চিত্রণে মহাভারতের প্রভাব পড়েছে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে মহাভারতের উল্লেখ করা হয়েছে।

● **শ্রীমদ্ভাগবত প্রসঙ্গ**

শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ ঘনরামের কাব্যে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। চরিত্র-চিত্রণে, ঘটনা-বর্ণনায় এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ অনেক স্থলে করা হয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র লাউসেন। তাঁর বাল্যকাল শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অনুরূপ। লাউসেনের সমগ্র চরিত্রেও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের প্রভাব আছে। লাউসেনের মুখে প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের কথা স্থান পেয়েছে। ভগবতের চতুর্থ স্কন্ধে ধ্রুবের কাহিনি এবং সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদের কাহিনি আছে। এছাড়াও পার্বতীর কাঁচলিতে কৃষ্ণলীলার যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুসরণ করা হয়েছে।

১. প্রথম সর্গ 'স্থাপনা পালা'য় : সৃষ্টি বর্ণনায় শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ রয়েছে।

২. দ্বিতীয় সর্গ 'ঢেকুর পালা'য় : ইছাই ঘোষ প্রবল হয়ে কর্ণসেনের সর্বস্ব লুণ্ঠন করলে ঘনরাম ইছাইকে বৃত্রাসুরের সহিত এবং কর্ণসেনকে ইন্দ্রের সহিত তুলনা করেছেন—"রণে বৃত্রাসুর যে ইন্দ্রে দিল তেড়ে।/শচীপতি পলাইল অমরাবতী ছেড়ে।"[৪২]

৩. তৃতীয় সর্গ 'রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা'য় : বৃদ্ধ কর্ণসেনের সহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ মহামদ সমর্থন করেননি। কর্ণসেনের প্রতি মহামদ ক্রোধান্ধ হলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন—"দৈবকী হইল রঞ্জা উগ্রসেন তুমি।/এ বংশে করিতে ধ্বংস কংসরূপী আমি।"৪৩

৪. পঞ্চম সর্গ 'শালে ভর পালা'য় : পুত্রকামনায় শালে ভর দিয়ে রঞ্জাবতী যখন প্রাণত্যাগ করলেন তখন স্ত্রী হত্যার পাপ সূর্যকে গ্রাস করতে গেল। সেই পাপের যে চিত্র ঘনরাম অঙ্কন করেছেন শ্রীমদ্ভাগবতে তার অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে বৃত্রাসুরকে বধ করার পর ব্রহ্মহত্যা পাপ চণ্ডালী রূপ পরিগ্রহ করে অহরহ ইন্দ্রকে অনুসরণ করবার যে বর্ণনা আছে ঘনরামের কাব্যে সেইরূপ চিত্র দেখি শালে ভর পালায় রঞ্জাবতীর প্রাণত্যাগে—

> বরণ বিকট কাল পিঙ্গলাক্ষ কেশ।/করে ভস্ম উষ্মামতি ভয়ঙ্কর বেশ।।/মূলাপালা দশন বসনহীন কটি।/উর্দ্ধমুখে অমনি আকাশে উঠে ছুটি।।/পথে আগুলিল পূষা পসারিয়া বাহু।/সূর্য বলে এল এবা আর কোন রাহু।।[৪৪]

৫. ষষ্ঠ সর্গ 'লাউসেনের জন্ম পালা'য়

ক. লাউসেনকে চুরি করতে এসে ইন্দ্রজাল কোটাল তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজ উদ্দেশ্যে বিস্মৃত করেছে। 'চোর বলে মোর ভাগ্য সীমা নাই আর'[৪৫] এবং সে তুলনা দিচ্ছে—"শ্রীনন্দকুমারের নিতে যেমন অক্রুর।/প্রবেশিল গোকুলে পাঠাল কংসাসুর।"[৪৬]

খ. হৃত পুত্রের শোকে রঞ্জবতী ব্যাকুল হলে তাঁকে কোনো প্রবীণা প্রবোধ দিচ্ছেন—

> দ্বারিকা নগরে যেন কৃষ্ণের নন্দনে।/শম্বর হরিল শিশু সূতিকাসদনে।।/কান্দেন রুক্মিনীদেবী হয়ে শোকাকুলি।/সেই পুত্র পেয়ে পুনঃ হলো কুতুহলী।।[৪৭]

গ. বালক লাউসেন ও কর্পূরকে কেউ কেউ—"মনে ভক্তি করে ভাবে কৃষ্ণ বলরাম।"[৪৮] এবং মনে হয়—"আপনি শ্রীদাম হয়ে করি পদসেবা।"[৪৯]

৬. নবম সর্গ 'গৌড়যাত্রা পালা'য় : শ্রীকৃষ্ণ যখন গোকুল হতে কংসের আমন্ত্রণে অক্রূরের সাথে মথুরায় চলে গেলেন তখন গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে একান্ত ব্যাকুল হলেন। কৃষ্ণের মথুরাগমন প্রাক্কালে সেই ম্লানকান্তি, স্খলিত দু-কূল, স্খলিত বলয়, স্খলিত কেশগ্রন্থি গোপবালাদের বিরহ-বিধুর চিত্র শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়—

> যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্রেণু রথস্য চ।
> অনুপ্রস্থাপিতাত্মানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ।। ১০/৩৯/৩৬

ব্রজরমণীদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত ধাবিত হয়েছিল। যতক্ষণ রথের পতাকা ও ধূলি দৃষ্টিগোচর হল ততক্ষণ পর্যন্ত তারা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইল। লাউসেনের গৌড়যাত্রার সময় বিদায়ের প্রাক্কালে সেই বিচ্ছেদ, বেদনা-বিধুর চিত্র পাই—"গোবিন্দ গমনে যেন যশোদা বিকল।/অবিরত রঞ্জার নয়নে বহে জল।।"[৫০] এবং "গোবিন্দ ছাড়িয়া যেন যাইতে গোকুল।/গোপিনী সকল শোকে কান্দিয়া ব্যাকুল।।/সেইরূপ কান্দে যত ময়নার মেয়ে।/যেন চিত্তপুত্তলি সেনের মুখ চেয়ে।।"[৫১]

৭. ত্রয়োদশ সর্গ 'হস্তীবধ পালা'য় : শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে কংসের রাজসভায় কৃষ্ণকর্তৃক কুবলয় হস্তী নিধনের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, ধর্মমঙ্গলে হস্তীবধ পালায় লাউসেন কর্তৃক পাটহস্তী নিধনে সেই চিত্রের অনুসরণ পাই। অর্থাৎ লাউসেনের পাটহস্তীবধ কৃষ্ণের

কুবলয়হস্তীবধের অনুরূপ। কবি ঘনরাম লিখছেন—"কৃষ্ণ হাতে যেমন কংসের কুবলয়।/স্কন্ধে দন্ত হাতীর রুধির সর্ব্বগায়।।"[৫২]

৮. চতুর্দশ সর্গ 'কাঙুর যাত্রা পালা'য় : মহামদের কুপরামর্শে গৌড়রাজ লাউসেনের কামরূপরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন। সেই নির্দেশ লয়ে যখন ভাট গঙ্গাধর লাউসেনের রাজসভায় গেলেন তখন পুরাণ পাঠ হচ্ছিল। কবি শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ করেছেন যখন—"নারদ লাগালে ভেদ কংস দুরাচারে।।/এইকালে অনায়া কৃষ্ণের দর্প কর চুর।/শুনিয়া গোকুলে কংস পাঠাল অক্রুর।।"[৫৩]

৯. ষোড়শ সর্গ 'কানাড়ার স্বয়ম্বর পালা'য়

ক. শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে শুক্রাচার্য যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা এরকম—স্ত্রীলোককে বশীভূত করবার জন্য, পরিহাস কালে, বিবাহ বরাদির গুণ-কীর্তনে, জীবিকা-অর্জনের নিমিত্ত, প্রাণসঙ্কটে গো ও ব্রাহ্মণের হিতের জন্য এবং কারও প্রাণনাশের সম্ভাবনা হলে তাকে রক্ষা করবার জন্য মিথ্যা কথা বলা দূষনীয় নয়। বৃদ্ধ গৌড়রাজ কানাড়াকে বিবাহ করবার জন্য ভাট গঙ্গাধরকে যখন সিমুলা পাঠিয়েছেন তখন বলেছেন—"বিবাহ বিষয়ে মিথ্যা দোষ নাহি তায়।।"[৫৪] ভাগবতে শুক্রাচার্যের উপদেশ অনুসৃত হয়েছে।

খ. কানাড়া লাউসেনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গৌড়রাজা তাঁকে জোর করে বিবাহ করতে মনস্থ করলেন কিন্তু তাঁর মনে পড়ল—"রুক্মিণী বিবাহে যেন বাড়িল জঞ্জাল।/সুতা হাতে অভব্য হইল শিশুপাল।/শ্রীকৃষ্ণে মজিয়াছিল রুক্মিণীর মন।।/কোথা রৈল ভাব জ্যেষ্ঠ ভায়ের বচন।।"[৫৫]

১০. অষ্টাদশ সর্গ 'মায়ামুণ্ড পালা'য়

ক. শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদের সৌভাগ্যগর্ব দর্শন করে তাঁদের অহংকার দূর করার নিমিত্ত এবং গোপীশ্রেষ্ঠাকে প্রসন্ন করবার জন্য যখন তাঁকে নিয়ে অন্তর্হিত হলেন তখন সেই বিরহ ব্যাকুল গোপীদের শ্রীকৃষ্ণকে সন্ধান করবার এক মধুর চিত্র পাওয়া যায়। তাঁরা একান্ত ব্যাকুল হয়ে বলছেন—

> হা নাথ রমণ, শ্রেষ্ঠ ক্বাসি মহাভুজ।
> দাস্যাস্তে কৃপণায়া যে সখে, দর্শয় সন্নিধিম্। ১০/৩০/৩৯

লাউসেনের মায়ামুণ্ড দর্শনে বিরহব্যাকুল চারজন রানির শোকাকুল অবস্থায় এই কাহিনি পাঠ করা হয়েছিল। ঘনারাম তার বর্ণনা দিয়েছেন—

> গোপীগণে কুঞ্জবনে কৃষ্ণহারা হয়ে।/কাননে কাননে ফিরে কানুর লাগিয়ে।।/না পেয়ে কান্দেন যত আহিরী অবলা।/কোথা গেল কি হইল নীলমণি কালা।।/জাতে থাকিতে আর কার মুখ চাব।/হা নাথ, হা নাথ, নাথ কোথা গেলে পাব।।[৫৬]

খ. লাউসেনকে যখন অজয় নদী পাতালে লয়ে গিয়ে বন্দি করল তখন তীরে ডোমগণ আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। শ্রীমদ্ভাগবতে কালীয়দমনের চিত্র এই বর্ণনা স্মরণ করিয়ে দেয়—"পাতালে বান্ধিল যদি ময়নার চাঁদে।/এ কূলে আকুল হয়ে ডোমগণ কাঁদে।।/কালীদহে কৃষ্ণ যেন ডুবিল মায়ায়।/আভীর বালক যত কান্দে উভরায়।।"[৫৭]

১১. বিংশ সর্গ 'অঘোর বাদল পালা'য় : এই পালাটি শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্রের রোষ, গোকুলে ঝড়বৃষ্টি এমন গিরিগোবর্ধন ধারণ করে কৃষ্ণের গোকুলকে রক্ষার চিত্রটি স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু দুটি ঘটনার কাহিনি উপস্থাপনা এবং বর্ণনা পৃথক। ঘনারাম নিপুণভাবে এখানে মহাকাব্যের আবহ সৃষ্টি করেছেন।

● **অন্যান্য পুরাণ প্রসঙ্গ**

আলোচিত এই তিনটি কাব্যের প্রভাব এবং উল্লেখ ব্যতীত ঘনরাম তাঁর কাব্যে অন্যান্য পুরাণ বা শাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বর্ণনায়, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র শাসিত সমাজে উচ্চবর্ণসুলভ সামাজিক অনুষ্ঠানের বর্ণনা করেছেন। লৌকিক অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে তিনি লৌকিক সংস্কার বিশ্বাসকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং সমসাময়িক অনুষ্ঠানের চিত্র অঙ্কন করেছেন। বিশেষ পৌরাণিক চরিত্রের উপমা দিয়ে ঘনরাম তাঁর নায়ক চরিত্রকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং আমাদের ভাবানুষঙ্গকে এক অসাধারণ স্তরে উন্নীত করেছেন।

রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত হতে চিত্র ও বর্ণনা গ্রহণ করে ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর শ্রীধর্মমঙ্গাল কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু ঘনরামের কৃতিত্ব এই যে তিনি বিভিন্ন কাব্য হতে কেবল অনুবাদ করেন নি অথবা উদ্ধৃতি দেননি। তিনি সেইসব চিত্র ও বর্ণনাকে স্বাঙ্গীকৃত করে কাব্যকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। কাব্যে শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

উৎসের সন্ধানে

১. পীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত : 'ধর্মমঙ্গাল' ঘনরাম চক্রবর্তী, কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম সংস্করণ, ১৯৬২, পৃ. ৭১৩
২. তদেব, পৃ. ৭১৩
৩. সুকুমার সেন : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭১০
৪. পীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত : 'ধর্মমঙ্গাল'—ঘনরাম চক্রবর্তী, কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম সংস্করণ, ১৯৬২, পৃ. ১৩০
৫. তদেব : পৃ. ১২০-১২১
৬. তদেব : পৃ. ১৩০
৭. তদেব : পৃ. ১৯৬
৮. তদেব : পৃ. ১৯৯
৯. তদেব : পৃ. ১৯৯
১০. তদেব : পৃ. ২৩১
১১. তদেব : পৃ. ৩০১
১২. তদেব : পৃ. ৩১২
১৩. যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু সম্পাদিত : 'ধর্মমঙ্গাল'—ঘনরাম চক্রবর্তী, বঙ্গাবাসী সংস্করণ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৩
১৪. পীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত : 'ধর্মমঙ্গাল'—ঘনরাম চক্রবর্তী, কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম সংস্করণ, ১৯৬২, পৃ. ৩৬৪
১৫. তদেব : পৃ. ৩৭৪

১৬. তদেব : পৃ. ৩৮০
১৭. তদেব : পৃ. ৪৩৬
১৮. তদেব : পৃ. ৪৩৭
১৯. তদেব : পৃ. ৪৪৪
২০. তদেব : পৃ. ৪৯৬
২১. তদেব : পৃ. ৫০৩
২২. তদেব : পৃ. ৫১২-৫১৩
২৩. তদেব : পৃ. ৫৩২
২৪. তদেব : পৃ. ১২৩
২৫. তদেব : পৃ. ১৯৯
২৬. তদেব : পৃ. ২৩৪
২৭. তদেব : পৃ. ২৪৫
২৮. তদেব : পৃ. ২৪৫-২৪৬
২৯. তদেব : পৃ. ২৭৩
৩০. তদেব : পৃ. ২৭৩
৩১. তদেব : পৃ. ২৯৩
৩২. তদেব : পৃ. ২৯৩
৩৩. তদেব : পৃ. ৩১৩
৩৪. তদেব : পৃ. ৩৩৯
৩৫. তদেব : পৃ. ৩৯০
৩৬. তদেব : পৃ. ৩৯০
৩৭. তদেব : পৃ. ৪৩৬
৩৮. তদেব : পৃ. ৪৩৭
৩৯. তদেব : পৃ. ৪৪০
৪০. তদেব : পৃ. ৪৬১-৪৬২
৪১. তদেব : পৃ. ৪৯৮
৪২. তদেব : পৃ. ৬০
৪৩. তদেব : পৃ. ৮১
৪৪. তদেব : পৃ. ৯৮
৪৫. তদেব : পৃ. ১২৭
৪৬. তদেব : পৃ. ১২৭
৪৭. তদেব : পৃ. ১৩৪
৪৮. তদেব : পৃ. ১৩৯
৪৯. তদেব : পৃ. ১৩৯
৫০. তদেব : পৃ. ২০১
৫১. তদেব : পৃ. ২০৩
৫২. তদেব : পৃ. ৩৩৮
৫৩. তদেব : পৃ. ৩৫৭-৩৫৮

৫৪. তদেব : পৃ. ৪১৫
৫৫. তদেব : পৃ. ৪২৩
৫৬. তদেব : পৃ. ৫০০
৫৭. তদেব : পৃ. ৫০৯

তথ্যের সন্ধানে

১. পীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত : 'ধর্মমঙ্গাল'—ঘনরাম চক্রবর্তী, কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম সংস্করণ, ১৯৬২
২. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস', কলিকাতা বুক হাউস, প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস', এ. মুখার্জি এন্ড কোং প্রা. লি., পরিবর্ধিত একাদশ সংস্করণ, ২০০৬
৩. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', আনন্দ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯৯
৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', মডার্ণ বুক এজেন্সী, দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব, ১৯৮৯
৫. যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু সম্পাদিত : 'ধর্মমঙ্গাল'—ঘনরাম চক্রবর্তী, বঙ্গাবাসী সংস্করণ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ
৬. নীহাররঞ্জন রায় : 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', দে'জ, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০২ বঙ্গাব্দ
৭. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি : 'ধর্মের গান কত কালের', প্রবাসী, ভাদ্র সংখ্যা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ
৮. দীনেশচন্দ্র সরকার : 'প্রাচীন বঙ্গো ধর্ম পুজো', প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ
৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'ধর্মঠাকুর ও কূর্মমূর্তি', প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ
১০. দীনেশচন্দ্র সেন ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত : 'ধর্মমঙ্গাল'- মানিকরাম গাঙ্গুলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯০৬
১১. সুখময় মুখোপাধ্যায় : 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম', ভারতী বুক স্টল, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৭
১২. দীনেশচন্দ্র সেন : 'বঙ্গাভাষা ও সাহিত্য', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯০১
১৩. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পুরুষ চরিত্র', প্রথম সংস্করণ
১৪. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র', পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬

সহায়ক গ্রন্থাবলি (ইংরেজি)

১. Dr. Shashi Bhusan Dasgupta : 'Obscure Religious Cults as the background of Bengali Literature'

অভয়ামঙ্গল কাব্যে শ্রীমন্ত চরিত্র
স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র সৃষ্টি

অলি আচার্য

সাহিত্যে চরিত্রচিত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ চরিত্রায়ণের ওপরেই কাহিনির সজীবতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। সার্থক চরিত্র সৃষ্টি কবি বা লেখকের দক্ষতাকে প্রমাণ করে। তবে আধুনিক যুগের সাহিত্যের চরিত্র এবং মধ্যযুগের সাহিত্যের চরিত্র নির্মাণে কিছু ফারাক রয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্য মূলত দেবনির্ভর, সেখানে কবির নিজস্বতা প্রয়োগের সুযোগ কম। তথাপি মঙ্গালকাব্যে বেশ কিছু সার্থক চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ধনপতি পুত্র শ্রীমন্ত সেইরূপ স্বতন্ত্র একটি চরিত্র। চরিত্রবৈশিষ্ট্যে নিজগুণে শ্রীমন্ত হয়ে উঠেছে মঙ্গালকাব্যধারার এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

মধ্যযুগের মঙ্গালকাব্য ধারায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম। গতানুগতিক মঙ্গালকাব্য ধারার ন্যায় দেবতা বিশেষের মাহাত্ম্য-কীর্তন প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও নানা দিক থেকেই গ্রন্থটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমসাময়িক জীবনের সার্থক রূপায়ণ যেমন ঘটেছে তাঁর কাব্যে তেমনি সমগ্র কাব্য জুড়ে লক্ষ করা যায় একের পর এক উৎকৃষ্ট চরিত্রচিত্রণ। বাস্তবতা তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একারণেই কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে বলা হয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের নাম ‘অভয়ামঙ্গাল’। কাব্যটির দুটি খণ্ড যথাক্রমে—আখেটিক খণ্ড এবং বণিক খণ্ড। আখেটিক খণ্ডের তুলনায় বণিক খণ্ডের পরিসর বিস্তৃত। স্বাভাবিকভাবেই বণিক খণ্ডের এই বিস্তৃত পরিসরে বহু বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। লহনা, দুর্বলা, শালবান ইত্যাদি একাধিক অমর চরিত্রের নির্মাতা কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী। তেমনই একটি সার্থক চরিত্র ধনপতি সদাগর এবং খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত। জন্মসূত্রে বণিকপুত্র হয়েও শ্রীমন্ত নিদারুণ ভাগ্যের পরিহাসে কৌলীন্যের অধিকারী নয়। জন্মাবধি পিতার মুখদর্শন থেকেও সে বঞ্চিত হয়েছে। অথচ শ্রীমন্ত রূপবান এবং নানা গুণে গুণবানও বটে। শ্রীমন্তের রূপের বর্ণনায় বলা হয়েছে—

নব শশী জিনি মুখ পঙ্কজ লোচন।
কুন্দে নিরমিল যেন অভিন্ন মদন।[১]

শ্রীমন্তর প্রকৃত পরিচয় সে স্বর্গের শাপভ্রষ্ট দেবতা মালাধর। দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যেই তাঁর মানবজন্ম। অতএব স্পষ্টতই চরিত্রটিকে আমরা শুরু থেকেই বিশেষ এক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য নিয়ে কাহিনি অংশে দেখতে পাই। শ্রীমন্তের নামকরণ উপলক্ষ্যে যে গণককে ডেকে আনা হয়েছিল তিনি যে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, তার মধ্যে দিয়েও শ্রীমন্তের উদ্দেশ্য বা তার দায়িত্বের দায়ভার স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয়—

শুভ যোগ কাল দণ্ড   ইথে জাত নহে ছণ্ড
পিতার উদ্ধারে হবে হেতু।
দ্বাদশ বৎসর কালে   ডিঙ্গা সাজি বুহিতালে
সিংহলেতে করিয়া প্রবেশ।
শাল বান নৃপে দণ্ডি   পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী
করিবেক পিতার উদ্দেশ।[২]

শ্রীমন্তের জন্মের পূর্বেই ধনপতি সিংহল যাত্রা করেছে, কিন্তু ফিরে আসেনি। ধনপতি ফিরে আসার বাসনায় খুল্লনা প্রতিদিন ভাগবত পাঠ করেছে। এই কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করে শ্রীমন্তকেও দেখা যায় কৃষ্ণের ন্যায় নানা ছল করে—

নগরিয়া শিশু সঙ্গে নিত্য করে খেলা।
কৃষ্ণ কথা অনুরূপে করে নানা ছলা।[৩]

বস্তুত শ্রীমন্তের চরিত্র বর্ণনায় এখানে পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা জানি, যে কংসের কারাগারে বাসুদেব এবং দেবকীর পুত্র রূপে কৃষ্ণের জন্ম হয়, এবং জন্মের পরেই তিনি পিতামাতার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হন। তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয় বহুদূর যশোদা এবং নন্দের গৃহে। পরবর্তীতে কৃষ্ণ মথুরায় গিয়ে কংস বধ করে পিতামাতাকে উদ্ধার করেছিলেন। কবি অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে কাব্যে এই পৌরাণিক চরিত্রটির অবতারণা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীমন্তও তাঁর পিতাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছে। সেদিক থেকে দু'টি চরিত্রের মধ্যে একটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কাহিনি পরম্পরায় দেখা যায় শ্রীমন্ত চরিত্র নির্মাণে শুধু কৃষ্ণ নয়, রামেরও ছায়াপাত পরেছে। শ্রীমন্ত যখন সিংহল উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সে মুহূর্তে তার যাত্রার সঙ্গে রামের অযোধ্যা ছেড়ে যাওয়ার তুলনা করা হয়েছে। তবে দেব অনুষঙ্গের বাইরেও শ্রীমন্ত চরিত্রটির নিজস্বতার পরিচয় সমগ্র কাব্য জুড়ে পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমন্তের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় তখন যখন বনে ছাগল চড়ানোর সময় ব্রহ্মা শ্রীমন্তের সঙ্গী সাথিদের মায়াপাশে হরণ করে। সে মুহূর্তে চিন্তান্বিত না হয়ে শ্রীমন্ত বিবেচনা করে অনুভব করতে পেরেছে এই কাজ স্বয়ং বিধাতার—

ক্ষণেক ভাবিয়া মনে বুঝিল শ্রীপতি।
আর নহে কার কর্ম বিধাতার কৃতি।[৪]

শ্রীমন্ত শিশুদের সাথে মিলে ভাগবত খেলে। প্রলম্বের বেশধারী গুণাকর দাসের সাথে শ্রীমন্ত লড়াই করে। অতঃপর সকল বালক মিলে শ্রীমন্তের দুরন্তপনার কারণে খুল্লনাকে অভিযোগ করে। এমন দুরন্ত ছেলেকে মানুষ করার জন্য খুল্লনা তাকে দনাই পণ্ডিতের পাঠশালায় ভরতি করিয়ে দেয়। শুরু হয় শ্রীমন্তের শিক্ষাগ্রহণের পর্ব। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে

শ্রীমন্ত নানান শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে শুরু করে। ন্যায়, দর্শন, সাহিত্য, অলংকার ইত্যাদি বহুবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠা শ্রীমন্তের তার গুরুর সাথেই বচসা শুরু হয়। শ্রীমন্ত দনাই পণ্ডিতকে প্রশ্ন করেছে—

> মুচুকুন্দ কৈল স্তুতি দৈবকীনন্দনে।/চরণে ধরিয়া কৈল তার প্রদক্ষিণে।।/সেই জন্ম নহে মুক্তি কিসের কারণে।/তার কেন গর্ভভোগ কৈল নিয়োজনে।।/পক্ষীবধ পাপ করি হৈল দ্বিজবর।/তবে মুক্তিপদ তারে দিলা দামোদর।।[৫]

কিন্তু গুরুর যুক্তিহীন উত্তরে শ্রীমন্ত সন্তুষ্ট হতে পারে না। গুরুও শ্রীমন্তকে যুক্তি দ্বারা পরাস্ত করতে না পেরে ক্রোধে ফেটে পড়েন। শ্রীমন্তর পিতৃপরিচয় নিয়ে তিনি মন্তব্য করে বসেন জারজ সন্তান বলে। শ্রীমন্তর উত্তরে তার যুক্তিবাদী এবং মানবিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়—

> অবিচারে গুরু মিথ্যা পরিবাদ বল।/জারজের ঘরে গুরু কেন খাও জল।।/পঞ্চাশ কাহন কড়ি লও মাসে মাসে।/আমি যদি জারজ তোমার জাতি কিসে।[৬]

শ্রীমন্ত খুল্লনাকে এই তিক্ত ঘটনার পর জানিয়েছে সে আর কোনোদিন পাঠশালা যাবে না। সকলের মাঝে তার এহেন অপমান শ্রীমন্ত মেনে নিতে পারেনি। তাই বিষপানে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। তার প্রখর আত্মসম্মান জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এই ঘটনার মধ্য দিয়ে। অতঃপর সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিতার উদ্দেশ্যে সিংহল যাত্রা করবে। শ্রীমন্তের জন্য নির্মিত হয় সাতটি ডিঙ্গা। ডিঙ্গা নির্মাণ পর্ব শেষ হলে শ্রীমন্ত সিংহল উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে। শ্রীমন্তের একাগ্রতা, অনমনীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় যখন যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীমন্ত খুল্লনাকে তার সংকল্পের কথা বলেছে—

> যদি পিতা পুত্রে মোর হয় দরশন।/আসিয়া করিব পুনঃ চরণ বন্দন।।/যদি পিতা পুত্রে মোর নহে দরশন।/কামনা করিয়া মোর সাগরে মরণ।।[৭]

শুধুমাত্র যে পিতাকে দর্শন করার জন্যই শ্রীমন্ত ব্যাকুল তা নয়, অদৃষ্ট পিতার প্রতি শ্রীমন্তর ঐকান্তিক ভক্তিশ্রদ্ধার পরিচয়ও রয়েছে। তার পিতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যখন সে বিক্রমকেশর রাজার সভায় উপস্থিত হয়। রাজাকে শ্রীমন্ত জানিয়েছে—

> পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম জপ তপ পিতা।/পিতা মহাগুরু পিতা পরমদেবতা।।/পিতার উদ্দেশ্যে যাব দক্ষিণ পাটন।/ইথে যদি মৃত্যু হয় পাব নারায়ণ।।[৮]

জন্মের পর শ্রীমন্ত স্বচ্ছল জীবনযাপন করার অবকাশ পায়নি ঠিকই কিন্তু জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নীল রক্তের প্রবাহ তার শিরায় শিরায় বহমান। শ্রীমন্তর মধ্যে সুপ্তভাবে নিহিত বণিকসুলভ আভিজাত্যের প্রতিধ্বনি লক্ষ করা যায় তার বাক্যে। বিক্রমকেশরকে শ্রীমন্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—

> যদি পিতৃসনে মোর হয় দরশন।
> দেউল মণ্ডিয়া দিব এ পঞ্চরতন।।[৯]

এতখানি অভিজাতসুলভ তেজ হয়তো ধনপতির পুত্রের পক্ষেই সম্ভব। শ্রীমন্তের আভিজাত্যের প্রতিফলন শুধু কথায় নয়, কর্মেও প্রত্যক্ষ করা যায়। ডিঙ্গায় যাত্রাকালীন শ্রীমন্ত যোগ্য বণিকের ন্যায় দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেছে। কর্ণধারকে নির্দেশ দেওয়ার মধ্য দিয়ে তার দক্ষতার পরিচয় আমরা কাব্যে পেয়েছি—

তুমি নাহি জান সাধু গাঙ্গের আদি মূল।
ইহারে তো বলে সাধু শঙ্খদহ কুল।।[১০]

এছাড়াও শ্রীমন্ত চরিত্রটি মধ্যে ধার্মিক প্রবৃত্তির পরিচয় রয়েছে। কর্ণধারের সঙ্গে সাক্ষ্যগ্রহণের সময় শ্রীমন্ত তাকে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যে কথাগুলি বলেছে তার মধ্যে দিয়ে তার ধর্মজ্ঞানের পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে—

সত্য বাক্যে স্বর্গে যায় মিথ্যা বাক্যে ক্ষয়।/হেন মিথ্যা হেতু বাছা করো কিছু ভয়।।/তীর্থ যজ্ঞ দানে হয় পিতার উদ্ধার।/মিথ্যা বাক্যে নরকে নাহিক প্রতিকার।[১১]

ধার্মিক, আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি শ্রীমন্ত চরিত্রটি পর্যাপ্ত পরিমাণে যুক্তিবাদী। নিছক দৈব ঘটনায় বা অলৌকিকতায় আস্থাবান নয় সে। তার যুক্তিবাদী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় যখন চৌষট্টি যোগিনী দর্শন করে মোহিত হওয়ার বদলে তার মনে প্রশ্ন জেগেছে—

যোজনেক প্রমাণ গভীর বহে জল।
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল।।[১২]

শ্রীমন্ত শৈশব থেকে কী প্রকার দুঃখের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছে তা সত্যিই ধারণাতীত। সিংহলরাজ শালবানের শর্ত অনুসারে কমলে কামিনী দর্শন করার পর সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহ স্থির করেন। বিবাহের সংবাদে আনন্দিত হওয়ার বদলে শ্রীমন্ত দেবী অভয়ার কাছে খেদ প্রকাশ করেছে কীভাবে শৈশব থেকে তার পিতা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর মায়ের হাতে আয়াত, আমিষ ভোজন দেখে জ্ঞাতি বন্ধুদের নিকট থেকে গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। সিংহল দেশে এসেও পিতাকে অন্বেষণ করে তিনি পাননি, অতএব শ্রীমন্তর মনে হয়েছে—'পিতা করে নান্দীমুখ তবে বিবাহের সুখ।' শুধু পিতৃ অনুরাগ নয়, শ্রীমন্তের চরিত্রে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং ভালোবাসার প্রমাণও লক্ষ করা যায়। খুল্লনাকে স্বপ্নে দর্শন করে শ্রীমন্ত জননীর চিন্তায় বিচলিত হয়ে পড়েন। তাই নিজ গৃহে ফেরার জন্য সুশীলার কাছ থেকে শ্রীমন্ত বিদায় চেয়েছেন। শত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে অবশেষে পিতাকে কারাগার থেকে উদ্ধার করে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছে শ্রীমন্ত। কাহিনির পরিসমাপ্তিতেও দেখা যায় খুল্লনা এবং সস্ত্রীক শ্রীমন্ত মন্দাকিনী জলে স্নান করে পূর্বমূর্তি ধারণ করে স্বর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। যে উদ্দেশ্যে তার জন্ম তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়েছে বলেই তারা ফিরে গেছে। কাব্যেই সমাপ্তিতেই রয়েছে সেই প্রমাণ—

মালাধর হৈতে হৈল পূজার প্রকাশ।
সাঙ্গ হৈল দেবীর পূজার ইতিহাস।।[১৩]

তুলনামূলকভাবে আমরা যদি মনসামঙ্গল কাব্যে লক্ষ্মীন্দর চরিত্রটিকে দেখি এই চরিত্রটিও জন্মের পর থেকেই বহুকাল পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত থেকেছে। চাঁদ সদাগর বাণিজ্যের জন্য দক্ষিণ পাটনে গিয়েছিল। কিন্তু চাঁদ সদাগর ফিরেও এসেছিল কিছু বছর পর। পিতাকে মুক্ত করে গৃহে ফিরিয়ে আনার দায়ভার লক্ষ্মীন্দরকে গ্রহণ করতে হয়নি। এমনকী কাহিনি পরম্পরায় দেখা যায় বাসরঘরে লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু হয়েছে এবং তার প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য তার মৃতদেহ নিয়ে স্বর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে স্ত্রী বেহুলা। মহাদেবের ভবনে বেহুলা নৃত্যগীত প্রদর্শন করে দেবতাদের তুষ্ট করে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে। এখানেই বেহুলা চরিত্রটি

লক্ষ্মীন্দরকে ছাপিয়ে গেছে। লক্ষ্মীন্দরের জীবনের নিয়ামক হয়ে উঠেছে সে। অথচ প্রাণ ফিরে পেয়ে লক্ষ্মীন্দরকে দেখা যায় বেহুলাকে গ্রহণ করতে তার হৃদয় দ্বিধাবিভক্ত—

মনসুখে একেশ্বর ভ্রমে ছয় মাস।
হেন নারী ঘরে নিলে লোকে করিবে উপহাস।।[১৪]

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে লক্ষ্মীন্দরকে মেরুদণ্ডহীন চরিত্র বললেও অত্যুক্তি হবে না। শ্রীমন্তের সাথে তার কোনো তুলনাই চলে না। অথচ এই দুটি চরিত্রই শাপভ্রষ্ট দেবচরিত্র। মঙ্গালকাব্য ধারার দুই অন্যতম মঙ্গালকাব্য হল মনসামঙ্গাল এবং চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য। দুই মঙ্গালকাব্যের বিস্তৃত পরিসর জুড়ে চলেছে বণিক সমাজে দুই নারীর পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম। চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের ধনপতি চরিত্রটিকেও আমরা মনসামঙ্গাল কাব্যের চাঁদ সদাগর চরিত্রটির আদলে নির্মিত একটি চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। দুই কাব্যেই দেখা যায় দেবীর পূজা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শ্রীমন্ত চরিত্রটি সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র একটি চরিত্র। নিজ চরিত্রগুণে শ্রীমন্ত কার্যক্ষেত্রে ধনপতিকে ছাপিয়ে গেছে। কাহিনির মূল নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে সে। পিতাকে বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করা থেকে গৃহে ফিরিয়ে আনা থেকে আরম্ভ করে সিংহলরাজ শালবান এবং উজানিনগরের নৃপ বিক্রমকেশরকে কমলে কামিনী রূপ দর্শন করানো—সমস্ত ঘটনাই শ্রীমন্তকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। শ্রীমন্তকে সেক্ষেত্রে আমরা কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র বলতে পারি।

লক্ষণীয় শ্রীমন্তের নামকরণটি, ধনপতি বাণিজ্যে যাওয়ার আগে গর্ভবতী খুল্লনার কাছে সন্তানের নাম নির্বাচন করে গিয়েছিলেন। পুত্রসন্তান হলে তিনি নাম রাখতে বলেছিলেন শ্রীমন্ত। নামকরণ বিষয়ে মুকুন্দ চক্রবর্তী অত্যন্ত সচেতন শিল্পী ছিলেন। সমগ্র কাব্যে চরিত্রের নামকরণের মধ্য দিয়ে কবি বিশেষ তাৎপর্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন—ফুল্লরা নামের অর্থ ফুলের মতো কোমল, কুসুমিতা। খুল্লনা শব্দের অর্থ—ক্ষুদ্র > খুল্লৃ + ললনা = কনিষ্ঠ বা অনুজ। ভাঁড়ু শব্দটি এসেছে ভাঁড় থেকে যার অর্থ বিদূষক, খল এবং পরশ্রীকাতর এই চরিত্রটির আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ, পোশাক সবেতেই ভাঁড়সুলভ নিদর্শন রয়েছে। অর্থাৎ নামকরণের ক্ষেত্রে কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী ব্যঞ্জনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এখানেও নামকরণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'শ্রীমন্ত' নামের অর্থ ভাগ্যবান বা বিত্তশালী। যিনি সদাগরের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন, ধন-বৈভব-প্রাচুর্য যে সন্তানকে অভ্যর্থনা জানাবে তার নাম শ্রীমন্ত হবে এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে জন্মের পর দীর্ঘ বারো বছর শ্রীমন্তকে অবিরত সংগ্রাম করতে হয়েছে। সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে জন্মের পূর্বেই শ্রীমন্তের নামকরণ এবং ধনপতির বাণিজ্যে গমনের মধ্য দিয়ে কবি কাহিনির মোড় পরিবর্তনের একটা আগাম ইঙ্গিতও প্রদান করেছেন। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী চরিত্রের নামকরণ নিয়েও কতখানি ভাবিত ছিলেন, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ শ্রীমন্ত চরিত্রটি।

পাশ্চাত্য ভাবনা অনুসারে চরিত্র সাধারণত দুই প্রকার—এক, টাইপ চরিত্র বা ফ্ল্যাট চরিত্র। দুই, ইনডিভিজুয়াল চরিত্র বা রাউন্ড চরিত্র। টাইপ চরিত্রগুলি একরৈখিক এবং সরল হয়। অন্যদিকে রাউন্ড চরিত্রগুলি জটিল হয়ে থাকে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে চরিত্রের এভাবে শ্রেণিগত বিশ্লেষণ করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মধ্যযুগের চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে একটা

বাঁধাধরা ছক অনুযায়ী কবিকে অগ্রসর হতে হত। কারণ মধ্যযুগ বিশেষত মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলির পরিণতি ছিল পূর্বনির্দিষ্ট। তাই অধিকাংশ চরিত্ররাই ছিল টাইপ চরিত্রভুক্ত। কাহিনি নির্মাণের ক্ষেত্রে যেমন মঙ্গলকাব্যের মূলরীতিকে বর্জন করে নতুনত্বের আমদানি কবিদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, চরিত্র চিত্রণেও অনুরূপ রীতির প্রচলন ছিল। বলাবাহুল্য শ্রীমন্ত চরিত্রটিও তার ব্যতিক্রম নয়। শ্রীমন্তকেও আমরা টাইপ চরিত্র বলতে পারি। তবে মঙ্গলকাব্যের পুত্রচরিত্রের ধারায় শ্রীমন্ত ব্যতিক্রমী সংযোজন। দৈবী মহিমা থাকা সত্ত্বেও শ্রীমন্ত চরিত্রটির যুক্তিবাদী মানসিকতা, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি নানা গুণ তাকে অন্যান্য চরিত্র থেকে ভিন্নরূপে চিহ্নিত করে। অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শ্রীমন্ত চরিত্রটি যথার্থ রূপেই স্বতন্ত্র একটি চরিত্র। চণ্ডীমঙ্গল তো বটেই, মঙ্গলকাব্যের ধারাতেও চরিত্রটি তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিরাজমান।

উৎসের সন্ধানে

১. শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত : 'জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গাল ধনপতি উপাখ্যান' (বণিক খণ্ড), প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২২১
২. তদেব
৩. তদেব, পৃ. ২২২
৪. তদেব, পৃ. ২২৩
৫. তদেব, পৃ. ২২৬
৬. তদেব, পৃ. ২২৭
৭. তদেব, পৃ. ২৩৫
৮. তদেব, পৃ. ২৩৫
৯. তদেব, পৃ. ২৪৭
১০. তদেব, পৃ. ২৪৮
১১. তদেব, পৃ. ২৬০
১২. তদেব, পৃ. ২৫৩
১৩. তদেব, পৃ. ৩১৫
১৪. শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত : কবিবর বিজয়গুপ্ত প্রণীত পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গাল, শুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃ. ২৪০

রবীন্দ্রোত্তর কবিতায় মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাব

পল্লবী সাহা

ত্রয়োদশ শতাব্দীর তুর্কি আক্রমণ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ের কালসীমায় বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ পরিব্যাপ্ত। এই দুর্যোগের মুহূর্তে সমগ্র বাঙালি সমাজ যখন আর্ত, বিপন্ন—সেই সময় রচিত হয়েছে মঙ্গালকাব্যগুলি। তাই মঙ্গালকাব্যগুলির বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে ফুটে উঠেছে রাষ্ট্রীয় জীবনের বিপর্যয়ের চিত্র ও লোকসমাজের দৈনন্দিন জীবনের অনুপুঙ্খ বিবরণ। মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ্যশাসিত বর্ণ বিভাজিত সমাজে নর-নারীর ভেদ ছিল, নারীরা ছিল অন্দরের জগতে সীমাবদ্ধ আর বাইরের জগতে পুরুষের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের মধ্যে নারী-পুরুষের কর্মের জগতে কোনো ভেদ ছিল না। মঙ্গালকাব্য এই প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের আরাধ্য দেবতাদের নিয়েই রচিত। যদিও দেশের ওই বিধ্বস্ত সময়ের মুহূর্তে আর্য ও আর্যেতর দুই সমাজ যাবতীয় প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে রেখে সন্ধি স্থাপন করে, এর ফলেই মিশে যায় আর্য সমাজের দেবতার সঙ্গে অনার্য সমাজের দেব-দেবী। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ কবিগণ মঙ্গালকাব্য লিখেছেন, কিন্তু তাঁরা এই মিলনসাধনের প্রসঙ্গাকে বাদ দেননি। সুতরাং এই ধরনের সময়পটে মঙ্গালকাব্য রচিত হওয়ায় সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে লোকপ্রচলিত কথা, পরাজয় ঘটেছে পৌরাণিক দেবতার অর্থাৎ মঙ্গালকাব্য সংস্কৃত পুরাণের সঙ্গে লোকপুরাণের সমন্বয়সূচক কাব্য। মধ্যযুগের মঙ্গালকাব্যগুলিতে আর্যেতর সমাজের কথা যেমন ঠাঁই পেয়েছে, তেমনই কবিরা সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনির সংযোজন ও অনুসরণ করেছেন। তাই মঙ্গালকাব্যের প্রারম্ভে দেববন্দনা, সৃষ্টিপত্তন কাহিনি, দেবখণ্ড—এগুলি সবই সংস্কৃত পুরাণ অনুসারে কল্পিত। আর নরখণ্ডে রয়েছে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কাহিনি, জীবনযাত্রা, গ্রামীণ সমাজ জীবনের বারোমাস্যা।

একথা ঠিক যে, মঙ্গালকাব্যগুলির সাহিত্যমূল্য খুব বেশি নেই। বাংলার লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই মঙ্গালকাব্যগুলি রচিত হয়েছিল। তবে তৎকালীন সময়ের বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র এই মঙ্গালকাব্যগুলিতে আমরা পাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী কবি জীবনানন্দ দাশের "রূপসী বাংলা" কাব্যের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতায় মঙ্গালকাব্যের ঘটনা ও চরিত্রগুলির উল্লেখ কবিতাটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। আর এখানেই মঙ্গালকাব্যগুলি

হয়ে উঠেছে কালোত্তীর্ণ। কবিতাটিতে কবি লিখছেন—

> বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ/খুঁজিতে যাই না আর, অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে/চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নীচে ব'সে আছে/ভোরের দোয়েলপাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ/জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের ক'রে আছে চুপ;/ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;/মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে/এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ/দেখেছিল; বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে—/কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—/সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,/শ্যামার নরম গান শুনেছিল—একদিন অমরায় গিয়ে/ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়/বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

চম্পকনগরের বণিক চাঁদ সদাগর ছিলেন শিবভক্ত, কিন্তু মনসা বিদ্বেষী। তাঁর স্ত্রী সনকা অন্তঃপুরে মনসার ঘট স্থাপন করে পূজা করলে ক্রুদ্ধ চাঁদ সদাগর লাথি মেরে মনসার ঘট ভেঙে দেন। মনসা কিন্তু চান অভিজাত চাঁদ সদাগরকে দিয়ে পূজা করাতে, যাতে উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে মনসার পূজা স্বীকৃতি পায়। কিন্তু চাঁদ সদাগর মনসার ঘট ভেঙে দিলে মনসা রুষ্ট হয়ে চাঁদের মহাজ্ঞান অক্ষয় কবচ হরণ করেন, তাঁর ছয় পুত্রের প্রাণনাশ করেন, সপ্তডিঙা মধুকর ডুবিয়ে দেন। এত কিছু সত্ত্বেও চাঁদ সদাগর মনসা পূজায় অনাগ্রহী থাকেন। কালক্রমে পুত্র লখিন্দরের সঙ্গে বেহুলার বিয়ে হয়। চাঁদ জানতেন বাসরঘরে সর্পদংশনে লখিন্দরের মৃত্যু হবে। তাই তিনি সাঁতালি পর্বতে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে লোহার বাসরঘর তৈরি করান, যাতে সাপ কোনোভাবেই প্রবেশ করতে না পারেন। কিন্তু মনসার ভয়ে বিশ্বকর্মা বাসরঘরে সামান্য ছিদ্র রাখেন এবং সেই ছিদ্র দিয়ে কালনাগিনী প্রবেশ করে লখিন্দরকে দংশন করে। মৃত স্বামীর প্রাণ ফেরানোর জন্য বেহুলা গাঙুরের ঘাট থেকে কলার ভেলায় চড়ে অনেক কষ্ট সহ্য করে শেষপর্যন্ত স্বর্গের দরজায় এসে পৌঁছান। নেত ধোপানির সাহায্যে স্বর্গের আসরে দেবতাদের নাচে-গানে মুগ্ধ করে তিনি মৃত স্বামীর জীবন ফিরে পান, সেই সঙ্গে ফিরে পান ছয় ভাসুরের জীবন এবং চাঁদ সদাগরের সব হারানো সম্পদ। অবশেষে বেহুলার স্নেহের কাছে নতিস্বীকার করে মনসার পূজায় সম্মত হন চাঁদ সদাগর। কিন্তু ডান হাতে শিব পূজা করার জন্য তিনি বাম হাতে পিছন ফিরে মনসার পুজো দেন। এইভাবেই মর্ত্যে মনসা পূজার প্রচলন ঘটে। মনসামঙ্গালের এই কাহিনি আমরা সকলেই জানি তবু আলোচিত কবিতাগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার জন্য কাহিনিটি আরও একবার আলোচনা করে নিলাম।

পরবর্তী কবিতা শঙ্খ ঘোষের 'হেতালের লাঠি'। এখানেও কবি চাঁদ সদাগর এবং লখিন্দরের প্রসঙ্গ এনেছেন। সেই সময়ের অস্থির পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সব কিছু অতিক্রম করার প্রয়াস কবি তুলে ধরেছেন—

> আমি শুধু এইখানে প্রহরীর মতো জেগে দেখি/যেন না ওদের গায়ে কোনো নাগিনীর শ্বাস লাগে/যেন কোনো ঘুম, কোনো কালঘুম মায়াঘুম এসে/শিয়র না ছুঁতে পারে আজ এই নিশীথনগরে/হেতালের লাঠি যেন এ-কালপ্রহরে মনে রাখে/চম্পকনগরে আজ কানীর চক্রান্ত চারদিকে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভাসান' কবিতায় বেহুলা ও লখিন্দরের কাহিনিটি প্রতীকায়িত হয়েছে। এখানে বেহুলা মিলিয়ে গেছে অনন্ত প্রকৃতিতে, আর লখিন্দরের হৃদয় মহৎ বেদনায় আলোকিত। কবি লিখছেন—

> গলিত কংকাল লয়ে একাকী সে কলার মান্দাস/ভেসে যায় কালো জলে চরিতার্থ অমল উদাস/সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ, অন্ধকার টেনে নিলো তারে/গাঙুরের জলোচ্ছ্বাস গ্রাসে সেই ক্লান্ত বেদনারে।।

মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি নিয়ে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখছেন 'বেহুলার ভেলা' কবিতা। এই ক্ষুদ্র কবিতায় মঙ্গালকাব্যের অনুষঙ্গে কবির স্বদেশপ্রেম নিবিড়ভাবে লক্ষ করা যায়—

> গাঙুরের জলে ভাসে বেহুলার ভেলা/দেখি তাই, শূন্য বুকে সারারাত জেগে থাকি—/আমার স্বদেশ করে কাগজের নৌকা নিয়ে খেলা।

এছাড়াও তাঁর 'লখিন্দর' কাব্যের 'বেহুলা' কবিতায় দেখি ভদ্রতার মুখোশধারী মানুষদের লালসা, কামনার্ত রূপ। এই তথাকথিত ভদ্র সমাজকে কবির মনে হয়েছে মৃত লখিন্দর। এই চেতনাহীন সমাজকে কবি নিজেই বেহুলা হয়ে নৃত্যের উদ্দামতায় জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন—

> যেখানে ভিড়বে ভেলা, যাবো। সমুদ্রেও/শান্ত প্রতীক্ষার স্তোত্র গাঁথবো পয়ারে;/গান দেব, জ্বলব, কিন্তু হবো না অঙ্গার;/সে জাগবে, জাগবেই, লখিন্দর সে আমার।

কবিতায় মঙ্গালকাব্যের বেহুলা হয়ে উঠেছে মূল্যবোধ, সুচেতনা, কল্যাণময় সমাজের প্রতীক।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতোই সব্যসাচী দেবের 'বেহুলা ভাসান' স্বদেশচেতনা থেকেই রচিত। লখিন্দর এখানে প্রিয় স্বদেশ ভারতবর্ষ। আর মনসা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, যার ছোবলে লখিন্দর অর্থাৎ স্বদেশ এখন শবমাত্র। বেহুলা একালের নারী, যে দেবতাদের সামনে এসে দাঁড়ায় নিজের শরীরকে পণ্য করে শবের প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন নিয়ে। নিজেকে নিঃস্ব করে, নগ্ন করে মৃত লখিন্দররূপী স্বদেশকে বাঁচিয়ে একালের বেহুলা বলে ওঠে—

> আর এই আমি নামিয়ে রাখলাম মৃতদেহ।/এসো দেবতারা, দেখো, এই আমার দেহ দুলে উঠছে/নাচের ছন্দে, দুলে উঠছে বিসর্জনের প্রান্ত থেকে বোধনের সীমানায়;/দুলে উঠেছে জীবনের নেশায়।/এসো, দেবতারা, তোমাদের দৃষ্টি লেহন করুক/আমার নগ্নতা আমার নারীত্ব/আমার কামনীয় নেই কিছুই, প্রাণ ছাড়া।

এই কবিতায় বেহুলা হয়ে উঠেছে দেশপ্রেমিকা, যে দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে দেশকে অনুভব করে। স্বদেশের এই অসহায় অবস্থা মঙ্গালকাব্যের পরিমণ্ডলেই যেন কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর 'অনন্ত ভাসানে' কাব্যের অন্তর্গত 'মনসামঙ্গাল' কবিতাটিও যেন এক আধুনিক মনসামঙ্গাল। কবি লিখছেন—

> কোথায় নিছনি কোথা চম্পক-নগর/সাতনরী শিকা ঝোলে ঘরের ভিতর/কুপিলম্পে রাতকানা নিরক্ষরা বুড়ি/লখার মরণে কান্দে আছুড়ি-পিছুড়ি/জাল-টানা ছেলে আজ রাতে গেছে জলে/রেখো মা মনসা তার সর্বাঙ্গ কুশলে।

সমকালীন সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, পাঞ্জাবে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ, অসমের বিদেশি খেদাও-এর নাম করে অজস্র মানুষের হত্যা—সবকিছুই এই কবিতায় মনসামঙ্গালের প্রেক্ষিতে ফুটে উঠেছে।

চণ্ডীমঙ্গালের দুটি কাহিনি—কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-শ্রীমন্ত। কালকেতু ব্যাধ, সে পশু শিকার করে আর তার স্ত্রী ফুল্লরা পশুর মাংস হাটে বিক্রি করে। এদিকে কালকেতুর পশু নিধনে অতিষ্ঠ হয়ে বনের পশুরা পশুদের দেবী মা চণ্ডীর আরাধনা করেন। দেবী চণ্ডী তখন স্বর্ণগোধিকার রূপ ধারণ করে কালকেতুর বনগমনের পথে পড়ে থাকেন। দেবীর মায়ায় কালকেতু সেদিন কোনো শিকার না পেয়ে ধনুকের ছিলায় স্বর্ণগোধিকাকে বেঁধে ঘরে নিয়ে আসেন। বাড়ি ফিরে ফুল্লরাকে দেখতে না পেয়ে কালকেতু তাকে খুঁজতে বের হয়। অন্যদিকে বাড়ি ফিরে ফুল্লরা দেখে এক সুন্দরী নারী তাদের ঘরে বসে আছেন। ফুল্লরা সেই রমণীর কথা শুনে ভাবে, কালকেতু তাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এসেছে। তাকে নিবৃত্ত করার জন্য ফুল্লরা তাদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনি শোনাতে থাকে, যা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'ফুল্লরার বারোমাস্যা' নামে পরিচিত। ইতিমধ্যে কালকেতু ফিরে এসে ওই অপরূপ রমণীকে বাড়ি থেকে চলে যেতে অনুরোধ করে। কিন্তু কথা না শোনায় কালকেতু ধনুতে শর যোজনা করে। তখন দেবী চণ্ডী নিজ মূর্তি ধারণ করে কালকেতুকে সাত ঘড়া মোহর ও একটি মূল্যবান অঙ্গুরীয় দিয়ে আশীর্বাদ করে নির্দেশ দেন জঙ্গল কেটে গুজরাট নগরের পত্তন করতে এবং সেখানে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচার করতে। এইভাবে ধীরে ধীরে মর্ত্যে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রসার লাভ করে। পরবর্তী আখ্যান ধনপতি-শ্রীমন্তের কাহিনি। এখানেও ধনপতি ও শ্রীমন্ত বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হয়ে সবশেষে দেবী চণ্ডীর মন্দির নির্মাণ করেন এবং চণ্ডীপূজা শুরু হয়।

এবার রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় চণ্ডীমঙ্গালের কাহিনির উল্লেখ কোথায় কোথায় আছে—তার কয়েকটা উদাহরণ এখানে তুলে ধরলাম। অমিতাভ দাশগুপ্তের লেখা 'চণ্ডীমঙ্গাল' কবিতা। এই কবিতায় কালকেতুর নাম কোথাও উল্লেখ নেই; কিন্তু তূণ, মৃগয়া, নিজ গুণে বাঁধা—এগুলির উল্লেখ রয়েছে। কবিতাটির মধ্যে দেখি—

> এবার তোমাকে বেধেঁছি প্রখর তূণে।/খরায় জ্বলছে পাপিষ্ঠ বৈশাখ,/দহনবেলায় তুমি নর্তকী মায়া,/মৃগয়ার রাতে নিষ্ঠুর লুব্ধক,/লুঠেরা গানের মোহন ফাঁসের/মিহিন তন্তু, রশ্মি,/অন্তিমে জাদু দুহাতে ছিঁড়েছি, তৃষ্ণা—/এবার তোমাকে বেঁধেছি নিজের গুণে।

সমকাল, পরিবেশ খুব নিপুণভাবে চণ্ডীমঙ্গালের অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'ফুল্লরা' কবিতায় দেখি—

> জানি, কুহকিনী, তুমি মনে রাখো, মনে-মনে বাঁধো সেতু
> অয়ি লাবণ্যে, আমি অরণ্যে চির-ব্যাধ কালকেতু।।

কবি যেন মনের নির্জনে আবিষ্কার করেছেন নিজের আর এক সত্তাকে। রহস্যময়তা, সাংকেতিকতার মধ্য দিয়ে কবি যেন হয়ে উঠেছেন মগ্নচৈতন্যের চিত্রকর।

তাই মধ্যযুগে রচিত মঙ্গালকাব্যের সমাজজীবন, নানা উপাদান বর্তমানের বাংলা কবিতায় নতুন ভাবে ধরা দিয়েছে। একালের কবিরা সমকালের বিভিন্ন ঘটনাকে কখনো প্রতীকের আড়ালে, কখনো রূপকের আড়ালে তুলে ধরেছেন মঙ্গালকাব্যের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে। তাই মঙ্গালকাব্যের আখ্যান, খণ্ডচিত্রগুলি নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিষয়ভাবনায় সীমাকে অতিক্রম করেছে এবং সেগুলির মধ্য দিয়ে বাংলার লোকপুরাণের নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন একালের কবিরা।

তথ্যের সন্ধানে

১. শঙ্খ ঘোষ : 'কবিতাসংগ্রহ' ২, ১৩৯৭ কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং
২. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪
৩. অমিতাভ দাশগুপ্ত : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬
৪. জীবনানন্দ দাশ : 'রূপসী বাংলা', কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৯৩২
৬. সঞ্জয় ভট্টাচার্য : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', কলকাতা, ভারবি, ২০০১
৬. তাপস ভৌমিক সম্পাদিত : কোরক, মঙ্গালকাব্য ও মঙ্গালকাব্যচর্চা, শারদ ২০১৬

শিকারি কালকেতু উচ্চবর্গের শিকার
যুগ বদলায়, ছবি বদলায় না
অনিরুদ্ধ বিশ্বাস

উচ্চবর্গের মানুষ যখন যেমন চাইবেন, যা চাইবেন তাই পাবেন। হ্যাঁ পাবেন। না পেলে তারা তা ছল করে (এই ছলের মধ্যে হিংসা প্রদর্শনের, লোভ প্রদর্শন, শক্তি প্রদর্শন, এমনকী মৃত্যুদণ্ডও থাকতে পারে) ছিনিয়ে নেবে। আসলে যুগে যুগে কালে কালে ক্ষমতাবান মানুষের ধর্মই (প্রবৃত্তি) এমন। আমরা যে সময় জীবিত থাকি সেই সময় জুড়ে তা দেখতে পাই। আর অতীতের মানে ধূসর অতীতের এই সব অপরাধের কথা, বৈষম্যের কথা জানতে পারি সে সময়ের সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের আখ্যানকাব্য সেই বাস্তবতারই জীবন্ত দলিল। শুধু একটু দৃষ্টিটা স্বচ্ছ রেখে অক্ষরগুলো পড়ে নিতে পারলেই হল। আমরা আমাদের এই আলোচনা মূলত মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যধারায় 'অভয়ামঙ্গাল'-র একটি চরিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। সে হল 'চোয়াড়' কালকেতু। নীচু জাতির কালকেতু। আর তার চরিত্রের নানা দিকে দৃষ্টি ফেলে বোঝার চেস্টা করব বঞ্চনার বহুমাত্রিক দিককে। আমরা আমাদের আলোচনার শিরোনামের মধ্যে 'উচ্চবর্গ' কথাটা ব্যবহার করেছি। এখানে উচ্চবর্ণ বা ব্রাহ্মণ্যবাদ বা আধিপত্যবাদ ব্যবহার করলেও বিষয়-ভাবনার কোনো বদল হয় না বা বিষয়ের তাৎপর্য পালটায় না।

সবার আগে মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা এ কারণে যে তিনি এমন একটি উচ্চ মানের শিল্পকর্ম উপহার দিয়েছেন; আর দ্বিতীয়ত, তিনি সমকালীন বৈষম্যকে জ্ঞানত ও অজ্ঞানত ফুটিয়ে তুলেছেন। এ কথা তো অনস্বীকার্য যে, তিনি সমগ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কবি। তাই তাঁর হাতে পড়ে যে-কোনো বর্ণনাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবে পাশাপাশি এ কথাও ঠিক যে তিনিও তাঁর বর্গগত অবস্থান থেকে সরে এসে নিরপেক্ষ থাকতে পারেননি এ কাব্যে। ফলে কালকেতু তাঁর বর্ণনায় প্রায় দৈত্য হিসেবেই উঠে আসে।

কালকেতু ব্যাধ সন্তান, তার বাবা ও মা ধর্মকেতু ও নিদয়া। এই কালকেতুর কী প্রয়োজন এই গোটা কাব্য জুড়ে? প্রয়োজন হল উচ্চবর্গের ইচ্ছেপূরণ। দেবী চণ্ডীর ইচ্ছে মর্ত্যে আমজনতার মধ্যে তাঁর পুজো প্রতিষ্ঠিত হোক, প্রচারিত হোক। অর্থাৎ আরও ভালো করে দেখলে বোঝা যায় যে, দেবী মর্ত্যেও অমর হতে চান। যে আমজনতার মধ্যে অমর হতে

চান সেই আমজনতা কারা? উচ্চবর্গ? একদমই না। উচ্চবর্গের মানুষ (তারাই তো দেবতা) অঙ্কে এত কাঁচা নন। হিসেব কষে দেখেছেন যে, জনসংখ্যার প্রায় সিংহভাগই হল এই নীচুজাতির লোক। তাই তাদের মধ্যে পুজো প্রচারিত না হলে অমর হওয়া যাবে না। তাই পরিকল্পনা শুরু। কালকেতুর জন্মের আগেই সে পরিকল্পনা শুরু হয়ে যায়। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে ফাঁদে ফেলে শাপ দিয়ে বাধ্য করে মর্ত্যে ওই নির্দিষ্ট জনজাতির ঘরে জন্মাতে। জন্মের সময় ধাইমার ভূমিকা পর্যন্ত পালন করেন চণ্ডী ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে, অমরত্বের কী দায়! তারপর—"দেবী তাকে কৌশলে কৃপা করে অনুগত দাসে পরিণত করলেন এবং কালকেতুর দ্বারা মর্ত্যে চণ্ডীপূজা প্রচারিত হল।"[১] একেই তো বলে প্রকৃত সাজানো ঘটনা।

এবার দেখি কালকেতুর কর্মকাণ্ডের কী বর্ণনা দেন স্বয়ং কবি। কালকেতুর সামর্থ্য, তার রূপের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেন—

মাতঙ্গ জিনিয়া গতি : রূপে জিনি রতিপতি : সবার লোচন-সুখ-হেতু।।
নাক মুখ চক্ষু কান : কুন্দে যেন নিরমাণ : দুই বাহু লোহার সাবল।
রূপে গুণে শীলে বাড়া : বাড়ে যেন হাতিকাড়া : ঘন জিনি সুচারুকুন্তল।।
বিচিত্র কপালতটি : গলায় জালের কাঁঠী : করযুগে লোহার শিকলী।"

এই কালকেতু দৌড়ে খরগোশ ধরে, হরিণ ধরে, বাতাসের আগে দৌড়াতে পারে। এমনই তার ক্ষিপ্রতা। ব্যাধজীবনের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী। কিন্তু ব্যাধ জীবনকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছেন আবার। কালকেতুকে পেটুকে পরিণত করেই তিনি থামেননি, তার খাবার খাওয়ার ধরনকে সাংঘাতিক ব্যঙ্গ করেছেন। রীতিমতো একটি জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বর্ণনাতে। তিনি বলেন এক নিশ্বাসে কালকেতু সাত হাঁড়ি 'আমানি' খেয়ে ফেলে, চার হাঁড়ি 'খুদ-জাউ' খায়, ছয় হাঁড়ি 'মুসুরী-সুপ' খায়, দু-তিন ঝুড়ি আলু-ওল পোড়া খায়। এরপর তিনি বলেন—

শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
ছোট গ্রাস তোলে যেন তেয়াটিয়া তাল।

আসলে মঙ্গালকাব্য সম্পর্কে যতই বলা হোক না কেন উঁচু-নীচু বর্ণের মিলন-মিশ্রণে সৃষ্ট এ কাব্য। তা একদমই নয়। ওসব ফুলিয়ে তোলা কিছু কথা। তেলে-জলে কি মিশ খায় এও তেমনি এক কাব্য। লিখেছেন যাঁরা তাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ কবি। তাঁরা তাঁদের অবস্থান থেকে; অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন। কিন্তু কোনো অব্রাহ্মণ লেখকের লেখা পেলে তুলনা করে বোঝা যেত আসলে সত্য কেমন ছিল। সে তো হওয়ার নয়। কারণ তখন শিক্ষায় তো তাদের অধিকার ছিল না। তাই লেখক তৈরি হওয়ার সুযোগই ছিল না তাঁদের। তাই অতি সহজেই একটি গল্প বলা গেছে যে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে এই মঙ্গালকাব্যগুলোতে। একদমই তা হয়নি। না মনসামঙ্গালে, না চণ্ডীমঙ্গালে। না অন্য কোনো মঙ্গালকাব্যে। সবসময় উচ্চবর্গীয়রাই আধিপত্য বজায় রেখে গেছেন, সমাজ এবং সাহিত্যে।

উঁচু-নীচুর সমন্বয়-সাধন হতেই পারত। সে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। কিন্তু তা মাঠে মারা গেছে। এবার সে কথায় আসি। কালকেতু ব্যাধ। তাই তার বুদ্ধি থাকতে নেই। সে ব্যাধ তাই তার খাদ্যাভ্যাস কুৎসিত হতে হবে। কালকেতু আদিবাসী তাই তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে

তাই করা যায়। তাকে যখন ইচ্ছে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। আবার যখন ইচ্ছে তার শক্তিও হরণ করা যায়। বর্ণহিন্দু সমাজ সম্পর্কে অন্ত্যজ সমাজের শ্রদ্ধাপূর্ণ উচ্চ ধারণাকে প্রকাশ করানো হয় কৌশলে এবং একই সঙ্গে নীচুজাত সম্পর্কে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করানো হয় সচেতনভাবে। তাই ছদ্মবেশিনী চণ্ডীর পোশাক-পরিচ্ছদ-রূপৈশ্বর্য দেখে কালকেতুর মনে হয়েছে নিশ্চয়ই সে কোনো উচ্চবর্ণের নারী। তাই তার মতো চোয়াড়ের কুঁড়ে ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়া সেই নারীর উচিত হয়নি। কালকেতু বলেছে—"এই ঘরে ঠাকুরাণী প্রবেশে উচিত হয় স্নান।" আর নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে সে বলেছে—"হিংসামতি আমি ব্যাধ অতি নীচ জাতি।"

কৌশলে এগুলো কালকেতুর মুখে বসিয়ে কবি দোষ কাটিয়ে নিলেন। এ কথাগুলো তো কালকেতু নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছে। তাই আমরা ভেবে নিলাম কোনো উচ্চবর্গের কেউ তো বলেননি। আসলে বলেছেন উচ্চবর্ণভুক্ত কবি মুকুন্দ। তাই একে মিলন-মিশ্রণের কাব্য বলা যাবে না। উচ্চবর্ণের কারো মুখে যদি কালকেতু সম্পর্কে শ্রদ্ধাপূর্ণ কোনো কথা থাকত তবে বোঝা যেত যে সত্যিই মানসিক নৈকট্য এসেছে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। তা তো কোথাও হতে দেখি না আমরা। এমনকী কোথাও কালকেতুর উপাধি পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়নি। আদিবাসীরা কি উপাধি ব্যবহার করত না যদি না করত তবে বাকিরা কেন করত নিশ্চয়ই আলাদা করে চেনানোর জন্য। কিন্তু কালকেতুদের নিশ্চয়ই তা ভাবা হত না। প্রকৃত অর্থে অবজ্ঞা, ঘৃণায় উচ্চারিত হত তাদের নাম। তাই আর উপাধি পর্যন্ত উচ্চারণের কষ্ট কে করে। যেখানে দত্ত, শীল ইত্যাদি উপাধি আছে সেখানে শুধু এরাই দলিত, মথিত, প্রয়োজনের উপাদান। এই কালকেতুকে চিত্রিত করতে গিয়ে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ সবসময় সাযুজ্য রাখতে পারেননি। চরিত্রটি অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর-বিরোধী হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর এ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন তাঁর 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন—

> কালকেতুর চরিত্রকে আদ্যোপান্ত পাঠ করলে পাঠকের মন খানিকটা অসন্তোষে ভোগে। চরিত্র চিত্রণের অসামঞ্জস্যই এর কারণ। দেবী কর্তৃক ধনদান কালকেতুর চরিত্রকে স্পষ্টত দুটি ভূমিকায় ও প্রকৃতিতে বিভক্ত করে রেখেছে। পূর্বের দারিদ্র্য ও অরণ্যনির্ভরতা রাজা কালকেতুর জীবনে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। অন্যদিকে স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন, প্রাণবন্ত দাম্পত্যসুখে তৃপ্ত ব্যাধদম্পতিকে খুঁজে পাওয়া যায় না আর উত্তরকালে। কালকেতু রাজা হয়ে আগের স্বতঃস্ফূর্ততা অনেকটা হারিয়ে ফেলে গতানুগতিক হয়ে পড়েছে।... পুরো আখ্যান জুড়ে এই শ্রেণীর দোলাচলতা কবির অস্থির-মতিত্বকে সপ্রমাণ করে।[২]

ওই যে আমরা আগেই বললাম জোর করে একটা সাংস্কৃতিক ও সম্প্রদায়গত মিলন-মিশ্রণের চেষ্টা হয়েছিল কাব্য জুড়ে তার ফলেই এমন অসংগতি এসেছে। তবে এই প্রচেষ্টাকে কখনোই অস্বীকার করা যাবে না। শ্রদ্ধার সঙ্গেই তাকে দেখছি আমরা এখানে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য বিষয় হল, তাতে কালকেতুর অবস্থার পরিবর্তন বিশেষ হয়নি। সেই ধারা চলছেই। বাস্তবে ও সাহিত্যে দুই ক্ষেত্রেই।

কালকেতু নিশ্চয়ই বোকা নয়। অথচ তাকে বোকা হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়। তার শক্তি আছে কিন্তু বুদ্ধি নেই। যখন কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধ হয় তখন তার স্ত্রী ফুল্লরার পরামর্শে

সে ধানের গোলায় লুকিয়ে পড়ে। এই নির্বুদ্ধিতার কাজ আসলে এই বার্তা দেয় যে, তাকে যতই রাজা বানিয়ে দেওয়া হোক না কেন সে আসলে নির্বোধ নীচু জাতেরই প্রতিনিধি। এই বর্ণনা ইচ্ছাকৃত। এই বিভাজন সূক্ষ্ম কৌশলগত। এখানেই আমাদের বলার বিষয় যে কালকেতুকে শুধুমাত্র অনুগ্রহ করা হয়। তার বেশি কিছু নয়। গুজরাট নগর পত্তন করার পর প্রজার অভাব দেখা দিল। কোনোভাবেই সে নগরে প্রজারা এসে বসতি স্থাপন করছিল না। কালকেতু রাজা। তখন তার দেবীর স্তব করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। সে ইতিমধ্যে বুঝে গেছে রাজা হওয়ার বিড়ম্বনা। তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে অরণ্য। সেখানে ঘর-বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। তাই কালকেতু খেদ করে বলেছে—

ধন দিয়া কাটাইলে গুজরাট বন।
কি কারণে এতগুলা তুলাল্যে ভবন।

যে নিজের অবস্থান এভাবে চিনে নিতে পারে তাকে আর যাইহোক বোকা বলা যায় না। কালকেতু যাতে আর কোনোভাবেই তার পূর্বের চেনা জগতে ফিরে যেতে না পারে, তার পাকাপাকি বন্দোবস্ত আসলে এটি।

যে কথা বলছিলাম, তা হল প্রয়োজনে অনুগ্রহ করা হয় কালকেতুকে আবার প্রয়োজনসিদ্ধ না হলে তার শক্তি পর্যন্ত হরণ করে নেওয়া হয়। একসময় দেখা যায় কালকেতু সমগ্র কলিঙ্গ সেনার বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে জয় প্রায় নিশ্চিত, তখন চণ্ডীর মনে হল নীলাম্বরের অভিশাপের কাল প্রায় ফুরিয়ে আসছে, অথচ তাঁর পুজো, তাঁর মাহাত্ম্য তখনো প্রচারিত হল না মর্ত্যে। তখন পদ্মার সঙ্গে যুক্তি করে দেবী বীরের বল হরণ করেন। কালকেতু বন্দি হয় কোটালের হাতে। কবি লিখেছেন—

বীরের শাপের কাল হৈল অবসান। সুরপুরে না যায় ইন্দ্রের অভিমান।। সম্পূর্ণ সময় হৈল কাল নাহি আর। ইহার ভিতরে চাহি পূজার প্রচার।।
এমন বিচার চণ্ডী করি পদ্মা-সনে। ইঙ্গিতে বীরের বল হরিলা সেখানে।।

এরপরই তো মুক্তির প্রত্যাশায় কালকেতু দেবীর স্তব করে। দেবী কলিঙ্গরাজকেও স্বপ্নে ভয় দেখান। সেই চেনা গল্প। অবশ্য এতে চণ্ডীর মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়। মর্ত্যে তার পুজো প্রচারিত হয়। এই তো গল্প। আমাদের মনে পড়ে যায় আধুনিক কালকেতুদের কথা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' গল্পেও তো সেই চিত্র। অর্থ কিংবা খাদ্যের লোভ দেখিয়ে ব্যাধ শিশুগুলোকে বাঘের টোপ বানানো হয়। তাদের বাবা-মায়েরা সেই ষড়যন্ত্র টেরও পায় না। তবে কালকেতু টের পায়। কিন্তু তাকে এমন ফাঁদে ফেলা হয় যে তার আর কিছুই করার থাকে না। সে বাধ্য হয় দেবীর পুজো প্রচার করতে। সুবোধ ঘোষের 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পে যেমন টের পেয়েছিল স্টিফান হোরো—"চা বিস্কুট টেনিস-সুসভ্যতার এক একটি প্রসাদ খাইয়ে হোরোকে যেন পোষ মানিয়ে রাখতে চাইছিলেন ফাদার লিণ্ডন।"[৩] তবে স্টিফানকে পোষ মানানো যায়নি। তাই ফাদার তার প্রেমিকাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। ধর্মান্তরিত করেছিল চিরকি মুরমুকে। যুগে যুগে কালে কালে গল্প একই থাকে। চরিত্রেরা বদলে যায়। পোষ মানানোর উপকরণ বদলে যায় মাত্র। মূলগত কাঠামো মোটের ওপর একই থাকে।

যাইহোক কালকেতুর চরিত্রকে সামনে রেখে আমরা দেখানোর চেষ্টা করলাম যে, সাংস্কৃতিক-সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের চেষ্টা আসলে একটা বাহ্যিক চেষ্টা। ভিতর থেকে তার কোনো চেষ্টাই দেখা যায়নি। তাই যথার্থই অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর অসংগতি দেখতে পান কালকেতুর চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে। অন্যদিকে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—

> কালকেতুর চরিত্র-পরিকল্পনার ভিতর দিয়াও মুকুন্দরামের অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার জীবনে তাহার সহজাত ব্যাধ-সংস্কারের সঙ্গে উচ্চতর কোনও জীবনাদর্শের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় নাই—সেজন্য তাহার চরিত্রটি নিতান্ত সহজ ও সরল। মুকুন্দরাম এক কথায় তাহার পরিচয়টি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—
>
> শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
> গ্রাসগুলি তুলে যেন তে—আঁটিয়া তাল।[৪]

এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই আমাদের মত ব্যক্ত করেছি। অধ্যাপক ভট্টাচার্য কালকেতু সম্পর্কে আরও বলেছেন যে—

> সে অরণ্যচর ব্যাধ, সুতরাং অরণ্য-প্রকৃতির সঙ্গে তাহার একটা সহজ সংযোগ আছে। প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার জীবনেও তাহারই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সে বীর, কিন্তু বীরত্ব তাহার কৃত্রিম অনুশীলনের বিষয় ছিল না, ইহা তাহার জন্মলব্ধ গুণ মাত্র ছিল। সেইজন্য বীরত্ব সম্পর্কিত কোনও সমাজ-নির্দিষ্ট আদর্শকে সে স্বীকার করে নাই, এই বিষয়ে সে তাহার জন্ম-সংস্কারকেই অনুসরণ করিয়াছে। তাহার চরিত্রের এই গূঢ় তাৎপর্যটি বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, কলিঙ্গারাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সে যে পত্নীর পরামর্শে ধান্যগৃহে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহাতে তাহার চরিত্রটি অস্বাভাবিক হইয়াছে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, আর্য বা ক্ষাত্র বীরত্বের আদর্শ ও অনার্য বীরত্বের আদর্শ এক নহে।... সে অনার্য, সুতরাং তাহার বীরত্ব কাপুরুষতামিশ্রিত, আত্মরক্ষার ধর্ম তাহার জীবনধর্ম—সুতরাং ক্ষাত্র বীরত্বের আদর্শ তাহার সম্মুখে স্থাপন করিলেই বরং তাহার চরিত্রটি অস্বাভাবিক হইয়া উঠিত।[৫]

এ বক্তব্যকে আমরা সমর্থন করি না। 'তাহার বীরত্ব কাপুরুষতা মিশ্রিত'—এ মন্তব্যের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। আর তাছাড়া কালকেতুকে মেধাহীন ভাবার একপেশে প্রবণতা থেকে কবি মুকুন্দ এমনভাবে দেখিয়েছেন। কারণ আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি যে, যিনি নিজের অবস্থানকে চিহ্নিত করতে পারেন তিনি বুদ্ধিহীন নয়। তাছাড়া কালকেতু ধান্যঘরে স্ত্রীর পরামর্শে লুকিয়ে পড়ে আবার প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করবেই বা কেন? কিন্তু সে তো বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছিল পরে। আবার আমরা তো দেখেছি দেবী চণ্ডী তার শক্তি হরণ করে নিচ্ছেন কৌশলে। তারপর তাকে বন্দি করা হয়েছে। কাজেই তার বুদ্ধি নিশ্চয়ই ছিল। শক্তি তো ছিলই। তাই এ মন্তব্য যুক্তিপূর্ণ মনে হয় না।

শেষপর্যন্ত কালকেতু উচ্চবর্গের শিকার হয়েই থেকে যায় এই কাব্যে। মঙ্গলকাব্যের কাঠামোর মধ্যে রেখেও তার চরিত্রটি আরও উদারতার সাথে আঁকা অসম্ভব ছিল না। তবে ছিল নানা রকম আর্য সংস্কারের প্রচ্ছন্ন কিছু বাধা। সেই সংস্কারবশত নির্মিত হয়েছে কালকেতু কবি মুকুন্দের হাতে। তাছাড়া আজও তো চারপাশ দেখলে বোঝা যায় মুকুন্দের লেখায় যা পাওয়া যাচ্ছে, আজকের সমাজের মধ্যেও তো সেই ধারণা মৌলভাবেই থেকে গেছে। কোনো

পরিবর্তন হয়নি। কাজেই কালকেতুরা বরাবরই বঞ্চিত। অবজ্ঞাত। তা বাস্তবেই হোক কিংবা সাহিত্যে। যুগ বদলায়, সমাজ বদলায়, কিন্তু সমাজের 'কালকেতু-দৃষ্টি' আর বদলায় না।

উৎসের সন্ধানে

১. মুকুন্দ চক্রবর্তী : 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', সম্পাদনা সনৎকুমার নস্কর, তৃতীয় সংস্করণ, পৌষ ১৪১২/ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ৪১৯
২. তদেব, পৃ. ৪১৯
৩. সুবোধ ঘোষ : চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ, সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠগল্প, প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬, পৃ. ২১৯
৪. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭০ (বঙ্গাব্দ ১৩৭৬), পৃ, ৫০৩
৫. তদেব, পৃ. ৫০৪

মনসামঙ্গল কাব্যের ধারায় লোকাচার

মনিহার খাতুন

গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ঐতিহ্যবাহিত আনুষ্ঠানিক সার্বিক আচরণক্রমই হল লোকাচার। অর্থাৎ সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত প্রথা লোকাচার। লোক ও আচার এই দুইয়ের সমন্বয়ে সৃষ্ট হয় লোকাচার। লোকসংস্কৃতির জগতে 'লোক' শব্দটি বিশেষ অর্থ বহন করে। লোকাচার শব্দটির ক্ষেত্রে 'লোক' বলতে ধারাবাহিত ঐতিহ্যানুগ গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষকে বোঝায়। আচার মূলত দুপ্রকার—শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয়। সাধারণত অশাস্ত্রীয় প্রকারের আচারকেই লোকাচার হিসেবে অভিহিত করা হয়। তবে আচার-অনুষ্ঠানের শাস্ত্রীয় রীতি হিসেবে বর্তমানে যা প্রচলিত তার অনেক কিছুতেই লৌকিক উপাদান প্রবিষ্ট হয়ে আছে। অনেক লৌকিকরীতিই যে পরবর্তীকালে শাস্ত্রায়িত হয়নি, একথাও জোড় দিয়ে বলা যায় না। বর্তমানে হিন্দু সমাজে প্রচলিত অনেক আচার-বিশ্বাসেরই মূল, অনার্য আচরণক্রমে নিহিত। এ বিষয়ে ড. নীহাররঞ্জন রায়ের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

> এ তথ্য সর্বজনস্বীকৃত যে আর্য-ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্তান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারানুষ্ঠান, নানা দেবদেবীর রূপকল্পনা, আহার-বিহারের ছোঁয়াছুয়ি অনেককিছু আমরা সেই আদিবাসীদের নিকট হইতে আত্মসাৎ করিয়াছি। বিশেষভাবে হিন্দুর জন্মান্তরবাদ; পরলোক সম্বন্ধে ধারণা, প্রেততত্ত্ব, পিতৃতর্পণ পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধাদি সংক্রান্ত অনেক অনুষ্ঠান, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সমস্তই আমাদের প্রতিবাসীর এবং অনেকেরই রক্তস্রোতে বহমান সেই আদিবাসী রক্তের দান।[১]

সুতরাং লোকাচার হল সমাজস্বীকৃত কিছু কৃত্য বা পদ্ধতি। একাধিক কৃত্য প্রযুক্ত হয়েই লোকাচার একটি অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। লোকাচারের সঙ্গে সমাজের একাংশের বা বৃহদংশের যোগ থাকায় সমাজের অজান্তে তা অনুষ্ঠিত হয় না বা হতে পারে না। বলাবাহুল্য এর সঙ্গে ব্যক্তি বা পরিবারের যত না শুভাশুভের যোগ তার চেয়ে মুখ্য সমাজের প্রতিকূল সমালোচনাকে অতিক্রমণের প্রচেষ্টা।

সুপ্রাচীনকাল থেকে মানবসভ্যতার ইতিহাস বহমান। আর্য অনুপ্রবেশের আগে ভারতবর্ষে বসবাস করত অনার্য গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। যাদেরকে পরবর্তীকালে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণেরা চিহ্নিত করেছেন দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ বলে। ধর্মাচরণের দিক থেকে এরা আদিম প্রকৃতি—নদী, গাছ, পাথর ইত্যাদির উপাসনা করত। অনেক সংস্কারও বাসা বেঁধেছিল তাদের

মনে। সেই সংস্কার অপ্রতিরোধ্যভাবে তাদের রক্তশিরায় বাহিত হতে হতে পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে। বস্তুতপক্ষে সব দেশে সব কালেই লোকাচার-লোকসংস্কারকে মানবসমাজ আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে। মধ্যযুগে সমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মানুষ নিজেকে সামাজিক জীবন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে বহু আড়ম্বরতা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে ধর্মভীরু ও দণ্ডভীরু সাধারণ মানুষ স্বার্থান্বেষী যাজক ও শাসকদলের বলির উপাচারে পরিণত হয়—

মেনে নেয় দ্বিজ, দেবতা ও শাসকের কঠোর অনুশাসন। মধ্যযুগের বাঙালি জীবনে তাই আরোপিত শাস্ত্রাচারের প্রাধান্য এত বেশি যে ধর্মব্যতীত তাদের সামাজিক জীবনের কোনো অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এই ধর্মশাস্ত্র অনুমোদিত হিন্দুধর্ম হলেও, এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে আত্মগোপন করে আছে অনার্য সংস্কার। বিজিত অনার্যগোষ্ঠীর লোকাচার প্রভাব ফেলেছে আর্যসংস্কৃতিতে। কখনোবা অনার্য জাতির চর্যার উপর প্রলেপ পড়েছে আর্যভাবধারার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই লোকাচার হিন্দুজীবনধারার সঙ্গে এমনই একীভূত হয়ে গেছে, যে তাকে পৃথক করে অনার্য-মূল সংস্কৃতি বলে চিনে নেওয়া দুষ্কর।

মধ্যযুগের প্রায় সমগ্র বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত মঙ্গলকাব্যগুলিতে তৎকালীন হিন্দু জনজাতির বিভিন্ন লোকাচার বিস্তৃত আকারে বর্ণিত হয়েছে। আমরা জানি, আর্য ও অনার্য, বর্ণ হিন্দু ও অন্ত্যজ হিন্দুদের সংস্কার-সাংস্কৃতিক স্বরূপ ও দেবদেবীদের মেলবন্ধন—মঙ্গলকাব্যগুলির প্রেরণা উৎস। ফলে প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায় হিন্দু বাঙালির সমাজ ও ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন লোকাচারের অনুপুঙ্খ বিস্তৃত বিবরণ। আমাদের আলোচ্য মঙ্গলকাব্যধারায় সর্বাধিক প্রচলিত ও জনপ্রিয় মনসামঙ্গল কাব্যে লোকাচার। মনসামঙ্গল কাব্যধারার সকল কবিই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তাঁদের কাব্যে। কবিরা যে অঞ্চলে বসবাস করতেন, সেই অঞ্চলের লোকাচারকেই মূলত প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে ভৌগোলিক অঞ্চলভেদে লোকাচারের ভিন্নতা সহজেই চোখে পড়ে। এখন আমরা দেখব মনসামঙ্গল কাব্যধারার বিভিন্ন কবিরা তৎকালীন বাঙালি হিন্দুর লোকাচারগুলিকে তাঁদের কাব্যে কীভাবে তুলে ধরেছেন। উল্লেখ্য আলোচনায় গভীরতা দানের উদ্দেশ্যে এখানে মনসামঙ্গলের বহু কবির মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে পাঁচজন প্রধান কবির কাব্যকে—

- নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ
- বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ
- বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল
- কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল
- জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল

হিন্দুর সামাজিক জীবনের উৎসব অনুষ্ঠানকে দুটো বৃহত্তর ভাগে ভাগ করা যায়—

১. জন্ম-মৃত্যু-বিবাহকেন্দ্রিক ও

২. পার্বণিক বা ব্রতমূলক।

প্রথমটি প্রাকৃত জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাসমূহের সঙ্গে অন্বিত। দ্বিতীয়টি তিথি, বার, মাস বা নক্ষত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট। মনসামঙ্গালের উপরোক্ত পাঁচজন কবির কাব্যেই রয়েছে জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুকেন্দ্রিক বা ব্রত-পার্বণমূলক বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অজস্র লোকাচারের বর্ণনা।

১. জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচার

❐ জন্মকেন্দ্রিক লোকাচার

শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে মানবসমাজে নানাবিধ লোকাচার পরিলক্ষিত হয়। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থা থেকে শুরু করে শিশুর প্রথম পৃথিবীর আলো দেখা ও তারপর তার ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে ওঠা পর্যন্ত—লোকায়ত জীবনে পালিত হয় বহু আচার-অনুষ্ঠান। প্রাচীন বাঙালি জীবনে পালিত এই লোকাচারগুলি মনসামঙ্গালের কবিরা সযত্নে তুলে ধরেছেন তাঁদের কাব্যে।

শিশুর জন্মের আগে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় গর্ভিনীর গর্ভের পঞ্চম মাসে গর্ভবতী নারীকে 'পঞ্চামৃত' খাওয়ানোর প্রথা প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত। দুধ, দই, ঘি, মধু ও চিনি এই পাঁচ খাদ্য গর্ভিনীকে খাওয়ানোর মাধ্যমে লোকাচারটি পালিত হয়।

ক. সোমাই পন্ডিত বলে সোনেকা গো মাও।
পঞ্চমাস হইলে তোমার পঞ্চামৃত খাও॥ (বিজয় গুপ্ত)

খ. পঞ্চমাস গর্ভ : লোকে বলে সর্ব্ব : শুনঝেউয়া বলি তোরে।
কতেক দিবসে : মনের মানসে : সাধ খাওয়াইবে মোরে।। (কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ)

গ. পঞ্চমাসে পঞ্চামৃত খায় বানিয়ানী।
দশমাসে দশদিনে হইল পুত্রখানি।। (জগজ্জীবন ঘোষাল)

এরপর মাতৃগর্ভের সাতমাস বয়সে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণের মাধ্যমে গর্ভিনীর 'সাধভক্ষণ' অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। লখিন্দরের জন্মের আগে মনসামঙ্গালে সনকার সাধভক্ষণের চিত্র উঠে এসেছে—

ক. নানা অলঙ্কার পৈরে গলায়ে হাসলি।
সাধভাত সোনকা খাইল তক্ষণি।। [বিজয় গুপ্ত]

খ. এ শুভ দিবসে : মনের হরিষে ঃ সাধ খায়াইবে মোরে।। [কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ]

কোথাও আবার নয় মাসে সাধভক্ষণের রীতি প্রচলিত—

নয় মাসে ভক্ষ্য দ্রব্য দেইতহরিষে। [বিপ্রদাস পিপিলাই]

সাধভক্ষণের অল্পদিনের মধ্যেই প্রসূতির প্রসবের সময় উপস্থিত হয়। প্রসবকালে প্রসূতিকে একটি নিরিবিলি পৃথক ঘরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এই ঘরকে বলে 'আঁতুড় ঘর' বা 'সূতিকা গৃহ'। লখিন্দরের জন্মের সময় সনকার জন্যও এমন আঁতুড় ঘরের ব্যবস্থা হয়েছিল—

কুমারিকা লতায় সুতিকা-ঘর বেড়ি
নানা মহোষধিতে গোমুড্ডদ্বারে এড়ি। [বি. পি]

অনেক সময় পাঁচদিনে প্রসূতিকে আঁতুড় ঘর থেকে বসত ঘরে আনা হত। এই উপলক্ষ্যে

নাপিত নখ কেটে দিত। প্রসূতিকে সাবান দিয়ে স্নান করানো হত। শিশুর জন্মের পাঁচদিনের অনুষ্ঠান হিসেবে এই লোকাচারটির নাম 'পাঁচটি' বা 'পাঁচুট্যা'। মনসামঙ্গলে রয়েছে এই পাঁচুট্যার দৃষ্টান্ত—

ক. এক দুই তিন চারি পঞ্চম দিবসে নারী
পাঁচটী করি জথা আশে...। (বি. পি)

খ. সনকা হরিযে পঞ্চম দিবসে
লোকাচারে কৈল নর্ত্তা। (কে. ক্ষে)

সন্তান জন্মের ষষ্ঠ দিনে পালিত লোকাচারটির নাম 'ষষ্ঠী পূজা' বা 'যেটেরা'। মনসামঙ্গালে বলা হচ্ছে—

ক. ছয়দিনে ষষ্ঠীপূজি করিল জাগরণ। (বি. গু)

খ. ছদিনে ষটিরা : করিল বাণ্যারা : সায় ষষ্ঠীপূজা করে। (কে. ক্ষে)

কোথাও কোথাও আবার একত্রিশ দিনে এই ষষ্ঠী পূজা সম্পন্ন হতো। বিপ্রদাসের কাব্যে পাওয়া যায়—

একত্রিশ দিনে করে ষষ্ঠীর পূজন।
নানা পরকারে কৈল নানা আয়োজন। (বি. পি)

ষষ্ঠী পূজার রাতে সন্তানের মায়েরা সারারাত হাতে খড়্গ ও শিশুর শিয়রে দোয়াত, কালি, মসীপত্র রেখে জেগে থাকত। লোক সাধারণের বিশ্বাস ঐ দিন রাতে বিধাতা সন্তানের ললাটে তার ভাগ্যলিপি লিখে দেন।

সনকা সুন্দরী : ষষ্ঠী পূজা করি : যাহার যে নীতি আছে।
হাতে খড়্গ লয়্যা : রহিল জাগিয়া : মসীপত্র থুয়্যা কাছে।। (কে. ক্ষে)

শিশুর জন্মের সপ্তম দিনের অনুষ্ঠান 'উঠানি'। অনেক জায়গায় পাঁচদিনের পরিবর্তে সপ্তম দিনে প্রসূতিকে আঁতুড় ঘর থেকে বাসগৃহে তোলা হয়। এই লোকাচার 'উঠানি' নামে পরিচিত। বিজয়গুপ্তের কাব্যে আছে—

সাতদিনে উঠানি করে শাস্ত্রের বিহিত।

পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে শিশুর জন্মের অষ্টম দিনে 'আটকলাই' লোকাচার পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পাড়া-প্রতিবেশীদের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের আটকড়াই ভাজা খাইয়ে আপ্যায়িত করা হয়। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে নবম দিনে নাপিত ডেকে প্রসূতির নখ কেটে ঘরে তোলা হয়, যা 'নত্তা' নামে পরিচিত। তবে একজন প্রসূতির ক্ষেত্রে উল্লেখিত প্রতিটি লোকাচার পালিত হয় না। জাতিবিশেষে বা অঞ্চলবিশেষে এক-একটি লোকাচারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। মনসামঙ্গালের কবিরাও বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ হওয়ায় তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এক-একটি লোকাচারের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। যেমন—

ক. অষ্টদিনে আটকলাই কৈল শিশুগণ। (বি. পি)

খ. নবম বাসরে নত্তা করিল হরিযে। (বি. পি)

গ. কৈল নয়দিনে নত্তা। (কে. ক্ষে)

সন্তানের যখন ছয় মাস বয়স তখন 'নান্দীমুখ যজ্ঞ', 'নামকরণ' ও 'অন্নপ্রাশন' অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অন্নপ্রাশনের আগে পুরোহিত ডেকে সম্পন্ন পরিবারে 'নান্দীমুখ' যজ্ঞ হয়। তারপর সন্তানের নামকরণ ও সবশেষে জাতকের মুখে পূজার প্রসাদ তুলে দেওয়া হয়। এরপর শিশুর মখে তুলে দেওয়া হয় ভাত বা অন্ন। লখিন্দরের নান্দীমুখ অন্নপ্রাশন ও নামকরণের অনুষ্ঠানটির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন কবিরা এইভাবে—

ক. নান্দীমুখ যজ্ঞ আদি করিলেক সুখে।
লখিন্দর নাম রাখি অন্ন দিল মুখে।। (বি. গু)
খ. শুভক্ষণে অন্ন দিল পুত্রের বদনে।
লক্ষিন্দর নাম রাখে রাজার বিধানে।। (বি. পি)
গ. ছয় মাসে করিল তার অন্ন প্রাসর্ন্ন (না. দে)
ঘ. ছয় মাসে মুখে বালার অন্নপরশাই।
বিচারিয়া রাখিল নাম দুর্ল্লভলখাই।। (জ. ঘো)

পুত্র সন্তানের অন্নপ্রাশন ছয়মাসে হলেও কন্যা সন্তানের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় সাত মাসে। কেতকাদাসের কাব্যে আছে—

সাত মাসে ঊষা বালীর করাল্য ভোজন।

যদিও নারায়ণদেব বেহুলার অন্নপ্রাশন ছয় মাসে সম্পন্ন হওয়ার কথা বলেছেন। বৈচিত্র্য লোকাচারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নারায়ণ দেবের ব্যতিক্রমটি এই বৈশিষ্ট্যকেই স্মরণ করায়।

এরপর শিশুর বয়স যখন পাঁচবছর হয় তখন আনুষ্ঠানিকভাবে তার লেখাপড়ার সূচনা ঘোষিত হয়। তাকে দিয়ে প্রথম একটি অক্ষর লেখানোর লোকাচারটি 'হাতেখড়ি' নামে পরিচিত। পঞ্চম বৎসরে হাতেখড়ির পাশাপাশি শিশুর 'কর্ণভেদ' অনুষ্ঠানটিও সম্পন্ন হত—

ক. পঞ্চমবৎসরের যদি লখিন্দর হইল।
হাতে খড়ি কর্ণভেদ এক কালেতে কইল।। (বি. গু)
খ. ই পঞ্চ বৎসরে করে কর্ণবেধ। (জ. ঘো)

❐ বিবাহ সম্পর্কিত লোকাচার

মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বিবাহ। বিবাহের মধ্য দিয়ে নরনারী নিয়ন্ত্রিত দাম্পত্য জীবনযাপনের বৈধ অধিকার লাভ করে। হিন্দু বাঙালির সংস্কৃতিতে বিবাহ নামক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নানা আচার-বিশ্বাস পালিত হয়। আজও বাঙালি বিবাহের অনুষ্ঠানে যে আচার পালন করা হয় তা হিন্দু বাঙালির প্রাচীন সংস্কৃতি-ই, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। বিবাহ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সনৎকুমার নস্করের বক্তব্য—

> হিন্দুর বিবাহ অনুষ্ঠান শাস্ত্র ও লোকাচারের মিশ্রণ। এর মন্ত্রসমূহ সাম অথবা যর্জুবেদীয়, কিন্তু স্ত্রী-আচার সম্পূর্ণভাবে দৈশিক। আসলে আদিম যুগের মানুষের মনে বিবাহ একটি সংস্কার সৃষ্টিকরেছিল এবং কোনও প্রকারে এর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল উর্বরতার ধারণা। কৃষি সভ্যতার মানুষ মাটির উর্বরতা শক্তির সঙ্গে নারীর সন্তানধারণকে এক গোত্রে ফেলে নানা বিশ্বাসের সূত্রে তৈরি করেছিল অসংখ্য আচার। এইভাবেই বিবাহের উপাচারে প্রবেশ করেছে হলুদ, কলাগাছ, পান সুপারি, সিঁদুর, কড়ি, কলা, শস্য, দূর্বা, মাছ, লোহা, আম্রপল্লব ইত্যাদি।[২]

বিবাহের অনুষ্ঠানে বর ও কনের পরিবার-প্রিয়জন আনন্দের সঙ্গে নবদম্পতির মঙ্গালকামনায় দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা আচারগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। এই আচার ভৌগোলিক অঞ্চলভেদে পরিবর্তনশীল। আবার বেশ কিছু আচার দীর্ঘ দিন ধরে প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। যেমন—অধিবাস, মঙ্গালসূত্র বন্ধন, আইবুড়ো ভাত, গায়ে হলুদ, নান্দীমুখ, বরবরণ, সাতপাক, শুভদৃষ্টি, কন্যাসম্প্রদান, বাসরঘর, বাসি বিয়ে, বরকনে বিদায়, বধূবরণ ইত্যাদি।

হিন্দু বাঙালি বিবাহে ঘটক একটা বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করে। ঘটক কন্যাপক্ষ ও পাত্রপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করে থাকে। অচেনা দুটি পরিবারকে মেলাতে ঘটকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মনসামঙ্গালকাব্যে রয়েছে এই ঘটক প্রসঙ্গ—

ক. রাজ্যের কথা যদি কহিলা দুইজন।
তবে ঘটকে কহে বিবাহের কথন।। (বিজয় গুপ্ত)

খ. ঘটক হইয়া তিনি করিল গমন।। (কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ)

পাত্র পাত্রী নির্বাচন হলে উভয়পক্ষ মিলে বিবাহ স্থির করে। বিবাহ স্থিরীকরণ প্রকৃতপক্ষে একটি চুক্তি। এই চুক্তি লিপিবদ্ধ করা হলে তাকে বলে 'লগ্নপত্র'। বিজয়গুপ্তের কাব্যে পাই—

সবে বলে যোগ্যবর হয়ে লখিন্দর।
এই বারে সদাগর লগ্নপত্র কর।।

বিবাহস্থিরীকরণ পর্বে এক অভিনব প্রথার পরিচয় পাই কেতকাদাসের কাব্যে। পাত্র ও পাত্রীপক্ষের মধ্যে তুলসী পাতা বদল করে বিবাহ স্থির করার প্রথার উল্লেখ করেন তিনি—

চতুর ঘটক ছিল জনার্দন সাথে।
তুলসী আনিয়া দিল দুজনার হাতে।।
তুলসী বদল কৈল বিভার নির্ণয়।
লক্ষিন্দরে বেহুলা দিব সায় বান্যা কয়।।

বিবাহের দিন স্থির হলে আত্মীয় পরিজনদের পান সুপারি প্রভৃতি দিয়ে নিমন্ত্রণ করার প্রথা প্রাচীনকাল থেকে সমাজে প্রচলিত। বিপ্রদাস পিপিলাই-এর কাব্যে লখিন্দরের বিবাহ প্রসঙ্গো উঠে এসেছে নিমন্ত্রণ প্রথার চিত্র—

আমাত্য বান্ধবগণ ডাকি যুক্তি করি।
প্রচুর গুবাক দিল হেম বাটী ভরি।।
আমার পুত্রের বিভা জানহ বিশেষ।
যত্ন করি জ্ঞাতিগণ আনো দেশে দেশে।।

নিমন্ত্রণ ছাড়াও বিবাহ সংক্রান্ত কাজকর্ম বা আচার-অনুষ্ঠান পালনে যে সকল মানুষ উপস্থিত হয়, তাদেরও পান সুপারি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত—

ক. আইয় আসিবে মঙ্গাল গাইতে : তারা চাবে পান খাইতে : তৈল সিন্দুর পাইব কথায়ে। (বিজয় গুপ্ত)

খ. কাজলা আনিয়া সাধু তারে দিল পান।
কাজলা মাল্যানী করে টোপর নির্ম্মাণ।।

বিবাহের মূল আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয় অধিবাসের মধ্য দিয়ে। বিবাহের এক বা দুই দিন আগে পালিত হয় অধিবাস। অধিবাসে বরণডালা পাত্র-পাত্রীর মাথায় ঠেকিয়ে রাখা হয়। কোথাও আবার বিবাহ যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সেই উদ্দেশ্যে অধিবাসে গণেশাদি দেবতার পূজা করা হয়। মনসামঙ্গালের একাধিক কবি বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ বা মনসার বিবাহে অধিবাসের প্রসঙ্গ এনেছেন—

ক. কল্য বিবাহ পদ্মার অদ্য অধিবাস। (বিজয় গুপ্ত)

খ. পূজিয়ে গজানন : অপর চারিজন : পূজিল অধিবাস কালে। (কে. ক্ষে)

বিবাহের দিন পাত্র-পাত্রীকে বরণ করে তার পরিবারের এয়োস্ত্রীরা হলুদ মাখিয়ে স্নান করায়। হলুদের স্পর্শে পাত্র-পাত্রীর ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গলকামনা করা হয়। গায়ে হলুদের পর পুকুর বা নদী থেকে আনা জল দিয়ে এয়োস্ত্রীরা পাত্র-পাত্রীকে স্নান করায়। একে বলে 'মঙ্গালস্নান'। মঙ্গালস্নানের প্রসঙ্গ এনেছেন মনসামঙ্গাল কাব্যের প্রায় সব কবি—

ক. পঞ্চ স্বরে বাদ্য বাজে মনোহর।
বিবাহের মঙ্গালস্নান করে মুনিবর।। (বিজয় গুপ্ত)

খ. স্নান করিয়া বেস করিলা লখিন্দর।
বিশ্বকর্মার নির্ম্মাণ সোনার টোপর।। (নারায়ণ দেব)

গ. আমলা তৈল দিয়া : হরিদ্রা মাখাইয়া : স্নান করাইল গিয়া।। (বিপ্রদাস)

ঘ. হরিদ্রা মাখিয়া গায় কাঞ্চনের দ্যুতি
পরিধান করিল পবিত্র গীত ধুতি (কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ)

বিবাহের দিন নাপিত এসে বরের নখ কেটে দেওয়ার প্রথা কোনো কোনো মনসামঙ্গাল কবি উল্লেখ করেছেন। যেমন—

ক. লখিন্দরের নখ কাটে আনিয়া নাপিত। (না. দে)

খ. জয়ে জয়ে হুড়াহুড়ি মঙ্গালবাদ্য গীত।
করিলা খেউর কর্ম সাধুর নাপিত।। (বি. গু

বিবাহের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকাচার 'নান্দীমুখ'। বিবাহে পুর্বপুরুষদের কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভের জন্য এই আচারটি পালিত হয়। পিতৃপুরুষকে স্মরণ ও অন্নজলাদি উৎসর্গের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যে নান্দীমুখের উল্লেখ আছে—

ক. চান্দো করে নান্দীমুখ : পিতৃলোকের হয়ে সুখ : বৃদ্ধি করয়ে সদাগার।। (বি. গুপ্ত)

খ. নান্দী মুখ করি হরিষে অধিকারী।
পাত্রে ফেলাইয়া দিল দধি।। (কে. ক্ষে)

বিবাহের দিন পাত্র-পাত্রীকে যে জলে স্নান করানো হয়, তা আগেভাগেই এয়োস্ত্রীরা নদী বা পুকুর থেকে সংগ্রহ করে রাখে। জলসংগ্রহের এই লোকাচারটির নাম 'জলসহা'। বিপ্রদাসের কাব্যে রয়েছে এই জলসহার প্রসঙ্গা—

চলিল সুরনারী : লইয়া হেম ঝারি : জলসহে ঘরে ঘরে।

বিবাহ করতে যাওয়ার পূর্বে বরের মাতৃ আজ্ঞা প্রার্থনা বিবাহের একটি অন্যতম লোকাচার।

মনসামঙ্গাল এই মাতৃ আজ্ঞা প্রার্থনার দৃষ্টান্ত সযত্নে বহন করছে। যেমন—

মায়ের চরণ ধরি : বিবিধ প্রণতি করি : আজ্ঞা কর বিভায়ে যাই। (জ. ঘো)

বর যখন বিবাহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তখন তাকে বিশিষ্ট সজ্জায় সজ্জিত করা হয়। পরণে ধুতি, মাথায় টোপর, হাতে দর্পণ, বা কাজললতা বা কাটারি। মনসামঙ্গালে রয়েছে বরের সাজসজ্জার বিস্তৃত বিবরণ—

ক. সুবর্ণ টোপর সাথে : কনক অঙ্গুরি হাতে : গলে মনি মুকুতার হার। (বি. গু)

খ. বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ সোনার টোপর।
জয়ধরে দিল লখাইর সিরের উপর।। (না. দেব)

কনের বাড়িতে বরযাত্রী সহ বর পৌঁছাল তাকে বরণ করার প্রথা প্রচলিত। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে বরকে বরণ করা হয়। মনসামঙ্গালও বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃত্য সহযোগে রূপায়িত বর বরণের লোকাচারটির দৃষ্টান্ত বহন করছে। যেমন, ক্ষেমানন্দের কাব্যে চরণে দধি ঢেলে বরকে বরণ করা হয়—

চরণে দধি ঢালি : দিলেন অঞ্জলি : মানিক অঞ্জলি দান।।

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে প্রদীপ জ্বেলে বরকে বরণ করা হয়—

ডাকিয়া আনেন ঋষি যত নরনারী।
মাথায়ে চালন বাতি হাতে জল ঝারি।।

বিবাহ শুরুর পর বর ও কনের প্রথম দেখা হয় 'শুভদৃষ্টি' নামক লোকাচারের মাধ্যমে। ছাঁদনাতলায় পাত্র ও পাত্রী উপস্থিত হলে পাত্রী মুখের আবরণ সরিয়ে বরের দিকে তাকায়। পাত্র ও কনের দিকে তাকায়। উভয়ের দৃষ্টি বিনিময়ের এই প্রথা 'শুভদৃষ্টি' নামে পরিচিত। শুভদৃষ্টির উল্লেখ রয়েছে মনসামঙ্গালের প্রায় সকল কবির কাব্যে—

ক. অন্তস্পষ্ট দূর করি মুখচন্দ্রিকা।
শুভদিনে বেউলা লখাই হইয়া গেল দেখা।। (না. দেব)

খ. দেখিয়া দুহার মুখ : দুহার পরম সুখ : দুহে দেখিল নয়ানভরি। (জ. ঘো)

বিবাহ আসরে বরের চারদিকে কনেকে সাতবার প্রদক্ষিণ করানোর যে প্রথা তা 'সাতপাক' নামে প্রচলিত। বিজয়গুপ্তের কাব্যে মনসার বিবাহে সাতপাকের প্রসঙ্গা আছে—

স্বামী দেখিয়া মনসার কৌতুক যেন প্রবিষ্টহইল অন্তরে।
ভক্তি বিনয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সাতবার প্রদক্ষিণ করে।।

প্রচলিত সাতপাকের ধারণাটি সার্থকভাবে বিবৃত হয়েছে বিপ্রদাসের কাব্যে—

বসাইয়া পাট করে : ফিরিল সাতবারে : ছায়নি করে তারপরে।

বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর বরকনেকে যে ঘরে তোলা হয় তাকে বলে 'বাসরঘর'। এই বাসরঘরে বরকনের মধ্যে বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে লোকাচার পালিত হয়। বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহের পর মনসার কোপ থেকে বাঁচাতে তাদের তোলা হয়েছিল লোহার বাসরে।

ক. সাতালী পর্ব্বতে লোহার বাসর ঘরে।
তাহাতে খেলায় পাশা কন্যা আর বরে।। (কে. ক্ষে)

খ. বাসরে বসিয়া বর-কন্যা খেলে জুয়া।
দুহার বদনে দুইজনে দেই গুয়া।। (জ. ঘো)

বিবাহের পরদিন বরকনে বরের বাড়ি গমন করে। সেখানে বধূবরণের লোকাচারটি সম্পন্ন হয়। বিপ্রদাস পিপিলাই, বিজয়গুপ্তসহ অনেক কবি বিস্তৃতভাবে তাদের কাব্যে বধূবরণের বর্ণনা দিয়েছেন। বধূবরণের পর কনেকে ঘরে তোলা হয়। ওই দিনের রাত্রিকালটা পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখা নিষেধ। তাই এই রাত 'কাল রাত্রি' নামে পরিচিত। নারায়ণদেবের কাব্যে কালরাত্রির নিষেধের কথা উল্লেখিত—

জদি হও প্রভু তুমি বিচারে পণ্ডিত।
কালরাত্রি কোন কর্ম্ম নহেত উচিত।।

কালরাত্রির পরের রাত্রি ফুলশয্যা নামে পরিচিত। এই ফুলশয্যায় স্বামী স্ত্রীর প্রথম সংসর্গ ঘটে। বর্তমানেও এই রীতি প্রচলিত। এই ফুলশয্যার বর্ণনা রয়েছে বিপ্রদাসের কাব্যে—

বিচিত্র কুসুমে রচি মদন মঞ্জরী।
হরষিত লখিন্দর করে লৈল ধরী।।

এভাবেই হিন্দু বাঙালি বিবাহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ লোকাচারগুলির বিবরণ উঠে এসেছে মনসামঙ্গালের পাতায়।

❐ মৃত্যু সম্পর্কিত লোকাচার

তৎকালীন হিন্দু বাঙালির মৃত্যু সম্পর্কিত নানা লোকাচার, যেমন—অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, পারলৌকিক ক্রিয়া, সহমরণ ইত্যাদির চিত্র মনসামঙ্গল কাব্যে প্রতিফলিত। যদিও মনসামঙ্গাল কাব্যে লখিন্দর ও চাঁদের ছয়পুত্রের শবকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তথাপি মনসামঙ্গালের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সাক্ষ্য থেকে বলা যায়, সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তি ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে মৃতদেহ দাহ করার রীতি ছিল—

পাত্রমিত্র পুরোহিত বলে সম্বিধান।
অগ্নিকার্য শ্রাদ্ধকর শাস্ত্রের বিধান।। (বিপ্রদাস পিপলাই)

শবদাহের জন্য প্রয়োজন একটি অগ্নিকুণ্ড। এই অগ্নিকুণ্ডকে বলা হয় চিতা। কাঠের চিতা সাজিয়ে শবদেহকে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে সারা শরীরে চন্দন লেপে চিতার পর শোয়ানো হয়। এরপর মৃতব্যক্তির পুত্র শবদেহকে সাত বার প্রদক্ষিণ করে মৃতদেহের দিকে না তাকিয়ে মুখে আগন দেয়। মুখে আগুন দেওয়ার লোকাচারটি 'মুখাগ্নি' নামে পরিচিত। সাধারণত মৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্র, অবর্তমানে কনিষ্ঠ বা অন্য পুত্র অথবা পুত্রহীন ব্যক্তির ভাতুস্পুত্র মুখাগ্নি করার অধিকারী। মৃতদেহের জন্য চিতা তৈরির প্রসঙ্গাটি উঠে এসেছে বিপ্রদাস ও জগজ্জীবনের কাব্যে—

ক. তবে সর্ব দেবগণ চণ্ডিকার বোলে।
করিল বিচিত্র চিতা ক্ষীরোদের কূলে।। (বি. পি)

খ. ছয় চিতা নিম্মাইল আনল জ্বালই।। (জ. ঘো)

চিতায় মৃতদেহকে শোয়ানোর আগে স্নান করিয়ে ঘি এবং চন্দন মাখানোর লোকাচারটিও মনসামঙ্গালে উঠে এসেছে—

দিলেন চন্দন কাষ্ঠ ঘৃত বহু তরে।
করাইয়া স্নান শোয়াইল গঙ্গাধরে।। (বি. পি)

মৃতদেহ সৎকারের পর তার পারলৌকিক অনুষ্ঠান হল শ্রাদ্ধ। স্বর্গত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্বক দান হল শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানটি নানাবিধ প্রথা ও আচারের সমষ্টি। শ্রাদ্ধ সাধারণত দু প্রকার—তেরাত্রি শ্রাদ্ধ ও অশৌচান্ত শ্রাদ্ধ। মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে মৃতের বিবাহিতা কন্যাদের দ্বারা পালিত শ্রাদ্ধ তেরাত্রি শ্রাদ্ধ। অশৌচান্ত শ্রাদ্ধ উদ্‌যাপিত হয় মৃতের পুত্র ও জ্ঞাতিদের দ্বারা। তবে অপঘাতে বা দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটলে তিনদিনেই অশৌচান্ত শ্রাদ্ধ পালিত হয়। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গালে সর্পদংশনে লখিন্দরের মৃত্যুর পর তেরাত্রি শ্রাদ্ধ পালন করার কথা বলেছেন সোমাই পণ্ডিত—

সোমাই পন্ডিত বলে স্থির কর মন।
তেরাত্রি শ্রাদ্ধ হবে বেবস্থার বচন।।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ লোকাচার ‘পিণ্ডদান’। প্রচলিত লোকবিশ্বাস-পিন্ডদান ব্যতীত মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতি হয় না। জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে উল্লেখিত—

করিলেক তর্পণ : পিণ্ড দিল তিনজন : তপস্যাকে চলিল সাগরে। শ্রাদ্ধের পর নানাবিধ দানের প্রথা প্রচলিত। শ্রাদ্ধান্তে দানের প্রসঙ্গা রয়েছে জগজ্জীবন ঘোষাল ও বিপ্রদাসের কাব্যে—

ক. বিধিমতে শ্রাদ্ধ কৈল দান যজ্ঞ আদি।
ক্ষিতি পরিতোষ কৈল দিয়া রত্ন নিধি।।
সুবর্ণের ভান্ডার পুরিয়া লক্ষ লক্ষ।
হেনমতে দ্বিজে দান করিল অসংখ্য।। (বি. পি.)

খ. শ্রাদ্ধ কর্ম করে চান্দ বিবিধ বিধান।।
দান ধ্যান বৃষোৎসর্গ করে বিধিমতে। (জ. ঘো)

মৃত স্বামীর সঙ্গো তার পত্নীর সহমরণে যাওয়ার প্রথা প্রাচীন বাংলার সমাজে প্রচলিত থাকলেও, মনসামঙ্গালে এই প্রথার উল্লেখ বিশেষ পাওয়া যায় না। একমাত্র উত্তরবঙ্গোর কবি জগজ্জীবন ঘোষাল চাঁদের ছয়পুত্রের সঙ্গো তার পুত্রবধূদের অনুমৃতা হতে যাওয়ার প্রসঙ্গা এনেছেন।

মরা ছয় লইয়া যায় গগরির ঘাট।
ছয় বধূ অনুসৃতা যায় ছয় ঠাঁট।।

যদিও শেষপর্যন্ত নেতার পরামর্শে, মনসার কৌশলে তাদের অনুসৃতা হতে হয়নি। তারা শ্বশুরগৃহেই থেকে গিয়েছিল।

২. পূজা-পার্বণী—ব্রত মূলক লোকাচার :

মানুষের কামনা-বাসনা পূরণের জন্য কৃত্য সম্পাদনই ব্রত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘বাংলার ব্রত’ গ্রন্থে লিখছেন, ‘‘নানা ঋতুর মধ্যে দিয়ে নানা সব ঘটনা মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করেছে এবং এই সকল ঘটনার মূলে দেবতা অপদেবতা নানারকম কল্পনা করে নিয়ে তারা শস্যকামনায়, সৌভাগ্য কামনায়—এমনি নানা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্রত

করছে।"[৩] সংসারের সুখ-শান্তি কামনায় বাঙালি সমাজে বিশেষ করে নারী সমাজে সূর্যব্রত, একাদশী ব্রত, শিবচতুর্দশী ব্রত, অষ্টমী ব্রত, নারায়ণ ব্রত, চণ্ডী ব্রত ইত্যাদি বহু ব্রত পালনের প্রচলন দেখা যায়। মনসামঙ্গল কাব্যেও তাই নানা ধরনের ব্রত পালনের কথা উঠে এসেছে। যেমন—

ক. সূর্য ব্রত করে যেবা বাইয়া রবিবার।
সূর্যরথে যায় সেই সূর্যের যে দ্বার।। (বিজয় গুপ্ত)

খ. যতি ব্রাহ্মণী আমি করি একাদশী।
ক্ষুধায় জঠর জ্বলে আছি উপবাসী।। (কে. ক্ষে)

দশহরা বাংলার একটি লৌকিক পূজানুষ্ঠান। রাঢ় অঞ্চলে ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে এই পূজা অত্যন্ত জনপ্রিয়। দশহরার দিন মনসার ডাল গৃহপ্রাঙ্গণে পুঁতে প্রতি পঞ্চমীতে মনসা পূজা দেওয়া হয়। তারপর সেই ডাল বিজয়া দশমীর দিন বিসর্জন দিতে হয়। বিপ্রদাস পিপিলাই কাব্যে দশহরা পূজা পালনের কথা উঠে এসেছে এইভাবে—

নানা কুতুহলে : বঞ্চয়ে সকলে : জ্যৈষ্ঠ মাস পরবেশ।
দশমী দশহরা : তিথি যোগ তারা : শুভক্ষণ সবিশেষ।।

দেবদেবীকে তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন পূজাপার্বণের পশুবলি দেওয়া একটি প্রাচীন প্রথা। ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ঘোষাল প্রমুখের কাব্যে বলিদানের চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে।

ক. বিশালাক্ষী মহারণে : বধিল অসুরজনে : কালিকা রুধির কৈল পান।
এই হেতু তার পূজা : করে ইন্দ্র আদি রাজা : মেষ মষি দিয়া বলিদান।। (কে. ক্ষে)

খ. শিশুগন বোলে আমরা পরের রাখালে।
বিষহরি পূজিতে দ্রব্য পাব কোথা গেলে।
বুটি বোলে কপোতের কর বলিদান।
বন পুষ্প দিয়া বাপু করহ পূজন.। (জ. ঘো)

হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানে উপবাস করার প্রথা প্রচলিত। ব্রত পালন, পূজানুষ্ঠানে উপবাস খুবই প্রচলিত, মনসামঙ্গালেও এই উপবাসের চিত্র রয়েছে—

গ্রামের যতেকজন : সভে পূজে ত্রিলোচন : জলপবান নাহি করে কেহ। (কে. ক্ষে)

৩. অন্যান্য লোকাচার :

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ মানব জীবনের এই তিনচক্র এবং ব্রত-পূজা-পার্বণে পালিত বিভিন্ন আচার ছাড়াও দৈনন্দিন সমাজজীবনে মানুষের জীবন অতিবাহিত হয় নানাবিধ প্রথা ও আচার অনুসরণে। সমাজে প্রচলিত এমন অসংখ্য লোকাচারের মধ্য থেকে বেশ কিছু প্রথা-আচার উঠে এসেছে মনসামঙ্গালের পাতায়।

বিবাহিত হিন্দু রমণীর কপালে সিঁদুর ও হাতে শাঁখা-লোহা পরার প্রথা প্রচলিত। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আবার এগুলির পরিত্যাগ করার প্রথা। নারায়ণ দেবের কাব্যে পাই—

সতেক বৎসর জিয় : সাতজাতির মাও হইল : সিন্দুর পরিও পাকা কেসে।
তাহার স্বামী মৈল : সে সোকে পাগল হৈল : হাতে সঙ্খফেলাইল ভাঙ্গিয়া।

বিজয় গুপ্তের কাব্যে পাই—

বনিয়া কুলের রাঁড়ি : শঙ্খ সিন্দূর নহে পরি।

আদর্শ চরিত্রবিশিষ্ট নারীর সমাজে প্রতিষ্ঠা চিরকাল। তেমনি চরিত্রভ্রষ্টা নারী সমাজে ভীষণভাবে নিন্দিত। প্রাচীনকাল থেকে সমাজে নারীর স্থান অত্যন্ত ঠুনকো। অতি সহজে নারীর চারিত্রিক সততা সম্পর্কে সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে। সন্দেহ জাগলেই নারীকে তার সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হত অনুষ্ঠান করে। নারীকে তার সতীত্বের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অগ্নিপরীক্ষা, সর্প পরীক্ষা, জতুগৃহ পরীক্ষা, জল পরীক্ষা, কলাই পরীক্ষা, তোলা পরীক্ষার সমুক্ষীণ হতে হত মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যে। নারায়ণ দেবের কাব্যেও বেহুলার জতুগৃহ পরীক্ষা, তোলা পরীক্ষা, জল পরীক্ষা দেওয়ার কথা এসেছে।

তার শেষে চন্দ্রধর : আসলেক জৌএর ঘর : তাতে বেউলা করিল প্রবেশ।
তৈল ঘৃত ঢালি : পুরিলেক অগ্নিজালি : নাহি লত্র একগাছি কেস।

ক্ষেমানন্দের কাব্যে এসেছে কলাই পরীক্ষার কথা—

হেনকালে বেনে কহে আর কথা।
যদি সে তোমার কন্যা হয় পতিব্রতা।।
লোহার কলাই দিবে করিয়া রন্ধন।
সেই ধনী বিভা করে আমার নন্দন।।

আচারনিষ্ঠ হিন্দু 'নিত্যকর্ম' ও 'আচমন' পালন করেন প্রতিদিন। 'নিত্যকর্ম' বলতে আহ্নিক ও পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে জলদান করাকে বোঝায়। 'আচমন' হল সন্ধ্যা বন্দনার আগে মুখে তিনবার জল দিয়ে ঠোঁট, নাক, কান ইত্যাদি আটটি অঙ্গ স্পর্শ করে দেহের ও মনের শুদ্ধি আনা। নারায়ণ দেব, ক্ষেমানন্দের আগে এই আচমনের উল্লেখ আছে—

করি আচমন : স্বস্তিক বচন : সূর্য সোম জোড় পুটে।। (কে. ক্ষে)

দেবতা, ঋষি ও মৃত পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে জলদান করার প্রথা সমাজে তর্পণ নামে পরিচিত। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গালে আছে তর্পণের প্রসঙ্গ—

কান্তার বাক্য শুনি সাধুর নন্দন।
গঙ্গাজলে করে পিতৃলোকের তর্পণ।।

গৃহে অতিথি অভ্যাগত বা সম্মানিত ব্যক্তির আগমন ঘটলে তাঁকে পাদঅর্ঘ দান করা সমাজের একটি বিশিষ্ট আচার বা প্রথায় পরিণত। বিজয় গুপ্তের কাব্যে পাই—

নারদ দেখিয়া সবে চিন্তলা কারণ।
পাদ-অর্ঘ দিলা দিল বসিতে আসন।।

দুইজন নারীর মধ্যে অনুষ্ঠান করে বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রথাকে বলে সই পাতানো। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতি-বর্ণকে গ্রাহ্য না করে দুজন নারী অভিন্ন হৃদয়বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রথার প্রচলন আজও আছে। মনসামঙ্গালের প্রায় সকল কবিই তাদের কাব্যে সই পাতানো প্রথাটি তুলে ধরেছেন।

ক. কপট করিয়া দেবী মিছা কথা কয়ে।
একই নাম জানিয়া বোলে তুমি আমার সই।। (বিজয় গুপ্ত)

খ. সহেলা করিব দুহে আনন্দ বদনে।
নানা দ্রব্য আনিয়া আনিল আইয়োগনে।।
নানা বাদ্যগন্ধ পুষ্প আনিল কাজলা।
পরম সানন্দে দুহে করিল সহেলা।। (বি. পি)

গ. সুবর্ণ কৌটায় করি : সুন্দর সিন্দূর ভরি : সয়লা পাতাতে দেবী যান। (কে. ক্ষে)

প্রাচীনকালে জামাইয়ের, শাশুড়িকে না দেখার প্রথা প্রচলিত। অর্থাৎ জামাই-শাশুড়ি দর্শন নিষিদ্ধ। বিবাহের দিন অবশ্য এই নিষেধাজ্ঞা নেই। লোকায়ত সমাজে এমন বহু নিষেধাজ্ঞা বা Taboo প্রচলিত। যেমন—

- স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর নাম উচ্চারণ করা নিষেধ।
- মৃত্যু অশৌচের একবৎসর পূর্ণ না হলে বিবাহ করা নিষেধ।
- ঋতুস্নানের পূর্বে নারীদের মন্দিরে প্রবেশ বা পূজার্চ্চনা নিষেধ ইত্যাদি।

ক্ষেমানন্দের কাব্যে এসেছে জামাইয়ের শাশুড়িকে না দেখার নিষেধাজ্ঞা—''লখাই অন্তর হৈল দেখিয়া শাশুড়ি।" ক্ষেমানন্দের কাব্যে রজস্বলা নারীর পূজার্চ্চনার নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গও আছে—

মনে ভাবি শশীকলা : রাজরানি রজস্বলা : আজি তার নাই লইব ফুল।।

এভাবেই প্রাচীন বাঙালি হিন্দুর বিভিন্ন লোকাচার মনসামঙ্গল কাব্যে বাস্তবরসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেই কালে এবং স্থানে যে জীবন নিজেকে সৃষ্টি করেছিল, মনসামঙ্গালের কবিরা সরস সজীব দৃষ্টি দিয়ে তাই বর্ণনার রেখায় রেখায় অবিকলভাবে তুলে ধরেছেন। কবিরা যে অঞ্চলে বসবাস করতেন সেই অঞ্চলের আচার অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁদের কাব্যে। ফলে ভৌগোলিক অঞ্চলভেদে লোকাচারের ভিন্নতা পরিস্ফুটিত হয়েছে। সনকার সাধভক্ষণ, লখিন্দরের জন্ম, বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ, মনসার বিবাহ, লখিন্দরের মৃতদেহ সৎকার, মনসার পূজাপদ্ধতি ইত্যাদি আরও বিভিন্ন প্রসঙ্গো পৌরাণিক আচার পালনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবিরা লৌকিক জীবনরসকেই পরিস্ফুট করেছেন। এ প্রসঙ্গো আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন—''বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গো ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের যে কীভাবে একদেহে লীন হয়ে আছে মঙ্গালকাব্যগুলি তাহার পরিচয়।"[৪] এই লোকাচার কোনো ব্যক্তি বা বিশেষকালের সৃষ্টি নয়। এগুলো বহুযুগের বহুলোকের পরম্পরায় পালিত কৃত্য। এ সবের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হয়তো নেই, তবুও মানুষ এগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে না। মধ্যযুগের সহজ-সরল-সংস্কার পুষ্ট মন চিরকাল এই লোকাচার পালন করে দুঃখে সান্ত্বনা, বিপর্যয়ে বল, বেদনায় শক্তি ও আনন্দে মুক্তির স্পর্শ পেয়েছে। এই আচার ও সংস্কারগুলিই অজ্ঞ, ভীরু, যুক্তিহীন, দুর্বল মানুষের মনের অবলম্বন, জীবনের নিয়ন্তা শক্তি।

উৎসের সন্ধানে

১. রায়, নীহাররঞ্জন 'বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)'. কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৬. সপ্তম সংস্করণ. পৃ. ৪৭৮

২. নস্কর, সনৎকুমার. 'প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পনর্বিবেচনা'. কলকাতা; দিয়া পাবলিকেশন. ২০১২. প্রথম প্রকাশ. পৃ: ৩৫৬
৩. চক্রবর্ত্তী, বরণকুমার (সম্পা.). 'বাংলার ব্রত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর'. কলকাতা; প্রজ্ঞা বিকাশ. ২০১২. প্রথম প্রকাশ. পৃ: ১৬
৪. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ. 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'. কলকাতা; এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি:. ২০১৫. প্রথম যৌথ প্রকাশ. পৃ: ১১

ব্যবহৃত গ্রন্থ

❐ আকর গ্রন্থ :

১. দাশগুপ্ত, শ্রী জয়ন্ত কুমার (সম্পা.). 'বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ.' কলকাতা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৬২. প্রথম প্রকাশ।
২. দাশগুপ্ত, শ্রী তমোনাশ চন্দ্র (সম্পা.). 'সকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ.' কলকাতা; কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৪২. প্রথম সংস্করণ।
৩. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা.). 'বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল'. কলকাতা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ২০০২. প্রথম প্রকাশ।
৪. ভট্টাচার্য, শ্রী বসন্তকুমার (সম্পা.). 'কবিবর বিজয়গুপ্ত প্রণীত পদ্মপুরাণ.' কলকাতা; সুধাংশু সাহিত্য মন্দির. ১৩৪২. চতুর্থ সংস্করণ।
৫. ভট্টাচার্য, শ্রী যতীন্দ্রমোহন (সম্পা.). 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল'. কলকাতা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৪৩. প্রথম প্রকাশ।
৬. ভট্টাচার্য, সুরেশচন্দ্র এবং আশুতোষ দাস (সম্পা.). 'কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল.' কলকাতা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০. দ্বিতীয় সংস্করণ।
৭. মিত্র, তন্ময় এবং মীর রেজাউল করিম (সম্পা.). 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গাল.' কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ. ২০১০. প্রথম প্রকাশ।

❐ সহায়ক গ্রন্থ :

১. গিরি, সত্যবতী এবং সমরেশ মজুমদার (সম্পা.). 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন.' কলকাতা. রত্নাবলী. ১৯৯৭. দ্বিতীয় সংস্করণ।
২. গুঁই, মৃত্যুঞ্জয়. 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে লোকাচার ও লোকবিশ্বাস কলকাতা; সাহিত্যলোক. ২০০৪. পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ।
৩. চক্রবর্ত্তী, বরুণকুমার (সম্পা.). 'বাংলার ব্রত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকর.' কলকাতা; প্রজ্ঞা বিকাশ. ২০১২. প্রথম প্রকাশ।
৪. নস্কর, সনৎকুমার (সম্পা.). 'প্রবহমান বাংলাচর্চা নির্বাচিত গবেষণাধর্ম। প্রবন্ধ সংকলন.' কলকাতা; প্রবহমান বাংলাচর্চা. ২০১৭. প্রথম প্রকাশ
৫. নস্কর, সনৎকুমার. 'প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা'. কলকাতা; দিয়া পাবলিকেশন. ২০১২. প্রথম প্রকাশ।
৬. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ. 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'. কলকাতা; এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি:. ২০১৫. প্রথম যৌথ প্রকাশ.

৭. মন্ডল, ইন্দুভূষণ. 'বাংলা মঙ্গালকাব্যে লৌকিক উপাদান.' কলকাতা; সাহিত্যলোক. ১৯৯৯. প্রথম প্রকাশ।

৮. রায় অনিরুদ্ধ এবং রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়. 'মধ্যযুগে সমাজ ও সংস্কৃতি.' কলকাতা; কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী. ১৯৯২. প্রথম প্রকাশ।

৯. রায়, নীহাররঞ্জন. 'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)'. কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং ১৪১৬. সপ্তম সংস্করণ।

১০. লালা, আদিত্যকুমার. 'মনসামঙ্গালকাব্য জীবনদৃষ্টি বিচিত্র দর্পণে'. কলকাতা কল্যাণী পাবলিকেশন. ২০১০. দ্বিতীয় সংস্করণ।

মঙ্গলকাব্যে বাঙালির খাদ্যোপাচার ও খাদ্যসংস্কৃতি

গৌতম দাস

বাঙালির দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসের পরিচয় ছড়িয়ে আছে মধ্যযুগে রচিত নানা ধারার সাহিত্য রচনায়। মঙ্গলকাব্য, নাথগীতিকায়, বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যজীবনী কাব্য, বাঙালি মুসলমান কবিদের রচিত প্রণয়োপাখ্যান কাব্য ও মৈমনসিং গীতিকাগুলিতেও তার অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তবে অন্যান্য কাব্যের তুলনায় মঙ্গলকাব্যের পরিসর ও ব্যাপ্তি বিপুলায়তন হওয়ায় মধ্যযুগের বাঙালির খাদ্যোপাচারের প্রকৃত আকর তথা নির্ভরযোগ্য দলিল হয়ে উঠেছে মূলত মঙ্গলকাব্যগুলিই।

কোনো অঞ্চলের জনসাধারণের খাদ্যাভ্যাস রীতি অনেকটাই সেখানকার ভৌগোলিক ক্ষেত্র, জলবায়ু, খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি এবং অন্যান্য পরিবেশ-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। আফ্রিকার পর্যটক ইবনবতুতা (ভারতে আগমন খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতক), ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার (ভারতে আগমন খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে) ও অন্যান্য বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে মধ্যযুগে বাংলাদেশ ছিল সুজলা-সুফলা ও শস্যশ্যামলা উর্বরা কৃষিজভূমি। তাই সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশ নানাবিধ ধান, শাকসবজি ও ফলমূলের ভূমিক্ষেত্র রূপে সমাদৃত হয়ে আসছে। আজকের মতো মধ্যযুগেও ভাত, মাছ, দুধ, ফলমূল এবং বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন দ্রব্য সাধারণ বাঙালির খাদ্য তালিকায় প্রাধান্য পেয়েছে। আজকের মতো সেযুগেও বাঙালির প্রধান খাদ্যদ্রব্য ছিল ধান। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' তে বাংলার মাটিতে বিবিধপ্রকার ধান চাষের উৎকর্ষতার কথা ও বহুল উৎপাদনের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন'-এর লেখক তথা ইতিহাসবিদ গোলাম হোসেন এবং 'খুলাসৎ'-এর রচয়িতা সুজন রায় ভাণ্ডারী মধ্যযুগে বাঙালির প্রধান খাদ্য হিসেবে ভাত ও মাছের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা মনে করেন, যেহেতু বাংলাদেশে গমের ফলন কম, তাই মধ্যযুগের বাঙালি জনসাধারণ গম ও রুটি প্রায় খেতই না।[১]

বাঙালির খাদ্য তালিকায় ভাতের উপস্থিতি সুপ্রাচীনকাল থেকেই। ৩৩ সংখ্যক চর্যা গানে (ঢেণ্ঢনপাদের 'টালত ঘর নাহি পরবেশি/ হাঁড়িত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী') মুখ্য খাদ্যোপাদান রূপে ভাতেরই উল্লেখ রয়েছে। কিংবা 'প্রাকৃতপৈঙ্গাল'-এর জনশ্রুত সেই বিখ্যাত পদ, যাতে প্রতিফলিত হয়েছে সেকালের বাঙালির প্রাত্যহিক খাদ্যোপাচার—

ওগ্‌গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা
গাইক ঘিত্তা দুগ্ধা সজুত্তা,
মোইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা
দিজ্জই কন্তা খাই পুনবন্তা।।[২]

অর্থাৎ ওগ্‌রা ভাত খাওয়া হচ্ছে কলা পাতায়, সঙ্গে গাওয়া ঘি, জুতসই দুধ, ময়না মাছের ঝোল, পুণ্যবান খাচ্ছেন। মঙ্গালকাব্যগুলিতে বিবিধ প্রকারের ধান, ধান থেকে চাল এবং চাল থেকে রকমারি খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনের কথা লিপিবন্ধ রয়েছে। রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর শিবায়ন কাব্য-এ কামিনি, পুণ্যভোগ, পারিজাত, জামাই নাড়ু, নীলাবতী, খয়েরশালী, কনকচূড়, চন্দ্রমণি প্রভৃতি বিচিত্র রকম ধানের উৎপাদনের কথা উল্লেখ করেছেন। মনসামঙ্গাল থেকে শুরু করে অন্নদামঙ্গাল, সর্বত্রই প্রধান খাদ্যসামগ্রী হিসেবে ভাত ও চাল থেকে জাত নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী, যেমন—মুড়কি, খই, চিঁড়ে প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। কৃষ্ণরামের কমলামঙ্গাল কাব্যেও প্রধান খাদ্যশস্য রূপে কয়েকপ্রকার ধানের পরিচয় লিপিবন্ধ রয়েছে। ধর্মঠাকুর কিংবা দক্ষিণ রায়ের পূজোপাচারেও চাল প্রদানের কথা বলা হয়েছে। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গাল কাব্যে যে রন্ধন প্রণালীর বিবরণ রয়েছে, তাতেও খাদ্য রসিক বাঙালির রসনা তৃপ্তিমূলক বিবিধ প্রকার ভাতের কথা পাওয়া যায়—

দাদুসাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি।
কেলেজিরা পদ্মরাজ দুদসার লুচি।। ...
সুধা দুধকমল খড়িকামুটি রান্ধে।
বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভারকান্ধে।।
রান্ধিয়া পায়রারস রান্ধে বাশমতী।
কদমা কুসুমশালী মনোহর অতি।।[৩]

পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গাল কাব্যের রচয়িতা নারায়ণ দেব। বেহুলার বিবাহে 'তারকার রন্ধন' প্রসঙ্গে যেসব অঞ্জন-ব্যঞ্জনের বর্ণনা আছে, তাতে মূলত আঞ্চলিক খাদ্য-সংস্কৃতির পরিচয়ই পরিস্ফুট হয়েছে—

> মুগ দিয়া মুগ দাইল আর মুগের বড়ি।/ঘৃতে ভাজিয়া কত তুলিল সিঙ্গাড়ি।।/পাকা কলা কাটী রান্ধিল অম্বল।/জাহার গন্ধ দেখ রান্ধনি পাগল।।/বন্ধন রান্ধে তারকা কানের লড় সোনা।/আমচুর দিয়া রান্ধে সৌল মৎস্যের পোনা।।/খাসির মাংস তোলে ঘৃতেতে ছাবিয়া।/হরিণের মাংস কথ অম্বল রান্ধিয়া।।[৪]

মুগ ডাল, মুগের ডালের বড়ি, ঘিয়ে ভাজা সিঙ্গাড়া, পাকা কলার অম্বল, আমচুর অর্থাৎ আমসি দিয়ে শৌল মাছ, ঘিয়ে কষানো খাসির মাংস, হরিণের মাংস আরও কত উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী, যা পূর্ববঙ্গের নিজস্ব খাদ্যসংস্কৃতিরই অঙ্গ।

সপ্তদশ শতকের পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গাল আরেক কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। ক্ষেমানন্দের কাব্যে রয়েছে নানা আঞ্চলিক খাদ্যোপাচারের বর্ণনা—

ঝাট কর‍্যা কাট, নাড়া, রামকলার পাত।
মৎস্যপোড়া দিয়া আজি খাব পান্তাভাত।।[৫]

কলাপাতায় মৎস্যপোড়া সহযোগে পান্তাভাত খাওয়ার রীতি মধ্যযুগে দক্ষিণবঙ্গের খাদ্যসংস্কৃতিরই অঙ্গ ছিল।

লখিন্দরের জন্মের আগে গর্ভবতী সনকার সাধভক্ষণের যে চিত্র ক্ষেমানন্দ তুলে ধরেছেন, তাতেও সাধারণ বাঙালি গৃহস্থের প্রাত্যহিক খাদ্যোপাচারের প্রসঙ্গই রয়েছে—

পায়েস পিষ্টক খাইতে মিষ্টক
ঘৃতে সম্বরিয়া শাক।
পান্ত ওদন তাহে পোড়া মীন
অধিক পাইলে কাঁজি।
পাইলে মিঠা তক্র হাতে পাই স্বর্গ
গ্রাস দুই চারি ভুঞ্জি।।
সরল শফরী পাইলে গোটাচারি
বোদালি হিলিঞ্চা সনে।[৬]

পান্তাভাত, সঙ্গে পোড়া মাছ, ঘিয়ে ভাজা সম্বরিয়া শাক, পায়েস, পিঠে, সাধারণ গৃহস্থের সাধভোজনে থাকত এরকমই কত কী উপাদেয় খাবার।

বিয়ের পর তার শ্বশুর বাড়িতে বেহুলাকে দেখতে যাওয়ার সময় তার ভায়েরা সঙ্গে নিয়ে যায় নানা উপাদেয় খাবার। ক্ষেমানন্দের কাব্যে তারও খুটিনাটি দিক উঠে এসেছে—

ভারীর স্কন্ধেতে দিল আগে পাছে ভার।।/চিপিটক মুড়কি তাহে উত্তম সন্দেশ।/রসাল পানের বিড়া ভোগাদি বিশেষ।।/ডাগর ঝালের নাড়ু চিনি চাঁপাকলা।/তিন ভাই গেল তারা আনিতে বেহুলা।।[৭]

বেহুলার সঙ্গে ছেলে লখিন্দরের বিয়ে পাকা করতে চাঁদবেনে যান সায়বেনের নিছনির বাড়িতে। সঙ্গে নেন মিষ্টান্ন সহ নানা দ্রব্যাদি—

হাঁড়ি ভর্যা নিল কত মিঠাই সন্দেশ।।
বিচিত্র বসন নিল বহুমূল্য যার।
মলাম সন্দেশ সাধু নিল সাত ভার।।
পূর্ণ সাজে গেল সাধু কন্যা দেখিবারে।[৮]

সপ্তদশ শতকের কবি দ্বিজ বংশী দাসের মনসামঙ্গল কাব্যেও আমরা বিবিধ প্রকার রন্ধন প্রণালীর বর্ণনা পাই। অভিজাত বাঙালির আমিষদ্রব্য সহযোগে রচিত এইসব খাদ্যতালিকা কবির ভোজনরসিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই পরিস্ফুট করে। সেযুগে বাঙালির খাদ্য তালিকায় স্থান পেত নানা প্রকার সুস্বাদু মাছ। যথা—রুই, কাতলা, কই, চিতল, মাগুর, ইলিশ, শোল, বোয়াল, রিঠা, পুটি, পাবদা, পোনা, ইচা, ভেকুট, ফলই, মায়া, সোনাখড়কী, আড়ি, বাচা, চেলা, কালবোস, বাঁশপাতা, টেঙ্গরা, ভেদা, কুড়িশা, খলিশা, খড়ম্বলা প্রভৃতি। এইসব মাছের কোনো কোনোটা পুড়িয়ে, কোনো কোনোটা বিবিধ প্রকার তরকারি সহযোগে উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে তারা আহার করত। দ্বিজ বংশী দাসের কাব্যে এরকমই একটা মৎস্য ব্যঞ্জনের তালিকা পাওয়া যায়। বংশী দাস লিখেছেন—

বড় বড় কই মৎস্য ঘন ঘন আঞ্জি।.../কাতালের কোল ভাজে মাগুরের চাকি।/চিতলের কোল ভাজে বসবাস মাখি।।/ইলিশ তলিত করে বাচা ও বাঙ্গনা।/শউলের খণ্ড ভাজে আর শউল

পোনা।।/বড় বর ইচা মৎস্য করিল তলিত।/রিঠাপুঠা ভাজিলেক তৈলের সহিত।।/বেত আগ পলিয়া চুঁচুরা মৎস্য দিয়া।/শুকতা ব্যঞ্জন রান্ধে আদা বাটিয়া।/পাবতা মৎস্য দিয়া রান্ধে নালিতার ঝোল।/পুরান কুমড়া দিয়া রোহিতের কোল।।.../বাগুণ দ্বিখণ্ডিত করি তাত লাউ যোগ।/মাগুর মৎস্য সহ রান্ধে কোঞর ভোগ।।/নবীন কুমড়া দিয়া কই মৎস্য সনে।/নিপুল বাইয়া ঝোল রান্ধিল বন্ধনে।।[৯]

ধর্মীয় বিধিনিষেধের কারণে বাঙালি হিন্দুগণ গোমাংস ভক্ষণ না করলেও অভিজাতদের খাদ্য তালিকায় মাছের পাশাপাশি স্থান পেত নানারকম উপাদেয় মাংস। কাঠা বা কাছিম, পাঁঠা, খাসি, কবুতর, হরিণ ছিল তাদের প্রিয় খাদ্য। দ্বিজ বংশী দাসের কাব্যে আমরা সেরকমই অভিজাত বাঙালির আমিষাশী খাদ্যের বিবরণ পাই—

কাউঠার রান্ধে মাংস তৈল ডিম্ব দিয়া।/তলিত করিয়া তুলে ঘৃতেতে ছাকিয়া।।/কৈতরের বাচ্চা ভাজে কাউঠার হাতা।/ভাজিছে খাসির তৈল দিয়া তেজপাতা।।/ধনিয়া সলুপা বাটি দারুচিনি যতো।/মৃগ মাংস ঘৃত দিয়া ভাজিলেক কত।।/রান্ধিছে পাঁঠার মাংস দিয়া খর ঝাল।/পিঠালী বাটিয়া দিল মরিচ মিশাল।।[১০]

ব্যাধ জাতীয় নিম্নশ্রেণির লোকেরা অবশ্যই ইঁদুর, গোসাপ, শুকরের মাংসও খেত। নিম্নবঙ্গের দরিদ্র লোকেদের প্রিয় খাদ্য ছিল শুঁটকি বা শুকনো মাছ।

উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের খাদ্য তালিকায় দিনাজপুরের খাদ্যসংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়—

প্রথমে রান্ধিল বালী শাক বড়ি ভাজা।/হরিদ্রা মাখিঞা ভাজে কদলীর মাজা।।/বাপের ঘরে থাকিয়া রন্ধন ভাল জানে।/চেঙ্গা মৎস্য পুড়িয়া জামির দিয়া সানে।।/ভাজিল পোহান মৎস্য চিতলের কোল।/সউলে শিকড় রান্ধে মরিচের ঝোল।।/খাশি মাংস ঝোল রান্ধে আর তার ভাজা।/রান্ধিল চুচুড়া মৎস্য দিয়া বাঁশ গাজা।।/সুকুতা কুষ্মাণ্ড ভাজে শাক দিয়া সিম।/সড়া মৎস্যে দেয় লাউ বাউকি দিয়া নিম।/কই মৎস্য ভাজে আর কৌতরের ছায়।/রুহি মৎস্যের ঝোল রান্ধে আঁকের পাতায়।।/বাছো বানিয়ার মিউ রন্ধন ভাল জানে।/ক্ষুদ্র মৎস্য ভাজিয়া জামির দিয়া সানে।।/নানা ব্যঞ্জন রান্ধে আর ভাজে বড়া।/তার পাছে রান্ধিল মৎস্যের বড় মুড়া।।/আম্র দিয়া রান্ধে বালী পুরাণ কাতল।/কুষ্মাণ্ড তেতলি দিয়া করিল অম্বল।।[১১]

লেবু দিয়ে মাখা পোড়া চেঙ্গা মাছ, মরিচের ঝোল, কিংবা আম দিয়ে কাতলা মাছ রাঁধবার রীতি, আঁড়ের পাতা সহযোগে রুই মাছ রন্ধন; সুকুতা, অম্বল—এসব মূলত দিনাজপুরেরই খাদ্যসংস্কৃতির পরিচয়বাহী। উত্তরবঙ্গে সম্ভবত বোয়াল মাছকেই পোহান বলা হয়ে থাকে। বৈচিত্র্যময় মাছের বৈচিত্র্যময় রন্ধন প্রণালী মাছ-ভাত প্রিয় বাঙালির চিরায়ত স্বভাবকেই পরিস্ফুট করে। কোথাও বা আছে মাছ-মাংস ব্যতীত অন্নভোজনের ছবি—

খাইতে দিল আনি বাছোর বানিয়ানী
অন্ন আর উত্তম ঘৃত।
করিল ভোজন বণিক নন্দন
পাইল পরম প্রীত। (পূর্বোক্ত)

কোথাওবা মিষ্টান্ন দ্বারা অতিথি আপ্যায়নের কথা—

মিষ্টি পরমান্ন দধি মধু আন
দ্রব্য যত দিল পাছে।
ঔষধের তর করিল অন্তর
রাখিল থালের কাছে।। (পূর্বোক্ত)

মধ্যযুগের রাজ-রাজাদের ফল-ফলাদিসহ পছন্দসই খাবারের একটি বিবরণ পাওয়া যায় জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে—

> রাজার বচন শুনি চান্দো সদাগর।/রাজার অগ্রেতে আনি দিল নারিকল।।/রাজা বোলে বড় গোটা কহি কুন ফল।/চন্দ্রপতি কহে রাজা এই নারিকল।।/জল খাঞা রাজা যদি খাইবেন শাঁস।/মন তৃপ্ত হয় আর বাই করে নাশ।।[১২]

কিংবা,

রাজা বোলে সদাগর নারিকল খাও বরাবর
শাঁস খাঞা খাও আর পানি।
ফল খাও বিদ্যমান তবে যদি বাঁচে প্রাণ
তবে আমি মিত্র বলি জানি।।[১৩]

অর্থাৎ শুধুমাত্র সাধারণ লোকের নয়, নারিকেল জল ও শাঁস ছিল সেইযুগে রাজ-রাজাদেরও প্রিয় খাদ্য।

উত্তরবঙ্গের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদিকবি মানিক দত্তের (আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) কাব্যেও আঞ্চলিক খাদ্যসংস্কৃতির তথ্যবহুল বিবরণ মেলে। তাঁর কাব্যে রন্ধনপ্রণালীর যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তা থেকে গৌড়বঙ্গের সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক খাদ্যাভ্যাস রীতির স্পষ্ট চিত্রাভাস পাওয়া যায়। কাঠের জ্বালে লহনা, সতীন খুল্লনার জন্য উপাদেয় খাদ্য তৈরি করছে—

> অগ্নি জালি কাষ্ঠ দেয় নাই করে হেলা।/রন্ধন করিল অন্ন চড়াঞা পাত্রলা।।/তৈলে বার্তকী ভাজে কই মাছের গোড়া।/কলা দিয়া রন্ধন করিল বড়া।।/রুহিত মাছের ভাজা কিছু কৈল ঝোল।/নানা জাতি মচ্ছ্য তাজে চিতলের কোল।।/দালির আম্বল করি কটরা ভরিল।/নানা জাতি বেঞ্জন রন্ধন করিল।।[১৪]

মানিকদত্তের এই বর্ণনা থেকে স্পস্ট সেযুগেও বাঙালির প্রধান খাদ্য ছিল মাছ-ভাত। সঙ্গো থাকত শাক-সবজি, তরকারি, ডাল, বড়া এবং অবশ্যই অম্বল বা চাটনি। রুই, কাতলা, কই, সঙ্গো চিতল মাছের কোল অর্থাৎ পেটি খাদ্যপ্রিয় বাঙালির রসনাতৃপ্তি ঘটাত। শেষপাতে অমৃত আস্বাদের মতো রাখা হত দধি-দুগ্ধ এবং আচমানের পর মুখশুদ্ধির জন্য কপ্পুর সহযোগে তাম্বুল। মধ্যাহ্নভোজের পর বণিক ধনপতি তাই—

অবশেষে দধি দুগ্ধ করিল ভোজন।
ভৃঙ্গারের জলে সাধু কৈল আচমন।।
কর্পুর তাম্বুল খাঞা মুখশুদ্ধি কৈল।[১৫]

কোনো কোনোদিন ভাতের পরিবর্তে ক্ষির-মিষ্টি সহযোগে দধি-চিঁড়া খাওয়াও চলে—

রাত্রি দিবা চলি জায় সাধুর নন্দন।
খির মণ্ডা দধি চিড়া করো এ ভোজন।।[১৬]

তবে অভিজাত পরিবারে উপরোক্ত উপাদেয় খাদ্য-খাবার রীতি থাকলেও দরিদ্র পরিবারে মাছ-ভাত সেভাবে জুটতই না। আম্বানি সহযোগে পান্তাভাতই ছিল তাদের প্রতিদিনকার খাবারের অঙ্গ। মানিক দত্তের কাব্যে তারও বর্ণনা আছে—

> ধর বলি ফুল্ব পান মোর খাবে।/আম্বনি পান্তাভাত বাড়িআ সে দিবে।।/আম্বানি খাইতে প্রভু তোর থাকে সাদ।/কাটিআ আনহ খুদিআ মানের পাত।।/খুদিআ মানের পত্র আনিল কাটিআ।/সাত হাড়ি আম্বানি দিলেন পলিআ।।[১৭]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের আখেটিক খণ্ডে ফুল্লরার রন্ধনদ্রব্য বেসাতি করার মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর সাধারণ বাঙালির প্রাত্যহিক খাদ্যোপাচারের ছবিই তুলে ধরেছেন। ব্যাধ দম্পতির এই খাদ্য তালিকার মধ্যে দিয়ে কবি আসলে সেযুগের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যসংস্কৃতিকেই সুকৌশলে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন—

মাংস বেচি লয় কড়ি চাল লয় দাল বড়ি
তৈল লোণ-কণয়ে বেসাতি।
শাক বেগুণ কচুমলা এঁটে থোড় কাঁচকলা
নানা সজ্জ ভরে আনে পাঁতি।।
নিদয়ার আজ্ঞা ধরে ফুল্লরা রন্ধন করে
আগে ধর্মকেতুর ভোজন।।
খাওয়ায় ফুল্লরা বধূ ক্ষীরখণ্ড দধি মধু
নিদয়ার সফল জীবন।।[১৮]

'নিদয়ার সাধভক্ষণ'-এ সমকালীন গ্রামবাংলার সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের খাদ্যোপাচারের বর্ণনা পাই—

আপনার মত পাই তবে গ্রাস দুই খাই
পোড়া মাছে জামিরের রস।
নিধানী করিয়া খই তাহাতে মহিষা দই
কুল করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি।
যদি পাই সাজো ঘোল পাকা-চালিতার ঝোল
প্রাণ পাই পাইলে আম্‌সি।।
আমার সাধের সীমা হেলঞ্চা কলমী গিমা
বোদালি কাটিয়া কর পাক।
ঘন কাটি খরজালে সান্তালিবে কটুতৈলে
দিবে তাতে পলতার শাক।।
পুঁইডগা মুখী কচু ফুলবড়ি আর কিছু
দিবে তথি মরিচের ঝাল।।...
ভাজ কিছু রাই খাড়া চিঙ্গাড়ির কর বড়া
সজারু করহ শিক-পোড়া।।...
মূলা বেগুনেতে সিম তাহে দিয়া রান্ধ নিম
তাহে দেও উড়ুম্বর ফল।।[১৯]

জামির অর্থাৎ লেবুর রস দিয়ে পোড়া মাছ খাওয়ার রীতি মধ্যযুগের খাদ্যসংস্কৃতির অঙ্গ ছিল। 'নিদয়ার সাধভক্ষণ' অংশেই শুধু নয়, মঙ্গালকাব্যের নানা ধারায় সাধারণ বাঙালির খাদ্য তালিকায় বহুবিধ পরিচিত-অপরিচিত শাকের নাম পাওয়া যায়। যথা- সরিষা, বাথুয়া, পলতা, পালং, নটে, কলমি, গিমা, পুঁই, কাঁটাসিজ, নলিতা, মেথি, কচু, মহুরী, সাঞ্চা, সম্বরিয়া, মাটা, নিমপাতা, লাউশাক, ছোলার শাক, হেলঞ্চা, বোদলী, বনতা, ঝপুই, ভদ্রপলা, হিজলি, জাঙ্গি, ডারি, পালা, ধনে প্রভৃতি। নিরামিষ রন্ধনের জন্য বহুরকম সবজি ব্যবহৃত। যেমন- কদলক, বেগুন, থোড়, আলু, মান, কুমড়া, কাঁঠাল বীজ, লাউ, কাঁচকলা, মোচা প্রভৃতি। তিতো ব্যঞ্জনের জন্য নিম, সিম, বেগুন এবং বেতের আগায় ছোটো মাছ ব্যবহার করা হত। মশলা হিসেবে মরিচ, মেথি, জিরা, লবঙ্গা ব্যবহৃত হত। ডালের ব্যঞ্জনও বাঙালির প্রিয় খাদ্য তালিকায় ছিল। বাঙালির রসনা তৃপ্তির জন্য মাষ, মুসুরি, ছোলা, অড়হর, মটর, কলাই প্রভৃতি ডালের চাষ হত। পুষ্টিকর খাবার হিসেবে ডিম খাওয়ার রীতি সেযুগেও ছিল। সেইজন্য গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে হাঁস, মুরগির পালন দেখা যেত। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-র 'কালকেতুর ভোজন' অংশে কালকেতুর খাদ্যগ্রহণে অতিরঞ্জন থাকলেও খাদ্যদ্রব্য বর্ণনাতে কোনোরূপ বাহুল্য নেই—

মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে। এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে।।
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ। ছয় হাঁড়ি মুসুরী-সুপ মিশা তথি লাউ।।
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া। কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া।।...
এন্যাছি হরিণী দিয়া দধি এক হাঁড়ি। তাহা দিয়া অন্ন বীর খায় তিন হাঁড়ি।।[২০]

ব্যাধ সন্তান কালকেতুর মধ্যাহ্নভোজের এইসকল খাদ্যোপাদান আসলে মধ্যযুগের প্রান্তিক জনসাধারণের দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গেই সঙ্গাতিপূর্ণ।

শিবায়ণ কাব্যে লোকায়ত গ্রামীণ চাষি পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্যাভাসের তালিকা পাওয়া যায় কবি রামেশ্বর ভট্টাযার্যের শিবায়ণ কাব্য থেকে। তথাকথিত উচ্চবর্গের কবির কলমেও উঠে এসেছে প্রান্তিক চাষির খাদ্যোপাচারের প্রসঙ্গ—

দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে।/বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে।।/সুক্ত খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।/অন্ন আন অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে।।/কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।/হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য ধরে খা।।/হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।/ঈষদুষ্ণ সুপ দিল বেশরির পরে।।/শঙ্কর বলেন শুন নগেন্দ্রের ঝি।/সুপ হইল সাঙ্গ আন আর আছে কি।।/দড়বড় দেবী এনে দিল ভাজা দশ।/খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ।।[২১]

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যে বর্ণিত লোকজ শিব-পার্বতীর অভাব-পীড়িত এই প্রাত্যহিক জীবনচিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে লোকায়ত জনসাধারণের প্রতিদিনকার বাস্তবোচিত খাদ্যাভ্যাসের ছবি। দরিদ্র কৃষক পরিবারে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় মাছ-মাংস জোটে না, শুক্তো, ভাজা, তরকারি আর শাক পেয়েই তারা খুশি।

মুকুন্দ কবিচন্দের বাসলীমঙ্গাল- এও রয়েছে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য সহযোগে দেবীর আরাধনার কথা। যা থেকে মধ্যযুগের বাঙালির রন্ধন উপাচারসহ দেব-দেবীর পূজারীতির পরিচয় উঠে এসেছে—

যদি নাহি থাকে গুণ কি করিবে রূপ।/যবক্ষারে রান্ধিতে দিল কলাই-র সুপ।।/সুগন্ধি কুসুম ঝারা বান্ধিল উপরি।/আবাহন করি পূজে ত্রিপুরা সুন্দরী।।[২২]

শাক, তরকারি, বিবিধ বড়ি সহযোগে নিরামিষ আহারের বিস্তৃত বর্ণনা মেলে ষোড়শ শতকের চৈতন্যজীবনীকার কৃয়দাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ। কৃয়দাস কবিরাজ লিখেছেন—

দশ প্রকার শাক নিম্ব সুকুতার ঝোল।/মরিচের ঝাল স্থানাবড়া বড়ী ঘোল।।/মোচা ঘণ্ট মোচা ভাজা বিবিধ শাকরা।।/বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।/ফুল বড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার।।/নব নিম্ব পত্রসহ ভৃষ্ট বার্তাকী।/ফুলবড়ী পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।।/মুদগবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।/ক্ষীরপুলী, নারিকেলপুলী আর যত পিষ্ট।।[২৩]

মধ্যযুগের সাধারণ বাঙালির আরেকটি উপাদেয় খাবার ছিল হাতে তৈরি রকমারি নাড়ু। বিভিন্ন প্রকার নাড়ুর বর্ণনা পাই কৃয়দাস কবিরাজের কাব্যে—

কথোক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।/চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া।।/শালি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া।/ঘৃতে সুক্তা চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া।।/কর্পূর মরিচ লবং এলাচি বসবাস।/চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস।।/শালি ধানের খৈ পুন ঘৃতেতে ভাজিয়া।/চিনি পাকে উখরা কৈল কর্পূরাদি দিয়া।।[২৪]

শুধু মঙ্গালকাব্যে নয়, মধ্যযুগে রচিত প্রায় সব ধারার সাহিত্য, চৈতন্যজীবনী কাব্য, বৈয়ব পদাবলী, শাক্ত গীতিকা, বাঙালি মুসলমান কবিদের প্রণয়োপাখ্যান, পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ গীতিকা সর্বত্রই সাধারণ বাঙালির চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যোপাচারের অজস্র উদাহরণ মেলে। যা অবশ্যই বাঙালির ঐতিহ্যময় খাদ্যসংস্কৃতিরই অঙ্গ।

উৎসের সন্ধানে

১. মুহম্মদ আবদুল জলিল : 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৪৪

২. পরিতোষ মুখোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যে অনগ্রসর শ্রেণী', গবেষণা গ্রন্থ ভাবনা, প্রথমপ্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ. ২৩

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত : 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪২

৪. নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ—এ বিষয় ও শিল্পকাঠামোয় বৈচিত্র্য, মঞ্জুলা বেরা, ঐকিক ১ম বর্ষ, ২০১৫, মনসামঙ্গাল কাব্য সংখ্যা, সম্পাদক- মিঠুন দত্ত, শিলিগুড়ি, পৃ. ৪৩

৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-বিলাপ', বাইশ কবির মনসা-মঙ্গাল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ. ২০৪

৬. তন্ময় মিত্র, মীর রেজাউল করিম, সুবোধকুমার যশ সম্পাদিত : 'মনসামঙ্গাল', কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৯

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

৮. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : সম্বন্ধ স্থির, বাইশ কবির মনসা-মঙ্গাল বা বাইশা, পৃ. ১৮১

৯. দীনেশচন্দ্র সেন : 'বঙ্গা সাহিত্যের পরিচয়', প্রথম খণ্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা,

১৯৪১, পৃ. ২২২-২৩
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪
১১. জগজ্জীবন ঘোষাল, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও আশুতোষ দাস সম্পাদিত : 'মনসামঙ্গাল', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ২১৬-২১৭
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬
১৪. সুনীল ওঝা সম্পাদিত : 'মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল', উত্তরবঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, ১৯৮১, পৃ. ২০৩
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪২
১৭. পূর্বোক্ত, ১৯৮৮, পৃ. ৭৭
১৮. মুকুন্দরাম প্রণীত : 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: নভেম্বর, ২০১৪, পৃ. ৩৯
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫
২০. উৎস-১৮, পৃ. ১৯৮
২১. অরবিন্দ পোদ্দার : 'মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৫৮
২২. বাসলীমঙ্গাল, মুকুন্দ কবিচন্দ্র, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬১বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
২৩. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত : চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সংশোধিত সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০৫-২১০
২৪. সুকুমার সেন সম্পাদিত : 'চৈতন্যচরিতামৃত', কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সাহিত্য অকাডেমি, দিল্লি, ১৯৭৭, পৃ. ৪৩৩-৩৪

শব্দকুশলী কবি ভারতচন্দ্র

ভবেশ মজুমদার

কালের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে নানা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় পারদর্শী হয়ে উঠেছেন ভারতচন্দ্র। যা তাঁকে দিয়েছে সম্মান ও সাহস। জীবনে অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করে নানা স্থানে গমন, ফলশ্রুতিতে নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে সংযোগের কথা এইখানে উল্লেখ্য। রাজসভার ঝাড়বাতির নীচে বসে রাজ-অর্থে বা রাজ-আজ্ঞায় তাঁকে যে সাহিত্য রচনা করতে হয়েছে সেখানে তিনি রাজ-মনোরঞ্জনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সেজন্য তিনি শ্লীলতার গণ্ডি অতিক্রমণের অভিযোগেও অভিযুক্ত। কিন্তু তাঁর উপায় ছিল না। জয়দেব কিংবা বিদ্যাপতিও এক্ষেত্রে নির্দোষ নন।

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্র নিঃসন্দেহে কবি-পণ্ডিত এবং শব্দকুশলী কবি। সৌন্দর্য-সৃষ্টির লক্ষ্যেই তিনি নির্মাণ করেছেন 'কাব্য-কথার তাজমহল'। মর্মর পাষাণের উপর উজ্জ্বল মণি-মাণিক্যের মতো এক-একটি কথা যেন তিনি ঘষে-মেজে বসিয়েছেন। অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার নজির হিসেবে উঠে এসেছে তাঁর অনির্বচনীয় ভাষা। মধ্যযুগীয় মঙ্গালকাব্যের কবিসমাজ এই ক্ষেত্রটিতে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করেননি।

সাহিত্যে ভাষা নির্মিত হয় অপূর্ব মণ্ডনকলা, শব্দতরঙ্গা, ছন্দের পারিপাট্য, মুঠো মুঠো অলংকারের সমন্বয়ে। এক অপরূপ সুর-হিল্লোলে এই ভাষার চরিত্র ভারতচন্দ্রের কাব্যকে জায়গা করে দিয়েছে চিরকালের রসিক সমাজে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাগবৈদগ্ধ্য। এটি কাব্যের যত বড়ো গুণই হোক না কেন এর মধ্যে লুকিয়ে আছে বহিরঙ্গের পরিচয়। যদিও কাব্যের বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা সম্পর্কের কথা আধুনিক রোমান্টিক কাব্যের সম্পর্কে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা গেলেও গতানুগতিক বিষয় নিয়ে রচিত মঙ্গালকাব্য সম্পর্কে কতদূর প্রযোজ্য তা বিশেষভাবে বিচার্য। মঙ্গালকাব্যের ইতিহাসকার শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

> অবশ্য যথার্থ সার্থক যে কাব্য তাহার বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গের মধ্যে কোন সুস্পস্ট সীমারেখা নাই, অন্তঃসৌন্দর্যের জ্যোতিতে ইহার বহিরঙ্গা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে; অতএব এক হইতে আরকে বিচ্ছিন্ন করিবার কল্পনাও করিতে পারা যায় না।[১]

ভারতচন্দ্র তাঁর সমগ্র কাব্যের ভিত্তিভূমির জন্য পূর্ববর্তীদিগের নিকট গভীরভাবে ঋণী। একটা যুগ এসে পূর্ণতা লাভ করেছে তাঁর মধ্যে। তাঁর কাব্যসৃষ্টির উপকরণসমূহ বিশ্লেষণ

করলে দেখা যাবে সেখানে রয়েছে সুদীর্ঘ একটা যুগের পরিণত সাহিত্য-সাধনার বহু উপাদান। ভারতচন্দ্র সত্যিকারের যুগস্রষ্টা নন, বরং যুগেরই সৃষ্টি। আসন্ন নবযুগের ইঙ্গিত তাঁর মধ্যে পাওয়া গেলেও তাঁকে নিয়ে একটি যুগ আরম্ভ হয়নি। বরং একটি যুগ তাঁর মধ্যেই পরিণতি লাভ করেছে। এই যুগ পটভূমি থেকে ভারতচন্দ্রকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করার উপায় নেই।

ভারতচন্দ্র ভাষাকে সরস করতে চেয়েছিলেন এই যুগের দিকে দৃষ্টিপাত করেই। তিনি জানতেন সকল যত্নসাধিত কাব্যকলার লক্ষ্য হল রস। রসহীন শিল্পকর্ম একপ্রকার ব্যর্থই। সেজন্য কবি-কলমে উঠে এসেছে 'যে হৌক সে হৌক ভাষা, কাব্যরস লয়ে'। এই রস সঞ্চারের দিকে লক্ষ রেখেই অন্নদামঙ্গালে হয়েছে শব্দের বিচিত্র প্রদর্শনী। নির্বিবাদে কাব্য-মধ্যে স্থান পেয়েছে তৎসম, তদ্ভব, দেশি, আরবি, ফারসি প্রভৃতি শব্দ। এর মধ্যে তৎসম কিংবা তদ্ভব অথবা দেশি শব্দ নিয়ে জিজ্ঞাসা বা কৌতূহলের কোনো কারণ নেই। বাংলা কাব্যে স্বাভাবিক ভাবে এর বাহুল্য থাকবেই। কিন্তু আরবি-ফার্সির বহুল ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বভাবিক। মনে হয় ভারতচন্দ্রের—"বাল্যে ফারসি শিক্ষা, ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং রাজসভার কবি হওয়া ওই সব শব্দকে কাব্যমধ্যে স্থান দিয়েছে।"[২]

সংস্কৃত ভাষায় ভারতচন্দ্রের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। কৈশোরেই সংস্কৃত ভাষায় গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি। যদিও পিতা ও অগ্রজেরা এতে অখুশিই হন। কারণ অর্থকরী বিদ্যা হিসেবে সেই সময় ফারসির বহুল কদর ছিল। বাড়ির সকলের কাছে পাণ্ডিত্যের চেয়ে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যই বড়ো বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদা ধনী পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টি চিন্তা করলে ভাবনাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। যৌবনে সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাতাবরণে আরবি-ফারসি ভাষা শিক্ষা করেছিলেন ভারতচন্দ্র। তাঁর বিভিন্ন রচনায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

বহু ভাষা ভারতচন্দ্রের জানা ছিল। কিন্তু সেইসব ভাষাতেই তিনি পুরো সংলাপ লেখেননি। বুঝেছেন, এতে দুর্বোধ্যতার বাধা আছে। তদুপরি প্রসাদগুণের অভাব ঘটবে এবং সরসতা আসবে না। তাই যাবনী-মিশাল ভাষাকেই কবি শ্রেয় মনে করেছেন—

পড়িয়াছি সেই মত, বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।।
না রবে প্রসাদ-গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী-মিশাল।।[৩]

যাবনী ভাষায় নিজের দক্ষতার কথা কবি মৃদু আত্মশ্লাঘার সঙ্গো বলেছেন। তিনি যখন মানসিংহের সঙ্গো জাহাঙ্গীরের কথাবার্তার বিবরণ দেন তখন আমরা শুনতে পাই—

মানসিংহ-পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারশী হিন্দুস্থানী।।
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি।[৪]

এরপরেই কবি বলছেন, ও সকল ভাষা জানা থাকলেও পুরো সংলাপ এতে তিনি লিখছেন না। লিখলে সবাই বুঝবে না। তাই ভাষার মিশ্রণ তিনি ঘটালেন।

এইখানে পরিমাণ-বুদ্ধির কথা এসে যায়। ভিন্ন ভাষা কতখানি মেশাল দেওয়া হবে তা

নির্ভর করে কবির সঙ্গাতিবোধের উপর। তিনি দেখবেন মূল কাব্যভাষার চরিত্র যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। বোধগম্যতা যেন বজায় থাকে। আবার যে ভিন্নভাষী মানুষটি কথা বলছেন বাগভঙ্গি থেকে যেন তাঁর চরিত্র চিত্রাকারে ফুটে ওঠে। নিঃসন্দেহে বলা যায় ভারতচন্দ্র এই পরিমাণবোধ যাবনী-মিশালে দেখিয়েছেন—

> যদিও শেষ পর্যন্ত কালের হাতে তিনি মার খেয়েছেন, কারণ তাঁর জীবনকালের পরে এদেশে রাজাবদল হয়ে যাওয়ায় যে-বিবেচনায় তিনি যাবনী মিশাল ভাষা নির্মাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তার প্রয়োজন হ্রাস পায়।[৫]

ভারতচন্দ্র তাঁর বড়ো-ছোটো সব কাব্যেই প্রথম থেকে যাবনী ভাষার ব্যবহার করেছেন। সত্যপীরের পাঁচালি কিংবা বিদ্যাসুন্দরে তার প্রমাণ আছে। বিদ্যাসুন্দরে 'ভাটের প্রতি রাজার উক্তি' কিংবা 'ভাটের উত্তর' অংশে খাঁটি যাবনী ভাষার ব্যবহার চোখে পড়লেও আমাদের লক্ষ্য অন্যত্র কিছু খণ্ড কবিতার অংশ, 'মানসিংহ'-এর কিছু অংশ ও অসম্পূর্ণ চণ্ডীনাটক। 'মানসিংহ' থেকে একটু অংশ উদ্ধার করি—

মানসিংহ যোড় হাতে অঞ্জলি বান্ধিয়া মাতে
কহে জাঁহাপনা সেলামত।
রামজীর কুদরতে মহিম হইল ফতে
কেবল তোমারি কেরামত।।
হুকুম শাহনশাহী আর কিছু নাহি চাহি
জের হইল নিমক হারাম।
গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হৈল
বাহাদুরী সাহেবের নাম।।[৬]

দিল্লিতে ভূতের উৎপাতের সকৌতুক বর্ণনাটি অসাধারণ। ভূতের হুংকারে যবনের হাহাকার দুর্দান্ত চিত্র-রসময় হয়ে উঠেছে—

> ঘরে ঘরে সহরে হইল ভূতাগত।/মিঞারে কহিছে বান্দী শুন হজরত।।/বিবীরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল।/পেশবাজ ইজার ধমকে ছিঁড়া দিল।।/চিৎপাত হয়ে বিবী হাত পা আছাড়ে।/কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে।।/শুনি মিঞা তসবী কোরাণ ফেলাইয়া।/দড় বড় রড় দিল ওঝারে লইয়া।।/ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত।/বিবী লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত।।[৭]

শব্দ প্রয়োগে ভারতচন্দ্র অনেকখানি সাম্যবাদী। ভাষার রাজ্যে তিনি সতর্ক বিচরণ করেছেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য সঙ্গত কারণেই তাঁকে প্রাচীন বঙ্গাভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ শব্দশিল্পী বলেছেন।

কাব্যের মধ্যে মূলত দুই প্রকার শব্দের ব্যবহার দেখা যায়—১. ওজোগুণ সমৃদ্ধ, ২. প্রসাদগুণ বিশিষ্ট। পৌরাণিক প্রসঙ্গ বর্ণনাতে প্রথমোক্ত শব্দের ব্যবহার হয়েছে অধিক। ভারতচন্দ্র দক্ষযজ্ঞ নাশের বর্ণনা দিয়েছেন এইরকম—

> ঊর্দ্ধ-বাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।/লম্ফ ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কর্ম্ম লাড়িছে।।/অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি দক্ষ দেহ পুড়িছে।/ভস্ম-শেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে।।/হাস্যতুণ্ড যক্ষকুণ্ড পূরি পূরি মুতিছে।/পাদ ঘায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তি পুঁতিছে।।/রাজ্য খণ্ড লণ্ড ভণ্ড

বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।/হূল হূল কূল কূল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে।।/মৌন তুণ্ড হেঁট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে।[৮]

পীঠমালা বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের শব্দশিল্পের জাদু যথার্থই চমকপ্রদ। এখানে রয়েছে সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দের বাহুল্য। পৌরাণিক নামের সঙ্গে পৌরাণিক প্রসঙ্গ শব্দকে ওজোগুণে সমৃদ্ধ করেছে। ভারতচন্দ্র পীঠমালার বর্ণনায় লিখেছেন—

হিঙ্গুলায় ব্রহ্মরন্ধ্র ফেলিলা কেশব।/দেবতা কোট্টরী ভীমলোচন ভৈরব।।/শর্করারে তিন চক্ষু ত্রিগুণ ভৈরব।/মহিষমর্দিনী দেবী ক্রোধীশ ভৈরব।।/সুগন্ধায় নাসিকা পড়িল চক্রহতা।/ ত্র্যম্বক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা।।/জ্বালামুখে জিহ্বা তাহে অগ্নি অনুভব।/দেবীর অম্বিকা নাম উন্মত্ত ভৈরব।।[৯]

শব্দের গ্রন্থনা এখানে শিল্পীচেতনার শীর্ষদেশে অবস্থান করছে। দক্ষযজ্ঞ নাশকালে দেখা যায় রুদ্রের ভৈরব-মূর্তি নিখুঁত শব্দ চয়নে একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। আর প্রসাদগুণ বৈশিষ্টে পারিবারিক জীবনের বর্ণনায় স্থান পেয়েছে মৃত্তিকালগ্ন মানুষের আটপৌরে ভাষা। হরগৌরীর কথোপকথন অংশে আনন্দসাগরে ডুব দেওয়ার চেষ্টায় শিবের গৌরীর প্রতি বিনয় এবং হাসিমুখে গৌরীর ব্যঙ্গ-পূর্ণ উত্তর এই খানে স্মরণযোগ্য। শিবের মুখে শোনা যায়—

তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বসার।/কৃপা করি আমারে করিলে অঙ্গীকার।।/দক্ষযজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি।/এত দিন ছিলা গিয়া হেমন্তের বাড়ী।।/ভাগ্যে সে তোমার দেখা পানু আর বার।/সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর।।[১০]

শিবের কথার প্রত্যুত্তর গৌরী দেন এইভাবে—

সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়।।/নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।/পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন।।/পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাদ করে।/তার সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে।।/পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।/অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়।।[১১]

চলিত ভাষা যে কতখানি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে এ যেন তারই নমুনা। একেবারে সাদামাটা দৈনন্দিন ব্যবহার্য শব্দ প্রয়োগের গুণে আমরা প্রবাদের মহিমা দেখতে পাচ্ছি। বাঙালি নারীর মান-অভিমানাহত মর্মলোকের চিরায়ত কথা শব্দকুশলী কবি আমাদের সামনে তুলে ধরছেন।

শব্দের সাহায্যে ভারতচন্দ্র এক অসাধারণ চিত্ররূপ রচনা করেছেন। শিবের দক্ষালয়ে যাত্রাতে অনুকার বিকারজনিত ধ্বনির পুনরাবর্তনে এক অনবদ্য চিত্ররূপ তৈরি হয়েছে—

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।/ভভম্ভম ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে।।/লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।/ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা।।[১২]

কিংবা,

ফণাফণ ফণাফণ ফণীফন্ন গাজে।/দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে।।/ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।।/ববম্ভম ববম্ভম মহাশব্দ গালে।।[১৩]

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন ভারতচন্দ্রের প্রতি কটূক্তির বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করলেও কবির শব্দমন্ত্রের উচ্ছ্বসিত স্তুতি করেছেন। অনুকারবাচক বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগে সৃষ্ট চিত্ররূপ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"মহাদেবের যে ভৈরবসুন্দর চিত্রখানি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা কাব্যসাহিত্যে শীর্ষদেশে স্থান পাইবার যোগ্য।"[১৪]

এখানে ভাষার উপরে কবির আশ্চর্য অধিকার দেখা যায়। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে যেন প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেনের একটি বক্তব্য এই খানে তুলে ধরা হল—

> 'ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা' এই ছত্রটিতে তরঙ্গের তিনটি গুণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, 'ছলচ্ছল'-জলের প্রবাহব্যঞ্জক, 'টলট্টল'-জলের নির্মলতাব্যঞ্জক, 'কলক্কল'-জলের নিক্কণব্যঞ্জক, —গঙ্গাতরঙ্গের এরূপ সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা বোধহয় আর কোন কবি দিতে পারেন নাই।[১৫]

সাহিত্যে ভাবযুগের পর স্বাভাবিক নিয়মেই শব্দযুগের আবির্ভাব ঘটে থাকে। মঙ্গালকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলী যা অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী সেখানে ভাবের প্রবহমানতা ছিল, তা ক্রমশ স্থিতিলাভ করে শব্দযুগে এসে। অষ্টাদশ শতকে ভাবের উপর শব্দতরঙ্গা ধ্বনির সৃষ্টি হল। সেইজন্য ভারতচন্দ্রের ভাষা হয়েছে 'ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা'।

ভারতচন্দ্র ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দের জন্য নিন্দা-প্রশংসা দুই'ই পেয়েছেন। ধ্বন্যাত্মক শব্দের কিছু উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে ব্যর্থতা অপেক্ষা সাফল্যই ভারতচন্দ্রের অধিক। শব্দের আতসবাজিতে অজস্র আলোকচূর্ণ আমাদের চোখে পড়ে—

ক। লটপট জটা লপটে পায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়।।
গর গর গর গরজে ফণী।
দপ দপ দপ দীপয়ে মণি।।
ধক ধক ধক ভালে অনল।
তর তর তর চাঁদ মণ্ডল।।[১৬]

খ। কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে।
গুন গুন গুন গুন ভ্রমর ঝংকারে।।
সুশোভিত তরুলতা নবদলপাতে।
তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে।।[১৭]

গ। ঝঞ্জনার ঝঞ্জনী বিদ্যুৎ চকমকি।
হড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি।।
ঝড়ঝড়ি ঝড়ের জলের ঝরঝরি।
চারিদিকে তরঙ্গা জলের তরতরি।।
থরথরি স্থাবর বজ্রের কড়মড়ি।
ঘুট-ঘুট আঁধার শিলার তড়তড়ি।।[১৮]

কাব্যের শৈলিতে দেখা যায় লেখকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত বাচনকলা। লেখকের ব্যক্তিত্ব, বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি কাব্যশৈলীর জগতকে সমৃদ্ধ করে। ভারতচন্দ্রের কাব্যশৈলী পুরোনো বিষয়বস্তুকে সঙ্গো নিয়েও নতুন হয়ে উঠেছে পাণ্ডিত্য ও প্রকাশভঙ্গির নিজস্বতায়। ভারতচন্দ্র দেশি শব্দের ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। একালের পণ্ডিত গবেষক জানিয়েছেন—

> যাবনী-মিশাল ভাষা নিয়ে ভারতচন্দ্র যে-ধরনের পরীক্ষাকাজ চালিয়েছিলেন, তা কোন ঐতিহাসিক কারণে সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেনি, কিন্তু তাঁর প্রয়াসের দারুণ সাফল্য ঘটেছে—খাঁটি দেশজ শব্দ ব্যবহারে।[১৯]

কিছু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাইছি—ডোকরা বামন, বড়ো কন্দলিয়া, কবে

যাবা, হুলাহুলি দিয়া, জামাই লেঙ্গাটা, বুড়া আঁটকুড়া, চক্ষু খেয়ে, মিটিমিটি, ঝাঁকড় মাকড়, ভাঙা লড়ি, বড়োই ছাবাল, দেয় খোঁটা ইত্যাদি। শিবের বিবাহ-সভায় গৌরীর বর দেখে মেনকা নারদের কাছে ক্ষোভ-দুঃখ প্রকাশ করেছে একেবারে গ্রাম্যভাষায়। সেই ক্ষোভ-দুঃখ দেশি শব্দে অসাধারণ রূপ লাভ করেছে—

ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে।।[২০]

ভারতচন্দ্রের রচনায় সংস্কৃত ও বাংলার শুভ-পরিণয় সাধিত হয়েছে। কিন্তু এই পরিণয় ঘটাতে তিনি রামপ্রসাদের মতো গলদঘর্ম হয়ে পড়েননি। হেসে খেলে যা করেছেন রামপ্রসাদ অনেক পরিশ্রম করেও তা পারেননি। রায়গুণাকরের শব্দ-চাতুর্যের গুণ এই, এতে শ্রমজনিত একটি স্বেদবিন্দুও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। শিশুর হাসি ও পাখির ডাকের মতো তা আড়ম্বরশূন্য। ছবির মতো সুন্দর হয়ে উঠেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও চরিত্রগুলি। কবির স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল প্রতিভা ফুটে উঠেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণনাগুলির মধ্যে। পরিহাস রসে মধুর ও আমোদকর হয়েছে ব্যাসের কাশী-নির্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, মানসিংহের সৈন্যে ঝড়-বৃষ্টি, ভবানন্দ মজুমদারের উপাখ্যান প্রভৃতি অংশ। 'ব্যাসের কাশী-নির্মাণ উদ্যোগ' থেকে একটু অংশ তুলে ধরা হল—

কাশীতে না পেয়ে বাস মনোদুখে বেদব্যাস
বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস।
তুচ্ছ লোক আছে যারা কাশীতে রহিল তারা
আমার না হৈল কাশীবাস।।
এ বড় রহিল শোক কলঙ্ক ঘুষিবে লোক
ব্যাস হৈলা কাশী হইতে দূর।
নাম ডাক ছিল যত সকলি হইল হত
ভাঙ্গাড় করিল দর্প চূর।।
তেজোবধ হয় যার প্রাণবধ ভাল তার
কোনখানে সমাদর নাই।
সবে করে উপহাস ইনি সেই বেদব্যাস
কাশীতে না হৈল যার ঠাঁই।।[২১]

ভারতচন্দ্রে ঊষার আকাশ, সন্ধ্যার নিঃশ্বাস, রাত্রির নৈশব্দ্য, সুবিশাল ধ্যান কিংবা একটি শিশির-বিন্দুর অনন্য জীবনের আশ্চর্য ইতিহাসকে খুঁজলে ভুল হবে। তাঁর অর্জিত বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে শব্দবিন্যাস। প্রগাঢ় অনুভূতি অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করেছে বুদ্ধির চাকচিক্য। স্বভাবতই ভারতচন্দ্রের ব্যবহৃত ভাষায় দেখা যায় চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য ও তীক্ষ্ণতা। লেখার মধ্যে রাজসিক পারিপাট্য থাকলেও নেই কোমল রসাবেশ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বলেছেন—

> ভারতচন্দ্রের শব্দ যতখানি উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ, ততখানি রসার্দ্র নয়। যাকে বলা হয় 'রহস্যঘরের চাবিকাঠির মতো শব্দ'—সে শব্দ তিনি নির্মাণ করতে পারেননি। তাঁর শব্দে আলো ছিল,

আচ্ছন্নতা ছিল না; গতি ছিল, ছিল না রসাবেশ; তাতে মুক্ত চোখের সন্ধানী দৃষ্টি কিন্তু অন্তর্লীন মগ্নতা নয়, সেখানে যে কোমলতা, তা নয় স্বপ্নকোমলতা।[২২]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাসও শব্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। বড়ুকবির কাব্যে ভাষা ব্যবহারে যে সচেতনতা ও নিপুণতা দেখা যায় তা বিস্ময়কর। বৈষ্ণব পদকর্তাদের শব্দ প্রয়োগের প্রতি মনোযোগও লক্ষ করার মতো। পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে চাওয়ার রোমান্টিকতা জ্ঞানদাসের মধ্যে দেখা যায়। আবার গোবিন্দদাসে ধরা পড়েছে শ্রাবস্তীর কারুকার্যের রোমান্টিকতা। নতুন কবিভাষা রূপে ব্রজবুলি বৈষ্ণব কবিদের সম্পদ। ভারতচন্দ্র বৈষ্ণব কবিদের অতিক্রম করেছেন অন্যত্র, পরীক্ষা-কর্মের পরিবর্তে সিদ্ধান্তে। ভারতচন্দ্র স্থির করেছিলেন জীবনকে স্বীকার করে নেব শব্দের ক্ষেত্রে। সেই শব্দে ক্ষুধা থাকবে—কামক্ষুধার মতোই অন্নক্ষুধা, মধুরতার সঙ্গে ইতরতা, চতুরতা।

ভারতচন্দ্র ভাষায় জ্ঞানবস্তু প্রকাশের পাশাপাশি সমাজজীবনের প্রবহমানতাকে তুলে ধরেছেন। সাধারণের মুখের কথাকে সাহিত্য-সম্পৃক্ত করে ভাষার দেহরক্তে স্বাস্থ্যের উন্মাদনা তিনি যেমন এনে দিয়েছেন, তেমনি তার উপরে ছড়িয়ে দিয়েছেন অলংকার-দ্যুতি। ফলে মণিকক্ষের ধাতব আলোক ও হাটে-মাঠের রৌদ্রকিরণ দুই-ই মিলেছে তাঁর ভাষায়। অসাধারণ ক্ষমতায় তিনি ভাষারাজ্যে প্রাসাদ ও প্রান্তরের ব্যবধান কমিয়ে দিয়েছেন।

সবশেষে বলি, ভারতচন্দ্রের শব্দমন্ত্রের কাছে সকলেই পরাভূত হয়েছেন। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে একই নিয়মে গতানুগতিক বর্ণনায় যেসকল আনুষঙ্গিক কাহিনি আমরা এতকাল ধরে পাঠ করে এসেছি, তা নবতর শব্দ যোজনায় নতুন ভঙ্গিতে রচনা করে ভারতচন্দ্র অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন। যা বৈচিত্র্যহীনতার জন্য প্রাণহীন হয়ে পড়েছিল নতুন রূপ-গরিমায় তা ঝলমল করে উঠল। ভারতচন্দ্র নিজের প্রতিভাবলে উচ্চতর কাব্যের উপযোগী করে শব্দের মন্ত্র যেভাবে নিজের হাতে তৈরি করেছেন যথার্থই তা অপূর্ব সৃজনীশক্তির পরিচায়ক। তাঁর মতো কথায় চিত্তহরণ করতে প্রাচীন-মধ্যযুগের আর কোনো কবি সমর্থ হননি। যদিও অনেকেই কবির শব্দ-শিল্পে একমাত্র কারিকুরিই লক্ষ করেছেন।

উৎসের সন্ধানে

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', এ মুখার্জি এন্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৮০৫
২. শঙ্করীপ্রসাদ বসু : 'কবি ভারতচন্দ্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ২৫৩
৩. মদনমোহন গোস্বামী : 'ভারতচন্দ্র, সাহিত্য অকাদেমি', নতুন দিল্লি, ১৯৮৪, পৃ. ৮৭
৪. তদেব : পৃ. ৮৭
৫. উৎস-২, পৃ. ২৫৪
৬. উৎস-৩, পৃ. ৮৭
৭. তদেব : পৃ. ৯০
৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত : 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৪২১, পৃ. ৩৬

৯. তদেব : পৃ. ৪১
১০. তদেব : পৃ. ৭৩
১১. তদেব : পৃ. ৭৩-৭৪
১২. তদেব : পৃ. ৩৪
১৩. তদেব : পৃ. ৩৪
১৪. দীনেশচন্দ্র সেন : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৫৯৫
১৫. তদেব : পৃ. ৫৯৬
১৬. উৎস-৮, পৃ. ৯৪
১৭. তদেব : পৃ. ১১৪
১৮. উৎস-৩, পৃ. ৮৫
১৯. উৎস-২, পৃ. ২৫৮
২০. উৎস-৮, পৃ- ৬২।
২১. তদেব : পৃ. ১৪৭
২২. উৎস-২, পৃ. ২৬১-২৬২

কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য : সর্বনাম প্রয়োগের বৈচিত্র্য

প্রণবেশ ঘোষ

বাংলা কাব্যধারায় চণ্ডীমঙ্গালের একটি স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র ও অন্যতম নিদর্শন ‘চর্যাপদ’-এর হাত ধরে যে বাংলা সাহিত্যের শুভ সূচনা হয়েছিল তা ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এর মধ্য দিয়ে আরও প্রসারিত হয়। ‘চর্যাপদ’-এর ‘আলো-আঁধারি’ ভাষার গণ্ডি অতিক্রম করে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ এসে বাংলা ভাষা আরো একটু সহজ-সরল হয়। বর্তমান বাংলা ভাষার সঙ্গো পরিচিত বাঙালির এই ভাষা বুঝতে আরো একটু সুবিধা হল। শুধু ভাষা তো নয়; ধ্বনি, রূপ, বাক্যগঠন ইত্যাদি সমস্ত দিক দিয়েই সহজতর হল। পরবর্তী মঙ্গালকাব্যের ধারায় তা আরও সহজ ও সরল হয়। তা হলেও বর্তমানের রূপবৈচিত্র্যর সঙ্গো তার পার্থক্য কিন্তু সহজেই লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যের সূচনা পর্ব থেকে আজ অবধি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে তার ধ্বনি, রূপ (নামপদ, ক্রিয়াপদ, অব্যয়) বাক্য গঠন ইত্যাদি সমস্ত দিক দিয়েই পরিবর্তন ঘটেছে। আর আমরা জানি পরিবর্তন, গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়েই ভাষা পরিশীলিত হয়। আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্ত-মধ্য পর্বের অন্তর্গত কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে সর্বনাম পদ কিভাবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকাল অপেক্ষা পরিবর্তিত হয়েছে বা নতুন নতুন চেহারা গ্রহণ করেছে তার রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

আমরা জানি মধ্যযুগের মঙ্গালকাব্য গোষ্ঠীর মধ্যে যে আখ্যানকাব্য সংকীর্ণ ধর্মগত গণ্ডি ছাড়িয়ে সার্বভৌম রস স্বীকৃতি লাভ করেছে তা কবিকঙ্কণ মুকুন্দর চণ্ডীমঙ্গাল বা ‘অভয়ামঙ্গাল’। ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি রচিত হয় বলে ধরা হয়। চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য ধারায় তাঁর পূর্ববর্তী কবি হিসেবে আমরা পাই মানিক দত্ত ও কবি দ্বিজমাধব বা মাধবানন্দের নাম। মাধবানন্দের কাব্যের রচনাকাল ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ বলে ধরা হয়। আর মানিক দত্তের কেবল নামই কবিকঙ্কণ মুকুন্দের গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর গ্রন্থের কোনো পুথি পাওয়া যায়নি। আর দ্বিজমাধব ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দের কাব্যের সময়কাল প্রায় একই। সুতরাং মুকুন্দ দ্বিজমাধবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা তা সন্দেহের বিষয়।

সাধারণভাবে আমরা অন্ত-মধ্য বাংলার সময়কাল ধরি ১৫০০-১৭৬০/১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সে দিক দিয়ে দেখলে দেখা যাচ্ছে যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অন্ত-মধ্য যুগের প্রথম শতাব্দীতেই রচিত। আমরা আলোচ্য এই কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বনাম প্রয়োগের বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করব এবং প্রসঙ্গক্রমে চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ও বর্তমান সময়ের সাহিত্যে পরিস্ফুট সর্বনামের রূপবৈচিত্র্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করব।

সর্বনাম বলতে বোঝায়—যা নাম শব্দের পরিবর্তে বসে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—"বাক্য মধ্যে পূর্বে ব্যবহৃত অথবা অজ্ঞাত কোন সংজ্ঞা বা নামের পরিবর্তে যে সকল শব্দের প্রয়োগ হয়, সেগুলিকে সর্বনাম বলে।"[১] তার মধ্যে 'সর্ব' অর্থে সকলের নামের স্থলে ব্যবহৃত হয় বলে 'সর্বনাম' নামকরণ হয়েছে। সর্বনাম পদের ব্যবহার দ্বারা একই পদের পুনরাবৃত্তি নিবারিত হয়।

লিঙ্গানুসারে বাংলায় সর্বনামের রূপভেদ হয় না; কেবল কতকগুলি সর্বনামের ক্লীবলিঙ্গে বিশেষ রূপ আছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সর্বনামের ৮টি শ্রেণি বলে উল্লেখ করেছেন[২]—

১. ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক
২. উল্লেখ সূচক বা নির্ণয় সূচক।
৩. সাকল্যবাচক
৪. সম্বন্ধ, সংযোগ বা সংগতি বাচক।
৫. প্রশ্নবাচক
৬. অনিশ্চয়সূচক
৭. আত্মবাচক
৮. ব্যতিহারিক।

সর্বনামের মোটামুটি দুটি রূপ দেখা যায় বলে ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেন—একটি কর্তৃকারকের বা অ-বিভক্তিক অথবা বিভক্তিহীন রূপ এবং অন্যটি প্রাতিপাদিক বা তির্যক অথবা সবিভক্তিক বা বিভক্তিগ্রাহী রূপ। ভাষাবিদ পরেশচন্দ্র মজুমদার আবার তাঁর 'বাংলা ভাষা পরিক্রমা' গ্রন্থে বাংলা ভাষার কাল ভেদে তার পুরুষ ও কারক ধরে ধরে আলোচনা করেছেন।[৩]

আমরা আমাদের আলোচ্য কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বনাম প্রয়োগের বৈচিত্র নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হব, আমাদের পূর্বে আলোচিত এইসব বিষয়গুলো মাথায় রেখে।

● **উত্তম পুরুষ সর্বনাম**

কর্তৃকারক : আমি, মুই

১. আমি ছার মন্দগতি অনলে ফেলিনু সতি।
২. কবে আমি হব নিরাকুল।
৩. রন্ধনের তরে আমি যদি চাই জল।
৪. কপি বলে রায় মুই হইনু নির্বংশ।

গৌণ কর্ম/মুখ্য কর্মকারক : মোরে, আমারে, তুয়া

১. কর মোরে কৃপা বিলোকন।

২. কোথা গেলে প্রাণ পিয়া আমারে ছাড়িয়া।

৩. নিশি নিশি তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দ কবি

সম্বন্ধ : মোর, আমার,

১. দূর করো মোর বিঘ্ন।

২. প্রজা সৃষ্টি করো মোর দূর করো ব্যথা।

৩. আমার প্রসঙ্গো তুমি পাবে বড়ো খোটা।

৪. পূর্ব কাল ধন্য মোর গঙ্গার মিলনে।

৫. আমার আশ্রম নাথ হৈলা পূণ্য শালী।

৬. মোর কন্যা আনি দিবে পুষ্প গঙ্গাজল।

৭. মোর তরে পোহাল্যা রজনী।

৮. অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ।

৯. কোন দেশে দুখিনী নাহিক মোর পারা।

১০. খড়েগর কারণে মোর মরে দুই ভাই।

চণ্ডীমঙ্গালে উত্তম পুরুষে কর্তৃকারকে ‘আমি’, ‘মুই’ ইত্যাদি সর্বনামের প্রয়োগ হয়েছে। ‘আমি’ সর্বনামটি প্রাচীন বাংলার ‘আম্হে’ থেকে এসেছে। আদি-মধ্য বাংলাতেও ব্যবহৃত হয় ‘আম্হে’/‘আম্হি’ সেখান থেকে অন্ত-মধ্য বাংলায় হয়েছে ‘আমি’। ‘মুই’ এসেছে প্রাচীন বাংলার ‘মো’ থেকে। আদি-মধ্য বাংলা ‘মো’/‘মোঁ’ থেকে অন্ত-মধ্য বাংলায় ‘মুই’। বর্তমানেও আমরা ‘আমি’ বা ‘মুই’ উভয় সর্বনামের ব্যবহার লক্ষ করি।

কর্মকারকে ব্যবহৃত ‘মোরে’, ‘আমারে’ সর্বনামটি এসেছে আদি-মধ্য বাংলার ‘মোহোর’ থেকে (চড় মায়িলি মোহোরে) সম্বন্ধে ব্যবহৃত ‘মোর’, ‘আমার’ শব্দ দুটি এসেছে যথাক্রমে ‘মোহোর’ ও ‘আম্হার’ শব্দ থেকে। প্রাচীন বাংলা এবং আদি-মধ্য বাংলা উভয় ক্ষেত্রেই ‘মোহোর’ শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। ‘আম্হার’ এর প্রয়োগ দেখা যায় ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’- এ (‘আম্হার বচন’)।

● **মধ্যম পুরুষ সর্বনাম:**

কর্তৃকারক : তুমি, তোমা

১. তুমি যারে করো কৃপা সেই জনা মহাতপা।

২. তুমি গো পরম রত্ন বিদিত সংসারে।

৩. তুমি গো বল্লভা কৃপা নাহি কর যারে।

৪. কোথা চণ্ডী আছে গো তুমিত মশানে।

৫. তুমি আজ্ঞা দিলে আমি যাই পিতৃবাস।

৬. আমার প্রসঙ্গো তুমি পাবে বড় খোটা।

৭. আমার ভবনে প্রভু তুমি বিদ্যমান।

৮. নিয়জিলুঁ তোমা আমি শোনো হে চামরি তুমি।

গৌণ কর্ম/মুখ্য কর্মকারক : তোমারে, তাকে, তোমা, তোমার, তোরে, তোমায়

১. তোমারে করিয়া ভক্তি মুনিগণ পাইল মুক্তি।
২. রণে জয়ী যে তোমারে স্মরে।
৩. তোমারে বলেন মাতা সর্ব গুণধাম।
৪. পুত্র বলি ব্যাস ডাকে উত্তর না দিল তাকে।
৫. তাকে দেখে বিদ্যাধরীগণ।
৬. মূঢ় পতি দক্ষ পতি তোমা নাহি চিনে।
৭. ততোধিক পূণ্য হইল তোমা দর্শনে।
৮. তোমা বিনে প্রাণপতি তিলেক যে জিয়ে রতি।
৯. তথায় তোমার স্বামী মিলিবে তোমারে।
১০. তনয়া মানিবে তোরে সম্বরের নারী।
১১. শুনোগো পদ্মমুখী তোরে আমি দেখি।
১২. তোমারে বিধি বিড়ম্বনা।
১৩. নিয়োজিলুঁ তোমা আমি শুনহ চামরী তুমি।
১৪. আমি তোরে দিনু ভার ফেরুহও রায়বার।
১৫. ভুজঙ্গ না জিনিবে তোমারে।
১৬. পশু মধ্যে তোমায় দেখিয়া বড় লোক।
১৭. রায়বার তোমারে করিয়ে আমি কোক।

সম্বন্ধ: তোমার, তব, তুয়া, তোর, তারে

১. ব্যাস আদি যত দেব তোমার চরণ সেবি।
২. তব পদে করিলুঁ বন্দন।
৩. অবনী লোটায়্যা কায় প্রণাম তোমার পায়।
৪. গাইয়া তোমার আগে গোবিন্দ ভকতি মাগে।
৫. সেবে তুয়া চরণ সরোজে।
৬. তোমার লক্ষ্মী হইতে রত্নাকর বলি তারে।
৭. বুঝিয়াছি চরিত্র তোমার।
৮. নাহি হবে দক্ষ তোর গতি মুক্তি পথে।
৯. তথায় তোমার স্বামী মিলিবে তোমারে।
১০. তোমার জিয়ে হৈতে গৌরী মজিল গিরিয়াল।
১১. দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘ ছাল।
১২. তোর বুক নখেতে করিব দুই চির।
১৪. তব নাম শোক নিবারক।

কর্তৃকারকে ব্যবহৃত ‘তুমি’, ‘তোমা’ এসেছে আদি-মধ্য বাংলায় ব্যবহৃত ‘তুহ্মী’, ‘তোহ্মা’ থেকে (‘মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি’)। বর্তমানের সাহিত্যে ব্যবহৃত এই ‘তুমি’ তারই

অনুবর্তন। আর 'তোমা' সর্বনামের বদলে ব্যবহৃত হয় 'তোমার' বা 'তোমাকে'। কর্মকারকে 'তোমারে', 'তোমার', 'তোমা', 'তোমায়', 'তোকে' এবং 'তোরে' ইত্যাদি সর্বনামগুলো ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত হয়েছে 'তোহোরে' ('কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলোই')। 'তোমা' সর্বনামটি এসেছে 'তোহ্মা' থেকে। ('তোহ্মা নিয়োজিলঁ সাসুড়ি আহ্মা রাখিবারে')। আধুনিক বাংলায় আমরা লক্ষ করি 'তোমাকে' ('রামবাবু তোমাকে বাংলা পড়ান')। সম্বন্ধ পদে চণ্ডীমঙ্গালে ব্যবহৃত হয়েছে 'তোমার', 'তব', 'তুয়া', 'তোর' ইত্যাদি সর্বনাম। 'তোমার' এসেছে 'তোহ্মার' থেকে, 'তোর' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও ব্যবহৃত হয়েছে।

● **প্রথম পুরুষ সর্বনাম:**

কর্তৃকারক : সে, তারা, তেন

১. নন্দী সে বুঝিয়া কাজ নিবায় দেউটি।
২. কৃষ্ণ আরাধনে তারা পাইল বড় সুখ।
৩. দক্ষিণ ধাইল তারা যেন বায়ু গতি।
৪. তেন মতে ধাও বরা।

গৌণ কর্ম/মুখ্য কর্মকারক : তানে, তারে, তাহা

১. তানে বলে পুরুষও প্রধান।
২. তারে মোর লক্ষ পরণাম। (সম্ভ্রমে)
৩. মহীচন্দ্র দিবাকর তারে দিলা স্থল।
৪. ব্রাহ্মণ পালিতে বুদ্ধি তারে দিল বিধি।
৫. তার বিদ্যা তারে দিয়া দিবে পরিচয়।
৬. কিনী তাহা লয় কোনজন। (মুখ্য কর্ম)

অধিকরণ কারক :

তাহে, তাহাতে,

১ তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু।
২. তাহাতে জন্মিল নীল লোহিত কুমার।
৩. ফুলবড়ী দিবে তাহে আর আদা রস।
৪. রান্ধিবে ছোলার ডালি তাহে দিবে খণ্ড।

সম্বন্ধ : সে, তার, তাহার, তার, তারে,

১. ছাড়হ সে জনে মাতা তার দোষ দেখি।
২. ভেদ বুদ্ধি না আছে তাহার।
৩. এমত তাহার গুণ।
৪. তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি।
৫. তার যজ্ঞে তিন লোক চলিলা প্রচুর।
৬. ওদন প্রাশন আদি করিল তাহার।
৭. তার বিদ্যা তারে দিয়া দিবে পরিচয়।

৮. তার সুত লঘুনাথ রাজ গুণে অবদাত।

৯. তুমি তারে হইবে সম্মুখ।

১০. তার সভাসদ রচি চারুপদ।

কর্তৃকারকে ব্যবহৃত হয়েছে 'সে', 'তারা' ইত্যাদি। 'সে' সর্বনামটি 'চর্যাপদে' ('এক সে শুণ্ডনী'), 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ও ('সে তো নান্দের পুত') ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক বাংলাতেও ব্যবহৃত এই 'সে' প্রাচীনেরই বিবর্তন। গৌণকর্মে ব্যবহৃত 'তাহা' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ও ব্যবহৃত হয়েছে। এই 'তাহা' থেকে পরবর্তীকালে হয়েছে 'তা'। অধিকরণকারকে ব্যবহৃত 'তাহে' এবং 'তাহাতে'। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' 'তাহাত'-র ব্যবহার দেখা যায় ('তাহাত মুগধী রাধা না পাতিল কানে')। সম্বন্ধ পদে ব্যবহৃত সে, তার, তাহার ইত্যাদির ব্যবহার আধুনিক বাংলাতেও লক্ষ করা যায়। 'তাহার' ব্যবহার দেখা যায় সাধু বাংলায় এবং 'তার' ব্যবহার দেখা যায় চলিত বাংলায়।

● **নিকট নির্দেশক সর্বনাম**

কর্তৃকারক : এই

১. এই বড়ো রহিল গঞ্জন।

২. এই পুত্রে আমার নাহিক কিছু কাজ।

গৌণ কর্ম/মুখ্য কর্মকারক : ইহাকে

১. ইহাকে পূজিবে সবে দেবতা সমাজে।

২. ইহাকে পূজিবে পুরন্দর আজি রাজা।

সম্বন্ধ : এই, যে, এমন

১. এই হেতু ইহার গণেশ অভিধান।

২. যে অঙ্গে যে অলংকার।

৩. এমন সময় আইল মহাশয়।

৪. এমন সময়ে গঙ্গা দিলেন উত্তর।

এখানে 'এই' সর্বনামটির প্রয়োগ চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এমনকি আধুনিক বাংলাতে লক্ষ করা যায়।

দূর নির্দেশক সর্বনাম

কর্তৃকারক : কেহ, ওই

১. ত্রিভুবনে কেহ নাই তোমার সমান।

২. কালকেতু ওই আসে বন।

সম্বন্ধ নির্দেশক সর্বনাম

কর্তৃকারক : যে

১ রণে জয়ী যে তোমারে স্মরএ।

২. তিলেক যে জিয়ে রতি।

গৌণ কর্ম/মুখ্য কর্মকারক : যার, যারে

১. বেদান্ত দরশনে প্রশ্ন করি যার ভনে।

২. তুমি যারে কর কৃপা সেই জন মহতপা।
৩. সেবে যারে এ মহীমণ্ডল।
৪. যারে যে উচিত হয় তার এ দিলা সে বিষয়

অধিকরণ : জাতে, তাতে

১. সংযোগের হইল জাতে তব পদধুলি।
২. ভিক্ষার তাতে দারুণ বিধি করিল গৃহিণী।

সম্বন্ধ : যেই, হেন, যে, সেই, যার, যাহার,

১. যেই হর কোপানলে তোমারে বধিবে হেলে।
২. হেন বরে বিবাহ দিল কি দেখি সম্পদ।
৩. শুনিলে হরয়ে দুখ যেই হেতু গজ মুখ।
৪. যেই হেতু ছয় মাথা।
৫. বন্ধনে যে দিব পাত্রে তাই ঘরে নাই।
৬. সেই নিশা গেল তবে হইল প্রভাত।
৭. কমলার পদে যার স্থির নহে মন।
৮. যার নামে জীব ত্রাণ মন্ত্রী যার জাম্ববান।
৯. কবিরাজ যাহার বাহন।

'যে', 'যেই' ইত্যাদি সম্বন্ধ নির্দেশক সর্বনামগুলির প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও লক্ষ করা যায়। ('সেসি নারী যে হএ সতী', 'যেই দধি দুধ ঘৃত ভাণ্ডত আছএ')। চর্যাপদে 'অন্তঃস্থ য' অপেক্ষা 'বর্গীয় জ'-এর প্রাধান্য বেশি লক্ষ করা যায়। তাই সেখানে 'জে', 'জা' ইত্যাদির প্রয়োগ দেখা যায়। ('জে জে আইলা', 'জা এথু জাম মরণে বি সঙ্কা')। আধুনিক বাংলা ভাষাতেও এই 'যে', 'যেই', 'যার', 'যারে', 'সেই' ইত্যাদি সম্বন্ধ নির্দেশক সর্বনামের প্রয়োগ দেখা যায়। ('কি করে মরে সেই মস্ত কথাটা'। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ 'ছেলেটা'/ "পুনশ্চ"), 'সকলের নয় যে আঘাত/ ধোয়ো না সবার চোখে'। ('বিশ্বলোক'/ "পুনশ্চ" কাব্য)।

● **অনির্দেশক/প্রশ্নবোধক সর্বনাম**

কর্তৃকারক :কেহ, কোন,

১. কেহ দেয় চাল কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি।
২. মধ্যে তে কাণ্ডার বস্ত্র ধরে কোন জন।
৩. কেমন প্রকারে তারে দিবো অভিশাপ।
৪. কোন কোন জন কিনী লয়।
৫. কোন জনে করয়ে বিক্রয়।

'কে', 'কেহ' ইত্যাদি অনির্দেশক সর্বনামগুলির প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও লক্ষ করা যায়। ('তোকে জানাইলে মাউলানী সম্বন্ধ', 'কেহ তবেঁ কিছু বোল বুলিতেঁ না পারে।)। বর্তমান বাংলা ভাষায়ও এই 'কে', 'কেহ' ইত্যাদির অনুবর্তন লক্ষ করা যায়।

● আত্মবাচক সর্বনাম

কর্তৃকারক : আপন, আপনি, আপনে

১. সমুদ্রে ফেলিয়া যারে আপন ভবনে।

২. মনোহর দেশ প্রভু ধরহ আপনি।

৩. হেন বরে বিহা দিয়া রাখি আপন কাছে।

৪. আপনে পূজিবো নৃপমণি।

৫. ভূভার খণ্ডিতে কৈলে আপনে প্রকার।

৬. আইলো আপন নিকেতন।

৭. আপনি থাকিবে তার সঙ্গে।

সম্বন্ধ : তুমি, আপনার

১. আপনার নাম তুমি না করহ রতি।

২. আপনার বেশ ধরি চলিলেন ত্রিপুরারি।

৩. মনে মনে নিন্দা করে আপনার পতি।

চণ্ডীমঙ্গলে ব্যবহৃত এই 'আপন', 'আপনার', 'আপনে', 'আপনি' ইত্যাদি আত্মবাচক সর্বনামের প্রয়োগ 'চর্যাপদ' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এও লক্ষ করা যায়। 'চর্যাপদে' —- 'আপনা মাসেঁ হরিণা বৈরী' (৬), 'আপনে অপা বুঝে' (৩২); শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে — 'আপনে আপনা বঞ্চে'। আধুনিক বাংলায়ও এই 'আপন', 'আপনি', 'আপনার' ইত্যাদি অনেক সর্বনামের প্রয়োগ ঘটেছে।

সাকল্যবাচক সর্বনাম:

কর্তৃকারক : সকল, সকলি, সবে,

১. সকল লোকের মাঝে অতিশয় সেই সাজে।

২. তোমার সকলি বিফল।

৩. সকল দেবের মাঝে হইবে প্রধান।

৪. সকল দেবতা মাঝে আগে পাবে পূজা।

৫. থাকিবে আনন্দে সবে কেহনা হিংসিবে।

৬. শরভ কুলীন তুমি সকল পশুর স্বামী।

সর্বনাম জাত ক্রিয়া-বিশেষণ:

১. অমোঘ শিবের বিন্দু তথি হইল গুণ সিন্ধু।

সংখ্যাবাচক শব্দ :

১. দুই অঙ্গ জরজর।

২. দুই তনু পুলোকে পুরিত।

৩. দুজনে আইলা ধাই।

৪. দুজনে প্রবোধ করি।

৫. জয়ন্ত নীলাম্বর দুই ভাই সহোদর।

৬. দোঁহে প্রবেশিয়া ঘরে মীন মাংস ভোগ করে।

পরিশেষে বলতে হয়, সাহিত্য সর্বদাই পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই সে সর্বদা নিজেকে নতুন নতুন রূপে উপস্থাপন করে। তার গঠনের দিকে তাকালে দেখা যায়, তার ধ্বনি, রূপ সব দিক দিয়েই পরিবর্তন-বিবর্তন ঘটে। আলোচ্য চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে সর্বনাম প্রয়োগের বৈচিত্র্যে সেই পূর্ববর্তীর অনুবর্তনই লক্ষ করা যায় এবং সেই ধারারই বিবর্তনের রূপ আজকের দিনেও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে নব নব ভাবে।

উৎসের সন্ধানে

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', রূপা পাবলিকেশন, নতুন দিল্লী, আগস্ট ২০১৭, পৃ. ২৭০

২. তদেব : পৃ. ২৭০

৩. পরেশচন্দ্র মজুমদার : 'বাংলা ভাষা পরিক্রমা' (দ্বিতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মে ২০১৫,

মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গালে তৎকালীন নারীপৃথিবীর পরিচয়

সামিম হোসেন খান

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক অতি মূল্যবান সম্পদ এই মঙ্গালকাব্য। বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগের যে সময় থেকে মঙ্গালকাব্যগুলি লিখিত হয়েছিল বলে জানা গেছে, সেই সময় বা তার পূর্বেই সংস্কৃত রামায়ণ কাব্যের অনুবাদ, শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুবাদ ও বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হয়েছিল। এগুলিতে এমনকী বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যেও সংস্কৃত গ্রন্থের প্রভাব ছিলই। কিন্তু বাংলার মঙ্গালকাব্যগুলি সেদিক থেকে বাঙালি কবিদের মৌলিক সৃষ্টি এবং বাংলার মাটির ফসল। এ কাব্যের প্রাপ্ত পুথির সংখ্যাও অন্যান্য গ্রন্থগুলির তুলনায় অনেক বেশি ছিল। সেকালে এই কাব্যগুলির জনপ্রিয়তাও ছিল সর্বাধিক। অশিক্ষিত নিরক্ষর বিশাল জনসমাজের প্রাণের ক্ষুধা মেটাতে এ-সাহিত্যের সেদিন জুড়ি ছিল না। মঙ্গালকাব্য লৌকিক জনজীবনেরই কাব্য। দেবতার কথা এতে থাকলেও মানব জীবনের কাহিনিই এখানে মুখ্য। দেবী মাহাত্ম্যকে ভিত্তি করে মধ্যযুগের সমাজ পরিমণ্ডলের একটি নিখুঁত প্রতিচ্ছবিই মূর্ত হয়ে উঠেছে এর মাধ্যমে। মুকুন্দ চক্রবর্তীও ঠিক তেমনি তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যের প্রতিবেদনে রূপকের আড়ালে সমকালীন সমাজের বাস্তব চিত্রটিকেই নিটোলভাবে তুলে ধরেছেন। সেই সময়ে সমাজের দ্বন্দ্ব—বিক্ষোভ, দস্যুবৃত্তি, জমিদার-জায়গিরদার, ডিহিদারদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ হয়ে উঠেছিল অতিষ্ঠ। সেই সময়টা ছিল রাজতন্ত্র ও আভিজাত্যবোধের। সাধারণ মানুষকে তখন মানুষ বলে গণ্যই করা হত না। আর নারীদের অবস্থা ছিল আরও মর্মবিদারক।

মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ প্রতিবেশে নারী স্বাধীনতার পরিসর স্বাভাবিকভাবেই ছিল যথেষ্ট সংকীর্ণ। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং পুরুষতন্ত্রের মধ্যে একটি সহযোগী সম্পর্ক বিদ্যমান। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতেই আচার-প্রথার সুনির্দিষ্ট নিগড়ে নারীকে বন্দি করতে সচেস্ট। নারীর জন্য বিভিন্ন আচার-অনুশাসনের বেড়াজাল তৈরি করে আসলে সামন্তপ্রথা নির্ভর পুরুষতন্ত্র সমাজবৃত্তে নিজের ক্ষমতায়ণের পরিসরটিকে অটুট রাখতে চায়। তাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পাতায় পাতায় সাধারণত আদর্শ সতীলক্ষ্মী গৃহস্থ নারীরই টাইপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মধ্যযুগের বৃহত্তর সাহিত্য পরিসরে এমন

নারীর সংখ্যা বড়োই স্বল্প, যারা পুরুষতন্ত্রের তৈরি করা নিয়মের গণ্ডির বাইরে এসে নিজেদের স্বরকে প্রকাশ করতে পেরেছে উচ্চ কণ্ঠে। প্রাক্-বৈদিক যুগে প্রাচীন ভারতেও নারীর যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। তাদের উপনয়ন সংস্কার হত এবং স্ব-গৃহেই পিতা বা ভাইয়ের কাছ থেকে তারা শিক্ষাও গ্রহণ করত। কিন্তু পরবর্তীতে মনুর সময়কালে বিভিন্ন সংহিতা ও সামাজিক অনুশাসনগুলি তৈরি হওয়ার সময় থেকেই নারী স্বাধীনতার পরিসরটি ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। মনু নারীজীবনকে তিনটি পর্বে যথাক্রমে—কন্যা, জায়া ও জননী রূপে চিহ্নিত করে এই তিনটি পর্বেই পুরুষের কাছে নারী অধীন—এই সত্যকেই উপস্থাপিত করেছেন—

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রম্।।[১]

এইভাবে ক্রমশ পুরুষরা নারীদের ওপর সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য বিস্তার করে। মধ্যযুগীয় পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষ সৌরলোকের সূর্য আর নারী হচ্ছে ছায়া। পুরুষ ধ্রুব আর নারী আপেক্ষিক। ফলত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নারীদেরকে আরও অবহেলিতের চোখে নিরীক্ষণ করা হত। প্রতি পদে তাদের জীবনধারা হত পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বস্তুত—“সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের চাপে নারীর স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রায় ভূলুণ্ঠিত হত, অস্বীকৃত হত তার ব্যক্তিসত্তা।” বাস্তবিকই উচ্চবর্ণের সমাজে অবরোধ প্রথায় নারীদের জীবন ছিল কঠোর নিয়মাধীন। কিন্তু অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের ক্ষেত্রে তা একটু শিথিল হলেও সামাজিক প্রথার চাপে উভয় নারীর জীবনই হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ।

মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের নারীদের চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের নারী পৃথিবীর পরিচয়টিকেই সামগ্রিকরূপে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তুলে ধরেছেন।

মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গলের দুটি খণ্ড তথা—বণিক খণ্ড ও আখেটিক খণ্ডের মাধ্যমে, বণিক খণ্ডে যথাক্রমে উচ্চবর্ণের নারীদের এবং আখেটিক খণ্ডে নিম্নবর্ণের নারীদের জীবনের খুঁটিনাটিকে তুলে ধরেছেন তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। কাব্যে উচ্চবর্ণের নারীদের জীবনকে ‘চণ্ডী’, ‘লহনা’ , ‘খুল্লনা’ ও ‘রম্ভাবতী’ আর নিম্নবর্ণের নারীদের জীবনকে ‘ফুল্লরা’, ‘দুর্বলা’ ও ‘লীলাবতী’ চরিত্রের সমন্বয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন দারুণভাবে। তৎকালীন সমাজে উচ্চবর্ণের নারীদের নিজস্ব স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। তারা আর্থিক এবং সামাজিক উভয় দিক থেকেই সম্পূর্ণরূপেই ছিল পুরুষের অধীন। কিন্তু অন্ত্যজ তথা নিম্নবর্ণের নারীরা সামজিক দিক থেকে পুরুষের অধীন হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা ছিল সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। পুরুষের মতো তাদেরও যে অর্থোপার্জনের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা ছিল চর্যাপদেও এর অসংখ্য প্রমাণ আছে, যেমন—

১. গঙ্গা জউণা মাঝেঁরে বহই নাই।
তহিঁ চড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।।[২]

২. হা লো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে
আইসসি জাসি ডোম্বী কাহরি নাবেঁ।।[৩]

মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যেও আমরা দেখি—

নিদয়া বসিল খাটে মাংস লইয়া জায় হাটে
অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা
সাযুড়ি জেমন ভনে তেনমত বেচে কিনে
শিরে কাঁধে মাংসের পসরা।
মাস বেচি আনয়ে কড়ি চালু লয়ে ডালি বড়ি
তৈল লোন আনয়ে বেসাতি।[৪]

ঘরের বাইরে এভাবে অবাধে বিচরণ করার অধিকার উচ্চবর্ণের নারীদের ছিল না। তৎকালীন সমাজে পুরুষরা বহু বিবাহ করত। সমাজে তাদের এই বহু বিবাহের কোনোরূপ অন্তরায় ছিল না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরাও কখনোই প্রতিবাদের সুর তুলতে পারেনি তা প্রতিহত করতে। বরং এর জন্য নিজের অদৃষ্টকেই দোষারোপ করে তারা অভিমানে, অন্তর্দ্বন্দ্বে হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত। মুকুন্দ চক্রবর্তী 'লহনা'-র মধ্যে দিয়ে সে যুগের নারীদের মর্মবেদনাকে দারুণভাবে প্রকাশ করেছেন—

বিধাতা আমারে বাম পরে নিব ধন—ধাম
মন পোড়ে শোকের আগুনি।
শোকানলে পোড়ে মন দাবানলে জেন বন
আঁখিজল নিবারিতে নারি।
দুঃখ রহিল মনে স্বামী দিব অন্য জনে
সঞ্চয় করিআ ঘরগারী।[৫]

এসব সত্ত্বেও স্বামীর প্রতি তাদের ভালোবাসা ছিল অবিচল। এভাবেই সেকালের নারীদেরকে নিজের জায়গা ছেড়ে দিতে হত অপর আরেক নারীর জন্য। ফলত সতীন সমস্যা ছিল এক অতি সাধারণ ব্যাপার। মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে এ সমস্যাটিকেও লহনা ও খুল্লনার মধ্যে দিয়ে দারুণভাবে তুলে ধরেছেন। তবে কাব্যে আমরা দেখি, লহনা ও খুল্লনার মধ্যে প্রথমে একটা প্রেম-প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল—

কর্পূর তাম্বুল খায়্যা দু-সতিনে থাকে শুয়্যা
এক শয়নে দিবারাতি।[৬]

কিন্তু এসব দেখে দাসী দুর্বলার সহ্য হয় না—

প্রেমবন্ধ দু-সতিনে দুবলা দেখিআ মনে
সাত পাঁচ ভাবে দুঃখমতি।[৭]

এবং শেষপর্যন্ত দেখা যায় এই দুর্বলা দাসীই লহনার মধ্যে ঈর্ষা জাগ্রত করে কোন্দল সৃষ্টি করতে সক্ষমও হয়ে ওঠে। আসলে মুকুন্দ চক্রবর্তী এই দুর্বলা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজে নিম্নবর্ণীয় যেসমস্ত নারীরা দাসী বৃত্তির কাজ করত তাদের স্বরূপটিকেই প্রকাশ করেছেন।

কপটতা, হিংস্রতা, খলতা, চতুরতা প্রভৃতি গুণে তারা ছিল গুণান্বিত। নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তারা কতটা নীচে নামতে পারে, তার পরিচয়ও আমরা পাই এই কাব্যে দুর্বলার মধ্যে দিয়ে—

প্রেমবন্ধ দু-সতিনে দেখিআ দুবলা
হৃদে কালকুট বিষ মুখে জেন তুলা।
লহনা খুল্লনা জদি থাকে এক মেলি
পাটী করি মরিব দুজনে দিব গালি
জেই ঘরে দু-সতিনে না বাজে কন্দল
সেই ঘরে রহে দাসী সে বড় পাগল।[৮]

এরপরেই 'দুর্বলা' নিজের পরিশ্রমকে লাঘব করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে লহনার মনে বিষবাষ্পের প্রবেশ পথকে সুগম করে তোলে নিজের বাক্‌চাতুর্যের মহিমায়—

শিশুমতি ঠাকুরাণী নাঞি জান পাপ
কি কারণে দুগ্ধ দিআ পোষ কালসাপ
নানা উপভোগ দিআ পোষহ সতিনী
আপনার কার্য নাশ করিলে আপনি।
সাপিনী বাঘিনী সদা পোষ নাহি মানে
অবশেষে অই তোমা বধিব পরানে।[৯]

ধীরে ধীরে সে হয়ে ওঠে লহনার পরিচালক। অবশ্য এই দাসীরা দু-দিককেই বজায় রেখে চলার চেষ্টা করত। দুর্বলার মধ্যেও আমরা তার প্রতিফলন দেখি। একদিকে সে যেমন লহনার পরিচালক হিসেবে পরামর্শ দিত, অপরদিকে তেমনি খুল্লনার পরিচারিকা হিসেবে সে নিজের দায়িত্বও পালন করত। আসলে তাদের এই দ্বিচারিতা নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখার এক অন্যতম কৌশলমাত্র।

সমাজে প্রচলিত পুরুষের বহুবিবাহের কারণে তৎকালীন উচ্চবর্ণের নারীর পাশাপাশি নিম্নবর্ণের নারীরাও যে ছিল সপত্নী ভয়ে ভীত, মুকুন্দ চক্রবর্তী ফুল্লরা চরিত্রটির রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে তা নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। কাব্যে আমরা দেখি, কালকেতু মৃগ শিকারে ব্যর্থ হয়ে ছদ্মবেশী চণ্ডীকে সুবর্ণ গোধিকারূপে ধনুকের ছিলায় বেঁধে নিয়ে এসেছিল। এরপরে দেবী চণ্ডী ষোড়শী নারী মূর্তির রূপ ধারণ করে ফুল্লরার হৃদয়ে বিস্ময়ের জাগরণ ঘটায়। ফুল্লরা সপত্নী ভয়ে ভীত হয়ে ছদ্মবেশী দেবীকে নানাবিধ কথা বলে, কখনও বা উপদেশ দিয়ে, কখনও আবার নিজের বারোমাস্যার কথা শুনিয়ে তার একটি উদ্দেশ্যকেই সে সফল করে তুলতে ছেয়েছে। তা হল—নিজের আসন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরানো। মুকুন্দ চক্রবর্তী ফুল্লরাকে দেবী চণ্ডীর কপট আত্মপরিচয় দানের মধ্যে দিয়ে উচ্চবর্ণের নারী সমাজেও যে এই সপত্নী সমস্যা বিদ্যমান ছিল সেই চিত্রটিকেই ব্যক্ত করেছেন—

কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা
স্বামী তারে ধরিলা মস্তকে
বরঞ্চ গরল খায় আমা পানে নাঞি চায়
ভবন ছাড়িল এই পাকে।
গঙ্গা বড় আউঞ্জালি সদাই পাড়য়ে গালি
স্বামীর সোয়াগ দরপে।[১০]

কবি এই কাব্যে ফুল্লরার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনচেতা নারী সত্তাটিকেও খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। উচ্চবর্ণের নারীদের মতো ফুল্লরা কালকেতুর এই অন্যায়কে নিশ্চুপভাবে মেনে নেয়নি বরং সে প্রায় প্রতিবাদের স্বরে বলে ওঠে—

পিপিড়ায় পাক উঠে মরিবার তরে।
কাহার সোলস্যা কন্যা আনিআছ ঘরে।
এতদিনে মহাবীর পাপে গেল মন।
আজি হইতে হইলে তুমি লঙ্কার রাবণ॥[১১]

তৎকালীন সমাজে নিম্নবর্ণের নারীদের যে নিজের কথা বলার অধিকার ছিল—তার প্রমাণ পাওয়া যায় কালকেতুকে ফুল্লরার ভর্ৎসনা করার মধ্যে দিয়ে। অবশ্য নিম্নবর্ণের নারীরাও যে উচ্চবর্ণের নারীদের মতোই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা লাঞ্ছিত হত সে পরিচয়ও ফুটে ওঠে ফুল্লরার ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডীকে বলা এই কথার মধ্যে দিয়ে—

ছাড়িয়া পতির বাস আইলে পরের আশ
আপনার কী সাধিতে মান।
অধম অবলা জাতি যদি থাকে একরাতি
পরের ভবনে কদাচিৎ।
ছল ধরে বন্ধুজন লোকে করে গঞ্জন
অবিচারে কৈলে বিপরীত॥[১২]

বস্তুত, মধ্যযুগীয় পুরুষশাসিত সমাজের কঠোর নিয়মে নারী হৃদয় নিষ্পেষিত হত। সেই সমাজে নারীদেরকে কেউই বিশ্বাস করতে পারেনি। খুল্লনার ক্ষেত্রেও আমরা দেখি সমাজ কক্ষের বণিকরা তার সতীত্বের পরীক্ষা নেওয়ার কথা বললে ধনপতি সদাগর প্রতিবাদ না করে বলতে থাকে—

উচিত বলিতে মোর কিবা আছে শঙ্কা
পরীক্ষা নহীলে দিব (এক) লক্ষ তঙ্কা।[১৩]

এ কথা বলাবাহুল্য যে, ধনপতি সদাগর পরীক্ষার বদলে এক লক্ষ টাকা দিয়ে সমাজের মুখবন্ধ করতে চেয়েছেন। এরূপ মন্তব্য থেকে খুল্লনার প্রতি তার দুর্বলতার প্রকাশ পাওয়া গেলেও, খুল্লনার প্রতি তার বিশ্বাসের কোনোরূপ পরিচয় প্রকাশ পায় না। খুল্লনা অবশ্য তাঁর সতীত্বের পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ, সে জানে অর্থের বিনিময়ে সে যদি সতীত্বের পরীক্ষা দেওয়া থেকে বিরত হয় তবে একদিকে যেমন ধনপতি তার পুঁজি হারাবে, ঠিক তেমনি অপরদিকে সমাজ তাকে কলঙ্কিনী আখ্যায় সম্মানিতও করবে—

অবোধ পরাননাথ বলিহে তোমারে
আজি ধন দিলে দিবে বৎসরে বৎসরে।
নিজ ধন দিতে দিতে তুমি হবে রঙ্ক
ভুবন ভরিআ মোর রহিব কলঙ্ক।[১৪]

এমনকী খুল্লনা একথাও ধনপতিকে জানায় যে—

পরীক্ষা লইতে তুমি জদি কর আন
গরল ভখিআ আমি তেজিব পরান।[১৫]

তৎকালীন সমাজে নারীদেরকে এভাবেই মাঝে মাঝে তাদের সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হত। খুল্লনার এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থেকে এই সত্যই প্রতিষ্ঠা পায় যে, নারীও সমাজের কাছে নিজের বিশ্বস্ততাকে তুলে ধরতে ছিল বদ্ধপরিকর। কেননা, পরীক্ষায় অনিচ্ছুক হলেই ধরে নেওয়া হত সে নারী দুরাচারী। ফলত এখানে নারীর প্রতিবাদের কোনো অবকাশ নেই। খুল্লনাও সে যুগের আর পাঁচটা নারীর মতোই নির্দ্বন্দ্ব প্রতীক চরিত্র রূপেই কাব্যে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

তৎকালীন সমাজে এরকম প্রচলিত বিভিন্ন আচার-সংস্কারের অন্তরালে সুষুপ্ত রয়েছে শত শত নারীর ক্রন্দনধ্বনি। মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে নারীপৃথিবীর পরিচয়দানের মধ্যে দিয়ে সেইসমস্ত প্রচলিত প্রথাগুলিকে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা ও বিধি নিষেধকে অপ্রতিহত রেখে নারীরা ক্রমশ এক ধাপ থেকে অন্যধাপে এগিয়ে যেতে লাগল। আসলে সেই সমাজের আবহাওয়ায় লালিত নারীরা পুরুষের অদম্য বাসনায় আপ্লুত হয়ে রইল। তাই নিজেকে তারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ইপ্সিত নারী অর্থাৎ সতী, পতিব্রতা, ধর্মপরায়ণা ও উৎসর্গীকৃত করে তোলার অভিব্যক্তিতে অধীর হয়ে ওঠে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দুর্দান্ত প্রতাপের কারণে নারীর নিজস্বতা গড়ে ওঠেনি। তারা হয়ে উঠেছিল এক নির্জীব পুতুল। অচলায়তনে তারা এতটাই আবদ্ধ ছিল যে, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি সম্বলিত মানসিকতার বিকাশের অবকাশ ছিল না। ফলে নানা কুসংস্কারকে সামাজিক বিধান হিসাবে মেনে নিতে তারা দ্বিধা করেনি। এই কুসংস্কারের বশবর্তী হয়েই নারীরা স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করত। তবে শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের নারীরাই নয়, নিম্নবর্ণের নারীরাও যে এই ধারণা পোষণ করত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত ফুল্লরার ছদ্মবেশী চণ্ডীকে বলা এই কথার মাধ্যমে—

স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার বিধাতা।[১৬]

তাছাড়া নারীরা বন্ধ্যা হলে কিংবা ঘরে সতীন এলে তারা নিজের অদৃস্টকেই দোষী সাব্যস্ত করত—এর প্রমাণও পাওয়া যায় মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের মধ্যে।

মধ্যযুগীয় সমাজে প্রচলিত একটি অন্যতম প্রথা ছিল সতীদাহ প্রথা। অমানবিক এই প্রথায় নারীরা দগ্ধ হত, অথচ চিরাচরিত প্রথায় তারা এতটাই জড়িত যে, তার থেকে উত্তরণের কোনো পথ ছিল না তাদের হাতে। আসলে তথাকথিত লোকের মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল, যে নারী স্বামীর আগে মৃত্যু মুখে পতিত হবে, সেই নারীই 'সতী' নারী। আর যে নারী এর থেকে ব্যতিক্রম হবে সেই নারীকে অবশ্যই স্বামীর চিতায় আরোহণ করতে হবে। এই সতীদাহ প্রথা যে কত মর্মান্তিক ও বীভৎস ছিল এর কথা বলতে গিয়ে 'কুমুদনাথ মল্লিক' বলেছেন—

> মধ্যযুগের কৌলীন্য প্রথার সুবাদে আরও একটি মর্মঘাতী প্রথা সে যুগে সমাজ জীবনকে কলুষিত করে তুলেছিল, তা হল 'সতীদাহ' প্রথা। কতযুগ বা যুগান্তর থেকে এই রাক্ষসী প্রথায় (সতীদাহ প্রথায়) কত কোটি কোটি বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা কবলিত হয়ে হিন্দুর সমাজবক্ষে জ্বালাময়ী চিতাবহ্নি প্রজ্বলিত করে হিন্দু সমাজকে দগ্ধ করে আসছিল তার ইয়ত্তা নেই।[১৭]

এই সতীদাহ প্রথার দৃষ্টান্তকে কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যেও নীলাম্বরের মৃত্যুতে স্ত্রী 'ছায়া'র সহমরণে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন—

স্বামী মৈল প্রথম জীবনে...
ঢালি বহু ঘৃত ভাণ্ড জ্বালিল অগ্নির কুণ্ড
সুরনদীতীরে সুরপতি
দুই কুলে দিয়া বাতি জীবন তেজিল সতী
পতির অনলে ছায়াবতী।[১৮]

সতীদাহ প্রথার মতোই সেই সময়ে কৌলীন্য ও বাল্যবিবাহ প্রথারও প্রচলন ছিল সমাজে। কবি মুকুন্দ সেই দিকটিকেও দারুণভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাঁর কাব্যের মধ্যে। কৌলীন্য প্রথার পরিচয় স্বরূপ বৃদ্ধ শিবের সঙ্গে গৌরীর এবং বাল্যবিবাহের পরিচয় স্বরূপ খুল্লনার সঙ্গে ধনপতির বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কাহিনিকে সৃজন করে তিনি নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়াও মাতৃহৃদয়ের স্নেহ ও সন্তানের জন্য তাদের আশঙ্কাকেও দারুণভাবে রূপায়িত করেছেন কবি মেনকা ও রম্ভাবতী চরিত্রকে অঙ্কনের মধ্য দিয়ে। বস্তুত তথাকথিত সমাজে নারীরা সপত্নী দ্বন্দ্ব এবং পুরুষের নির্যাতনকে প্রতিরোধ করার জন্য যে বশীকরণ বিদ্যাকে আঁকড়ে ধরতে চাইত, তার দৃষ্টান্তও আমরা এই কাব্যে দেখি লহনা ও 'রম্ভাবতী' চরিত্রের মাধ্যমে। এভাবেই মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে নারী চরিত্রগুলিকে চিত্রিত করার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন নারী সমাজের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, সামাজিক অবস্থানকে এককথায় সমগ্র নারীপৃথিবীকে দারুণভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

উৎসের সন্ধানে

১. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : 'মনুসংহিতা', সদেশ, কলকাতা- ৭০০০০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ; ২০১১, পৃ. ২০০
২. নির্মল দাশ : 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ; জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ১৪৯
৩. তদেব : পৃ. ১৩৭
৪. সুকুমার সেন সম্পাদিত : 'চণ্ডীমঙ্গল', সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী, দ্বিতীয় সংস্করণ; ২০১৩, পৃ. ৪৪
৫. তদেব : পৃ. ১১৯
৬. তদেব : পৃ. ১৩১
৭. তদেব : পৃ. ১৩১
৮. তদেব : পৃ. ১৩১-১৩২
৯. তদেব : পৃ. ১৩২
১০. তদেব : পৃ. ৫৯
১১. তদেব : পৃ. ৬২
১২. ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত : 'কবি কঙ্কণ চণ্ডী (প্রথম খণ্ড)', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ; ২০০৭, পৃ. ১৬৮-১৬৯

১৩. উৎস-৪, পৃ. ১৮২
১৪. তদেব : পৃ. ১৮৪
১৫. তদেব : পৃ. ১৮৪
১৬. তদেব : পৃ. ৬০
১৭. সুতপা মুখোপাধ্যায় : 'বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যে নারী সমাজ', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৪০৩, পৃ. ভূমিকা
১৮. উৎস-৪, পৃ. ৩৮

মনসামঙ্গল কাব্যে প্রতিফলিত সমাজে নারীর অবস্থান

সৌমিলি দেবনাথ

মধ্যযুগে বাঙালি নারীর জীবন ছিল পুরুষতন্ত্রের ঘেরাটোপের আড়ালে আবৃত। তার পারিবারিক শিক্ষা শুরু হতো কঠোর পিতৃতন্ত্রের অধীনে। সেখানে সামাজিক সহবত শিক্ষাই মূল। তার বুদ্ধিবৃত্তিতে শান দেবার জন্য কোনো পুথিপাঠের আয়োজন ছিল না। সুতরাং, বাইরের পৃথিবীতে তার যোগ্যতা দেখানোর কোনো সুযোগ সৃষ্টি করেনি পুরুষসমাজ। সে তখন মর্যাদা হারিয়ে পরিণত হয়েছে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। বিবাহিতা নারী প্রবলভাবে আটকে পড়েছে স্বামী-সন্তান-সংসার-সমাজের চার দেওয়ালের গণ্ডিতে। ক্ষমতাতন্ত্রের বলয় থেকে সে তখন অনেক দূরে।

পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবস্থান ছিল শোচনীয়। নিজের একান্ত প্রিয়জন স্বামীর কাছেও তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য পেত না। সে ছিল যেন 'সন্তান উৎপাদনের মন-হীন একটি যন্ত্র'। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বিজয়ী পুরুষ নিজের স্বার্থে নারীর জন্যে গড়ে তুলেছে দাসীর দর্শন। এই দর্শনের ভাষ্য রচিত হয়েছে পুরাণে, স্মৃতিতে, সংহিতায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দীর্ঘকাল ধরে তাকে জপ করানো হচ্ছে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বিষাক্ত মন্ত্র—নারীমন্ত্র। এই মন্ত্র জপতে জপতেই সে পুরুষের সেবাদাসী, গৃহদাসী, যৌনদাসী। শাস্ত্রবাক্য অনুসারে, নারী হল পুরুষের ছায়া। তার কোনো স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা নেই। এটি দাবি করার মতো শিক্ষাই তাদের ছিল না। নারীরা সেকালে অর্থনৈতিক দিক দিয়েই পরাধীন ছিল। তাই তার উপার্জনক্ষম পতির ছায়ায় নিজেকে ধন্য মনে করত। পুরুষের চোখে নারী ছিল কেবল ভোগের সামগ্রী। তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পতি তো বটেই, সমাজের অন্যান্য পুরুষরাও লালসা পোষণ করত। কৌলীন্য প্রথার কারণে সমাজে চালু ছিল বহুবিবাহ প্রথা। পুরুষ তার নিজের সুখের জন্য এই রীতি বানিয়ে নারীর ঘাড়ে সতীন যন্ত্রণা, বাল্যবিবাহ, অসম দাম্পত্য ইত্যাদি বোঝাগুলো চাপিয়ে দিয়েছিল। বিপরীত দিকে নারীর কাছে দাবি করা হতো—সতীত্ব তথা পাতিব্রত্য। সন্তানের লালন-পালন ও সাংসারিক শান্তি বজায় রাখার দায়িত্বও নারীর ওপরে বর্তাত। অভিজাত সমাজ ব্যতীত অন্য সমাজে নারীকে বিভিন্ন পেশা বেছে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। সংসারে নারী কেবল পুরুষদের দ্বারা শাসিত-শোষিত হতো না, কখনো কখনো নারী হয়ে উঠত নারীর শত্রু। সোজা কথায়, মধ্যযুগে বাঙালি নারীর

অস্তিত্ব ছিল বিপন্ন। তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মবোধ বিকশিত হয়ে ওঠার কোনো সুযোগ ছিল না। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ছিলেন সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের কবি। তাঁর 'মনসামঙ্গল'-এর আখ্যানে, চরিত্রে নারীর যে অবস্থান ফুটে উঠেছে, সেটি এখন পর্যালোচনা করা যেতে পারে। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে বৈচিত্র্যের অভাব চরিত্র নির্মাণে কবিদের প্রধান সমস্যা। এর মধ্যে 'মনসামঙ্গল' কাব্য ধারাটি অত্যন্ত সুবিস্তৃত পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে একাধিক কবি যে কাব্যসাধনা করে আসছেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে কোনো কবির পক্ষে তার মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির অবকাশ ছিল কম। তথাপি মনসা, বেহুলা, সনকা ইত্যাদি নারী চরিত্র নির্মাণে কবি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবি প্রতিভায় এই নারী চরিত্রগুলি তৎকালীন বঙ্গসমাজে নারীর অবস্থানটিকে সুস্পষ্ট করে তোলে। তাদের মাধ্যমে জানা যায় সমাজে নারীর অবস্থান।

বেহুলা : কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে বেহুলার চারপাশে অতিলৌকিক কল্পনার কিছু আবরণ রয়েছে। কিন্তু তাকে অতিক্রম করে তার মানবিক ব্যক্তি চরিত্র প্রাধান্য লাভ করেছে। পৌরাণিক সাবিত্রী চরিত্রের সতীত্বের আদর্শে এই নারী চরিত্রটি অঙ্কন করা হয়েছে। বেহুলা বহুগুণান্বিত তরুণী সুন্দরী নারী। চাঁদ সদাগর তাঁর পুত্রবধূ রূপে এই নারীকেই নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের রাতে সর্পাঘাতে তার স্বামী মারা যায়। সেই মৃত্যুর জন্য বেহুলা দায়ী না হলেও তার কলঙ্কের ভার তাকে বহন করতে হয়। সেই আক্ষেপে বেহুলা বলে—

বিভার শুভ রাতি খাইলুঁ প্রাণপতি
কলঙ্ক ঘুষিব লোকে।।[১]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলা মোটের ওপর গর্বিতা নারী ছিল। কিন্তু লোক গঞ্জনা কোনোভাবে সহ্য করতে পারত না। তাই সে বলে—

বড় অভাগিনী আমি কলঙ্কে পূরিল ভূমি।।
মনে বড় পাই তাপ সায় সদাগর বাপ।।[২]

বেহুলার এই জীবন আলেখ্য-এ বোঝা যায় সেকালের সমাজ সংসারে নারীর অবস্থান কতখানি সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ ছিল। বেহুলা চরিত্রের আরও একটি বড়ো পরিচয় ফুটে ওঠে যখন সে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভেলায় ভেসে যায়। মধ্যযুগের বাংলাদেশে সতীদাহ প্রথায় নারীর যে বেদনাময় রূপটি ফুটে উঠেছিল, এখানে বেহুলার ভাসানযাত্রায় সেই ত্যাগের মহিমা ফুটে উঠেছে। মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেলায় ভেসে যাওয়ার সময় বেহুলা অনেক বিপদে পড়েছিল। কিন্তু কোথাও বেহুলা তার সতীত্ব হারায়নি। এ প্রসঙ্গে মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল : জীবন বীক্ষার আলোকে' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

> বেহুলার সবচেয়ে বড় ভরসা ঈশ্বর। সেই সঙ্গে তার অসামান্য মানসিক শক্তি। নিয়মিত ব্রত পূজা করার ফলেই হয়তো এই বিশ্বাসে শক্ত ভূমিটি সে লাভ করেছিল। এমন ভক্তিপ্রাণা ললনাকে অভিশাপ দেবেন কী করে দেবী? তাই ভগবানকেও এক্ষেত্রে চিন্তায় পড়তে হয়েছে।[৩]

এখানে বেহুলার চরিত্রের সাহস ও বলিষ্ঠতাও ফুটে উঠেছিল। কোমলতা, সহৃদয়তা, দুঃসাহস, দুঃখের তপস্যা সব নিয়ে বেহুলা মধ্যযুগের সমাজে নারীর অবস্থান সুস্পষ্ট করে তোলে।

সনকা : সনকা চরিত্রটি বাঙালি সমাজে টাইপ চরিত্রের আদর্শে নির্মিত। সে মনসার ভক্ত। তার স্বামী চাঁদ সদাগর কিন্তু মনসা বিরোধী। তার পতি ভক্তি ও দেবী ভক্তির মধ্যে একটা জটিল বিরোধ গড়ে ওঠে এই কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে। তার মধ্য দিয়ে তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্বাধীনতা হীনতার স্বরূপ ফুটে ওঠে। তাই স্বামীর ক্রোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে তাকে লুকিয়ে মনসা পুজা করতে হয়। চাঁদ সদাগরের নিশ্চিত বিপদ জেনেও বাণিজ্য যাত্রা থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে না।

তাই বণিক চাঁদ সদাগরের পরিবারের অন্দরমহলে সনকা অতিশয় অবহেলিত। ছয় পুত্রের মৃত্যুর যন্ত্রণা তাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। তথাপি স্বামীর বিরুদ্ধে যেতে পারেনি। তদুপরি অন্তঃসত্ত্বা সনকাকে রেখে চাঁদ দ্বিতীয়বার বাণিজ্য যাত্রায় যায়। চাঁদের অবর্তমানে সনকা লখিন্দরের জন্ম দিলে গড়ে ওঠে লোক-অপবাদ। চাঁদ সেই পত্নী-কলঙ্ক রটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। সব ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এসবের মধ্য দিয়ে নারীর অবস্থানটি ফুটে ওঠে।

এই দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবি কেতকাদাস সমাজে পত্নী ও পুত্রবধূ—এই দুই শ্রেণির নারীর সামাজিক অবস্থানটিকে অঙ্কন করেছিলেন অসাধারণভাবে। নারীর বিড়ম্বিত জীবনের একটি ইতিহাস ফুটে ওঠে এখানে। সেই সামাজিক অসহায়তা ফুটে ওঠে সনকার একটি মাত্র উক্তিতে—"ঘাটিলুঁ দেবীর পায়ঃ কি বিধি লিখিল তায়ঃ আমার কপালে কদাচিত।"[৪]

এই সনকা চরিত্র সম্পর্কে মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গাল : জীবন বীক্ষার আলোকে' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

> ছয় পুত্র হারিয়ে শোকাকুল সনকা এতদিন পরে লখীন্দরকে পেয়েছে। তাকে সে আর কোনোভাবেই হারাতে চায় না। স্বামী যখন বিদেশে বাণিজ্যে গিয়েছিল তখনই লখাই-এর জন্ম। পিতার অনুপস্থিতিতে জননী সনকার তৎপরতা ও কর্তব্য-কর্মে কোনো শিথিলতা লক্ষণীয় হয় নি। বরং অভিভাবকের যোগ্য ভূমিকা-ই যথাযথভাবে পালন করেছিল সে। একুশ দিনে পুত্রের ষষ্ঠী পূজা, ছয় মাসে অন্নপ্রাশনের আয়োজনও করেছিল। সন্তানের প্রতি সনকার মমতা ও বাৎসল্যের পূর্ণ পরিচয় কেতকাদাস অত্যন্ত বাস্তব সম্মত ভাবে অঙ্কন করেছেন।[৫]

মনসা : মনসার চরিত্রের যথার্থ শিল্পমাত্রা ফুটে ওঠে তার মানবীসত্তায়। মনসার আর্য সমাজে সংগ্রামের মধ্যে সেই সত্য নিহিত রয়েছে। মনসার জন্ম-বিবাহ-নির্বাসনের ধারাবাহিক কাহিনিতে সংগ্রামী নারী চরিত্রের সেই তাৎপর্য প্রতিফলিত হয়। শিবের কামনায় মনসা জারজ সন্তান রূপে পাতালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবির কথায়—

পাতালে হইল জন্ম, নাম পদ্মাবলি।
ভূষণে বাসুকি ছিল যৌতুকমণ্ডলী।।[৬]

রতিকামী শিবের ঔরসে মনসা জন্ম নিলেও শিবের গৃহে মনসা কন্যার সম্মানে থাকতে পারেনি। এখানে জারজ সন্তানের সামাজিক অমর্যাদা ও যন্ত্রণার একটি রূপ ফুটে উঠেছে।

যৌবনে নাগ-কন্যা মনসা সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। কবি কেতকাদাস মনসার সেই যৌবন মূর্তিটি অসাধারণভাবে অঙ্কন করেছেন—

কাম ধনুশ্বর ভুভঙ্গা সুন্দর তিলফুল জিনি নাশা।
অধর বিম্বকী সদা হাস্যমুখী মধুর কুকিল ভাষা।।[৭]

এই রূপের অধিকারিণী হয়েও সে নিজ পরিবারে ও বৃহত্তর সমাজে অবহেলিতা। শিব মনসাকে আশ্রয় দিতে গৃহে নিয়ে এলে প্রথমে সে বিমাতা চণ্ডীর আক্রমণের শিকার হয়। 'মনসা-ভবানী দ্বন্দ্ব', 'চণ্ডীর রণসজ্জা', 'মনসার রণসজ্জা' ইত্যাদি কাব্যাংশে কবি সেই বিমাতার লাঞ্ছনাকে সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। যার মধ্যে কোনো দেবতার কথা নয়, প্রতিফলিত হয়েছে অসাধারণ সামাজিক মাত্রা। তার সামগ্রিক বর্ণনা দিয়ে কবি বলেছেন—

দেখিয়া ভবানী জ্বলিল আগুনি ক্রোধে কাঁপে কলেবর।
ইহার কারণ করিল বঞ্চন বিভা করিয়াছে হর।।
দৈবের কাহিনী মনসা ভবানী দুইজনে বাজে দ্বন্দ্ব।
দাহন অঙ্গারে দেবী মনসারে বাম চক্ষু কৈল অন্ধ।।[৮]

শিবের দ্বিতীয় বিবাহের আশঙ্কার ফল ভোগ করতে হল অসহায় মনসাকে।

মনসার এইরূপ বিড়ম্বিত জীবনের এক রূপ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর হকে অবলম্বন করে। একচক্ষু অন্ধ একটি জারজ কন্যার বিবাহ সেকাল-একাল সমাজের এক মস্ত সংকট। এইরূপ বিড়ম্বিত নারীর প্রতি সামাজিক বঞ্চনার একটি রূপ ফুটে উঠেছে চণ্ডীর কথায়। মনসার বিবাহ উদ্যোগকালে নারদকে চণ্ডী বলেছেন—

জন্মের নাহিক স্থিতি, কেবা পিতামাতা।
ভিখারী ভাঙ্গড় কহে আমার দুহিতা।।[৯]

চণ্ডী মনসাকে সন্তান পরিচয় দিতে নারাজ। তাই বিবাহের যোগ্য পাত্র পাওয়া ভার। তাই অবশেষে বৃদ্ধ জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহের ব্যবস্থা করে শিব কন্যাদায় এড়াতে চায়। এই অসম বিবাহে বিষহরি মনসা কখনও দাম্পত্য সুখ অর্জন করতে পারে না। নারীর সেই বিড়ম্বিত ভাগ্যের কাহিনিটি কবি সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন।

সামাজিক বঞ্চনা ও দাম্পত্যের অপূর্ণতা মনসা চরিত্রটিকে জটিল মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রে পর্যবসিত করেছে। নানাভাবে স্বামীকে সংসারে ধরে রাখার চেস্টা করেও মনসা ব্যর্থ হয়েছে। সেই সর্বরিক্ত নিঃসহায় নারীর বেদনা ফুটে ওঠে এইভাবে—

বিভা করি নিজ জায়া তাহারে না কর দয়া
কিবুদ্ধি করিব তবে আমি।
সয়াল ভুবন মাঝে বিধাতা নির্বন্ধ আছে
পত্নী-অঙ্গা হয় অর্ধখানি।।[১০]

অর্ধাঙ্গিনীর কোনো মর্যাদা লাভ করতে পারেনি মনসা তাঁর বৈবাহিক জীবনে। শেষ পর্যন্ত জরৎকারু সন্ন্যাসী হয়ে যান। বঞ্চিতা মনসা পুত্র অস্তিক-কে নিয়ে নিঃসঙ্গ দারিদ্রময় জীবন অতিবাহন করেন।

এই মনসা চরিত্র সম্পর্কে মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল : জীবন বীক্ষার আলোকে' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

অলৌকিক ক্রিয়ায় মনসার পুত্রলাভ ঘটলো। জীবনের সবরকম সহজ স্বাভাবিকতা থেকে

> মনসা বরাবরই বঞ্চিত হয়েছেন, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। স্বামীর সঙ্গ-সুখ-বঞ্চিতা মনসা কিন্তু পুত্রলাভেই পরম আনন্দিত হলেন এবং জননীর কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালনে ব্রতী হলেন তিনি।[১১]

এভাবেই দেখা যায় যে, মধ্যযুগের সামন্তপ্রভু সদৃশ স্বামীর কাছে স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা যে একেবারেই মূল্যহীন ছিল, তা সনকা ও চাঁদ সদাগরের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। আবার স্বামীর আশ্রয়ের নিশ্চিন্ত নিরাপদ ছায়ায় কালাতিপাত করার মানসিকতা লক্ষ করা যায় ধন্বন্তরি ওঝার স্ত্রী কমলার মধ্যে। পরম নির্ভরতায় স্বামীকে সে বলে যে, স্বামীর প্রসাদে তার কিসের দুর্গতি। আত্মসমর্পণের এই মনোভাব মধ্যযুগের অধিকাংশ স্ত্রীর মধ্যেই বর্তমান ছিল।

উৎসের সন্ধানে

১. সনৎ কুমার নস্কর সম্পাদিত : 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গাল', প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১১, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২১৫
২. তদেব : পৃ. ২১৮।
৩. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় : 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গাল : জীবন বীক্ষার আলোকে', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৮২
৪. উৎস-১, পৃ. ২১৬
৫. উৎস-৩, পৃ. ৭৯
৬. উৎস-১, পৃ. ১৬
৭. তদেব : পৃ. ১৬
৮. তদেব : পৃ. ১৮
৯. তদেব : পৃ. ৬২
১০. তদেব : পৃ. ৬৮
১১. উৎস-৩, পৃ. ৩৫

কবিকঙ্কণের ফুল্লরার বারোমাস্যা : পাঁচ শতাব্দী পূর্বের বাংলার বৎসর পরিক্রমা

তাপস অধিকারী

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গালকাব্যগুলি খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়কালে রচিত হয়েছিল। মূলত নিম্নবর্ণের হিন্দু দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে মঙ্গালকাব্যগুলি বেশ কয়েকটি শাখায় বিকাশ লাভ করে। তবে নির্দিষ্ট কোনো দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা ও পূজা প্রচার মঙ্গালকাব্যগুলির উদ্দেশ্য থাকলেও এগুলিতে কবিরা সমকালীন সমাজজীবনের বাস্তব ছবিকে নানাভাবে তুলে ধরেছেন। এজন্য মঙ্গালকাব্যগুলিকে মধ্যযুগের বাংলাদেশের সমাজ-ইতিহাসের বাস্তব দলিলের মর্যাদা দেওয়া হয়। একথা যেমন বাংলা মঙ্গালকাব্যের আদি শাখা মনসামঙ্গাল সম্পর্কে প্রযোজ্য, তেমনি মঙ্গালকাব্যের অন্যান্য শাখাগুলি যেমন চণ্ডীমঙ্গাল, ধর্মমঙ্গাল, শিবমঙ্গাল বা শিবায়ন, অন্নদামঙ্গাল প্রভৃতি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। মঙ্গালকাব্যধারার চণ্ডীমঙ্গাল শাখার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যে কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী (কবির নাম মুকুন্দ চক্রবর্তী না মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে) এ ব্যাপারে কোনো দ্বি-মতের অবকাশ নেই। চণ্ডীমঙ্গাল তো বটেই, মঙ্গালকাব্যধারার সমস্ত শাখার পাশাপাশি সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির স্বীকৃতিও তাঁকে দেওয়া হয়। মুকুন্দ চক্রবর্তী দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে দুই খণ্ডে (আখেটিক খণ্ড ও বণিক খণ্ড) তাঁর 'অভয়ামঙ্গাল' কাব্যটি রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যের এই দুই খণ্ডে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যের কথা থাকলেও সমকালের বাংলাদেশের সমাজচিত্র যেভাবে উঠে এসেছে, তা মধ্যযুগের অন্যান্য রচনায় খুব কম দেখতে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বেশিরভাগ সাহিত্যিক নিদর্শনগুলির মতো 'অভয়ামঙ্গাল' কাব্যেরও কবির প্রকৃত নাম ও রচনাকাল নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বাংলা সাহিত্যের প্রথম বহু আলোচক এই কাব্যের কবিকে 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' বলে অভিহিত করলেও এযুগের অনেকেই তাঁর নামের মধ্যে থেকে 'রাম' কথাটি বাদ দিয়ে শুধু মুকুন্দ চক্রবর্তী বলতে চান। অবশ্য বেশিরভাগ সময় কবি নিজের 'কবিকঙ্কণ' পরিচয়টি দিতে স্বচ্ছন্দবোধ করেছেন। যাইহোক, আমি এই বিতর্কে না ঢুকে তার মুকুন্দ চক্রবর্তী নামটি বেছে নিয়ে আমার

আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়াস করছি। কবির নামের মতোই তাঁর কাব্যের রচনাকাল নিয়েও বিতর্ক আছে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর তাঁর 'অভয়ামঙ্গাল' কাব্যের 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশে নিজের আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে অনেক তথ্য দিয়েছেন। এই প্রদত্ত তথ্যগুলিকে ভিত্তি করে প্রায় সমস্ত পন্ডিত-গবেষক কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর জীবৎকাল ও তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। এসব আলোচনা থেকে কোনো স্থির সন-তারিখে উপনীত হওয়া সম্ভব না হলেও প্রায় সকলেই একটি বিষয়ে একই রকম মতামত দিয়েছেন যে, মুকুন্দ চক্রবর্তী ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন এবং তাঁর 'অভয়ামঙ্গাল' কাব্যটি এই শতকের একেবারে শেষদিকে রচনা করেছেন। কাব্যটির বিভিন্ন অংশে সরাসরি বা রূপকের মধ্য দিয়ে যে সমাজের ছবি স্থান পেয়েছে, তা মুকুন্দ চক্রবর্তীর স্বচক্ষে দেখা ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলাদেশের সমাজজীবনের ছবি।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গাল' কাব্যের নানা স্থানে সমকালের বাংলাদেশের সমাজজীবনের প্রচুর ছবি আছে। এর মধ্যে অবশ্যই কাব্যটির 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এর পাশাপাশি কাব্যটির 'আখেটিক খণ্ড'-এ কালকেতুকে কেন্দ্র করে ব্যাধ অর্থাৎ অন্ত্যজ সমাজের নানা ছবি আছে। এছাড়াও নারীদের পতিনিন্দা, ফুল্লরার বারোমাস্যা, পশুদের কান্না, ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারি শীলের নানা কার্যকলাপ, কালকেতুর গুজরাট নগরের পত্তন ও নানা মানুষজনের আগমন প্রভৃতি বর্ণনাতেও কবি সমকালের সমাজজীবনকে তুলে এনেছেন। এসবের মধ্যে ফুল্লরার বারোমাস্যায় যা মূল কাব্যে 'ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেখানে সুন্দরী নারী রূপিণী দেবী চণ্ডীকে আপন সতীন ভেবে কালকেতুর স্ত্রী ব্যাধ রমণী ফুল্লরা নিজের বারোমাসের দুঃখের কথা নিবেদন করেছে। এখানে আপাতভাবে একজন অন্ত্যজ রমণীর এক বছরের দুঃখের ছবি থাকলেও সামগ্রিকতার দিক থেকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, সমকালীন অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচ শতাব্দী পূর্বের ষোড়শ শতকের বাংলাদেশের বৎসর পরিক্রমার ছবিই প্রকাশ পেয়েছে। এই বর্ণনায় মাসভেদে বাংলা প্রকৃতি জগতের পরিবর্তনের ছবি যেমন আছে, তেমনি সেই পরিবর্তিত প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গো সঙ্গো বাঙালির জীবন পরিক্রমার ছবিও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাই মুকুন্দ চক্রবর্তীর অভয়ামঙ্গাল কাব্যের ফুল্লরার বারোমাস্যা অংশটিকে শুধু ব্যাধ রমণী ফুল্লরার সুখ-দুঃখের কাহিনি হিসেবে না ধরে পাঁচ শতাব্দী পূর্বের বাংলার সমাজ-ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বাঙালির বৎসর পরিক্রমা হিসেবে ধরাই যায়।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গাল' কাব্যের আখেটিক খন্ডের কাহিনি অংশে দেখা যায় দুর্ধর্ষ বীর ব্যাধ কালকেতুর অত্যাচারে জর্জরিত ও ভীত হয়ে বনের পশুরা দেবী চণ্ডীর শরণাপন্ন হলে দেবী চণ্ডী তাদের অভয় দান করে ব্যাধ কালকেতুর পরীক্ষা নিতে আসেন। দেবী মায়াবলে সমস্ত পশুকে লুকিয়ে ফেলেন এবং নিজে একটি 'স্বর্ণগোধিকা'-র রূপ ধরে পথের পাশে পড়ে থাকেন। স্বভাবতই সেদিন কালকেতু কোনো শিকার ধরতে না পেরে ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ি রওনা দেয়। সে পথে স্বর্ণগোধিকাটি দেখতে পেয়ে তাকে ধনুকের ছিলায় বেঁধে নিয়ে বাড়ি ফেরে। তখন ফুল্লরা বাড়িতে অনুপস্থিত। কালকেতু স্বর্ণগোধিকাটি রেখে বাড়ির বাইরে গেলে

ফুল্লরা বাড়ি ফেরে। ততক্ষণে দেবী তাঁর স্বর্ণগোধিকা রূপ পরিত্যাগ করে এক সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করেন। তাঁকে দেখে ফুল্লরা পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, তিনি উত্তরে জানান—

আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিয়াছে তব স্বামী বান্ধি নিজগুণে।।

একথা শুনে ফুল্লরা তাঁকে সতীন ভেবে বাড়ি থেকে তাড়ানোর জন্য নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু দেবীর উপর তার বক্তব্যের কোনো কথা প্রভাব না পড়লে সে নিজের বারোমাসের দুঃখের কাহিনি বলে তাঁকে নিজের সতীন হওয়া থেকে নিরস্ত্র করতে চেয়ে অনেক কথা বলেছে। ফুল্লরার এই কথাগুলিই 'ফুল্লরার বারোমাস্য' নামে খ্যাত, যা মূল কাব্যে 'ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ' নামে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানে ফুল্লরার সংসার জীবনের নানা অভাব- অনটনের কথা থাকলেও এরই মধ্যে সমকালীন বাংলাদেশের বৎসর পরিক্রমার এক চমৎকার ছবি উঠে এসেছে। ফুল্লরার বারোমাসের দুঃখের বর্ণনা শুরু হয়েছে এইভাবে—

পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী।/ভাঙ্গা কুঁড়িয়া, তাল-পাতার ছাওনী।।/ভেরেণ্ডার খামা মোর আছে মধ্য ঘরে।/প্রথম আষাড়ে ঘর নিত্য পড়ে ঝড়ে॥

এরপর কবি ফুল্লরার মধ্য দিয়ে বাংলা বৎসর পরিক্রমার প্রথম মাস বৈশাখের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—

পুণ্যকর্ম্ম বৈশাখেতে খরতর খরা।/তরুতল নাহি মোরে করিতে পসরা।।/অগ্নিসম রবিতাপ বা জায় শহন।/শিরে দিতে নাহি আটে অঙ্গের বসন।।/বৈশাখে হৈলা বিষ বৈশাখে হৈলা বিষ।/মাংস না বিকায় সর্বজন নিরামীস॥

অর্থাৎ বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড খরায় চারিদিকে রুক্ষতা ও শুষ্কতা এতটাই বিরাজ করত যে গাছের তলাতেও বসে থাকা যেত না এবং আগুনের মতো অসহনীয় সূর্যের তাপ মাথায় নিয়ে চলতে হত। বৈশাখ মাসে সেকালের বেশিরভাগ বাঙালি নিরামিষ আহার করত। এরপর ফুল্লরার মাধ্যমে কবি বাংলা বৎসর পরিক্রমার দ্বিতীয় মাস জ্যৈষ্ঠের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

জইষ্ঠের রবির তাপে কেহ নহে স্থীর।/তৃশাকুল হই গ নিকটে নাহি নীর।।/পশরা য়েড়িয়া জল খাত্যে জাত্যে নারী।/দেখিতে দেখিতে চিলে লয় এক শারী।।/পাপীষ্ঠ জৈষ্ঠ মাস পাপীষ্ঠ জৈষ্ঠ মাস।/বেঙুচের ফল খায়্যা করি উপবাস॥

অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের সূর্যের প্রখরতা আরও বৃদ্ধি পেত এবং এতে কেউ যেমন স্থির থাকতে পারত না, তেমনি চারিদিকে জলকষ্টও তীব্র আকার ধারণ করত। আর ফুল্লরাদের মতো সমাজের নিম্নবিত্তের শ্রমজীবী মানুষগুলিকে একপ্রকার উপবাস করেই দিন কাটাতে হত। এরপর বাংলা বৎসর পরিক্রমার তৃতীয় মাস আষাঢ়ের আগমন ঘটে। এই আষাঢ় মাস সম্বন্ধে ফুল্লরার জবানিতে কবি লিখেছেন—

আষাঢ়ে পুরিৎ মহি নবমেঘজল।/ভাল ভাল গৃহস্থের টুটয়ে সম্বল।।/মাংসের পশরা লৈয়া ভ্রমি ঘরে ঘড়ে।/কিছু খুদ কুড়া মিলে উদর না পুরে।।/অভাগ্য মনে গণী অভাগ্য মনে গণী।/কত কত খায় জোক নাহি খায় ফণী।।/দুঃখ নহে দৈব ঘা দুঃখ নহে দৈব ঘা।/কাহারে দোষিব যে দরিদ্র বাপ মা।।

অর্থাৎ আষাঢ় মাসে নতুন মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হওয়ায় গ্রীষ্মের দাবদাহ কিছুটা কমত। তবে নববর্ষার আগমনের সঙ্গো সঙ্গো মাঠে ঘাটে জোঁক ও সাপের উৎপাত বাড়ত। এই আষাঢ় মাসে ভালো ভালো গৃহস্থেরও সম্বল ফুরিয়ে আসত। সুতরাং নিম্নবিত্তের মানুষদের অবস্থাও যে ভালো থাকত না তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাংলা বৎসর পরিক্রমার চতুর্থ মাস হল শ্রাবণ মাস। এই শ্রাবণ মাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখছেন—

> শ্রাবনে বরিসে ঘন দিবস রজনী।/সিতাশীত দুই পক্ষ য়েক নাহি জানী॥/ভুবন পুর্ণীত হৈল নবমেঘজল।/হেন কালে মৃগ মারে পাপ কর্মফল॥/দেখ য়েই স্থান দেখ য়েই স্থান।/বৃষ্টী নাঁহি হৈতে গ কুড়্যাতে আসে বাণ॥

অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে দিন-রাত্রি জুড়ে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হত এবং সর্বত্র নবমেঘজলে পূর্ণ হয়ে যেত। এসময় পশুদের প্রজননকাল। আর অতিবৃষ্টির কারণে গরিব-দুঃখীর কুঁড়ে ঘরগুলিতে মাঝেমধ্যেই বন্যার জল ঢুকে পড়ত।

বাংলা বৎসরের পঞ্চম মাস ভাদ্র মাসে বর্ষার প্রকোপ যে আরও বৃদ্ধি পেত, তা মুকুন্দ চক্রবর্তী সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই মাস সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল—

> ভাদ্রপদ-মাসে ঝড় দুরন্ত বাদল।/নদনদি একাকার আটদিকে জল॥/সদাই দরিদ্র পতি ক্ষুধায় বিকল।/সকলে দরিদ্র বীর অন্নেতে বিরল॥/বঞ্চিত করিল সুখ বিধাতা আমারে।/অনলে পোড়ায়ে অঙ্গা ভিতরে বাহীরে॥/কত নিবেদিব দুখ কত নিবেদিব দুখ।/বিপাখ পাইল স্বামী বিধাতা বিমুখ॥

অর্থাৎ এই মাসে বৃষ্টিপাতের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় সবদিকে জল থইথই করত। বৈষ্ণব কবিরা ভাদ্রকে মিলনের মাস (এ ভরা বাদর/মাহ ভাদর/শূণ্য মন্দির মোর) হিসেবে বোঝাতে চাইলেও মুকুন্দ চক্রবর্তী জানিয়েছেন এ মাসে নিম্নবিত্তের মানুষগুলির অঙ্গা ভিতরে-বাইরে পুড়লেও অন্ন সংস্থানের বিফল প্রচেষ্টাতেই তাদের দিন কাটত। এরপর কবি বাঙালির উৎসবের মাস অর্থাৎ ষষ্ঠ মাস আশ্বিন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

> আশ্বীনে অম্বিকা-পূজা করে যগজন।/মহীস ছাগল মেস করে নিজোজন॥/উত্তম বসন বেষ করয়ে বণিতা।/অভাগী ফুল্লরা করে সম্বলের চিন্তা॥/মাংশ কেহ না আদরে মাংশ কেহ না আদরে।/দেবীর প্রসাদ মাংশ প্রতি ঘরে ঘরে॥

অর্থাৎ এখনকার মতো সে সময়েও আশ্বিন মাসে খুব ধুমধাম করে 'অম্বিকা' অর্থাৎ দুর্গা বা কালীপূজা হত এবং 'যগজন' অর্থাৎ আপামর বাঙালি নতুন বস্ত্র পরিধান করে তাতে অংশগ্রহণ করত। পাশাপাশি সে সময়ে দেবীর পূজায় মহিষ, ছাগল, মেষ বলিও যে ব্যাপক হারে হত, কবি তার উল্লেখও করেছেন। এরপর কবি বাংলা বৎসরের সপ্তম মাস কার্তিকের বর্ণনা করতে গিয়ে ফুল্লরার জবানিতে জানিয়েছেন—

> কার্ত্তিক মাশেতে হয় হিমের প্রকাশ।/যগজনে করে শীত-নিবারণ বাস।।/নিযুক্ত করিলা বিধি সভার কাপড়।/অভাগী ফুল্লরা পড়ে হরিণের ছড়।।/কত দুঃখ শহে গায় কত দুঃখ শহে গায়।/নিরামিশ্য করে লোকে মাংশ না বিকায়।।

তখন কার্তিক মাস থেকেই শীত পড়তে শুরু করত এবং মানুষজন শীত নিবারণের জন্য

উপযুক্ত জামাকাপড়ের ব্যবস্থা করত। তবে নিম্নবিত্তের মানুষগুলির সেই সামর্থ্য ছিল না। পাশাপাশি বৈশাখের মতো কার্তিক মাসেও অধিকাংশ বাঙালি নিরামিষ আহার করত।

এরপর বাঙালির নবান্নের মাস অর্থাৎ বৎসরের অষ্টম মাস অগ্রহায়ণ সম্পর্কে কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী আলোকপাত করেছেন। এই মাসের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

> মাস মধ্যে মাস্যর আপনে ভগবান।/হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান।।/উদর পুরিয়া অন্ন দৈবে দিলা যদি।/যম-শম শীত তথি নিরমিলা বিধি।।/শুন দুঃখের কাহিনি শুন দুঃখের কাহিনি।/পুরাণ দোপাটা গায়ে দিতে করে পানী।।

অগ্রহায়ণ মাসে গ্রামবাংলায় সকলের ঘরে নতুন ধান উঠত এবং লোকের অভাব-অনটন দূর হত, এই জন্যে কবি ফুল্লরার মাধ্যমে এই মাসকে 'ভগবান' বলেছেন। এ মাসে হাটে, মাঠে, গৃহে, গোষ্ঠে সর্বত্র ধানের ছড়াছড়ি থাকত লোক দুবেলা পেট পুড়ে খেতে পারত। তবে এই অগ্রহায়ণ মাস থেকে শীতের প্রকোপও অত্যন্ত বৃদ্ধি পেত। বাংলা বৎসর পরিক্রমার নবম মাস শীতের আমেজ আনা পৌষ মাস সম্বন্ধে কবি ফুল্লরার জবানিতে জানিয়েছেন—

> পউষে প্রবল শীত সুখী যগজন।/তুলী পড়ি (পাটী/পাড়ি) পাছড়ি সিতের নিবারণ।।/হরিণ বদলে পাল্য পুরাণ ঘোসলা।/উড়িতে শকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা।।/বৃথা বণিতা-জনম বৃথা বণিতা-জনম।/ধুলী ভয় নাহি মিলী শয়নে নয়ন।।

অর্থাৎ পৌষমাসে প্রবল শীত পড়ত এবং যাদের শীত নিবারণ করার সামর্থ্য ছিল, তারা এই শীতে সুখ অনুভবও করত। কিন্তু ফুল্লরার মতো যাদের গরম বস্ত্র জোগাড় করার সংস্থান ছিল না, তাদের কষ্টের সীমা-পরিসীমা ছিল না। পাশাপাশি এই সময় প্রকৃতিতে ধুলোর মাত্রাও অত্যধিক বৃদ্ধি পেত। বৎসরের দশম মাস মাঘ সম্পর্কেও কবি এখানে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এই মাসের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন—

> মাঘে কুজ্ঝটিকা প্রভু মৃগয়াতে জায়।/আন্ধারে লুকায় মৃগ দেখিতে না পায়।।/ফুল্লরার কত আছে কর্মরে বিপাক।/মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক।।/দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।/জানু ভানু কৃষানু শিতের পরিত্রাণ।।

মাঘমাসে প্রবল কুয়াশা দেখা যেত এবং দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যেত। শীতের প্রকোপও অনেকটা বাড়ত। ফুল্লরার মতো নিম্নবিত্তের বাঙালিরা অতি কষ্টে এই শীত থেকে পরিত্রাণ পেত। পাশাপাশি এই মাসে বাঙালি শাক খেত না। এরপর কবি বাঙালির 'মধুমাস' হিসেবে খ্যাত ফাল্গুন মাসের বর্ণনা দিয়েছেন। ফুল্লরার জবানিতে তিনি জানিয়েছেন—

> মলয় পবন মধুমাসে নানা ফুল।/হরশীতে মধুপান করে অলিকুল।।/মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।/মালতীয়ে মধুকর পীয়ে মকরন্দ।।/বণিতা-পুরুষ অঙ্গে পিড়য়ে মদন।/আমার পিড়িত অঙ্গ যঠর-দহন।।/অতি দুঃখ মধুমাসে অতি দুঃখ মধুমাসে।/য়েকত্রে শয়নে স্বামী জেন শোল কোসে।।

এই মাসে প্রকৃতিতে 'মলয় পবন' বইত, গাছে গাছে নানা ফুল ফুটত এবং 'অলিকুল' অত্যন্ত হরষিত চিত্তে সে সমস্ত ফুল থেকে মধুপান করত। এখানে ক্ষুধাকে কেন্দ্র করে ফুল্লরার দুঃখের কথা থাকলেও কবি ফাল্গুন মাসের একটি মনোরম ছবিও তুলে ধরেছেন।

বাংলা বৎসর পরিক্রমার দ্বাদশ অর্থাৎ শেষ মাস চৈত্র মাস যে পুণরায় প্রকৃতির বুকে

রুক্ষতা ও শুষ্কতা নিয়ে হাজির হত কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তা জানাতে ভোলেননি। তাই তিনি এই মাসের বর্ণনায় লিখেছেন—

> ফলে গুণে দ্বিগুন শীত (বসন্তের) খরতর খরা।/খুদ সেরে বান্ধা দিল মাটীয়া পাথরা।।/ফুল্লরার কত আছে কর্মরে বিফল।/মাটিয়া পাথরা বিনে অন্য নাহি স্থল।।/কি কহীব আন কি কহীব আন।/আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।।

এই বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় যে, চৈত্র মাসে রৌদ্রের প্রখরতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করত এবং ফুল্লরার মতো নিম্নবিত্তের মানুষগুলির অসহায়তা প্রবলরূপে প্রকট হতে দেখা যেত। এইভাবে মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর 'অভয়ামঙ্গাল' কাব্যের 'আখেটিক খণ্ড' ব্যাধ কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনিতে ফুল্লরার বারোমাস্যার বর্ণনায় ফুল্লরার দুঃখের কাহিনির বর্ণনা দিতে গিয়ে সমকালীন অর্থাৎ পাঁচ শতাব্দী পূর্বের বাংলাদেশের বৎসর পরিক্রমার ছবি অত্যন্ত বাস্তবতার সাথে চিত্রিত করেছেন। এখানে যেমন সে সময়কার আবহাওয়া পরিবর্তনের ছবি আছে তেমনি মাসভেদে বাঙালির আর্থ-সামাজিক অবস্থার ছবিও প্রকাশ পেয়েছে। আজ বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রেক্ষিতে সারা বিশ্বের জলবায়ুতে অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। গ্রীষ্ম দীর্ঘায়িত হচ্ছে, শীতের প্রকোপ কমে যাচ্ছে। কোনো বছর অতিবৃষ্টি, আবার কোনো বছর অনাবৃষ্টির মতো ঘটনাবলি বাড়ছে। মানুষের ভোগের উপকরণ বৃদ্ধি, নগরায়ণ, মাত্রাধিক পরিবেশ দূষণ, যথেচ্ছভাবে অরণ্য নিধন প্রভৃতি বিষয়কে এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এইস্থানে দাঁড়িয়ে মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গাল' কাব্যের 'ফুল্লরার বারোমাসের দুঃখ' অংশটিতে আমরা আবহমান কাল ধরে চলে আসা বাংলাদেশের বৎসর পরিক্রমার এক সামগ্রিক চিত্রও পাই। তাই কবিকঙ্কণের ফুল্লরার বারোমাস্যার বর্ণনার একটি আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব যেমন আছে, তেমনি একে পাঁচ শতাব্দী পূর্বের বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি ঐতিহাসিক দলিল বলেও মনে হয়।

উৎসের সন্ধানে

১. অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীহৃষিকেষ বসু সম্পাদিত : 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' (প্রথম ভাগ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৪, https://bn.wikisource.org/wiki/লেখক : মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। (উদ্ধৃত কবিতার চরণগুলির অধিকাংশ এখান থেকে নেওয়া)।
২. সৌমেন্দ্রনাথ সরকার : 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গাল', পুনর্মুদ্রণ, মার্চ ২০১৭, গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা
৩. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস', দ্বাদশ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০০৯, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (২য় খণ্ড), পুনর্মুদ্রণ ২০১২-১৩, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' (প্রথম খণ্ড : আদি ও মধ্যযুগ), পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৯৯, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা
৬. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড) : নবম মুদ্রণ অক্টোবর ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গালে জীবিকা
একটি অনুসন্ধানমূলক সমীক্ষা

সুমন দাস

জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন, অর্থাৎ যার দ্বারা আমরা বেঁচে থাকার অপরিহার্য উপাদান সংস্থান করি তাকেই বলি জীবিকা। এই জীবিকা অর্জনের যে পদ্ধতি, যে ক্রিয়াকর্ম তাই বৃত্তি। সমাজে বাঁচতে হলে মানুষকে কোনো না কোনো বৃত্তি অবলম্বন করতেই হয়। আদিকালেও করতে হয়েছিল এবং এখনও জীবনধারণের জন্য তা অপরিহার্য। তবে বৃত্তি কখনও একজনের বিশেষ কাজ নয়, বৃত্তি হল সেই কাজ যা বহুজন জীবনধারণের জন্য করে থাকেন। এক এক বৃত্তিকে অবলম্বন করে এক এক গোষ্ঠীর জাতি পরিচয় গড়ে ওঠে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মঙ্গালকাব্যে বিভিন্ন স্তরের বাঙালির বিভিন্ন জীবিকার পরিচয় দিয়েছেন কবিগণ। এরা কেউ কৃষক, কেউ পুরোহিত, কেউ শিকারি, কেউ প্রহরী, কেউ ঘটক, কেউ গণক, কেউ ভিক্ষুক, কেউ বণিক, কেউ কোটাল, কেউ পাটনি, কেউ বৈদ্য, কেউ নাপিত ইত্যাদি। অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় শতাধিক জীবিকা মেলে মঙ্গালকাব্যের পাতায়। এইসব জীবিকাধারী মানুষের চিত্র অঙ্কনে মঙ্গালকাব্যের কবিদের কল্পনার আশ্রয় তেমনভাবে নিতে হয়নি। কারণ, মঙ্গালকবিরা যখন তাঁদের কাব্যে এইসব জীবিকাধারী মানুষের চিত্র অঙ্কন করেন তখন তাঁদের সময় কালে, তাঁদের চোখে দেখা সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন মানুষের ছবি আঁকার অবকাশ পেয়ে যান। বলাবাহুল্য, এইসব মানুষেরা সমাজের অত্যন্ত কাছের মানুষ। প্রতিদিন এইসব মানুষদের অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন কবিরা। তাদের কাজকর্ম, চলাফেরা, কথাবার্তা, জীবনচর্যা প্রভৃতি কবিরা তাঁদের চোখের সামনে দেখেছেন এবং অত্যন্ত নিপুণভাবে তা পর্যবেক্ষণ করেছেন। মঙ্গালকাব্যগুলিতে তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী আখেটিক খণ্ডে গুজরাট নগরে নতুন বসতি স্থাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাতির আগমনের কথা বলতে গিয়ে বিশদে তাদের জীবিকার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি ব্রাহ্মণ সমাজের বিভাজন দেখিয়েছেন এবং বিভাজন অনুযায়ী কোন্ ব্রাহ্মণ কোন্ জীবিকার সাথে যুক্ত তার পরিচয় দিয়েছেন। নগরে যেমন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না, তেমনি মূর্খ ব্রাহ্মণও ছিল। এছাড়াও ছিল অগ্রদানী ব্রাহ্মণ, গ্রহবিপ্র বা গণক, বর্ণবিপ্র

বা বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ। বৈশ্যরা কৃষিকাজ ও গো রক্ষণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন হীরে-জহরত কেনা-বেচার সাথে যুক্ত ছিল। আমরা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি বণিক ও মনসামঙ্গালের চাঁদ বণিককে এই সূত্রে পেয়েছি। বৈদ্য সম্প্রদায়ের কাজ ছিল চিকিৎসা করা। কায়স্থরা ছিলেন মূলত সমাজের সম্পন্ন জাতি। লেখাপড়ায় ভালো বলে তারা রাজকর্মচারীর কাজ করতেন, পাশাপাশি কৃষিকাজও করতেন। এছাড়াও তিলিরা তেল বার করত, তাম্বুলীরা পানের বীড়া বাধত, কুমাররা মাটির হাড়ি গড়ত, তন্তুবায় তাঁত বুনত, নাপিতরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্ষৌর কর্ম করত, মোদকরা মিষ্টান্ন বিক্রি করত, মালিরা ফুলের চাষ করত এবং মালাও প্রস্তুত করত। ধীবররা কেউ মাছ ধরত, জাল বুনত, মাছ বেচত, দরজিরা সেলাই করত, ধোবারা কাপড় কাচত, কেউ কেউ চিত্র নির্মাণ বা ছবিও আঁকত।

তৎকালীন হিন্দু সমাজের পাশাপাশি মুসলমান সমাজের যে বিশেষ উপস্থিতি ছিল কবিকঙ্কণ তা জানাতে ভোলেননি। গুজরাট নগরের পশ্চিমে বসবাসকারী মুসলমান সমাজের এক বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবি তিনি এঁকেছেন। কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তনকালে শত শত বৃত্তিজীবী মানুষ তার নগরে বসবাসের জন্য আসে। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল জাতিতে মুসলমান। এরা হল জোলা, মুকেরি, পিঠারী, কাবাড়ি, কাগজি, বেনটা, কুন্দুর সানাকার, তীরকর, হাজাম, রঙ্গারেজ, কসাই ইত্যাদি। এরা সকলেই ছিল ধর্মান্তরিত মুসলমান। তাই ধর্মান্তর কালে তাদের জীবিকা একই রয়ে গেছে, শুধু নামকরণ বদলে গেছে।

চণ্ডীমঙ্গালের বণিক খণ্ডেও আমরা নানা জীবিকাধারী মানুষের সন্ধান পাই, যেমন—ঘটক, দাসী, শিকারি, সেবক, কৃষক, গায়েন, গ্রহওঝা, ভাণ্ডারিক, পাইক, ভিক্ষুক, কান্ডারি বা মাঝি, কারিগর, কোটাল, রাজপুরোহিত, গণক, বণিক, রাজা ইত্যাদি।

চণ্ডীমঙ্গালের মতো কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গাল কাব্যেও রয়েছে নানা জীবিকার সমাহার। মনসামঙ্গাল কাব্য-কাহিনির মূলে আছে বণিক সমাজ। শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে তারা অধিকাংশই ছিল গর্বিত, স্পর্ধিত, স্বেচ্ছাচারী। সমাজে বণিক ছাড়াও আমরা পেয়েছি মুচি, রাখাল, মালিনী, ভিক্ষুক, মাঝি, ধীবর, ভৃত্য বা নফর, কাঠুরিয়া, গণক, ঘটক, দূত বা অনুচর, ঘাটিয়াল, ব্যাধ, দাসী, ঘাসী, ভারী, প্রহরী, মোদক, ব্রাহ্মণ পুরোহিত, নাপিত, ওঝা, গায়ক, বাদ্যকর, কাজী, মোল্লা, জোলা, গোয়ালিনী, কুমোর, নির্মাণ শিল্পী বা কারিগর, মাহুত, নটী বা নর্তকী, কোটাল, রাজা, ধোপা, কৃষক প্রভৃতি বৃত্তিধারী মানুষ।

শতাধিক জীবিকার সন্ধান পাই আমরা মঙ্গালকাব্যের পাতায়। পূর্বে মঙ্গালকাব্যের উপর অনেক আলোচনা গ্রন্থ বেরিয়েছে। সেখানে আমরা পেয়েছি চাঁদ চরিত্র, মনসা চরিত্র, ধনপতি চরিত্র, চণ্ডী চরিত্র ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রধান চরিত্রের গুরুত্ব বেশি পেয়েছে তুলনায় চাঁদ সদাগরের পুরোহিত সোমাই পণ্ডিত, ওঝা ধন্বন্তরি, রজককন্যা নেতা ধোপানি, প্রতারক ভাঁড়ু দত্ত, বেনে মুরারি শীল, দাসী দুর্বলা, ঘটক দনাই পণ্ডিত প্রভৃতি চরিত্রগুলি মঙ্গালকাব্যের আলোচনা গ্রন্থাদিতে খানিকটা উপেক্ষিত রয়ে গেছে। হয়তো আলোচনা হয়েছে কিন্তু খুব সংক্ষেপে অন্তত প্রধান চরিত্রগুলির মতো তো নয়ই। আসলে পাঠকের চোখে কাব্যের

পাত্র-পাত্রীরা এক একজনের কাছে এক একরকম ভাবে ধরা পড়ে। পাঠকের চোখে কোনো চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ হয় আবার কোন চরিত্র গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু কবি যখন তাঁর কাব্যে নর-নারীর চিত্র অঙ্কন করেন তখন তিনি তাঁর হৃদয় উজার করে দিয়ে চরিত্রটিকে পরিস্ফুট করে তোলেন, তা সে যতই ছোটো চরিত্র হোক না কেন। অর্থাৎ কবির চোখে কিন্তু তাঁর কাব্যের প্রধান ও অপ্রধান উভয় চরিত্রই গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গালকাব্যের কবিরা যখন তাঁদের কাব্যে নর-নারীর চিত্র অঙ্কন করেন তখন তাঁদের সময়কালে, তাঁদের চোখে দেখা সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন মানুষের ছবি আঁকার অবকাশ পেয়ে যান। বলাই বাহুল্য এইসব মানুষেরা সমাজেরই অত্যন্ত কাছের মানুষ। প্রতিদিনই এইসব মানুষদের কবি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাদের কাজকর্ম, চলাফেরা, কথাবার্তা, জীবনচর্যা প্রভৃতি কবিরা তাঁদের চোখের সামনে দেখেছেন এবং অত্যন্ত নিপুণভাবে তা পর্যবেক্ষণ করেছেন। তারা কি কাজ করছেন, সেই কাজের প্রকৃতি কেমন ছিল এবং প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের সামাজিক অবস্থান কিরূপ ছিল এইসব চিত্র অঙ্কনে মঙ্গালকাব্যের কবিদের তেমনভাবে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি। মঙ্গালকাব্যে মধ্যযুগে বিভিন্ন স্তরের বাঙালির বিভিন্ন জীবিকার পরিচয় রয়েছে। এক্ষেত্রে আমার আলোচ্য বিষয় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্য। এই কাব্য আলোচনার মধ্যে দিয়ে এখন কি কি জীবিকা উঠে এসেছে আমরা তারই আলোচনা করব।

● **বাদ্যকর :** কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গাল কাব্যের 'মনসা-বিবাহে দেবগণের যোগদান' এবং 'বেহুলার বিবাহ সজ্জা' অংশে আমরা বাদ্যকরের প্রসঙ্গা পাই। কাব্যে আমরা দেখি মনসার বিবাহ উপলক্ষ্যে নানা দেবতা ও মুনিগণ কৈলাসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চললেন। দেবতাদের মধ্যে ছিলেন—ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, যম, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি এবং মুনিদের মধ্যে ছিলেন ব্যাস, বসু, সনাতন, বালখিল্য, বাল্মীকি, বামন, পরাশর, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র। বিবাহ উপলক্ষ্যে চারিদিকে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের আসর বসেছে—

ঘন বাজে জয়ঢোল ঝনঝন ঝিকিরোল
দামা দড়মসা জয়ঢাক।
বাজে শঙ্খ সিন্ধুয়ান কাঁসি বাঁশী খরসান
পাখাজুয়া দেই ঘন পাক।।
রসাল মৃদঙ্গা পড়া সানি বেণী বাজে কাড়া
রবাবী রবাব বাজায়।*

চারিদিকে ঘন ঘন জয়ঢোল বাজছে, এর পাশাপাশি বাদ্যকরেরা দড়মসা, জয়ঢাক, শঙ্খ, কাঁসি, বাঁশি, মৃদঙ্গা, কাড়া ইত্যাদি বাজাচ্ছে। কাব্যে 'বেহুলার বিবাহ সজ্জা' প্রসঙ্গেও আমরা বাদ্যকরদের কথা পাই। বিবাহ উপলক্ষ্যে তারা মাদল, কাড়া, সানাই, মুহরি, মৃদঙ্গা, ঝাঁঝরি বাজাচ্ছে।

● **রাখাল :** কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গালের একাধিক অংশে আমরা রাখালিয়া বালকদের পরিচয় পাই। সাধারণত গোপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করত। মর্ত্যে মনসা নিজের পূজা প্রচারের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলে তার সহচরী নেতা ধোপানি তাকে প্রথমে নিম্নশ্রেণির রাখালদের পূজা নিতে বলেন। নেতার পরামর্শে

মনসা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধরে রাখালদের ছলনা করতে গেছেন। কাব্যে 'রাখাল বালকগণের গোধন-রক্ষা' অংশে আমরা দেখি বারো জন রাখাল বালক ষোলোশত গোরু নিয়ে কচুয়া তটে চরাতে গেছে—

যোলশত ধেনু লয়্যা দ্বাদশ রাখাল।
কচুয়ার বনে আইল চরাইতে পাল।।

এমন সময় ব্রাহ্মণী বেশী মনসা সেখানে উপস্থিত হয়। মনসা তাদেরকে নিজের পূজা করার কথা বললে তারা ছদ্মবেশী মনসাকে উপহাস করে। কেউ তার রঙ্গান চুপড়ি কেড়ে নেয়, কেউ ঢেলা মারে, কেউ গায়ে ধুলো দেয়। রাখালদের এইরূপ অবহেলার দরুন মনসা নিজের স্বরূপ বোঝানোর জন্য রাখালদের গো-ধন হরণ করেন। গোপালনই তাদের বৃত্তি। গোরু-বাছুর হারিয়ে যাওয়া মানে তাদের সমূহ ক্ষতি। রাখালদের ক্রন্দনে মনসার চিত্ত বিগলিত হল। তিনি নিজের রূপে রাখালদের সামনে এলেন। ছদ্মবেশিনী মনসা তাদের কাছে পূজা চাইলে রাখাল বালকেরা তাঁকে কুশের আসনে বসান এবং পূজার উপাচার সংগ্রহ করে তাঁর পূজা করতে প্রস্তুত হয়।

● **প্রহরী :** কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গালের 'রাখাল বালকগণের মনসা-পূজার আয়োজন' অংশে আমরা প্রহরীর প্রসঙ্গা পাই। সাধারণত পাহারাদানকারীদের প্রহরী হিসেবে গণ্য করা হত, সে বস্তু যতই দুর্মূল্য হোক কিংবা নিকৃষ্ট হোক। অনেক সম্ভ্রান্ত ধনী বাড়ির চারপাশে এরকম প্রহরী নিযুক্ত করা হতো যাতে কোনো বিপদ-আপদ না হয়। কাব্যে আমরা দেখি রাখালগণের সর্দার রাসু তার দুই সঙ্গীকে মনসার পাহারায় বসিয়ে নিজের বাড়ি গেছে চাল আনতে।

● **মোদক/মিষ্টান্ন বিক্রেতা :** ভোজনরসিক বাঙালি যে মিষ্টান্ন প্রিয়, তার পরিচয় শুধু মঙ্গালকাব্যেই নয় প্রাগাধুনিক সাহিত্যের নানা শাখায় আমরা পেয়েছি। আমাদের আলোচ্য কেতকাদাসের মনসামঙ্গালে 'রাখাল বালকগণের মনসা-পূজার আয়োজন' অংশে আমরা মোদক বা মিষ্টান্ন বিক্রেতার পরিচয় পাই। এদের ঘরে মিষ্টান্নর ভান্ডার থাকত এবং এই মিষ্টান্ন বিক্রি করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করত। কাব্যে রাখাল বালক বালা মনসা পূজার উদ্দেশ্যে মোদকের দোকানে গিয়ে ডালা, সন্দেশ, মোয়া, মিষ্টান্ন কিনে আনে—

মোদক দোকানে বালা ধরিয়া তরাজু ডালা
কিনিল সন্দেশ মিঠাখণ্ড।
ঝুড়ি নিল তিন পুয়া আদেশা সন্দেশ মুয়া
আধসের নিল নব খণ্ড।।

মিষ্টান্নই নয় মিষ্টান্ন রাখার জন্য সে ঝুড়ি কিনল তিন পোয়া। তারপর সমস্ত মিষ্টান্ন দ্রব্য নিয়ে সে কচুয়া তটের উদ্দেশ্যে রওনা দিল যেখানে মনসার পূজা হচ্ছে। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে পুজো-আচ্চা বা কোনো শুভ কাজের জন্য এ যুগে যেমন মিষ্টান্নকে শুভ হিসেবে ধরা হত সেকালেও তাই ছিল।

● **মালিনী/মালাকার :** কেতকাদাসের মনসামঙ্গালের একাধিক অংশে আমরা মালিনী বা মালাকারের প্রসঙ্গা পাই। এরা সাধারণত ফুলের মালা গেঁথে ও সেই ফুল বিক্রি করে জীবিকা

নির্বাহ করত। কাব্যে আমরা মালাকারের প্রথম সাক্ষাৎ পাই 'রাখাল বালকগণের মনসা-পূজার আয়োজন' অংশে—

আতব তুণ্ডল নিল নৌতন বাসনে থুল
মালাকারে গাঁথ্যা দিল ফুল।
সুগন্ধি বকুল-ঝাঁপা শশিমালা শ্বেতচাঁপা
কনক কেতকী বহু মূল।।

সাধারণত যারা নানা ধরনের ফুল দিয়ে মালা গেঁথে বিক্রি করে তারা হল মালাকার। এই মালা তৈরিতে তাদের যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য অংশে মনসা পূজার অভিপ্রায়ে রাখালরা হাসনহাটির হাটে গেলে সেখানে পূজার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কেনার পাশাপাশি মালাকারের কাছ থেকে মালা নিয়েছে। বকুল, ঝাঁপা, শশিমালা, শ্বেতচাঁপা, কেতকী প্রভৃতি ফুলের সমন্বয়ে মালা গেঁথে সেই মালা নিয়ে রাখালরা মনসার পূজা করতে চলেছে।

কাব্যের আরেক অংশে আমরা এই মালাকারের প্রসঙ্গ পাই। 'বাসর নির্ম্মাণ' অংশে আমরা দেখি ঊষা ও তাঁর প্রিয় সখী চিত্রলেখা যুক্তি করে মালাকারকে ডেকে এনে ঊষার জন্য একটি সুন্দর পুষ্প সজ্জিত বাসরঘর নির্মাণ করে দেওয়ার কথা বলেন। এও বলেন যে, এর জন্য সে মালাকারকে বিশেষ পুরস্কার দেবে। রাজকুমারী ঊষার মুখে এ প্রস্তাব শুনে মালাকার খুব আনন্দিত হল এবং সুন্দর বাসরসজ্জা নির্মাণ করল।

মালিনীরা পুষ্প বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত। কাব্যে 'মালিনীর সহিত দেবীর বিরোধ ও মালিনীর দুই পুত্র নাশ' অংশে আমরা কাজলা মালিনীর প্রসঙ্গ পাই। সে চম্পক নগরে বাস করে। চাঁদকে সে রোজ শিব পূজার জন্য ফুলের জোগান দেয়। মনসা যখন নেতর পরামর্শে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণের জন্য নটীর বেশ ধারণ করেন, তখন পুষ্পমাল্যে অঙ্গসজ্জার জন্য তাঁকে কাজলা মালিনীর বাড়িতে যেতে হয়।

কাব্যে 'মনসার মালিনী বেশ ধারণ' অংশেও আমরা মালিনীর প্রসঙ্গ পাই। মনসা নেতর কাছে ধন্বন্তরি ওঝার মৃত্যুর উপায় জানতে চাইলে নেত মনসাকে পরামর্শ দেন যে, প্রথমে ওঝার ছকুড়ি শিষ্যকে আগে হত্যা করতে। শিষ্যদের বধ করার জন্যে মনসাকে নেত মালিনীর ছদ্মবেশ ধারণ করতে বলেন। নেতর পরামর্শে মনসা মালিনী বেশ ধারণ করে বিষপুষ্প দিয়ে ধন্বন্তরির শিষ্যদের হত্যার পরিকল্পনা করেন। সেই বিষপুষ্পের মালা যখনই তারা গলায় দেবেন তখনই তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন—

তোমার পুষ্পের মাল্য যত হলাহলে।
যদি সে পুষ্পের মালা তারা দেই গলে।।
তখন মরিবে তারা বিষমাল্য বাণে।

এরূপ পরিকল্পনা করে যোলো বছর বয়সি মালিনী সেজে মালঞ্চ বাড়ি গিয়ে বিভিন্ন ফুল তুলে মালা গেঁথে মনসা ধন্বন্তরি ও তাঁর শিষ্যদের কাছে গেলেন।

● **দূত/অনুচর :** কেতকাদাসের মনসামঙ্গালের 'হাসনহুসেন সমীপে মনসা পূজার বার্তা', 'কচুয়ার তটে হাসনের দূত', 'দূত কর্তৃক মনসা পূজার দ্রব্য লুণ্ঠন' প্রভৃতি অংশে আমরা দূত

বা অনুচরের প্রসঙ্গ পাই। সাধারণত এরা এক প্রকারের রাজকর্মচারী এবং রাজ্যের কোথায় কী হচ্ছে তার গোপন সংবাদ রাজার কান অবধি পৌঁছে দেওয়াই এদের কাজ। কাব্যে হাসান-হুসেনের দূতের নাম সাদ্যা। সে একদিকে যেমন ভীষণ অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর অন্যদিকে ভয়ংকর রকমের হিন্দু বিদ্বেষী। হাসান-হুসেনের রাজ্যে হিন্দু দেবতার পূজা হচ্ছে—এই খবর শুনে তারা সাদ্যাকে বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করার জন্য কচুয়ার তটে প্রেরণ করেছেন।

● **নফর/ভৃত্য** : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গালের একাধিক অংশে আমরা নফর প্রসঙ্গ পাই। এরা এক প্রকারের ভৃত্য, যারা মালিকের সাথে সর্বক্ষণ থেকে মালিকের ফাইফরমাস খাটে এবং পরিবর্তে মাস মাইনে পায়। কাব্যে নাড়া হল চাঁদ সদাগরের নফর বা ভৃত্য। সে চাঁদের সর্বক্ষণের সঙ্গী এবং চাঁদের ভালোমন্দের ব্যাপারে খুবই সচেতন। নাড়া বুদ্ধিমান, ফন্দিফিকিরও সে ভালো মতোই জানে। প্রভুকে খুশি করাই তার একমাত্র ব্রত। চাঁদের মতো সেও দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্পন্ন। দরিদ্র প্রজারা তাকে ভয়ে সমীহ করে চলে। জালু-মালুর প্রসঙ্গে আমরা দেখি চাঁদের নির্দেশে নাড়া যখন জালু-মালুর কাছে যায় তখন—

নাড়ারে দেখিয়া জালু মালু দুইজন।
সম্ভাষ করিয়া দিল বসিতে আসন।।

নাড়া নিজে চাঁদের ভৃত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও জালু-মালুকে সে 'দাস' বলে সম্বোধন করেছে—'ডাকিতে আইলু আমি শুন দুই দাস।।' অর্থাৎ, বোঝাই যাচ্ছে চাঁদ বণিকের নফর বলে সে বাড়তি সমাদর পেয়েই থাকে। তাই তার প্রতাপ ও অহমিকা কম কিছু না।

কাব্যে নাড়ার সঙ্গে পাঠকের দ্বিতীয় পরিচয়ের অভিজ্ঞতা আরো ভয়ংকর। সংসারে থেকে সংসারের খেয়ে কী করে সংসারেই আগুন লাগাতে হয়, তা এদের মতো ভৃত্যরা ভালো মতোনই জানে। তাই সংসারের মঙ্গালের জন্য সনকা লুকিয়ে মনসার ঘট পূজা করলে সেই খবর চাঁদের কাছে নাড়া পৌঁছে দিয়ে চাঁদকে উত্তেজিত করেছে।

● **দাসী** : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গাল কাব্যের 'হাসনের পুরীনাশের উদ্যোগ' অংশে দাসীর প্রসঙ্গ আছে মাত্র তবে বিস্তারিত বিবরণ নেই। ধনী পরিবারে দাসী পোষার রীতি তৎকালীন সময়ে প্রচলিত ছিল। সংসারের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করাই ছিল এই দাসীদের কাজ। আমরা চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের ধনপতি উপাখ্যানে দুর্বলা দাসীর প্রসঙ্গ পেয়েছি। তিনি ছিলেন লহনার দাসী। আলোচ্য কাব্যে আমরা দেখি হাসান-হোসেনকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে মনসা তার অনুচর বিঘতিয়া নাগকে পাঠায় হাসনের পুরী ধ্বংস করার জন্যে। হাসনের পুরীতে গিয়ে বিঘতিয়া নাগ তার হত্যালীলা চালায়। সবার আগে সে হত্যা করে পুরীর দাসীকে। তারপর একে একে পুরীর সকলকে বিঘতিয়া নাগ হত্যা করতে থাকে।

● **ঘাসী** : কেতকাদাসের মনসামঙ্গালে 'হাসনের পুরী নাশের উদ্যোগ' অংশে আমরা ঘাসীর প্রসঙ্গ পাই। যদিও কবি এর বিস্তারিত বিবরণ দেননি, প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন মাত্র। ধনী গৃহে এরা হল এক প্রকারের কর্মচারী বিশেষ, যারা কাজের পরিবর্তে মাস মাইনে পায়। সাধারণত বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ঘাসের যত্ন নেওয়া এবং যেখানে অগাছার পরিমাণ বেশি হলে তা কেটে ছাটাই করে পরিষ্কার করা—এইসবই ছিল তাদের কাজ। কাব্যে আমরা

দেখি মনসার নির্দেশে বিঘতিয়া নাগ হাসনের পুরী নাশ করতে এলে সে সাতজন ঘাসীকে হত্যা করে। যেখানে ঘাসের পরিমাণ বেশি, সেখানে গিয়ে বিঘতিয়া নাগ লুকিয়ে থাকে এবং যখনই ঘাসীরা সেই বাড়তি ঘাস কাটতে আসে তখনই নাগ তাদের হাতে দংশন করে। বিষের জ্বালায় ঘাসীরা মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

● **ভিক্ষুক :** কেতকাদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে 'দেবীর ছলনা ও চাঁদের দুর্দ্দশা' অংশে আমরা চাঁদের ভিক্ষাবৃত্তির পরিচয় পাই। কালীদহে চাঁদের সপ্তডিঙা ডুবে গেলে মনসার দয়ায় চাঁদ সদাগর কোনোক্রমে তীরে উঠতে সমর্থ হয়। কিন্তু তখন সে কপর্দকশূন্য নিঃস্ব ভিক্ষুক ছাড়া আর কিছুই নয়। পরণের কাপড়টুকু পর্যন্ত তার নেই। লজ্জা ঢাকার জন্য শ্মশানে গিয়ে 'মরা-কানি' পরে চাঁদ ভিক্ষাবৃত্তিকেই বেঁচে থাকার পথ হিসেবে গ্রহণ করেছেন—

শ্মশানের কানি সাধু লাজে গিয়া পরে।
ভিক্ষা মাগি খাত্যে যায় নগরে নগরে।।
বাম হাতে হোলা আর ছিঁড়া কাঁথা গায়।
মনসার হটে সাধু ভিক্ষা মাগ্যা খায়।।

হাতে হোলা নিয়ে চাঁদ ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে বেড়ায়। তাঁকে দেখে রাস্তার শিশুরা পাগল ভেবে ইট ছুড়ে মারে। চাঁদ যতই বলে যে সে চাঁদ বণিক কিন্তু কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না। সকলেই তার কথাকে পাগলের প্রলাপ ভেবে হাসে। ভিক্ষা হিসেবে সে ঘরে ঘরে ধান, চাল, কড়ি ইত্যাদি পায়। একটি ভাঙা ঘরে সে এই সমস্ত ভিক্ষা দ্রব্যগুলি রাখে। কিন্তু সেখানেও তাঁর রেহাই নেই, মনসার নির্দেশে গণেশ তাঁর বাহন ইঁদুরের মাধ্যমে চাঁদের সমস্ত ধান চুরি করে নেয়।

● **আক্ষটি/ব্যাধ :** কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গালে 'চাঁদের মিত্র গৃহে গমন' অংশে আমরা আক্ষটি বা ব্যাধের প্রসঙ্গা পাই। সাধারণত পশু-পাখি শিকার করেই এরা জীবিকা নির্বাহ করে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'আখেটিক খণ্ড'-এ আমরা ব্যাধ কালকেতুর পরিচয় পেয়েছি। আলোচ্য প্রসঙ্গো আমরা দেখি একদল আক্ষটি মৃগয়ায় এসেছে। বারো বছর তারা কোনো শিকার পায়নি, তাই শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় জাল, দড়ি, সাতনলা কাঠি নিয়ে তারা বনে এসেছে শিকারের আশায়। কাব্যে আমরা দেখি—

এ বার বৎসর তারা না পায় শিকার।
সেই দিন মৃগয়াতে কৈল আগুসার।।
আঠা কাঠি সাত নলা লয়্যা জাল দড়ি।
শিকার কারণে তারা বন গিয়া বেড়ি।।

শিকার করার পদ্ধতি হল প্রথমে খাবার দিয়ে টোপ ফেলা, তারপর সেই খাবারের লোভে পশু বা পাখি সেখানে এলে তাদের উপর জাল ফেলে বন্দি করা। এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিল ব্যাধেরা। তারা খাবার ছড়িয়ে দিয়ে পাখিদের সেই খাবারের লোভ দেখিয়ে তাদের সযত্নে সেখানে নিয়ে আসে। কিন্তু তার মাঝেই ঘটে যায় বিপত্তি। চাঁদ বেনে 'হায়' বলে তাঁর মনোদুঃখ ব্যক্ত করার সাথে সাথে আওয়াজে পাখির দল সেখান থেকে উড়ে যায়। বারো বৎসর তারা কোনও শিকার পায়নি। তাই আজ হাত থেকে শিকার ফস্কে যাওয়ায় তারা

যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়ে। তারা চাঁদ বেনেকে ধরে মারতে শুরু করে। পরে অবশ্য চাঁদের কাতর অবস্থা দেখে তারা চাঁদকে রেহাই দেয়।

● **কাঠুরিয়া বা কাষ্ঠ বিক্রেতা :** কেতকাদাসের মনসামঙ্গালে 'মনসার বাদে চাঁদের বিড়ম্বনা' অংশে আমরা কাঠুরিয়া বা কাষ্ঠ বিক্রেতাদের সন্ধান পাই। বনে-জঙ্গালে কাঠ কেটে সেই কাঠ হাটে গিয়ে বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। মনসার চক্রান্তে কালীদহের কুলে চাঁদ সদাগরের সাত ডিঙা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পরে নদীতে ডুবে যায়। কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে সাত-আট জন কাঠুরিয়ার সাথে চাঁদের দেখা হয়। তারা সকলে জঙ্গালে কাঠ কাটতে যাচ্ছে—"কাঠুর্‌যার সঙ্গে তার পথে হৈল দেখা।।/একত্রে মিলিয়া তারা জনা সাত আট।/গহনেরে যায় তারা কাটিবারে কাঠ।।"

সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে জানতে পারা যায় যে, এরা জাতিতে কাষ্ঠ বিক্রেতা এবং এখানে 'জাতি'র উল্লেখে তৎকালীন বৃত্তিনির্ভর শ্রেণি বিভক্ত সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এক বোঝা কাঠ নগরে বেচতে পারলে আট পণ কড়ি রোজগার হয়। যে যত বেশি কাঠ বেচতে পারবে তার দিনে তত রোজগার। নিঃস্ব, ক্ষুধার্ত চাঁদ একথা শুনে কিছু পয়সা রোজগারের আশায় তাদের দলে ঢুকে কাষ্ঠ বিক্রি করতে রাজি হয়।

● **ব্রাহ্মণ কৃষক :** কেতকাদাসের মনসামঙ্গাল কাব্যে 'মনসার বাদে চাঁদের বিড়ম্বনা' অংশে আমরা কৃষক ও কৃষিকাজের সন্ধান পাই। সে কৃষক হলেও জাতিতে ব্রাহ্মণ, কাব্যে তাঁর কোনো নাম দেননি কবি। আমরা চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যেও কৃষক ও কৃষিকার্যের পরিচয় পেয়েছি। এর থেকে বোঝা যায় তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশে কৃষিকাজ একটি প্রাচীন ও অন্যতম জীবিকা ছিল। মনসার কোপে কালীদহের কুলে চাঁদের সাত ডিঙা ডুবে গেলে অসহায় চাঁদ কোনোক্রমে নদীর তীরে ওঠেন। এরপর ক্ষুধার্ত চাঁদ বিভিন্ন জায়গা ও পথ অতিক্রম করেন। পথিমধ্যে অনেক কষ্ট, লাঞ্ছনা, শারীরিক নির্যাতন, মারধর সহ্য করে অবশেষে চাঁদ এক কৃষকের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় যিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ—"তথা হৈতে চাঁদবান্যা কান্দিতে কান্দিতে।/উপনীত হৈল গিয়া বিপ্রের বাটীতে।।/থাকিব তোমার বাড়ী বহিয়া কম্বল।/উদর পুরিয়া মোরে দিবে অন্নজল।।" চাঁদ ব্রাহ্মণকে বলেন যে, সে যা বলবে চাঁদ তাই করবে পরিবর্তে তাকে যেন একটু অন্নজল দেওয়া হয়। এই কথা শোনার পর ব্রাহ্মণ চাঁদকে ক্ষেতে ধান নিড়াবার কাজে নিযুক্ত করেন। এখানেও মনসা মায়ার সৃষ্টি করলেন। চাঁদকে আরো কষ্ট দেবার জন্য প্রচুর খড় জমিতে ফেলে রাখলেন। এদিকে চাঁদ তো বণিক, সে বাণিজ্য ছাড়া কিছুই বোঝেন না আর সেই কারণে পড়ে থাকা খড় ও ধানের মধ্যে তফাত বুঝলেন না।

তাই খড়ের পরিবর্তে ধান গাছগুলিকেই চাঁদ কেটে ফেলেন। চাঁদের এই কীর্তি দেখে ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধ হয়, সে হাহাকার করতে থাকে। চাঁদকে সে চড়-চাপড় মারতে থাকে। পরে প্রচণ্ড প্রহারে জর্জরিত চাঁদের অসহায় করুণ মুখ দেখে ব্রাহ্মণ তাঁকে আর না মেরে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন।

● **নাপিত :** কেতকাদাসের মনসামঙ্গালে 'লখীন্দরের জন্ম' অংশে নাপিত প্রসঙ্গ আছে। বিভিন্ন শুভকাজে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কাব্যে লখিন্দরের জন্ম উপলক্ষ্যে আমরা

দেখি লখিন্দরের জন্মের পঞ্চম দিনে বণিকের বাড়ির সবার খেরু কর্মের বা ক্ষৌরকর্মের দায়িত্ব ছিল নাপিতের উপর। বিভিন্ন পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানে তৎকালীন সময়ে এই নাপিতদের উপস্থিতি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

● **দৈবজ্ঞ গণক :** কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে একাধিক অংশে আমরা গণক প্রসঙ্গ পাই। চণ্ডীমঙ্গলেও আমরা এই গণকের প্রসঙ্গ পেয়েছি। এরা রাশি, পাঁজি দেখে যাত্রার শুভদিন, শুভক্ষণ ইত্যাদি বিচার করতেন। কোন্ কাজ করা উচিত, কোন্ কাজ উচিত না সেই সম্পর্কে গৃহস্থদের পরামর্শ দিতেন। তাঁদের কথা ফলত বলে গৃহস্থেরা তাঁদের কথা বেদবাক্যের মতো মানতেন। এরা ব্রাহ্মণ গোত্রের মধ্যে পড়েন। গণকদের গ্রহবিপ্রও বলা হত।

আলোচ্য কাব্যে 'দেবীর চক্রান্তে ওঝার জীবন রক্ষার নিষ্ফল চেষ্টা' অংশে আমরা প্রথম গণকের সাক্ষাৎ পাই তাও আবার ছদ্মবেশী। মুখোশের আড়ালে ছিলেন মনসা। ঘটনাটি খানিকটা এইরূপ—উদয়কাল সর্পের দংশনে ধন্বন্তরির মৃত্যুর আশঙ্কা তৈরি হলে সে তাঁর দুই শিষ্য ধনা-মনাকে গন্ধমাদন পর্বত থেকে বিশল্যকরণী আনতে পাঠান। সেই ঔষধ আনলে ধন্বন্তরি বেঁচে যাবেন। তাই ধনা-মনাকে ছলনা করার জন্য মনসা দুঃখিনী চেড়ীর বেশ ধরে দুই শিষ্যকে বলেছেন—

দুঃখী চেড়ী বলে আর কি কাজ ঔষধে।
ধন্বন্তরি ওঝা মৈল মনসার বাদে।।

ব্যাপারটিকে আরো বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার জন্য ধনা-মনাকে খড় পোড়ানোর ধোঁয়াও দেখিয়েছেন তিনি। মনসার এই চক্রান্ত ধন্বন্তরি সবই বুঝে গিয়েছিলেন। তাই দেবীর মহিমা খর্ব করার জন্য ধন্বন্তরি তাঁর শিষ্যদের তাঁর শেষ ইচ্ছার কথা জানান। কাজেই ধন্বন্তরির এই ইচ্ছাকে আবার বিফল করার জন্য এবার মনসা গণক ঠাকুরের ছদ্মবেশ নেন।

কাব্যে 'চাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তন ও দৈব-নির্য্যাতন' অংশে আমরা দ্বিতীয়বার গণকের প্রসঙ্গ পাই। এখানেও মনসা গণকের ছদ্মবেশ নিয়ে সনকার গৃহে এসেছেন এবং সনকাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে, তার বাড়িতে আজ চুরি হবে, এমনকি পাঁজি, পুথি মেলে চোরের চেহারার বর্ণনাও দিয়েছেন গণকবেশী মনসা। তাই সন্ধেবেলায় কলাবাগানে কাউকে যেন নড়তে-চড়তে দেখে সনকার নির্দেশে চাঁদের ভৃত্য নাড়া চাঁদের ঘাড়ে লাফিয়ে পরে 'চোর' বলে তাকে কিল, লাথি মারতে থাকে।

● **নটী বা নর্তকী :** একসময় নটী বা নর্তকী বৃত্তি সমাজের চোখে নিন্দনীয় ছিল। যারা নটী কিংবা নর্তকী হত, সমাজ তাকে 'কুলটা' শিরোপা দিত। আলোচ্য কাব্যে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণের জন্য নেতর পরামর্শে মনসা নটীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। 'মালিনীর সহিত দেবীর বিরোধ ও মালিনীর দুই পুত্র-নাশ' অংশে আমরা দেখি লাসবেশ পরিহিতা দেবী পুষ্পমাল্যের প্রয়োজনে যখন কাজলা মালিনীর কাছে গেছেন, তখন মালিনী তাঁকে স্পষ্টই বলেছে—"কুলটারে না পারিব পুষ্প ধার দিতে।।"

আবার 'নাড়া কর্তৃক চাঁদকে নটীর সংবাদজ্ঞাপন' অংশে দেখি চাঁদের ভৃত্য নাড়া নটীকে দেখে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমাতে চাইছে। এই নর্তকীরা যে দেহ পসারিনি তা জানাতেও কবি ভুলে যাননি। 'চাঁদবান্যার কামার্ত্তি' অংশে কবি বলছেন—

বেউশ্যার মূর্ত্তি হয়্যা   সাধুর সদনে গিয়া
শিয়রে বসিলা কমলিনী।

'চাঁদবান্যার মতিভ্রম' অংশে আমরা দেখি নৃত্যগীতে চাঁদকে মোহিত করল নটী। মোহবিস্তার ও কামকলায় এরা এতটাই পারদর্শী ছিল যে, সম্পন্ন পুরুষেরা স্ত্রী-সন্তান ত্যাগ করে তাদের রূপ-যৌবনেই আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। চাঁদও তাই করেছেন—

ছটি পুত্র মোর   কাটি পাএ তোর
সনকারে দিব দাসী।

পুরুষের রক্ষিতা রাখার অভ্যাসটি এই উক্তিতে আভাসিত হয়েছে। বেহুলাও স্বামীর পুনর্জীবন প্রাপ্তির আশায় দেব সভায় নৃত্য গীত পরিবেশন করেছে। কিন্তু সেখানে সে নর্তকীর পরিচয়ে নাচেনি। দেবতারা তার নাচে মুগ্ধ হলেও পতিব্রতা সতীর সম্মান সে পেয়েছে।

মনে রাখতে হবে নটী বা নর্তকী পেশাভিত্তিক অভিধা হলেও 'নাচনী' আসলে নৃত্যশিল্পী, যা আমাদের সংস্কৃতি চর্চারই দৃষ্টান্তবাহী। পেশাদার নর্তকী ছিল সমাজের চোখে নিন্দনীয় কিন্তু নৃত্যশিল্পীর কদর সকলেই করতেন।

নির্মাণ শিল্পী/কারিগর : নদী বেষ্টিত বাংলায় স্থলযানের তুলনায় জলযানই ছিল প্রশস্ত। দৈনন্দিন যাতায়াত অথবা বাণিজ্যের কারণে ডিঙি, নৌকার উপর নির্ভর থাকতে হত বেশি। এই ডিঙা তৈরি করতে যথেষ্ট সময় লাগত। অত্যন্ত যত্নসহকারে কারিগরেরা এই ডিঙা তৈরি করতেন। আলোচ্য মনসামঙ্গাল কাব্যে 'বিশ্বকর্ম্মার মধুকর-নির্ম্মাণ ও চাঁদবান্যার বাণিজ্যযাত্রার উদ্যোগ' অংশে আমরা এই নির্মাণ শিল্পীর পরিচয় পাই। চাঁদ সদাগর দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য যাত্রায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি বিশ্বকর্মাকে বলেন তাঁর জন্যে সপ্তডিঙা গড়ে দেবার জন্য—

তত্ত্বকথা শুন তুমি   সফর যাইব আমি
গড়্যা দিবে সপ্তমধুকর॥
শুন বিশ্বকর্ম্মা মহাশয়।

দক্ষিণ সমুদ্রের লবনাক্ত জল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কারিগর বিশাই তদনুযায়ী ভালো কাঠ আনতে বলেন হনুমানকে। কারণ দক্ষিণের জল নোনা, তাই কাঠের মান খারাপ হলে সেই কাঠ নোনা জলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। তাই বিশাইয়ের কথামতো হনুমান একটানে শত শত বৃক্ষ এনে ফেলেন বিশ্বকর্মার কাছে। বিশ্বকর্মা যখন যা চান হনুমান তাই এনে দেন সপ্তডিঙা গড়ে দেওয়ার জন্যে। বিশ্বকর্মা কেমন করে গড়লেন সেই ডিঙি তার যথাযথ বিবরণ দিয়েছেন কবি—

বিংশতি চৌষট্টি গজে   একখান ডিঙ্গা সাজে
লোহার গজাল বিরচিতে।
চাঁদবান্যা মধুকর   মাঝে বান্ধে ছইঘর
নানা চিত্র করিল বিশাই।।

এইসব নৌকাগুলির সামনের দিকের গলুই নানারূপ জীবজন্তুর মুখের আকারে নির্মিত এবং নানা মূল্যবান রত্ন দ্বারা খচিত। নৌকা নির্মাণ করে বিশ্বকর্মা ঘরে গেলেন আর চাঁদ

বিভিন্ন বিনিময় দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে ডিঙা ভরতে লাগলেন। কাব্যে 'বিশ্বকর্ম্মার লৌহ বাসর নির্মাণ ও মনসার নির্দেশে সর্পের গমন পথ' অংশে আমরা লৌহ বাসরঘর নির্মাণের কারিগরের প্রসঙ্গা পাই। মনসা যেহেতু চাঁদের সমস্ত পুত্রকে হত্যা করেছে তাই এই কাজের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেই কারণে চাঁদ বিশ্বকর্মাকে দিয়ে লখিন্দরের বিবাহের জন্য সাঁতালি পর্বতে লোহার বাসরঘর বানাতে বলেন এবং বলেন সেখানে একটি পিঁপড়ের প্রবেশেরও যাতে পথ না থাকে। লক্ষ মণ লোহা এনে, নানা অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে কারিগর সাঁতালি পর্বতে চড়ে লোহার বাসরঘর নির্মাণ করার কাজ শুরু করল। সাধুর মনোমত বাসরঘর নির্মাণ করে কারিগর নানা ধনরত্ন পুরস্কার পেয়ে নিজের বাড়িতে চলল।

● **ঘটক :** চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের মতো কেতকাদাসের মনসামঙ্গাল কাব্যেও আমরা ঘটক প্রসঙ্গা পাই। কাব্যে ঘটকের নাম হল জনার্দন। সে জাতে ব্রাহ্মণ। তাই তার নামের আগে 'দ্বিজ' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। পৌরোহিত্যের পাশাপাশি সে ঘটকালিকেও তার জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছে এটা ভাবলে ভুল হবে। সম্ভবত ঘটকালি তার পেশা নয় শখ। প্রসঙ্গাত উল্লেখযোগ্য, মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গালে ধনপতি আখ্যানের ঘটক চরিত্রের নামও জনার্দন। তবে আলোচ্য মনসামঙ্গাল কাব্যে জনার্দন ঘটক ছাড়াও আমরা আরেকজন ঘটকেরও পরিচয় পাই। তিনি হলেন নারদ মুনি।

কাব্যের দেবখণ্ডে 'জরৎকারু মুনির নিকট বিবাহ-প্রস্তাব' অংশে আমরা দেখি শিব নারদ মুনিকে নিয়ে পরামর্শ করেন মনসার বিবাহের উদ্দেশ্যে। শিব চান মনসাকে ঋষিকুলে বিবাহ দিতে তাই তিনি নারদকে ঘটক হয়ে কন্যার জন্য ঋষিকুলে পাত্রের সন্ধান করতে বলেন—

নারদের তরে পুন কহেন ঈশান।
ঋষিকুলে দিব আমি বিষহরি দান।।
ঘটক হইয়া তুমি করহ পয়ান।
নারদ ঘটক-বেশে হৈলা আগুয়ান।।

শিবের কথামতো নারদ ঘটক সেজে ঋষি কুলে যান পাত্রের সন্ধানে। সেখানে তপস্যারত জরৎকারু মুনির সাথে তার সাক্ষাৎ হলে নারদ জরৎকারু মুনিকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। স্বাভাবিকভাবেই পাতালবাসিনী, নাগকন্যা মনসাকে বিবাহ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন জরৎকারু মুনি কিন্তু পরে যদিও তিনি বিবাহে রাজি হয়েছিলেন। কাব্যে 'লখীন্দরের সম্বন্ধ-নির্ণয়' অংশেও আমরা ঘটক প্রসঙ্গা পাই। কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দরের বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছায় চাঁদ তাঁদের কুলপুরোহিত জনার্দন ব্রাহ্মণকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

বিবাহের অনুষ্ঠানে এই জাতীয় ঘটকদের ক্রিয়াকর্মের একটি যথেষ্ট ভূমিকা ছিল তৎকালীন সময়ে। এই জাতীয় চরিত্র শুধু মধ্যযুগেই নয়, বর্তমান কালেও পরিদৃষ্ট হয়; যদিও এখন তার সংখ্যা অনেক কম। তবে কাব্যে শেষপর্যন্ত ঘটক ও পুরোহিত উভয় দিক থেকেই জনার্দন জয়ী হয়েছেন।

● **ঘাটিয়াল :** কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গাল কাব্যের 'জগাতির সুমতি' অংশে আমরা ঘাটিয়াল প্রসঙ্গা পাই। লখিন্দরের মৃতদেহ নিয়ে বেহুলা যখন স্বর্গপুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল তখন সে একের পর এক পথঘাট, গ্রাম-জনপদ পেরিয়ে যাচ্ছিল। বেহুলার এই

যাত্রাপথ ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা। নানা হিংস্র মাংসভুক পশু থেকে শুরু করে লোভী মানুষের সাথেও তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। নদীর ঘাটে ঘাটিয়াল থাকে, কর সংগ্রহ যাদের উদ্দেশ্য। বেহুলা জগাতি ঘাটে তেমনি এক ঘাটিয়ালের সাক্ষাৎ পায়।

জগাতি মধ্যযুগীয় পুরুষদের বাইরের মানুষ নয়। তাই একাকী বেহুলাকে দেখে সে প্রথমে তাকে 'কুলটা' বলে উপহাস করেছে এবং পরে তার সঙ্গ কামনা করেছে। জগাতি জগাতিঘাটার ঘাটিয়াল। তার নামেই এই ঘাটের নামকরণ। সুতরাং এই ঘাটের উপর তার প্রভাব প্রতিপত্তি থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই বেহুলার রূপে মুগ্ধ হয়ে জগাতি তাকে পাওয়ার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছে। কিন্তু বেহুলা যখন সবিস্তারে তার দুরবস্থার কথা ব্যক্ত করেছে এবং বলেছে—

অকারণে কেন তুমি ঝাঁপ দিবে জলে।
পাঁচ মাস পাঁচ মড়া প্রাণনাথ কোলে।।

তখন তা শুনে জগাতি অবিশ্বাস করেনি এবং পতিব্রতা সতী বলে বেহুলাকে সম্মান জানিয়েছে।

● **গোয়ালিনী/দধি-দুগ্ধ বিক্রেতা :** কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গল কাব্যের 'দেবীর গোয়ালিনী-বেশ ধারণ', 'শঙ্খিনী নগরে দেবীর দধি-পসরা' অংশে আমরা গোয়ালিনীর প্রসঙ্গ পাই। গোয়ালারা নগরে নগরে দধি-দুগ্ধ বেঁচে জীবিকা নির্বাহ করত। কাব্যে আমরা দেখি মনসা ধন্বন্তরির ছকুড়ি শিষ্যদের হত্যা করার জন্যে তাঁর সহচরী নেতর পরামর্শে গোয়ালিনীর বেশ ধারণ করেন। দেবী প্রথমে গেলেন কুমারের বাড়ি। সেখানে গিয়ে ছকুড়ি ছয় শিষ্যের জন্য ছকুড়ি ছয় ভাণ্ড কিনলেন। তারপর নেতর কথামতো মঙ্গালা, বোড়া সাপের বিষ মিশিয়ে সেই বিষদধির পসরা নিয়ে মনসা চললেন শঙ্খিনী নগরে ধন্বন্তরির শিষ্যদের হত্যা করতে।

● **কুমার/কুমোর :** কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গল কাব্যের 'দেবীর গোয়ালিনী-বেশ ধারণ' অংশে আমরা কুমারের প্রসঙ্গ পাই। সাধারণত মাটির হাড়ি, নানা মাপের পাত্র গড়িয়ে তা বিক্রি তারা জীবিকা নির্বাহ করত। এই সমস্ত মাটির তৈরি জিনিসপত্রগুলি যাতে টেকসই হয়, সেইজন্য এগুলি আগুনে ভালোভাবে পোড়ানো হত।

কাব্যে আমরা দেখি দেবী মালিনীর বেশ ধরে ধন্বন্তরির শিষ্যদের বিষপুষ্প দিয়ে মারার চেস্টা করলেও অবশেষে বিফল হন। ধন্বন্তরির সহায়তায় শিষ্যরা প্রাণে বাঁচেন। প্রচেস্টা ব্যর্থ হল দেখে দেবী এবার নতুন কৌশল নিলেন। এবার তিনি সাজলেন গোয়ালিনী। এবার দধি-দুগ্ধ রাখার জন্য তো পাত্র চাই, তাই দেবী গেলেন কুমারের বাড়ি এবং সেখানে গিয়ে ছকুড়ি ছয় শিষ্যের জন্য ছকুড়ি ছয় ভাণ্ড কেনার জন্য।

● **সূত্রধর :** যারা সূত্র দ্বারা যজ্ঞবেদি ও অট্টালিকা সূচনা করতেন, ফলকাদির উপরে প্রাসাদের লক্ষণ বা মানচিত্র অঙ্কন করতেন তারাই সূত্রধর নামে পদবাচ্য হতেন। এরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়ে আসছেন। পশ্চিমবঙ্গে এরা ছুতোর নামেও পরিচিত। কাঠের কাজই এদের প্রধান জীবিকা। করাত চালাবার সময় কাঠ চেরাইয়ে যে সুতোর মাপজোখের দরকার হয়, সংস্কৃতি সেই সূত্র শব্দ থেকেই সূত্রধর কথাটি এসেছে।

আলোচ্য কাব্যে 'হাসন-হুসন সমীপে মনসা-পূজার বার্ত্তা' অংশে আমরা সূত্রধরের প্রসঙ্গ পাই। আমরা দেখি মনসা সূত্রধরকে ডেকে এনে তার ভক্তদের জন্য কাঠের বাধা গড়ে দিচ্ছেন—

আদেশ করিল দেবী তবে সূত্রধরে।
বাধা গড়্যা দেহ তুমি রাখালের তরে।।

রাখালদের কাছ থেকে পুজো পেয়ে মনসা সন্তুষ্ট হলে মনসা তাদের বর দিতে চান এবং সেই বর স্বরূপ মনসা এই কাঠের বাধা নির্মাণ করে দেন, যাতে গোচারণের সময় রাখালদের পায়ে কুশাঙ্কুর না ফোটে।

● **ধোপা বা রজক :** সভ্য সমাজের গোড়া থেকেই বস্ত্র-ধৌতকরণ প্রথা ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত। বাংলাদেশে এই প্রথা বহুদিনের। সাধারণত হিন্দুরা নিজেদের অপরিষ্কার বস্ত্র নিজেরা ধৌত করেন না। যারা এই কাজ করেন তারা রজক, ধৌতকার, ধোপা নামে পরিচিত। পুরুষানুক্রমে এদের প্রধান বৃত্তি হল কাপড় ধোয়া বা কাপড় কাচা। সাহিত্যে এই জাতির বিষয়ে কিছু কিছু উল্লেখ আছে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন মনসামঙ্গল কাব্যে এ জাতির প্রসঙ্গ রয়েছে। সেখানে আমরা দেখি কাব্যের অন্যতম চরিত্র চাঁদ সদাগরের সাধ্বী পুত্রবধূ বেহুলা যখন মনসার শাপে বিবাহ-বাসরে বিধবা হন, তখন বেহুলা স্বামী লখিন্দরকে বাঁচাবার জন্য নেতা ধোপানির শরণাপন্ন হন এবং নেতা ধোপানির সাহায্যে দেবসভায় গমন করে স্বামীর পুনর্জীবন লাভে সমর্থ হন। সম্পর্কের গুরুত্ব বোঝাতে যাকে আমরা জীবনের friend, philosopher ও guide, রূপে মনে করি আলোচ্য কাব্যে মনসার জীবনে নেতর ভূমিকা ঠিক ওইরকমই। নেত না থাকলে মনসা জগজ্জননী হয়ে উঠতে পারতেন কিনা সন্দেহ। অসাধারণ বুদ্ধিমতী বাস্তবজ্ঞানসম্পন্না নেতা মনসার প্রধান পরামর্শদাত্রী, তার নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গীও সে।

● **ওঝা :** যে সকল ব্যক্তি মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা যে সাপের বিষের চিকিৎসা করে তাদের ওঝা হিসেবে অভিহিত করা হয়। সাপুড়ে জনগোষ্ঠীর একাংশ ওঝা নামে পরিচিত। বলা হয়ে থাকে যে ওঝা সাপের বিষ নামিয়ে দেয়। আমাদের আলোচ্য মনসামঙ্গল কাব্যে আমরা এক ওঝার পরিচয় পাই, যাঁর নাম ধন্বন্তরী। এই ধন্বন্তরী নামটির মধ্যেই যেন অসাধ্য সাধনের ইঙ্গিত আছে। বিভিন্ন রোগ থেকে আশ্চর্য রকমের মুক্তি প্রসঙ্গে আজও আমরা ধন্বন্তরী বিশেষণটি প্রয়োগ করি। কেতকাদাসের কাব্যে ধন্বন্তরী পেশায় ওঝা। সে চাঁদ সদাগরের পরম মিত্র। কাব্যে 'নেত ও মনসার যুক্তি' অংশে আমরা দেখি মনসা নেতর কাছে ধন্বন্তরীর সম্বন্ধে জানতে চাইলে নেত বলেছেন—

ক্ষীরোদ মন্থন হর কৈল যেইকালে।
সেইকালে উঠে কালকূটি হলাহলে।।
চন্দ্রের পশ্চাতে উঠে ওঝা ধন্বন্তরি।
কালকূটি বিষ হেতু সেই হৈল বৈরী।।

সমুদ্রমন্থনে চন্দ্রের পরে ধন্বন্তরী উত্থিত হয়। সাপের বিষে কারো প্রাণনাশ হলে ধন্বন্তরীর মন্ত্রে সে পুনরুজ্জীবন লাভ করে। মনসার সঙ্গে চাঁদের দ্বন্দ্বে সে সবসময় চাঁদের পাশে

থেকেছে। মনসা চাঁদের মহাজ্ঞান চুরি করে নিলে চাঁদের সবার আগে ধন্বন্তরীকেই প্রয়োজন হয়েছে। কাব্যে 'ধন্বন্তরি কর্তৃক চাঁদকে পুনরায় মহাজ্ঞানদান ও মনসার ক্রোধ' অংশে চাঁদকে আমরা বলতে দেখি—

> শঙ্খিনী নগরে আছে ধন্বন্তরি ভাই।/তাহারে আনিতে পার তবে জ্ঞান পাই।।/তাহা বিনে ওঝা আর নাহি ত্রিভুবনে।/হুঙ্কারে জীয়ায় মড়া ব্রহ্মার বচনে।।/তার আগে কহ গিয়া আমার দুর্গতি।/অন্তকালে ধন্বন্তরি দোসর সারথি।।

নাড়া তৎক্ষণাৎ ধন্বন্তরীর কাছে গিয়ে চাঁদের দুরবস্থার কথা জানালে ধন্বন্তরী চাঁদের কাছে আসার উদ্যোগ নিয়েছেন। সঙ্গে নিয়েছেন তার ছকুড়ি ছয়জন শিষ্যকে। তিনি বলেছেন—"পুনরুপি আমি তারে দিব মহাজ্ঞান।/ছকুড়ি ছজন শিষ্য সাজহ ঝাপান।।"

কেতকাদাস চাঁদের সঙ্গে ধন্বন্তরীর ভ্রাতৃসুলভ মিত্রতার সম্পর্ক যেমন চিত্রিত করেছেন, তেমনি চাঁদের মতো তাকেও মনসা বিদ্বেষী রূপে এঁকেছেন। এর কারণ হয়তো ধন্বন্তরী মনসার বাহন সাপের শত্রু। সাপ যাকে মারে ধন্বন্তরী তাকে বাঁচায়। চাঁদ সম্পর্কে ধন্বন্তরীর অনুজ, মিত্র। তাই মিত্রর অনিষ্ঠ সাধনে যে তৎপর, তাকে ধন্বন্তরী সহ্য করেন কেমন করে? তাই চাঁদকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার আগে ধন্বন্তরী নিধনের প্রয়োজন আছে। তাই মনসা প্রথমে মালিনী ও পরে গোয়ালিনীর বেশ ধারণ করে ধন্বন্তরীকে ছলনা করতে গেছে। কাব্যে 'শিষ্যগণের মোহ ও গুরু কর্তৃক পরিত্রাণ' অংশে আমরা দেখি পুষ্পমালা পরে ধন্বন্তরীর শিষ্যরা বিষের জ্বালায় চেতনা হারিয়েছে। তাদের চেতনা ফিরিয়ে ধন্বন্তরী ঘোষণা করেছে—

> জীয়াইয়া শিষ্যগণে ধন্বন্তরি কৈল মনে
> বিষহরি করে বিসম্বাদ।
> মনে ভয় নাহি করে মোর শিষ্যগণ মারে
> বুঝি তার মরিবারে সাধ।।
> ঝাপান সাজিয়া যাই যথা তার লাগ পাই
> মনসার বধি গিয়া প্রাণ।
> শুনিঞা গুরুর বাণী ছাড়িয়া হুঙ্কার ধ্বনি
> সর্ব্ব শিষ্য করিল পয়ান।।

অনমনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ধন্বন্তরী কিন্তু নিজের স্ত্রীর অনুরোধের কাছে হার মেনেছে। এক্ষেত্রে মনসার ছলনা বোঝার মতো বুদ্ধি তার কাজ করেনি। ধন্বন্তরীর প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণীর বেশে মনসা তার বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তারপর সুযোগ বুঝে ধন্বন্তরীর স্ত্রী কমলার সাথে সইয়ের সম্পর্ক পাতিয়ে কমলাকে দিয়ে ধন্বন্তরীর মৃত্যুর খবর জানিয়ে নিয়েছে। 'ধন্বন্তরির মৃত্যু-রহস্য ভেদ ও উদয়কাল কর্তৃক ওঝাকে দংশন' অংশে আমরা দেখি ধন্বন্তরী তার স্ত্রীকে বলছেন তার মৃত্যুর উপায় বললে মনসা শ্বেতমাছিরূপে সে কথা শুনে নিলেন। এইভাবে ওঝা নিজের মৃত্যুর পথ নিজেই প্রশস্ত করে দিলেন। মনসা উদয়কাল সর্প প্রেরণ করে ওঝার প্রাণনাশ করলেও শেষপর্যন্ত বাঁচার চেষ্টা চালিয়ে গেছে সে। সে শিষ্যদের গন্ধমাদন পর্বত থেকে ওষুধ সংগ্রহ করতে পাঠিয়েছে। কিন্তু পথে মনসার ছলনায় বিভ্রান্ত হয়ে শিষ্যরা দেরি করে ফেলে। শেষ রক্ষা হয় না। ধন্বন্তরী প্রাণ হারায়।

● **পাটনী/কাণ্ডারি/মাঝি** : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গালে 'মনসার জন্মপালা' অংশে আমরা প্রথমে পাটনীর প্রসঙ্গা পাই। নৌ চালনাই এদের জীবিকা। আলোচ্য অংশে আমরা দেখি যে চণ্ডী পাটনীর বেশ ধারণ করে নৌকা বাইছেন জলে। শিব নৌকা করে নদী পার হবার উদ্দেশ্যে বল্লুকার তীরে আসেন। বল্লুকার তীরে উপস্থিত হয়ে শিব চারিদিকে তাকাতে তাকাতে এক রমণীকে খেয়া পারাপার করতে দেখেন। রমণীর উদ্দেশ্যে শিব বলেন—

শুনলো পাটনী রামা রূপের অবধি।
তরণী বাহিয়া আস্য, পার হই নদী।।
চন্দ্র লাজ পায় তোর দেখিয়া বয়ান।
কত যে হানহ মোরে নয়নের বাণ।।

পাটনীর রূপ দেখে শিব মোহিত হলেন। শিব পাটনীকে এই বলে দুঃখ করতে লাগলেন যে, কীভাবে পাটনীর স্বামী বাড়িতে থেকে নিজের স্ত্রীকে পাটনীবৃত্তি করতে পাঠিয়েছেন। শিব পাটনীর কাছ থেকে আলিঙ্গান চাইলেন এবং বললেন যে—আলিঙ্গান ছাড়া তিনি বাঁচতে পারবেন না। ছদ্মবেশিনী চণ্ডী নানা ছল করতে লাগলেন। তিনি বললেন শিবকে যে—এই বল্লুকার তটে নানা মুনি তপ করেন। কেউ যদি তাকে আলিঙ্গান দিতে দেখে ফেলেন, তাহলে তার কলঙ্ক লাগবে। কিন্তু শিব নাছোড়। সে কোনো কথাই শুনতে চায় না। তখন চণ্ডী পরামর্শ দিলেন—"তবে মোর কলঙ্ক রহিব ক্ষিতি জুড়্যা।/বাঘাম্বর পাতি লহ সজ্জ কর কুড়্যা।।" শিব এককথায় রাজি। বাঘাম্বর পেতে কামে গদগদ হয়ে শিব যখন ধরতে গেলেন পাটনীকে, তখনই শিবকে ছলনা করে গৌরী সেখান থেকে অন্তর্ধান হলেন। তবে এই সমস্ত গল্প কাহিনির মধ্যে থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে, তৎকালীন সময়ে নদ-নদী পরিবেষ্টিত বাংলাদেশে নৌকা ছিল জলপথের যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম।

জেলে/ধীবর : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গালে 'শতভার মৎস্য আনয়নে জালু-মালুকে চাঁদবান্যার আদেশ' অংশে আমরা জেলের প্রসঙ্গা পাই। নদীতে মাছ ধরে এরা জীবিকা নির্বাহ করত। কাব্যে জেলে বলতে আমরা জালু-মালু এই দুই ভাইয়ের কথা বলতে পারি। এদের একটি পূর্ব পরিচয় আছে, দেবরাজ ইন্দ্রের দুই পুত্র পুরবর ও মালাধরই আলোচ্য কাব্যের জালু-মালু। মনসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্যে এরা ধীবরের ঘরে জন্মগ্রহণ করে। এরা দুই ভাই সহজ-সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। চাঁদ সদাগরকে এরা মাছের যোগান দেয়। তাকে জালু-মালু যথেষ্ট মান্য করে। তাই চাঁদের ভৃত্য নাড়ার কাছে যখন তারা শুনেছে যে সাধু তাদের দুই ভাইকে ডেকেছে, তখন—

নাড়ার বচনে জালুমালু দুইজন।
সাধুর সদনে গিয়া দিল দরশন।।
করজোড়ে দুই দাস নোঙাইল মাথা।
চাঁদবান্যা বলে জালু শুন মোর কথা।।

চাঁদ ব্রায়ণ-ভোজনে আগ্রহী হয়ে জালু-মালুকে শতভার মীন ধরার আদেশ দিয়েছে। মাথায় হাত পড়ল দুই ভাইয়ের। তখন বণিক অধিপতি চাঁদ নিজের প্রতাপ দেখালেন এই বলে যে, নির্দেশ অমান্য করলে তাদের জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হবে। পরিণাম ভেবে শিউরে উঠল

দুই ভাই কিন্তু পরে অবশ্য দেবীর কৃপায় তারা শতভার মৎস্য বণিককে দিয়ে বণিকের রোষ থেকে মুক্ত পেলেন। শুধু তাই নয়, জাল থেকে মাছ তোলার সময় জালের মধ্যে তারা মনসার বারা পেয়েছেন। সেই বারা পুজো করে তারা বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছেন।

● **পাইক :** কেতকাদাসের কাব্যে 'হাসন-হুসেনের যুদ্ধযাত্রায় মাতার নিষেধ' অংশে আমরা পাইক প্রসঙ্গ পাই। তবে এখানে পাইকদের কোনো বিস্তারিত পরিচয় কবি দেননি। এরা সাধারণত রাজকর্মচারী। রাজার নির্দেশ মেনে চলাই এদের কাজ। কাব্যে আমরা দেখি মনসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার উদ্দেশ্যে হাসন-হুসেন তৈরি হচ্ছেন সেই সঙ্গে তৈরি হচ্ছে সেনা, পাইকগণ—

কাড়াদারে দিল কাড়া মিঞা পাইক পাল্য সাড়া
বারাল্য মাকুন্দি ফতেজঙ্গা।

রাজার নির্দেশে এরা নগরে ঘুরে বেড়াত এবং চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখত।

● **ভারী :** কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে 'কমলার সাথে দেবীর সয়লা স্থাপন' অংশে আমরা ভারীর প্রসঙ্গ পাই। এরা সাধারণত ভৃত্যের কাজ করতেন এবং জিনিসপত্রের ভার এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতেন। আলোচ্য অংশে আমরা দেখি মনসা ধন্বন্তরীর স্ত্রী কমলার বাড়িতে অনেক উপহার-ভেট সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হন। এইসব উপহার সামগ্রী মনসা এক ভারীর মাধ্যমে বহন করে আনেন—

কপট চাতুরী করি চলে জয় বিষহরি
ভারীর কান্ধেতে দিয়া ভার।

কদলী, খই, হরিদ্রা, দই, গুয়া, পান প্রভৃতি জিনিস দিয়ে পাত্র ভরতি করে তা ভারীর কাঁধে দিয়ে মনসা চললেন ধন্বন্তরীর বাড়ি তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি কেতকাদাসের মনসামঙ্গল সপ্তদশ শতাব্দীর সমাজচিত্র হিসেবে নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কাহিনির প্রয়োজনে তিনি যেমন কাব্যে বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন; একইভাবে তাদের বিচিত্র আচার-আচরণ, তাদের বিচিত্র জীবন-যাপন পদ্ধতিও কবির চোখে ধরা পড়েছে। উপরিউক্ত জীবিকাগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এভাবেই কৃষিজীবী থেকে রাজকর্মচারী, পণ্ডিতসমাজ থেকে শিল্পীকুল—বিভিন্ন জাতির মানুষ বিভিন্ন জীবিকার মধ্যে দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করতেন। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে তার বৈচিত্র্যময় বাস্তব উপস্থাপন বারবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবশেষে বলি, একজন সাহিত্যিক চান বা না চান যেহেতু তিনি সমাজের মানুষ, তাই তাঁর সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামাজিক চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটবেই এটা স্বাভাবিক। আর যে সাহিত্য আখ্যানধর্মী সেখানে সমাজ আসবে না তো আর কোথায় আসবে। মঙ্গলকাব্যেও ঠিক তাই ঘটেছে।

তথ্যের সন্ধানে

এই প্রবন্ধের সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত, 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল', প্রজ্ঞাবিকাশ, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৭, কলকাতা।

মঙ্গালকাব্যে সেকেলে শিক্ষাব্যবস্থার ছবি প্রসঙ্গা মনসামঙ্গাল

অরিতা ভৌমিক অধিকারী

ইতিহাস হল মানবসভ্যতার সেই শিকড়টুকু, যার মধ্যে অযুত সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। জাতির উত্থান-পতন থেকে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পালাবদলের সালতামামিটুকুই শুধু ইতিহাস নয়। বরং ঘটে যাওয়া ঘটনার যে অনুরণন বর্তমানেও কান পেতে স্পষ্ট শোনা যায়, উপলব্ধি করা যায় উত্থান কিংবা পতনের শুরুর দিককার সূচকগুলোকে তাই-ই ইতিহাস। Prof. G. R. Elton-এর মতে—"History is concerned with all those human sayings–thoughts, deeds and sufferings which occured in the past and have left present deposit."[১] অতীত আর বর্তমানের এই নিরন্তর কথোপকথনে সাহিত্যের ভূমিকা সেতুবন্ধনের কিংবা ধারকের। দেশ-কাল-সমাজের চিহ্ন শরীরে জড়িয়েই সাহিত্যের বেড়ে ওঠা। তাই ইতিহাসের রেখাপাত সেখানে অনিবার্য। ইতিহাস কখনও সাহিত্যের প্রেক্ষাপট, কখনও উপাদান, কখনও আস্ত একখানা চরিত্র। সময়সারণি আঁকার দায় হয়তো সাহিত্যিকের নেই। কিন্তু যুগলক্ষণকে ফুটিয়ে তোলার দায় অবশ্যই রয়েছে—

> মাটির বিশিষ্টতা ও উর্বরতা যেমন স্থান বিশেষে ভিন্ন ও উন্নততর ফসল ফলাতে সমর্থ হয়, তেমনি দেশ ও কাল পরিবেশের পার্থক্য আলাদা জাতের ও মানের সাহিত্যের জন্ম সম্ভব করে তোলে।[২]

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গালকাব্য ধারার উদ্ভবও একটা বিশেষ কালপর্যায়ে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে মঙ্গালকাব্য রচনার কালসীমা হিসেবে নির্দেশ করেছেন।[৩] ক্ষেত্র গুপ্ত আবার পঞ্চাদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই ধারাটি প্রচলনের পক্ষে সওয়াল করেছেন।[৪] মোটের উপর তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী বাংলাদেশকে মঙ্গালকাব্য রচনার প্রেক্ষাপট বলা যায়। সুদীর্ঘ চার-পাঁচশো বছরের যে মঙ্গালকাব্যীয় পরম্পরা, তার সঙ্গো বাংলার সমাজ-ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। শুধু প্রকরণগত ভাবেই মঙ্গালকাব্যগুলো মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে অনন্য লক্ষণবিশিষ্ট নয়, দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবেও আলাদা। ধর্মযাপনের আকুতি কিংবা বিলীনতা নয়, রক্তমাংসের মানবসমাজকে প্রতিফলনের এক অলিখিত শপথে মুখর মঙ্গালকাব্যের ছন্দবদ্ধ পঙ্ক্তিগুলি। এ এমন এক ন্যারেটিভ, যার

মধ্যে মধ্যযুগের কিংবা তারও আগের বঙ্গদেশকে খুঁজে পেতে কিংবা চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। এমনকি কোনো কোনো আখ্যায়িকার ভৌগোলিক পরিসর বঙ্গদেশের সীমারেখাকে ছাপিয়ে যায়। তাই মনসামঙ্গালে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী দক্ষিণে পাটন অভিমুখে যায়। ধনপতি সদাগরের সিংহলযাত্রার বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয় চণ্ডীমঙ্গালের পুথিতে। কালকেতু গুজরাটে নগর পত্তন করে। আবার ধর্মমঙ্গালের বীররসাত্মক আখ্যায়িকায় রাঢ় বাংলার ইতিহাসের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। লৌকিক দেবতার আর্যায়ানের প্রসঙ্গ যতখানি গুরুত্বপূর্ণ মঙ্গালকাব্যের আলোচনায়, ঠিক ততটাই গুরুত্ব সহকারে বিবেচ্য দেবতার মানবায়নের দিকটিও। শিব-পার্বতীর কোন্দল তাই হয়ে ওঠে একান্তই ঘরের কথা। নির্গুণ ঈশ্বরও হয়ে ওঠেন দোষে-গুণে ভরা মানুষেরই প্রতিকল্প। বাংলা আর বাঙালির কৃষ্টিগত যাবতীয় অভিজ্ঞান ধারণ করে তাই মঙ্গলকাব্য হয়ে ওঠে দেশ-কাল-সমাজ ইতিহাসের এক সাহিত্যিক নির্মাণ। চার-পাঁচশো বছরের একটা সুদীর্ঘ ব্যাপ্তি জুড়ে এই ধারার কাব্যচর্চা। তাই এই দীর্ঘ কাল পরিসরে ইতিহাসের গতিপথ যেমন যেমন বদলেছে, মঙ্গালকাব্যের ঘরানাতেও তার স্বরটুকু ধরা পড়েছে। মঙ্গালকাব্যের এই বহুস্তরীয় ইতিহাস-প্রবণতায় খুব স্বাভাবিকভাবেই জায়গা করে নেয় শিক্ষাপ্রসঙ্গ। সমাজবাস্তবতার নিরিখে মঙ্গালকাব্যের কোনো কোনো ধারাকে সমালোচকরা ইতিহাসের লক্ষণাক্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এই সমাজবাস্তবতার দাবিকে মান্যতা দিয়েই মঙ্গালকাব্যে বিদ্যা-সংস্কারের প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত হয়েছে। গর্ভসঞ্চার থেকে জন্মগ্রহণ পেরিয়ে একটা চরিত্রের বেড়ে ওঠার বাস্তবানুগ ছবি আঁকতে গিয়ে কাব্যকাররা সেকালের শিক্ষাব্যবস্থার একটা মোটামুটি অবয়ব ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলার শিক্ষা-ইতিহাসের একটা বিশেষ কালপর্বকে বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে মঙ্গালকাব্যগুলোকে তাই অন্যতম আকর বলা যেতে পারে। পরমেশ আচার্য 'বাংলা পাঠশালার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল, ধর্মমঙ্গাল, শীতলামঙ্গাল কাব্যের একাধিক কবির পুথি থেকে উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছেন। আবার বিনয়ভূষণ রায়ের মতে—

> দ্বিজমাধবের 'চণ্ডীমঙ্গাল' ও 'অভয়ামঙ্গাল' থেকে চট্টগ্রামের, মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গাল' থেকে মেদিনীপুরের, ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্ম্মমঙ্গাল' থেকে বর্ধমানের, মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গাল থেকে হুগলির প্রাথমিক বা শিশুশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়।[৫]

মঙ্গালকাব্যের অন্যতম প্রধান ধারা মনসামঙ্গাল। সাহিত্য-ইতিহাস প্রণেতাদের মতে, মঙ্গালকাব্যের আদিধারাও এটি। তাই গবেষণা-নিবন্ধটিতে মনসামঙ্গাল কাব্য বিশ্লেষণের নিরিখেই বাংলার শিক্ষা-ইতিহাসের একটা বিশেষ কালপর্বের ছবি ফুটিয়ে তোলার চেস্টা করা হয়েছে। একাধিক পালাকারের প্রাসঙ্গিক পদ বিশ্লেষণ, নিহিতার্থ নির্ণয় ও তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে নিবন্ধটিতে মধ্যযুগীয় বাংলার শিক্ষা-ইতিহাস নির্মাণে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যসম্ভারের গুরুত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে। উপনিবেশ-পূর্ববর্তী বাংলার শিক্ষা মানচিত্রকে বুঝতে হলে যে সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম—তা তুলে ধরার চেস্টা করা হয়েছে মঙ্গালকাব্যের একটিমাত্র সুনির্দিষ্ট ধারার সাপেক্ষে। পরবর্তী পর্যায়ে মঙ্গালকাব্যের অন্যান্য ধারার নিরিখে আলোচনাকে সুসংবদ্ধ রূপ দেওয়ার সম্ভাবনাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটা অন্যতম লক্ষণ এই সাহিত্যের উদ্ভব মূলত মৌখিক, গেয় সাহিত্য হিসেবে।

মঙ্গলকাব্যধারা সম্পরকেও একথা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। জনপদে, হাটে-বাজারে, গেরস্ত বাড়িতে মঙ্গলগীত গেয়েই পরিবেশন করা হত। আধ্যাত্মিকতার গণজ্ঞাপনের মাধ্যমে তুর্কি আক্রমণে বিধ্বস্ত বাঙালি জাতির মানসিক উদ্‌বেগ প্রশমনের এ এক অন্যোন্য কার্যকরী উপায়। সতেরো শতকের আগে লিপি করা বাংলা পুথি পাওয়া গেছে মাত্র কয়েকটি। সতেরো শতক বা তার পরবর্তী পর্যায়ে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের লিপি করা পুথির প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারার পুথিগুলির লিপিকালও সতেরো শতক ও তৎপরবর্তী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পাঠশালা শিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে এই লিপি করা পুথির বাড়বাড়ন্তের একটা যোগসূত্র আছে বলে সহজেই অনুমান করা যায়। পরমেশ আচার্যের মতে, "পাঠশালা শিক্ষার প্রসারের ফলে লিখতে জানা লোকের সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়ছিল। বাংলা কাব্যগুলি লিপি করার প্রথাও সেই সঙ্গে চালু হয়েছিল বলেই অনুমান করি।"[৬] সব মঙ্গলকাব্যে পাঠশালা শিক্ষার প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই। কিন্তু বিদ্যারম্ভ সংস্কারের উল্লেখ প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেই আছে। বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁর 'মনসাবিজয়' কাব্যে লিখছেন—

> লখাইয়ের অনুমতি পায়্যা রাজরানি/সোমাই পণ্ডিত দ্বিজে ডাক দিয়া আনি/সনকা বলেন দ্বিজ না করিহ হেলা/যত্নে পড়াইহ মোর লখিন্দর বালা।/শুনিয়া হরিষ দ্বিজ রানির বচনে/লখাইর হাতেখড়ি দিল শুভক্ষণে।[৭]

শিক্ষার্থীর অনুমতি বা ইচ্ছে সাপেক্ষে বিদ্যার্জনের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। বিদ্যারম্ভ সংস্কার হিসেবে 'হাতেখড়ি' কিন্তু একেবারে বাংলার নিজস্ব কৃষ্টিগত উপাদান। স্মার্ত শিক্ষাধারার পড়াশোনার আবর্ত থেকে বেরিয়ে বাংলার নিজস্ব শিক্ষাধারায় লেখাপড়ার পরম্পরাটুকুই যেন 'হাতেখড়ি' সংস্কারের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। 'হাতেখড়ি' শব্দবন্ধটিও এক্ষেত্রে লক্ষণীয় একেবারেই মৌখিক আটপৌরে বাংলা। ব্রাহ্মণ্যবাদ কবলিত সংস্কৃত নির্ভর বিদ্যাচর্চার খানিক বিপ্রতীপে যেন এর অবস্থান। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাবিজয়'-এর রচনাকাল পনেরো শতক। কিন্তু আদর্শ পুথির লিপিকাল আঠারো শতকের আশেপাশে। তাঁর কবিতায় বাংলা পাঠশালার আদল আর বাংলা পড়াশোনার চলটুকু কিন্তু চোখ এড়ায় না—

> ক খ গ ঘ ঙ পড়ে হরিষ অন্তরে/চৌত্রিশ অক্ষর পড়ে বালা লখিন্দরে।/অষ্টাদশ ফলা পড়ে হরষিত-মন/চৌত্রিশ অক্ষরে ফলা করিল গঠন।/অষ্টধাতু অষ্ট শব্দ পড়িল সত্বরে/সোমাই পণ্ডিত দ্বিজ শুভদিন করে।[৮]

অক্ষর, ফলা, বানান এসবই পাঠশালা শিক্ষার বিষয়। শিক্ষার একেবারে প্রারম্ভিক পর্যায়ে ধাপে ধাপে ভাষাশিক্ষার বিষয়টিই এখানে মান্যতা পেয়েছে, অক্ষর পরিচয় দিয়ে যার সূচনা। আরও একটি তথ্য এক্ষেত্রে সংযোজনযোগ্য, বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সূত্রও কিন্তু বিপ্রদাসের বর্ণনায় খুঁজে পাওয়া যায়—"শাস্ত্রশাল লইলেক বালা লখিন্দর/প্রথমে পড়ায় সূত্র সুখে দ্বিজবর।"[৯] অক্ষর পরিচয়, শব্দগঠন সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠলে তবেই শাস্ত্রশালের দরজা উন্মুক্ত হচ্ছে লখিন্দরের জন্য। সোমাই পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে সহজ থেকে অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয়ের অভিমুখে পরিচালিত হচ্ছে লখিন্দরের বিদ্যাচর্চা। পাঠ্য তালিকায় একে একে জুড়ে যাচ্ছে সাহিত্য, অলংকার, কাব্য, নাটক, জ্যোতিষ, এমনকি অষ্টাদশ পুরাণও—

তারপর ব্যাকরণ পড়ে রাজসুতে/ভট্টি রঘু সাহিত্য পড়িল হরষিতে।/অলংকার কুমার পড়িল অভিধান/জ্যোতিষ নাটক কাব্য পড়িল বিধান।/অষ্টাদশ পুরাণ পড়িয়া অনিবার/হইল পন্ডিত বড়ো রাজার কুমার।[১০]

দেখা যাচ্ছে, বিদ্যাশিক্ষা যত অগ্রসর হচ্ছে ততই তা সংস্কৃত ধারার অনুসারী হয়ে পড়ছে।

পনেরো শতকের আর-একজন কবি বিজয়গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ'-এ লখিন্দরের জন্মবর্ণনার একেবারে শেষ পর্বে এসে শিক্ষাদীক্ষার কথা বলা হয়েছে—"দিনে দিনে বাড়ে কুমার দেবতার বর।/এক দুই তিন হইল চতুর্থ বৎসর।।/চান্দর ব্যথিত বড় সোমাই ব্রাহ্মণ।/শাস্ত্র পড়ান তারে হইয়া একমন।।"[১১]

চার বছরে শিক্ষা শুরু হচ্ছে লখিন্দরের। এক্ষেত্রে প্রথমেই শাস্ত্রপাঠের উল্লেখ করা হয়েছে। সেদিক থেকে দেখলে বিপ্রদাসের বর্ণনা কিন্তু অনেক বেশি বাস্তবানুগ। শিক্ষার স্তরভেদের সঙ্গে বিষয়ভেদের ক্রমটি সেখানে স্পষ্ট। প্রাক্প্রাথমিক পড়াশোনার আদল বিপ্রদাসের কাব্যে যেভাবে ফুটে উঠেছে, বিজয়গুপ্তের কাব্যে তা অনুপস্থিত। বিজয়গুপ্তের কাব্যে লখিন্দরের বিদ্যাশিক্ষার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা না থাকলেও 'কর্ণভেদ' অনুষ্ঠানটির উল্লেখ করা হয়েছে—

দিনে দিনে বাড়ে লখাই মনসার বর।
সাত বৎসরের হইল কুমার লক্ষ্মীন্দর।।
শুভদিন পাইয়া করাইল কর্ণভেদ।
রাজনীতি শিখাইল জানাইল বেদ।।[১২]

সনাতনী হিন্দুধর্মে ষোড়শ সংস্কারের মধ্যে একটা কর্ণভেদ। প্রকৃতিগতভাবে এটি বিদ্যারম্ভ সংস্কারেরই পর্যায়ভুক্ত। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় বেদপাঠে অধিকার অর্জনের জন্য কর্ণভেদ ছিল আবশ্যিক একটি প্রথা। উপনয়ন সংস্কারের অঙ্গ হিসেবেই কর্ণভেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে অব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে যেহেতু উপনয়ন সংস্কার পালনের বিধি নেই, তাই কর্ণভেদে সংস্কার পালনের মাধ্যমে বেদপাঠে অধিকার অর্জনের বিষয়টি প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি স্বীকৃত রীতি। সেই পরম্পরারই অনুবর্তন লক্ষ করা যায় বিজয়গুপ্তের বর্ণনায়। সেকালে বেনের ছেলের যে বেদপাঠে অধিকার ছিল—এই তথ্যটুকু প্রতিষ্ঠিত হয় গুপ্ত কবির ব্যাখ্যানে। আবার বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যে লখিন্দরের পড়াশোনার যে ছবি ফুটে ওঠে, সেখানে কিন্তু ন্যারেটিভটা ভিন্ন। লখিন্দরের বিবিধ বিষয় শিক্ষার প্রসঙ্গ সেখানে থাকলেও বেদ পাঠের কোনো উল্লেখ কিন্তু পাওয়া যায় না। পরমেশ আচার্যের ভাষায়, "দেখা যাচ্ছে বেনের ছেলের সংস্কৃত শিক্ষায় বাধা ছিল না। তবে বেদ, বেদান্ত বা স্মৃতির উল্লেখ না থাকায় বোঝা যায় ওই সব শাস্ত্র পড়ার কোনো অধিকার বেনের ছেলের ছিল না।"[১৩] মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে একমাত্র বিজয়গুপ্তর রচনাতেই বেদ পাঠের উল্লেখ আছে। তবে হাতেখড়ির পাশাপাশি কর্ণভেদ সংস্কারের উল্লেখ আরও একাধিক পালায় লক্ষ করা যায়। আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও সংকলিত 'বাইশ কবির মনসামঙ্গাল'-এ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের নামাঙ্কিত 'মিলন' পালায় রয়েছে—

চন্দ্রের দোসর বাড়ে লখিন্দর
দিনে দিনে আন জ্যোতি।

খড়ি হাতে দিতে　　পরম পীরিতে
　　পূজা কৈল সরস্বতী।।
পুত্র লখিন্দর　　বাড়ে নিরন্তর
　　সাধুর সন্তোষ মনে।
কতদিন গেলে　　মহা কুতূহলে
　　কর্ণ বিন্ধে শুভক্ষণে।।[১৪]

হাতেখড়ি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে যে বিদ্যারম্ভ হচ্ছে সেই বিষয়টুকু স্পষ্ট। কারণ বৈদিক মতে যাই হোক না কেন, বাঙালির কৃষ্টিগত ঐতিহ্যে সরস্বতী বিদ্যার দেবী। তাই বিদ্যাচর্চার বিস্তারিত বিবরণ না থাকলেও অনুষঙ্গটুকু সহজেই অনুমান করা যায়। 'কর্ণভেদ' সংস্কারের পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষালাভের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কেতকাদাসের কাব্যে অনুপস্থিত। 'কুতূহলে' দিন অতিবাহিত করার ধরতাইটুকু দিয়েই পড়াশোনা শেখার বিষয়টা কষ্টসাধ্য অনুমানমাত্র। বরং কেতকাদাস যে লখিন্দরের ছবি এরপর আঁকেন সে আর পাঁচটা গেরস্তবাড়ির ধুলোমাখা শিশুরই প্রতিনিধি—

করে নানা খেলা　　গায়ে মাখে ধূলা
　　হাতে হেম তাড়-বালা।
কার চুলে ধরি　　করে মারামারি
　　ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলা।।
যার পুত্র মারে　　কহে সনকারে,
　　'তোমার লখাই নহে ভাল।
না জানি কি বাদে　　কোন্ অপরাধে
　　মোর পুত্রে মার্য়া গেল।।'
সনকা সুন্দরী　　তারে মানা করি,
　　'শুন পুত্র, লখিন্দর।
পরের ছাওয়ালে　　মার নিজ বলে
　　মনেতে না বাস ডর।।'
মায়ের বচনে　　হাসে মনে মনে
　　ত্রাসে না আইসে কাছে।
ক্ষেমানন্দের বাণী　　'রক্ষ ঠাকুরাণী,
　　যতেক কায়স্থ আছে।।[১৫]

না, এই বর্ণনায় বিদ্যাচর্চার কোনো বিবরণ নেই। কিন্তু শিশু মনস্তত্ত্বের সার্থক প্রতিফলন রয়েছে। বিদ্বান আর সুশীল হওয়ার সামাজিক দায়টুকু কেতকাদাস চাপিয়ে দেননি লখাইয়ের ওপর। তাই তার স্বাভাবিক বেড়ে ওঠায় শৈশব-বয়ঃসন্ধির বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে পড়ে সহজেই।

উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে আবার পুথি ভেদে শিক্ষা প্রসঙ্গের বর্ণনায় পাঠান্তর লক্ষ করা যায়। সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ দাস সম্পাদিত 'কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল' গ্রন্থে লখিন্দরের পড়াশোনা শুরুর বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে—"বানিয়ার নন্দন বাঢ়ে বানিয়ার ঘরে।/পঞ্চ বৎসরে বালা কর্ণবেধ করে।।/পঢ়িবারে দিল বালা গুরু বিদ্যমানে।"[১৬] সতেরো শতকের কবি জগজ্জীবনের এই বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় বাংলার সব অঞ্চলেই

তখন লেখাপড়ার প্রচলন ছিল। তাঁর পালায় অবশ্য হাতেখড়ির উল্লেখ নেই। পাঁচ বছর বয়সে লখিন্দরের কর্ণভেদের কথাই বলা হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায় অঞ্চলবিশেষে বিদ্যারম্ভের সাধারণ সংস্কার হিসেবে কর্ণভেদেরও প্রচলন ছিল। আবার পরমেশ আচার্যের মতে, "পঢ়িবারে দিল বালা গুরু বিদ্যমানে"—এই কথার মাধ্যমে পাঠশালা শিক্ষার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এবং পাঠশালার শিক্ষকদের যে গুরুমশাই বলা হত—এই বিষয়টিও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।[১৭] সাম্প্রতিককালে গবেষক নবনীতা মুখার্জীর সম্পাদনায় জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গাল'-এর যে সংস্করণ চোখে পড়ে সেখানে আবার লখিন্দরের লেখাপড়া শেখার বর্ণনা খানিকটা এইরকম—

> ব্যানার নন্দন বাড়ে বানি আর ঘরে।/পাঁচ বৎসর হৈলো দুর্লভ লখিন্দরে।।/সোনার গুলাল বাটুল হস্তের উপোরে।/একেলা খেলিয়া বেড়ায় সুন্দর লখিন্দরে।।/ সপ্ত বৎসরের বালা হস্তে খোড়ী দিল।/দ্বাদশ বৎসর তবে লখহি হইলো।।/নানা শাস্ত্র পড়ে বালা গুরু বরাবরে।/ব্যাকরণ আদী পড়য়ে একোস্বরে।।[১৮]

সাত বছরে লখিন্দরের হাতেখড়ি হচ্ছে। পড়াশোনা শুরুও হচ্ছে সেইসময়ে। অর্থাৎ প্রাথমিকের ধাপ থেকেই এখানে পড়াশোনা শুরুর বিবরণ পাওয়া যায়। তার আগের ছবি কিন্তু লখাইয়ের খেলাধুলো করে বেড়ানোর। বারো বছর বয়সে পৌঁছে তবে গুরু সমীপে শাস্ত্র-ব্যাকরণ পাঠের প্রসঙ্গ এসেছে। অর্থাৎ শিক্ষায় স্তরভেদের বিষয়টি জগজ্জীবনের বর্ণনায় স্পষ্ট। অন্যান্য পালার তুলনায় এখানে কিন্তু লখাইয়ের পড়াশোনা শুরু হচ্ছে খানিকটা দেরিতেই। অধিকাংশ পালাকারের বর্ণনাতেই বিদ্যারম্ভ সংস্কারের বয়ঃক্রম চার-পাঁচ বছর বলেই উল্লেখিত হয়েছে। পাঠশালার প্রত্যক্ষ উল্লেখ না থাকলেও এমন কিছু অনুষঙ্গ রয়েছে, যাতে পাঠশালা শিক্ষার আভাস পাওয়া যায়। যেমন, এক জায়গায় বলা হচ্ছে "গুরুগৃহে পড়ে বালা সিসু সঙ্গে করি।"[১৯] আবার সুন্দরী কন্যার উপহাসে লখিন্দরের চুপচাপ ঘরে ফিরে এসে দরজায় খিল তোলা এবং সনকার তাকে গুরুগৃহে খুঁজতে যাওয়ার প্রসঙ্গাটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়—

> এতেক বচনে বালা লাজ্বিতা হৈলো মন।/আপন মন্দিরে বালা করিল গমন।।/কপাট দিয়া শুইলো শয়ন মন্দির ঘরে।/পরিল সোনার মনে এ দুই প্রহোরে।।/তেমকি চলিয়া গেল গুরু বরাবর।/কোথা গেল মোর দুর্লভ লখিন্দর।।[২০]

এই বর্ণনা অনুসরণ করে লখিন্দরের বাড়ি আর পাঠশালার মধ্যে বিশেষ দূরত্ব ছিল না, তা অনুমান করা যায়। অর্থাৎ, জনপদকে কেন্দ্র করে পাঠশালা শিক্ষার বিস্তারের ইতিহাসটুকু এখানে উঁকি দিয়ে যায়। পাঠভেদে মনসামঙ্গাল কাব্যের এরকম বর্ণনান্তর হয়তো অন্য কবিদের কাব্যেও লক্ষ করা যাবে। তবে গবেষণামূলক নিবন্ধের সীমিত পরিসরে সমস্ত পাঠান্তরগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। নবনীতা মুখার্জীকৃত জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গাল'টি আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। 'মনসামঙ্গাল' কাব্যে শিক্ষাপ্রসঙ্গা বিশ্লেষণে মূলত লখিন্দরের লেখাপড়ার বিষয়টিই উঠে এসেছে। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে 'চাঁদের জন্ম' পালায় চাঁদ সদাগরের শাস্ত্র শিক্ষার উল্লেখ রয়েছে—"বেদ-অনুসারে সব করি সংস্কার।/গুরুতে সঁপিল পরে শাস্ত্র পড়িবার।।/পড়িয়া পন্ডিত হৈল করি শাস্ত্র শিক্ষা।/গুরুয়ে

ভৈরবী মন্ত্রে করাইল দীক্ষা।।"[২১] আবার 'ছয় পুত্রলাভ' অংশে চাঁদ-সনকার ছয় পুত্রের বেড়ে ওঠার প্রসঙ্গ বলা হয়েছে—"দেবতা-গন্ধর্ব হেন বাড়ে ছয়জন।/দেখি সনকার বড় আনন্দিত মন।।/হস্তি আরোহণে কিবা ঘোড়ার পৃষ্ঠেত।/মল্লবিদ্যা-ধনুর্বিদ্যাসবে সুশিক্ষিত।।"[২২]

শাস্ত্র-শিক্ষার প্রচলিত ছকের বদলে এখানে বংশীদাস মূলত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লেখাপড়াই হোক বা যুদ্ধবিদ্যা, শিক্ষণ-শিক্ষণের পরম্পরায় যে ছেলেদেরই একচেটিয়া অধিকার পূর্বাপর বিশ্লেষণে এ কথা স্পষ্ট। এখানেই খানিকটা ব্যতিক্রমী কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ আর জগজ্জীবন ঘোষালের বর্ণনা। 'বেহুলার জন্মগ্রহণ' অংশের এক জায়গায় কেতকাদাস বলেছেন, "শিশুকাল হইতে কন্যা শিখে নৃত্যগীত।"[২৩] অর্থাৎ প্রথাগত শিক্ষার আঙিনায় মেয়েদের সেভাবে চোখে না পড়লেও নাচগান শেখায় কোনো বাধা ছিল না। আবার জগজ্জীবন ঘোষাল আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে পাঠশালা শিক্ষায় মেয়েদের সপ্রতিভ উপস্থিতির ছবি এঁকেছেন—

> গুরুগৃহে পরে বালা সিসু সঙ্গে কোরি।/ব্রাহ্মণ কন্যা হৈল পদ্দা পরম সুন্দরী।।/সুন্দর বালার পানে চাহে ঘনে ঘনে।/হাস্বো পারিহাস্বো করে বান্যা নন্দনে।।/ক্রোধি করি কন্যা বলে শুনহো লখাই।/আমাকে দেখিয়া হাসো না হবে ভালাই।।/আমার সঙ্গোতে হাস্বো করো কী কারণে।/বাছীয়া সুন্দরী বিভা করহ যতনে।।[২৩]

পর্দানসিন হলেও জনৈক ব্রাহ্মণ কন্যা যে অবলা নয় তা বেশ বোঝা যায়। পাঠশালায় সহশিক্ষার ব্যবস্থা আর পড়াশোনায় মেয়েদের অধিকারের সপক্ষেই সাক্ষ্য দেয় এই পঙ্‌ক্তি। বাংলার দেশজ শিক্ষা ধারায় যে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার সংস্থান ছিল এই তত্ত্বই জোরদার হয়ে ওঠে। তবে 'ব্রাহ্মণ কন্যা'-র উল্লেখে লিঙ্গের পাশাপাশি বর্ণের মাত্রাটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্ণভেদে মেয়েদের বিদ্যাচর্চার অধিকারে ফারাক হত বলে অনুমান করা যায়।

সামগ্রিকভাবে 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কিছু নির্বাচিত পাঠ-বিশ্লেষণে বাংলার দেশজ শিক্ষাধারার ক্রমবিস্তারের আংশিক ছবি ফুটে ওঠে। যত বেশি পুরোনো পালা, সেখানে বর্ণিত শিক্ষাচিত্রে সংস্কৃত ধারার অনুসরণ ও অনুবর্তন তত বেশি। পরমেশ আচার্যের মতে, "মনে হয় মঙ্গলকাব্যের রচয়িতারা শ্রোতাদের সমীহ আদায়ের জন্যই তাদের নায়কদের সংস্কৃত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছেন।"[২৪] এই সার্বিক বিশ্লেষণ 'মনসামঙ্গল' কাব্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতার সঙ্গে পাণ্ডিত্যকে গুলিয়ে ফেলার একেলে দর্শনেরই যেন এ এক মধ্যযুগীয় ডিসকোর্স। তবু প্রাক্-উপনিবেশ বাংলায় যে একটা নিজস্ব শিক্ষাধারা ছিল 'মনসামঙ্গল' কাব্যে শিক্ষা প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ সেই সত্যিটুকু উন্মোচনের এক একনিষ্ঠ প্রয়াস। আত্মবিস্মরণের এক ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এমন এক ধারাকে হাতড়ানো, যার মধ্যে বাঙালির জাতীয় জীবনের উপাদান সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত বলে সমালোচকদের অভিমত। উপনিবেশের ঠুলিটুকু নামিয়ে রেখে বাংলার সমান্তরাল শিক্ষা ইতিহাস নির্মাণের একেবারে প্রারম্ভিক পদক্ষেপে এই গবেষণা-নিবন্ধ।

উৎসের সন্ধানে

১. G. R. Elton : 'The Practise of History' Fontana Press, London, 13th Ed. 1989, P. 24
২. সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার সম্পাদিত : 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন', রত্নাবলী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৯, পৃ. ১৩৩
৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ৮-৯
৪. ক্ষেত্র গুপ্ত : 'বাঙলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস', গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, ২০০৭, পৃ. ৬৭
৫. বিনয়ভূষণ রায় : 'শিক্ষাসার' থেকে 'বর্ণপরিচয়: সমাজের সঙ্গে প্রাথমিক পাঠের বিবর্তন: বিদ্যাসাগরের ভূমিকা, চিকিতুষী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২৫৪
৬. পরমেশ আচার্য, বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৯, পৃ. ৭৭
৭. তদেব : পৃ. ৮৯
৮. তদেব : পৃ. ৯০
৯. তদেব : পৃ. ৯০
১০. তদেব : পৃ. ৯০
১১. বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য সংকলিত : 'বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল', সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫১
১২. তদেব, পৃ. ১৫১
১৩. উৎস-৬, পৃ. ৯০
১৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও সংকলিত : 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬২, পৃ. ১৭৬
১৫. তদেব, পৃ. ১৭৬
১৬. উৎস-৬, পৃ. ৯১
১৭. তদেব : পৃ. ৯১
১৮. নবনীতা মুখার্জি সম্পাদিত : 'কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল পুথি' পাঠ বিচার ও কাব্য বিশ্লেষণ, গবেষণাপত্র, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬, আন্তরর্জালিক সংযোগ: http://ir.nbu.ac.in/handle/১২৩৪৫৬৭৮৯/১৬৯৯, সংগৃহীত, ২৭ মার্চ, ২০২১, পৃ. ২৯৬
১৯. তদেব : পৃ. ২৯৬
২০. তদেব : পৃ. ২৯৭
২১. উৎস-১৪, পৃ. ৫৯
২২. তদেব : পৃ. ৬৪
২৩. তদেব : পৃ. ১৭৩
২৪. উৎস-১৮, পৃ. ২৯৬
২৫. উৎস-৬, পৃ. ৯৪

দ্বিজ বংশীদাসের চাঁদ : স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানে

আস্তাইন বিল্লা

চৈতন্য পরবর্তী মনসামঙ্গল ধারার অন্যতম প্রতিভাবান কবি দ্বিজবংশীদাস। প্রতিভার বিচ্ছুরণ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কাব্যের চরিত্র ভাবনায়, অপূর্ব কাহিনি নির্মাণে, রচনাশৈলী নৈপুণ্যে। কবির চাঁদ চরিত্রের বিশিষ্টতা দৃশ্য স্থাপন করেছেন গতানুগতিক প্রথা অর্থাৎ পূর্ব কবিগণের অনুসরণ ও নিজস্ব জীবন দৃষ্টিভঙ্গির অপূর্ব মিশ্রণে। সমকালীন যুগে কবিদের চিন্তাভাবনা এখনকার মতো দ্রুত পরিবর্তন হত না এবং দ্রুত ছড়িয়েও পড়ত না বিভিন্ন কারণে। তাই কাহিনি ও চরিত্রের মূল উপাদান প্রায় একই থাকাটা স্বাভাবিক ছিল। নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন করাও সম্ভব ছিল না। তবুও সীমাবদ্ধতার মাঝেও কবিগণ নিজ নিজ প্রতিভা ও কবিত্ব গুণে স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখেছেন। সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয় দ্বিজবংশীদাস। তাঁর কাব্যে চরিত্র নির্মাণে যে স্বতন্ত্রতার ছাপ তা স্বীকার করেছেন বিভিন্ন সমালোচক। তবে এ বিষয়ে প্রখ্যাত সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> চাঁদ সদাগর এই চরিত্র পরিকল্পনা মঙ্গলকাব্যের মূল আদর্শের বিরোধী।...চরিত্র সৃষ্টিতে বংশীদাস এই গতানুগতিক কাহিনিভাগের মধ্যেও কোন কোন স্থলে অভিনবত্ব দেখাইছেন। সমগ্র মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে তাহার চাঁদ সদাগরের চরিত্র সৃষ্টি অভিনব। চাঁদ চরিত্রের কঠোরতা তিনি বিন্দুমাত্র হ্রাস হতে দেই নাই।[১]

শুধু মনসামঙ্গল তা কিন্তু নয়, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে এরকম দৃঢ়, পৌরুষ্যে উজ্জ্বল, কঠিন অথচ নরম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্র লাভের কারণে দেবভক্ত সমাজে রক্তে-দেহগড়া মানুষ হয়ে একক প্রচেষ্টায় অতিলৌকিক শক্তির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাওয়া; বারবার পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও এবং শেষে দেবত্বে স্বীকার স্নেহে। মধ্যযুগের মানুষ সর্বদা দেবতার কৃপায় নিয়ন্ত্রিত হলেও শুধুমাত্র যুক্তিবাদী মনন, কঠোর একাগ্রতার সঙ্গে নিজ আদর্শের প্রতি অটল বিশ্বাসের কারণে চাঁদ নিজ গুণে আজও আমাদের হৃদয়ে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য ও আদরণীয়।

অধিকাংশ মনসামঙ্গল কাব্য অধিকার্থে দেবী মনসার পূজা আর অন্যদিকে চাঁদ অন্য সকল দেবতার প্রতি অগাধ ভক্তিতে বিগলিত হলেও মনসার প্রতি ছিল অচ্ছুৎ মনোভাব ও অপরিসীম ঘৃণা, রাগ, বিদ্বেষ, হিংসা। বংশীদাসের কাব্যে বিপরীত কাহিনি লক্ষ করি। তার কাছে দেবী মনসা পূর্ব থেকেই পরিচিত ও পূজিত—"করজোড়ে ভক্তিভাবে করিলেক স্তুতি। ব্রহ্ম স্বরূপিনী

তুমি আদ্যা প্রকৃতি।/যেই দূর্গা সেই তুমি জগতের মাতা। অভেদ চন্ডিকা তুমি নাহিক অন্যথা।”[২]

তিনি বণিককুলের রাজা। পিতা কোটীশ্বরের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। আভিজাত্য আর প্রাচুর্যের মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠা। আর্থ-সামাজিক বলিষ্ঠে বলীয়ান। পূর্ব-জন্ম থেকেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সর্পকুল ধ্বংসের ব্যাপারে। কারণ, তপস্যারত অবস্থায় দুটো পক্ষীশাবককে উদ্ধার করে বন্যার জল থেকে ভেসে যাওয়া থেকে। নিজ সন্তানের ন্যায় লালন-পালন করে স্বাবলম্বী করে খুবই যত্নের সঙ্গে। হঠাৎ তার অনুপস্থিতিতে তাদের ভক্ষণ করে এক সাপ। শোকাহত, বেদনার্ত তপস্বী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সর্পের চিরশত্রুতে পরিণত হয়। আর সবই যেন অদৃস্ট লিখিত নিয়মানুসারে হয়েছে। এ ঘটনা বংশীদাস কাব্যে বর্ণিত হলেও আসলে কবি অতিভক্তিতে চৈতন্যদেবের আশ্রয়ে প্রভাবিত হয়ে অর্থাৎ অভেদ-ভেদ-অভেদ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন মনে হয়। কোনো দেবতার মধ্যে মূল আদর্শগত বিরোধ নেই। তাই কাহিনির প্রারম্ভে চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্বের লেশমাত্র নেই। মনসার সঙ্গে চাঁদের বিরোধীতা থেকেই ভক্তের সঙ্গে আরাধ্য দেবীর বিরোধে পরিণত হয়েছে মনসা ও চণ্ডীর ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের ফলেই। শিব প্রধান আরাধ্য দেবতা নয়, বরং চণ্ডী প্রধান পূজনীয় দেবী। শিব ও শাক্ত দুই প্রেরণাই সঞ্চারিত।

চণ্ডী ও মনসার ইগো পর্যবসিত মনসার সঙ্গে চাঁদের। যেন নিয়তিতাড়িত ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়েই নানা লাঞ্ছনা দুর্গতির স্বীকার। কেননা, তার আরাধনায় মনসা তো চিন্তার বাইরে ছিল না। কিন্তু চণ্ডী শুধু প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে স্বপ্নাদেশে মনসা পূজা করতে নিষেধ করে। আর তখনই শুরু চাঁদের বিপর্যয়। এমন তো হওয়ার কথা নয়। অর্থবান বা পুঁজিবাদী শ্রেণির প্রতিনিধি চাঁদের লক্ষ্মীশ্রী স্ত্রী সনকা, ছয় পুত্রসহ পুত্রবধূ, সাজানো-গোছানো রাজ-সাম্রাজ্যে মনসা পূজো আদায়ের জন্য হিংস্র মনোভাব, ক্রূরতা, বিদ্বেষ, অহংকারই ধ্বংস বা কালরূপে তার জীবনকে তছনছ করে দেয়। এই বিপর্যয় চণ্ডীর প্রতি অতিভক্তি থেকেই। মতাদর্শ রক্ষার প্রয়াসও বটে। প্রতিনিয়ত দুর্বার ঘন ঘন খাড়া নেমে আসে স্বাভাবিক নিয়মেই। এই পরিণতির জন্য দায়ী কি শুধু চাঁদ, না, মনসার অমানবিক নির্যাতন ও কূটকৌশলও দায়ী।

তবে চাঁদের ট্র্যাজেডির মূলে ধর্মভ্রান্তি, অপরিসীম দম্ভ, চরিত্রভ্রষ্টতা, অবিমৃষ্যকারীর মতো সিন্ধান্ত গ্রহণ, কালাপাহাড়ি মানসিকতা। বঞ্চিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত মনসা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেই হয়ে ওঠে হিংস্র ও জেদি। নিজ স্বার্থ কায়েম করার জন্য যে-কোনো অবিবেচক, বিবেকহীন, নৈতিকতাহীন সিন্ধান্ত গ্রহণে পিছুপা নন। ঠিক তেমনি চাঁদের শখের গুয়াবাড়ি ধ্বংস, ছয়পুত্র বধ, বিশাল সাম্রাজ্যের লোকবল ক্ষয় এবং লখিন্দরের বাসরঘরে মৃত্যুসহ নানা দুর্গতির চরমতার শিকার হয়েও অঞ্জলি দানে শুধু ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান নয়; নানা কু-কথায় অপমান। প্রতিমুহূর্তে ক্লাইম্যাক্স বা সংকট লেগেই আছে। তবে এহেন কাহিনির প্রতি তীব্র আকর্ষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাঁদের মতো ব্যতিক্রমী চরিত্রের মাধুর্যের জন্যই তা অকপটে স্বীকার করতেই হয়। কেননা মনসা যতই হিংসাত্মক ধ্বংসাত্মক কর্ম বেছে নিয়েছে ততই সে দুর্বার গতিতে নিজ মতাদর্শ বা বিশ্বাস থেকে এক মুহূর্তের জন্য হলেও সরে দাঁড়াননি। ঘটনাক্রমে এও লক্ষ করি, চাঁদকে যতবার হেনস্থা করে শর্ত দিয়েছে এই মর্মে, পুজো দিলে হারানো

ধন ফিরে পাবে। এখন প্রশ্ন হল, সে কি জানত না কার সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে নাকি শিব-চণ্ডীর আশীর্বাদ থাকায় অহংকার দানা বেঁধেছিল? যদি তাই হয়, তাহলে সর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব হল না, তা অধিক প্রাণপ্রিয় ধন লখিন্দরের বাসরঘরে কালনাগ দংশনে মৃত্যু হলেও সে পরাজয় স্বীকার রাজি নয়, বরং সগর্বে ঘোষণা করেছে—"শতেক লখাই যদি যায় এই মতে। তেও না পূজিব কানী পরাণ থাকিতে।।/কানীর উচ্ছিষ্ট পুত্র গাঙ্গে ভাসাও নিয়া। দোল মৃদঙ্গ কাড়া আন ডাক দিয়া।।"৩

দেবী চণ্ডী তার দুঃসাহসিকতার রসদ এটা ঠিক। তেমনি নিজের আত্মবিশ্বাস,আত্মমর্যাদা, আত্মনির্ভরশীলতাও কম ছিল না বৈকি। তার প্রমাণও আছে। কাহিনির শুরু থেকে শেষপর্যন্ত কোথাও বা কখনও নিজস্ব চিন্তাভাবনা দৃঢ়তার অভাব পরিলক্ষিত হয়নি। বরং কাহিনির গতি যত এগিয়েছে, তত ঝাঁজ বেড়েছে প্রতিবাদের, প্রতিরোধের। কেননা, পরপর যথাসর্বস্ব খুইয়ে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হত যদি সে দুর্বল মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি হত। বেহুলা দেবপুর থেকে শর্তসাপেক্ষ লখিন্দর সহ অন্যান্যদের জীবন ফিরিয়ে উদ্ধার করে বটে কিন্তু তখনও দুঃসাহসিকতার উপর ভর করেই বলে, অবশিষ্টাংশ বিনাশ হলেও 'কানীর' পুজো সে করবে না। কেননা, "চণ্ডীর চরণ বিনে অন্য নাহি জানি।"

চাঁদের পতনের অন্যতম কারণ ধর্মভ্রান্তি। 'অন্ধবিশ্বাস-জেদি অযৌক্তিক মনোভাব। সে জ্ঞানত ছিল যে, শিবের মানসকন্যা মনসা। অর্থাৎ শিবের অংশ। কোথাও তো ভেদ থাকার কথাও নয়, সাধারণ জ্ঞানে। অথচ শিব তার কাছে পরম পূজনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কথাবস্তুর বর্ণনানুযায়ী কার্তিক-গণেশের জন্মের পর শিবের মনস্কামনা ছিল এক আদুরে কন্যার। সেই স্নেহের, প্রাণের তুল্য মনসাকে পুজো করতে অস্বীকার করা বোকামি, অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই না। দ্বিতীয়ত, শিবের অন্যতম সঙ্গী উদয়নাগ। জটায় সর্পের বাস প্রতিমুহূর্তে। অথচ তার সর্পকুলের বিরোধিতা কোনো যুক্তিতে আশচর্যের নয়, বিস্ময়কর। এসব জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও চাঁদের মনসার প্রতি বিরুদ্ধাচারণ সত্যি অবাক করে দেয়।

অহংকার বা দম্ভ পতনের অন্যতম কারণ হয়ে থাকে যে-কোনো ক্ষেত্রে। তেমনটার ব্যতিক্রম ঘটেনি চাঁদের ক্ষেত্রেও। সেই দম্ভ বা অহংকার কিন্তু দৈবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে আসেনি। এসেছে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও আভিজাত্যের প্রাচুর্যে। দ্বিতীয়ত, স্ত্রী সনকাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা বা অবজ্ঞা এবং হঠকারী সিদ্ধান্ত না নিত তাহলে হয়তো বা এরকম পরিণতি আমরা নাও দেখতে পারতাম। কারণ, আমরা জানি প্রতি দুর্যোগের প্রতিমুহূর্তে পত্নী সনকার নিষেধ সত্ত্বেও সংঘর্ষ লিপ্ত হওয়া এটাও পতনের অন্যতম কারণ। অর্থাৎ একের পর এক বিপর্যয়ের ভয়াবহতা, অসহায়ত্ব শুধু নিয়তিতাড়িত বা ভাগ্যবিড়ম্বিত নয়। বরং কর্মদোষও অনেকাংশে দায়ী। কারণ, দেবতার আশীর্বাদরূপে 'মহাজ্ঞান' লাভ। যা কিনা মৃত্যু মানুষকেও জীবন্ত করতে সিদ্ধহস্ত। বংশীদাসের কাব্যের কথাবস্তুতে দেখি, উপায়ান্তর না দেখে যখন মনসা নেতর পরামর্শে তপস্বী বেশে গভীর অরণ্যে পরমাসুন্দরী ছদ্মবেশে শিকারি চাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তৎক্ষনাৎ চাঁদ রূপে মুগ্ধ হয়ে পরিচয় জানতে চায় এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব করে। ছদ্মবেশী মনসা 'মহাজ্ঞানের' প্রার্থনা করে মিথ্যে গল্প শোনায়ে। আসলে মোহান্ধ,

রূপান্ধ চাঁদ ক্ষণিক সৌন্দর্যের মায়াজালে নিজেকে আবদ্ধ করা মাত্র অতি মূল্যবান 'মহাজ্ঞান' খুইয়েছে। অথচ নিজের গুণবতী সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অপর লোলুপ দৃষ্টি চরিত্রভ্রষ্টতারই প্রকাশ। তার জ্ঞান থাকা উচিত ছিল যে, একাজ মনসার ষড়যন্ত্র হতে পারে। তবুও সে উন্মাদ, আত্মহারা রূপে। কামনা করে সংগমের। যে এত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী শুধু নয়, পূর্ব অভিজ্ঞতার নাকানিচুবানির ঘটনার কথা একবারের জন্য স্মরণ হল না! কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেল না! ক্ষণিক সাক্ষাতে এতবড়ো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমাদের অবাক করে দেয় বটে, চরিত্র স্খলনের বহিঃপ্রকাশ। সর্বক্ষেত্রে এটা চিরসত্য যে, হঠকারী সিদ্ধান্ত মানুষের পতন এনে দেয়। আর সেই পথে পা বাড়িয়ে নিজের পতন নিজে ডেকে এনেছে। চরিত্রভ্রষ্টতার কারণে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য তা ইতিহাসও সাক্ষী। যার উপর শিব-চণ্ডীর অপরিসীম স্নেহ বা আশীর্বাদে সাজানো-গোছানো সংসার, সুন্দরী পত্নীসহ বিশাল সাম্রাজ্য সে কি না মূর্খের মতো কামনার জালে পড়ে পরাজয় স্বীকার করল! তার মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন প্রশ্ন হল, এত কিছু হারানোর পরও চাঁদের মনে কি কোনো বিষণ্ণতা, বেদনা, হাহাকার দানা বাঁধেনি! বা বাঁধলেও তা আত্মমর্যাদা ও জেদি মনোভাবের কাছে নেহাতই তুচ্ছ? সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়া হয়তো সম্ভব নয়। তবে সন্ত্রাসী মনসার 'মহাজ্ঞান' হরণ, ধন্বন্তরি বধ, একে একে ছয় পুত্র বধ করে স্বার্থ কায়েম রেখেছে বটে। কিন্তু রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত, মর্মাহত চাঁদকে বোঝানোর চেস্টা করে যাতে তার অটল সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করে অর্থাৎ মনসাকে ভক্তিভরে পুজো করার অনুরোধ জনায়। রক্ত মাংসে দেহগড়া মানুষের এত বিপর্যয়ে কি নীরব থাকা সম্ভব! অথবা থাকলেও ভিতরের জগতে অকৃত্রিম স্বতঃস্ফূর্ত বেদনার উদ্রেক হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছয়পুত্র নিধনে চাঁদ হয়তো নিজের বলিষ্ঠতা, আত্মবিশ্বাস, মতাদর্শকে সচল রাখতে ঘোষণা করে, কাতর হইলু জানি : হাসিবেক লঘুকানী : সে মোর অধিক দুঃখ লাজ।" কাতর, মর্মাহত অথচ মনসার কাছে পরাজয় বা হাসির খোরাকে পরিণত হবে এই আশঙ্কা থেকেই এরকম অভিব্যক্তি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণা, বেদনা, হাহাকার গ্রাস করেছিল। আর গ্রাস যদি নাই বা করে তাহলে 'কাতর' শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন! গভীর শোক চাপা দেওয়ার জন্য আত্মীয়-স্বজনদের হুঁশিয়ারি দেয়, যদি কান্নার রোল ধ্বনিত হয় তাকে বিতাড়ন করা হবে। হয়তো এমন গভীর শোক, আঘাত থেকে দ্রুত কাটিয়ে ওঠার জন্যই এরকম হুংকার দিতে বাধ্য হয়। লখিন্দরের মৃত্যুতে চাঁদের বাৎসল্যভাব পরিস্কার। ছয় পুত্রের মৃত্যুর কারণে ক্ষত এবং উপরন্তু বাণিজ্যযাত্রায় সর্বস্ব খোয়ানো আর ফেরার পথে মনসার চক্রান্তে নানা দুর্গতিতে পড়ে অভূতপূর্ব হেনস্থা বা অপমানজনক পরিস্থিতি স্বীকার হয় মারাত্মকভাবে। এহেন যন্ত্রণার মুহূর্তে লখিন্দরের মতো সুকুমার পুত্রের মুখদর্শন কতটা আনন্দের, উৎফুল্লের তা কবির ভাষায়—"কপালে চুম্বন দিয়া কোলে তুলি লৈয়া।" যেন আকাশের ন্যায় একরাশ যন্ত্রণা, হাহাকার মুহূর্তে উবে গেল। দ্বিতীয়ত, লখিন্দরের মৃত্যুর সংবাদ চাঁদ পূর্ব থেকেই শুনেছিল। ব্রাহ্মণী ছদ্মবেশে মনসা অভিশাপ দিয়েছিল বেহুলাকে এই মর্মে, বাসরঘরে স্বামীর মৃত্যু কালনাগ দংশনে। তাতে আতঙ্কিত হয়ে বাসরঘর নির্মাণের মাধ্যমের সন্তানের জীবন রক্ষার প্রয়াস একজন পিতৃসত্তার পরিচায়ক। রাজ্যের সুদক্ষ কারিগর দিয়ে

লোহার ঘর নির্মাণে তদারকি, যেন কোথাও বিন্দুমাত্র ছিদ্র না থাকে, এমনকি সর্পের যম হিসাবে পরিচিত বিভিন্ন প্রতিরোধক গাছ রোপন থেকে শুরু সৈন্য-সামন্ত পাহারার ব্যবস্থা—সমস্তকিছু সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা, আদর থেকেই সম্ভব। এরকম যত্নের সঙ্গো তদারকি সত্ত্বেও অনিবার্যভাবে কালনাগ দংশনে মৃত্যু হয়, তখন একজন পিতার কী পরিমাণ শোক থেকে যন্ত্রণা, আঘাত পেতে পারে তা কল্পনাতীত।

চাঁদের পিতৃসত্তার গভীরতা পাওয়া যায় লখিন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলার জলে ভেসে দেবপুরে গমনের ঘটনায়। বংশীদাসের কাব্যে আত্মপ্রত্যয়ী, সাহসী বেহুলা যখন স্বর্গপুরে ভেলা নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্মতি প্রার্থনা করে চাঁদের। কিন্তু কপট, ছলনা, কৌশলের কাছে বারবার যেহেতু পরাজিত। তাই পুনরায় হয়তো মনসার ষড়যন্ত্রের শিকার। সেই প্রবল সম্ভাবনা থেকেই প্রথমে সম্মতি দিতে চাননি। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও। তারপর আত্মীয়-স্বজন, হিতাকাঙ্ক্ষীদের সুচিন্তিত পরামর্শে সহমত পোষণ করে। আসলে সহজে পরাজয় স্বীকার করলে পক্ষান্তরে একপ্রকার হার মনসার কাছে। সে চিন্তাও মাথায় কাজ করছিল। আর আত্মবিশ্বাসে যেন কোনো প্রকারে চিড় না ধরে সেই লক্ষ্য থেকেই এরকম ভাবনার অভিব্যক্তি। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, লখিন্দরের মৃত্যুতে তার অন্তর্দাহ শুরু। মনের ক্ষীণ আশাও বর্তমান ছিল।

পতি হিসেবে ততটা সফল নন। একজন পতির যে দায়িত্ববোধ, ভালোবাসা, সুখে-দুঃখে পাশে থাকা। বিপদে পরামর্শ গ্রহণ-দান, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস-ভালোবাসা একান্ত কাম্য। দাম্ভিকতার পরিচয় দিয়ে অগ্রাহ্য করা কখনই পতিসুলভ আচরণ নয়। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু চাঁদ সদাগরের মধ্যে ভালো-মন্দের দুইয়ের সহাবস্থান নেই তা নয়। সেটা ক্ষীণ। প্রথমে বলতে হয় ধর্মীয় বিশ্বাসে সংকীর্ণ মনোভাব। সনকার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা অবশিষ্ট ছিল না। তা ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হোক বা কোনো পারিবারিক সিন্ধান্তে হোক। যন্ত্রের মতো সবকিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে জোর করে। যখন সংবাদ পেয়েছে সনকা মনসাকে আরাধ্য দেবীরূপে পুজো করছে হুংকারের সঙ্গো ঘট ভেঙেছে। যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ বলা যায় নির্দ্বিধায়।

চাঁদ চরিত্রের সবচেয়ে মহত্বের দিক হল সহনশীলতা ও ধৈর্য ক্ষমতা। মনসার সঙ্গো বিবাদের সূত্রপাত এবং পুজো পর্যন্ত একজন ব্যক্তির উপর অমানবিক অকথ্য অত্যাচারের মাত্রা ছিল মাত্রাতিরিক্ত। শুধুমাত্র পুজো পাওয়ার জন্য। তবুও চাঁদ বিন্দুমাত্র ভেঙে পড়েনি। ধৈর্যের বাঁধ নির্মাণ করেছে বারবার ঠান্ডা মাথায়। নিজ আদর্শ বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে সমস্ত গ্লানিকে হেলায় তুচ্ছের ন্যায় জ্ঞান করেছেন। এখানে মনসার ব্যক্তিত্ব ক্ষুন্ন হয়েছে পক্ষান্তরে চাঁদের ব্যক্তিত্ব বা ইমেজ বহুগুণে বৃদ্ধি বর্ধিত।

সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করেও সমাজজাত রীতিনীতি, বাধা-নিষেধ, সংস্কার কখনই অগ্রাহ্য করতে পারেননি। বাণিজ্যযাত্রার পূর্বে সনকার গর্ভ সঞ্চারিত হয়, যাত্রা মানেই বহু সময়ের। সেহেতু বুদ্ধিমতী সনকা প্রমাণপত্র হিসাবে চাঁদের কাছে স্বীকারোক্তির পত্র লিখে নেন। গর্ভ সঞ্চারের মাস, তারিখের। দীর্ঘদিন পর বাণিজ্যযাত্রা ভেস্তে গিয়ে নানা দুর্গতির মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফিরে এসে ঘরে সুকুমার লখিন্দরকে দেখে কিছুটা অবাক, কিছুটা বিস্ময়,

কিছুটা সন্দেহবশত সনকার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং অকথ্য ভাষায় ভর্ৎসনা করে। সমাজ বিকৃত মানসিকতার পরিচয় বহন করে। দ্বিতীয়ত, লখিন্দরে বিয়ের সম্বন্ধের জন্য পাত্রী নির্বাচনে স্বয়ং পুত্রকে নিয়ে যাওয়া পাত্রী নির্বাচনের জন্য, তা কিন্তু আধুনিক মানসিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। এমনকি পাত্রীর কর্মকুশলতা, সৌন্দর্য, সতীত্বের নানা পরীক্ষা সমাজব্যবস্থার নিয়ম-রীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় সতীত্বধর্ম বজায় রাখতে গিয়ে মেয়েদের কী পরিমাণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হত তার চরিত্রের মাধ্যমে উদ্ভাসিত।

আত্মসমালোচনা, অনুশোচনাবোধের অভাবের ব্যতিক্রম দেখি চাঁদের মধ্যে। 'মহাজ্ঞান' হাতছাড়া মোহান্ধ ও রূপান্ধে পড়ে। এতকিছুর দুর্যোগের শিকার অথচ ন্যূনতম আত্মসমালোচনার আভাস পর্যন্ত লক্ষ করি না। এমনকি মেয়েদের সঙ্গে শালীন ব্যবহারে ছিল অনীহা ও অবজ্ঞা। ভাষাবোধে যেন শিষ্টাচারের নামমাত্র গন্ধ নেই। কেননা, মনসাকে 'কানী' ছাড়া অন্য কোনো সম্বোধন প্রকাশ নেই। মনসা যতই শত্রুপক্ষের হোক না কেন তাই বলে শালীনতা বজায় থাকবে না! না কি অতিরিক্ত ঘৃণা, বিরক্তি থেকেই এরকম অভিব্যক্তি! তবে বেহুলার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ব্যবহার আছে।

সমকালীন সংস্কৃতি, বিশ্বাস-সংস্কারের প্রতি দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে পারেননি অধিক শক্তিশালী হয়েও। তার প্রমাণও আছে। বেহুলার 'স্বর্গারোহন' পালায় দীর্ঘদিন স্বামী লখিন্দরকে ভেলায় ভাসিয়ে স্বর্গপুরে গমন, দেবতাদের নৃত্যের মাধ্যমে তুষ্টকরণ এবং মনসার অভিসন্ধি অনুযায়ী প্রাণপ্রিয়'র প্রাণ ফিরিয়ে আনেন অনেক দুঃসাহসিকতার উপর ভর করে। তাতে চম্পক নগরবাসীদের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের আর আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু মনসার সতীত্বের প্রশ্নে বেঁকে বসল। দীর্ঘদিন যাত্রায় তার সতীত্বের কোনো হানি হয়েছে কিনা, সেই অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন ছুঁড়ে; পুত্রবধূকে সতীত্বের পরীক্ষায় অবতীর্ণ করে। এই পরীক্ষা নেওয়াটা হীন মানসিকতার পরিচয় যেমন বহন করে, তেমনি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বয়ে যাওয়া সন্দেহ থেকে মুক্ত ও উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যও বটে। সমাজের বাঁকা আঙুল কোনোমতেই সদাগর ও পরিবারের প্রতি তুলতে না পারে সেও কারণ বর্তমান। অথচ সে না কি সমাজের সবচেয়ে অগ্রগণ্য ক্ষমতাধর শক্তিশালী ব্যক্তি। সমাজ নিয়ামক। সমাজ পরিচালক। শুধুমাত্র সমাজ ভবিষ্যতের আশঙ্কায় হীন কাজে জড়াতে ন্যূনতম বিবেককে তাড়না দেয়নি। চাঁদ খুব ভালোভাবে জানত বেহুলা সতীত্ব সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। সমাজের শৃঙ্খলা, রীতি-নীতি মানুষই নির্ধারণ করে। তবুও তার পক্ষে ভাঙা সম্ভব হল না। হয়তো যুগরুচি মানত না। এর পরিণতিতে কী হয়েছিল আমরা সকলে জানি। তাতে চাঁদের মহিমা কতটা ক্ষুণ্ণ হল তা নতুন করে বলতে হবে না। শাসক তথা সমাজের মাথা হিসাবে পরিগণিত ব্যক্তিদের প্রজাবৎসল নাহলে রাষ্ট্রে বা সমাজে অরাজকতা, বৈষম্য, অস্থিরতা প্রকাশ পায়। আর তা যদি সিংহাসন বাঁচানোর লড়াই হয়, তাহলে স্বৈরাচারী হওয়াও স্বাভাবিক। চাঁদেরও সহৃদয়তা আছে কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে। কেমন! যখনই স্বার্থের প্রশ্ন এসেছে তখনই প্রজাবৎসল মনোভাব উদ্ভাসিত। বাণিজ্যযাত্রায় সৈন্য-সামন্ত, অমাত্য বা কর্মীদের কর্মে খুশিতে নানা উপঢৌকন মাতিয়ে রেখেছে কিন্তু যখনই বহুমূল্যবান সম্পদ ও "সত্তর হাজার লোক" মনসা আক্রমণে ধূলিসাৎ এবং বিনষ্ট হয়েছে

তার জন্য কোনো অনুশোচনা নেই বরং শহীদ পরিবারের আত্মীয়-স্বজনদের হাহাকার, বুকভাঙা কান্নায় কোনো রকম সান্ত্বনা দেননি, উপরন্তু হুঁশিয়ার বা হুংকার দিয়ে নীরব থাকতে বাধ্য করে। এখানে স্বৈরাচার মনোভাব সুস্পষ্ট, শুধুমাত্র নিজের ইমেজ রক্ষার্থে।

মনসার কাছে চাঁদ বারবার পরাজিত হলেও নিজের প্রতিবাদী সত্তা স্তিমিত হয়নি। বরং মনসার আগ্রাসন, ক্ষমতা, শক্তি সম্পর্কে অবগত থেকেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝাপিয়েছে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে এবং স্পষ্টত জ্ঞান ছিল যে, অতিলৌকিক শক্তির কাছে পরাজয় অবশ্যাম্ভাবী। যে দেব সমাজে গৃহীত নয়, তাকে পুজো দেওয়া মানে নিজ আভিজাত্য, গৌরব, বিশ্বাসে আঘাত করা। সেই মানসিকতায় বশবর্তী হয়ে মনসার অন্যায়, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, প্রতিরোধে নেমেছে জীবন-মৃত্যুর তোয়াক্কা না করে। এমনকি ঐতিহ্য, সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই এরকম দুঃসাহসিকতা দেখাতে পেরেছেন। কেননা, বংশ পরম্পরাগত চলে আসা আরাধ্য দেবী বাদ দিয়ে হঠাৎ করে অচেনা কাউকে দেবীরূপে পুজো করা ঐতিহ্যের পরিপন্থীও বটে।

আমরা জানি, দোষে-গুণে মানুষ। ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত। রক্ত -মাংসের দেহগড়া সুতরাং ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে সমস্ত মহিমা, উচ্চ পর্যায়ের দৃঢ়চেতা মানসিকতার কোনো হানি ঘটেনি চাঁদের ক্ষেত্রে। শেষপর্যন্ত তাহলে পুজো দিল কেন? হয়তো কাব্যের প্রয়োজনীয়তায় এরকম উপসংহার টানতে বাধ্য হয়েছে, চাঁদের নিদারুণ পরাজয় হয়েছে মনসার কাছে। কবিদের মূল উদ্দেশ্য তো মনসার মহিমা প্রচার। তবুও তার মধ্যে চাঁদ আপন ভাস্বর হয়ে আছেন। সামান্য ত্রুটির মধ্যে বরং অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। মধ্যযুগের অগণিত চরিত্রের ভীড়ে কতটা ছাপ রয়েছে একজন বিখ্যাত সমালোচকের মন্তব্য দিয়ে বক্তব্য শেষ করব—

> মনসাদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে চাঁদ সদাগরের চরিত্র বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে পুরুষকারের জীবন্ত আদর্শ। মনসা দেবীর ক্রোধে ছয় পুত্র বিনষ্ট হইল, 'মহাজ্ঞান' লুপ্ত হইল 'সপ্তডিঙ্গা মধুকর' অমূল্য সম্পত্তি লইয়া জলমগ্ন হইল কিন্তু এই উপর্যুপরি বিপদরাশি দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াও চাঁদ সদাগর ভ্রুক্ষেপহীন। পুত্রশোকোন্মত্তা সনকার মর্মভেদী ক্রন্দনে তাহার গৃহের পাষাণ প্রাচীরগুলিও বুঝি দ্বিধা হইতেছিল, কিন্তু সদাগরের বজ্রাদপি সুকঠিন পণ ভঙ্গ হয় নাই।

উৎসের সন্ধানে

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, ২০০২, পৃ. ২৮১-২৮২
২. রামনাথ চক্রবর্তী ও দ্বারকানাথ চক্রবর্তী : 'পদ্মাপুরাণ', ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স, কলকাতা, ১৩১৮, পৃ. ১৯৩
৩. তদেব
৪. দীনেশচন্দ্র সেন : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ১৬৫-১৬৬

মঙ্গলকাব্যের চিত্রিত বণিক পরিবারে নারীর স্থান

গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাগাধুনিক বাংলার সমাজজীবন ছিল মূলত পল্লি-নির্ভর ও কৃষি-প্রধান। মুঘল অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। তাই জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের জীবিকা ছিল কৃষিকার্য। বাংলার অর্থনীতিতে কৃষির পরেই স্থান ছিল শিল্পের আর সেই সূত্রে বাণিজ্যের। বস্ত্রশিল্প, লবণশিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি বিবিধ প্রকার ক্ষুদ্র শিল্পের বহুল প্রচলন ছিল। সেইসঙ্গে কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি আন্তঃদেশীয় ও বহির্দেশীয় বাণিজ্যের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ভিতকে শক্ত করে গড়ে তুলতেন বণিকেরা। বাংলার সমাজজীবনে এই কারণেই অন্যতম সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল বণিকশ্রেণি ও তাদের পরিবার। মধ্যযুগের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বাঙালি বণিকদের বিদেশে বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। সপ্তডিঙা সাজিয়ে বিদেশযাত্রার এই সমস্ত বর্ণনায় কবি-কল্পনার কিছু অতিরঞ্জন সংযোজিত হলেও সেই কল্পনার পট ছিল বাস্তব। বণিকেরা বাংলার কৃষিজাত ও কুটিরশিল্পজাত জাতীয় দ্রব্যাদি এসে নিয়ে যেতেন এবং তার বিনিময়ে বহুমূল্য ধাতব দ্রব্য ও রত্নাদি লাভ করতেন। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে বাঙালি বণিকদের এমন বিনিময়-বাণিজ্যের পরিচয় বিধৃত রয়েছে। এই সমস্ত প্রতিপত্তিশালী বণিকশ্রেণির পরিবারের পরিচয়ও তুলে ধরা হয়েছে সমকালীন বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে। মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদসদাগর ও তার পরিবার, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি সওদাগর ও তার পরিবার, বাশুলীমঙ্গলকাব্যে ধুসদত্ত ও তার পরিবার, ধর্মমঙ্গল কাব্যে বণিক সুচন্দ্রের পরিবার জীবন, রায়মঙ্গল কাব্যের বণিক পুষ্পদত্তের পরিবার জীবন, সত্যনারায়ণের পুথিতে দুই সদাগর সদানন্দ ও বিনোদের পরিবার প্রভৃতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত পরিবারে বিভিন্ন সদস্যের কম-বেশি পরিচয়ের পাশাপাশি যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে চিত্রিত হয়েছে তৎকালীন বণিক-বধূদের জীবনচর্যা।

অন্ত্যজ পরিবার এবং কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ বাঙালি পরিবারে নারী-পুরুষ উভয়েই অর্থোপার্জনের মাধ্যমে পরিবার প্রতিপালনে ভূমিকা গ্রহণ করত, সেই কারণে পরিবারে নারী-পুরুষের অনেকখানি সমকর্তৃত্ব চোখে পড়ে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলিতে চিত্রিত বণিক পরিবারে কেবলমাত্র পুরুষরাই বাণিজ্যকর্মের মাধ্যমে উপার্জন করত, আর তাদের সেই উপার্জিত অর্থেই বণিক পরিবারের প্রতিপালন ও প্রতিপত্তি নির্ধারিত হত, পরিবারগুলি ছিল

মূলত পুরুষশাসিত। গৃহকর্তাই ছিল পরিবারগুলির প্রধান, তার অনুশাসনই পরিবারের সকলকে মান্য করতে হতো। নারীরা ছিল প্রায় অন্তঃপুরচারিণী। তাদের বসন-ভূষণ, অলংকারাদি এবং যাবতীয় পারিবারিক সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ ছিল স্বামী-নির্ভর। গৃহকর্তার সর্বময় কর্তৃত্বের অধীনে অতিবাহিত হতো বণিক-বধূর জীবন। পুরুষ ইচ্ছেমতো একাধিক দেওয়ার পরই গ্রহ করত কখনো প্রথমা স্ত্রীকে জানিয়ে, কখনো বা তার অজান্তে। এমনকি দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য প্রয়োজনে বণিক ছলনার আশ্রয় নিয়ে প্রথমা পত্নীর মানভঞ্জন করে তাকে প্রতারণা করতেও দ্বিধা করত না। চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে ধনপতি সদাগরের সঙ্গো খুল্লনার বিবাহ স্থির হওয়ায় ধনপতির প্রথমা পত্নী লহনা বিলাপ করে বলেছে—

এ ভর যৌবন কালে সতা দেহি মোর তরে
বড়হি নিষ্ঠুর মোর স্বামী

তখন ধনপতি সওদাগর স্ত্রীকে ছল প্রবোধ দিয়ে বলেছে—

> রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে।/চিন্তামণি নাশ কৈলে কাচের বদলে।।/স্নান করি আসি শিরে না দাও চিরুণী।/রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিন্ধে পানী।।/অবিরত ওই চিন্তা অন্য নাহি গণি।/রন্ধনের শালে নাশ হইলে পদ্মিনী।।/মাসী পিসী মাতুলানী ভগিনী সতিনী।/কেহ নাহি রহে ঘরে হইয়া রান্ধনী।।/যুক্তি যদি লহ মনে কহিবে প্রকাশি।/রন্ধনের তরে তব করে দিব দাসী।।/বরিষা বাদলেতে উনানে পাড় ফুক।/কর্পূর তাম্বুল বিনা রসহীন মুখ।। (মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : কবিকঙ্কণ চণ্ডী, শ্রী বিজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।)

বণিক ধনপতি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের জন্য প্রথমা স্ত্রী লহনাকে প্রতারণা করে এটাই বোঝাতে চেয়েছে যে, লহনার সৌন্দর্য রক্ষা এবং রন্ধনের কষ্ট লাঘব করার সৎ উদ্দেশ্যেই সে দ্বিতীয় বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনুরূপভাবে, মুকুন্দ মিশ্রের বাশুলীমঙ্গাল কাব্যেও বণিক ধুসদত্ত পুনর্বিবাহের জন্য প্রথমা পত্নী সত্যবতীর সঙ্গো এক নিষ্ঠুর চাতুরী করেছে। সে সত্যবতীর রাঁধা প্রতিটা ব্যঞ্জনের মিথ্যা নিন্দা করে বলেছে—

শুন সত্যবতী সতী কহি দৃঢ় ভারতী
নিশ্চয় ভুলিলে রন্ধনে।
বিবাহ করিব আমি শুন তুমি সীমন্তিনী
বিষাদিত না ভাবিহ মনে।।
বড় তুমি পাও দুখ করাইব আমি সুখ
আর যেন না যাহ রন্ধনে।

(কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র : বাশুলীমঙ্গাল বা বিশাললোচনীর গীত, শ্রী সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী শুভেন্দুসুন্দর সিংহরায় সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।)

গৃহকর্ম নিখুঁতভাবে সুসম্পন্ন করার যাবতীয় দায় ছিল গৃহবধূর। পরিবারে দাসী রাখার ব্যবস্থা থাকলেও, রান্নার দায়িত্ব নিতে হতো মূলত বধূকেই। আর এই রান্নায় কোনোরকম ত্রুটি হলেই তার দায় বর্তায় বণিকবধূর ওপর। এই কারণেই প্রতি ও ধুসদত্ত উভয়েই পুনর্বিবাহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য স্ত্রীর রন্ধনকার্যকেই অবলম্বন করেছে।

তৎকালীন সমাজে বহুবিবাহ ছিল পুরুষের স্বাভাবিক সামাজিক অধিকার। স্বামীর পুনর্বিবাহ ও সতীনজ্বালা সে যুগের নারীর কাছে সম্ভবত সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা ছিল। অথচ কোনমতেই তারা পুনরায় বিবাহ করা থেকে স্বামীকে বিরত করতে সক্ষম হতো না। কখনো বংশরক্ষার তাগিদে, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নবযৌবনা নারীর রূপমুগ্ধ হয়ে তারা আসঙ্গালাভের বাসনায় পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করত। সত্যবতী স্বামী ধুসদত্তকে অনুনয় করে বলেছে—

প্রাণনাথ সতিনী না দিহ তুমি।
বিভা কর দূর শুন হে ঠাকুর
নিবেদিল তোহে আমি।। (প্রাগুক্ত গ্রন্থ)

সেই অসহায়ভাবে স্বামীকে তুষ্ট করার ও বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে লহনাও স্বামী ধনপতির দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছে অভিমান ভরে ভর্ৎসনার সুরে বলেছে—

স্ত্রী গত-যৌবনে পুরুষ নির্ধনে
কিবা আদরের চিন।
কামদেব পাপ নাহি ধরে চাপ
করি রাখে গুণহীন
কপট প্রবীণ কুলিশ কঠিন
তোমার দারুণ হিয়া।
সত্য কৈলে যত সব হৈল হত
কি দোষ মোর দেখিয়া।।
না করিল বিধি জীবন অবধি
নারীর যৌবনকাল।
শিশির উদয়ে কমল না রহে
মরণে রহিল শাল।।
অঙ্গানা-সমাজে কিবা গৃহ-কাজে
কি করিনু অনুচিত।
যদি কিবা সতা কে তার রক্ষিতা
কেন না কৈলে ইঙ্গিত।।

একাধিক স্ত্রীর প্রতি স্বামীর পক্ষপাতিত্বপূর্ণ আচরণ সপত্নী-কলহ ও সপত্নী-বিদ্বেষের অন্যতম কারণ হয়ে উঠত। স্বামী-বঞ্চিতা অসহায় বণিক-গৃহিণীদের সমব্যথী ও মন্ত্রণাদাত্রী হত দাসী আর সখীরা। লহনার বেদনায় তার পাশে থেকেছে দাসী দুর্বলা আর সখী লীলাবতী। ধুসদত্তের স্ত্রী সত্যবতীও তার দুঃখের কথা সখীকে জানিয়েছে। বণিক রমণীরা যে লেখাপড়া জানত তার পরিচয় পাওয়া যায়, যখন লীলাবতী ধনপতি বণিকের নামে ছল পত্র লিখে দেয় লহনাকে, আর খুল্লনা সেই ছল পত্র পড়ে সেটা যে স্বামীর হাতে লেখা নয় তা বুঝতেও পারে। এই সমস্ত স্বাক্ষর রমণীর জীবন কাটত ঘরের চার দেওয়ালের ভেতর, পারিবারিক অনুশাসন, সন্তান পালন, আর গৃহকর্মাদির মধ্যে। তৎকালীন বণিক পরিবারে অবিবাহিতা কন্যার পিতারা কন্যার জন্য এমন পাত্র খুঁজত, যারা কুলে-শীলে-মানে-প্রতিপত্তিতে তাদের

সমকক্ষ হবে। বেহুলার বাবাকে তাই বলতে শোনা গেছে—"কুলে শীলে অর্থে হবে আমার সমান।/সে পুত্রেরে আমি কন্যা করিব প্রদান।" (কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : মনসামঙ্গাল, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য সংকলিত ও সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০০।) কন্যাকে পাত্রস্থ করা হত গণকের বিচার অনুসারে। সতীনের সংসার কন্যাকে তুলে দিতে বিশেষ দ্বিধা করত না বণিক পিতা। সতীনের সংসারে গিয়ে কন্যাকে যে কী পরিমাণ যন্ত্রণা ও অশান্তি ভোগ করতে হবে, সেই ভাবনায় আশঙ্কিত হয়ে উঠত মায়ের মন। খুল্লনার বিবাহের প্রস্তাব শুনে তার মা রম্ভাবতী স্বামী লক্ষপতি সদাগরকে বলেছে—

আগু পাছু না গণিয়ে কথায় বিহ্বল হয়ে
কেন দেহ হেন অনুমতি।
হিতাহিত নাহি গণ না লব কন্যার পণ
কেন ঝিয়ে করাব দুর্গতি।।
পড়ে শুনে হৈলে পশু ব্যয় করি নিজ বসু
কন্যা দিবে দারুণ সতিনে।
লহনাকে নাহি জান হেন কথা মনে আন
করুণা নাহিক তব মনে।।
তোমারে বুঝাব কি লহনা ভায়ের ঝি
তুমি যদি তারে দিবে সতা।
কেন কৈলে হেন কাজ সঞ্চয় করিলা লাজ
লোক মাঝে না তুলিব মাথা।।
খুল্লনা বান্ধিয়া গলে মরিব গঙ্গার জলে
নাহি দিব দারুণ সতিনে।
দুরন্ত ঝিয়ের মোহ লোচনে গলয়ে লোহ
ধরে লক্ষপতির চরণে।।
নাহিক মধুর কথা যে ঘরে লহনা সতা
ভেবে দেখো কেমন বাঘিনী।
বিচারে হইয়া অন্ধ পদ গলে দিয়া বন্ধ
ভেট দিবে খুল্লনা হরিণী।।

(মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত গ্রন্থ)

কিন্তু খুল্লনার বৈধব্যযোগ থাকায় গণক ঠাকুর বিচার করে দোজবর পাত্রের সঙ্গো তার বিবাহের বিধান দিয়েছেন খুল্লনার পিতা ধনপতির সঙ্গোই কন্যার বিবাহ দেন। বণিক পরিবারে যদিও কর্তা স্বেচ্ছায় একাধিক বিবাহ করতেন, তথাপি কন্যার বিবাহের ক্ষেত্রে পিতার সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। নারীর জীবন শৈশবে পিতার শাসনাধীন, যৌবনের স্বামীর আজ্ঞাধীন, আর বার্ধক্যে পুত্রের অধীন—

শিশুকালে রক্ষিতা বাপ থাকে সেই ঘর।/যুবাকালে রাখে স্বামী প্রাণের ঈশ্বর।।/বৃদ্ধকালেতে থাকে পুত্রের অভ্যন্তর।/অর্থাৎ পরিবারে নারী আজীবন পুরুষ-নির্ভর।।

বণিক পরিবারে পুরুষের আর্য-দম্ভের পাশে গোপনে চলত নারীর অনার্য দেবীর পূজার্চনা।

এই গোপনীয়তা ভঙ্গা হলেই স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সংস্কারে দ্বন্দ্ব বেধেছে। স্ত্রীর বিশ্বাসের প্রতি স্বামীর কোনোরকম শ্রন্ধাবোধ চোখে পড়ে না। উপরন্তু সনকার পাতা মনসার ঘট-কে হেতালের দণ্ড দিয়ে ভেঙে দেয় চাঁদসদাগর। অপমানিতা সনকার ক্ষীণ প্রতিবাদ স্বামীর দম্ভের দাপটে হারিয়ে যায়। ওদিকে ধনপতি সওদাগরও খুল্লনার মঙ্গালচণ্ডীর ঘটে বামপদে পদাঘাত করেছে। স্ত্রী-দেবতার পূজায় সে নারাজ। মঙ্গালচণ্ডীর পূজা করার অপরাধে খুলনাকে যথেচ্ছভাবে প্রহার ও অপমান করতে দ্বিধা করে না ধনপতি—

> দেখি ধনপতি দত্ত জ্বলে কোপানলে।/ধর্মসাক্ষী করি ধরে খুল্লনার চুলে।।/কোপযুক্ত ভাবে কিছু বলে ধনপতি।/অদৃষ্টে আমার ছিল পাপিণী যুবতী।।

বাশুলীমঙ্গাল কাব্যেও বণিক ধুসদত্ত স্ত্রী রুক্মিণীর বাশুলীর ঘট-কে বামপদে লঙ্ঘন করেছে। আসলে নারীসমাজ লৌকিক প্রতিবেশের সঙ্গো ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তাদের ঘরোয়া ব্রতাচারের মধ্যে লৌকিক দেব-দেবীরা স্থান করে নিয়েছিল। জালু-মালুর মা নিছনির কাছ থেকে মনসা পূজার পদ্ধতি জেনেছিল সনকা। সমকালীন সমাজে নারীর সতীত্বের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে তার মাধ্যমে উচ্চতর সমাজের সামনে সুকৌশলে লৌকিক দেবীর পূজার মহিমাকে পরিবেশন করেছেন মঙ্গালকবিগণ। নারীর যাবতীয় ব্রত-পূজাদি স্বামী-সন্তান-সংসারের মঙ্গাল কামনায়, যা কখনোই উপেক্ষা করা যায় না।

বণিক পরিবারে যে-কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গৃহস্বামীর কর্তৃত্বই ছিল সর্বময়। পরিবারে নারীদের ভূমিকা ছিল কর্তার যাবতীয় আজ্ঞা পালনে এবং পরিবারের সকল বিষয়ে দেখাশোনা করায়। সৌন্দর্যে-স্বভাবে তাকে হতে হত অতুলনীয়, রাঁধতে-বাড়তে সাজাতে-গোছাতে তাকে হতে হত দক্ষ। একমাত্র তখনই যৌবনবতী সেই স্ত্রী স্বামীর কাছে গুরুত্ব পেত। নচেৎ স্বামী অপর কোনো সুন্দরী রমণীর সন্ধানে আপন দৃষ্টি বিস্তার করত। আর উপেক্ষিতা বঞ্চিতা অভাগিনী স্ত্রীর সহায় হত সখী, দাসী, আর চোখের জল। এমনকি এ কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না যে, বেশিরভাগ বাঙালি বণিক পরিবারেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল অনেকটা প্রভু-ভৃত্যের মতো। যেন-তেন-প্রকারেণ স্বামীর মতে চলতেই হত স্ত্রীকে, সায় দিতে হতো স্বামীর সকল সিদ্ধান্তে।...আজ্ঞা যদি না পাল য়ামার।/গৃহে জাঞা নাক কান কাটিব তোমার।।" অথবা "সত্য না পালিলে তোর মুণ্ডাইব কেশ"—এই প্রকার শিকারও হতে হত বণিক-বধূদের।

তৎকালীন বণিক পরিবারে নারীর অমর্যাদার আরো একটি মর্মান্তিক দিক পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত বিলাসী বণিকেরা রূপতৃষ্ণা চরিতার্থ করার জন্য সুন্দরী রমণীদের বিবাহ করে নিয়ে আসত। তারপরেই হয়তো রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাদের চলে যেতে হত বাণিজ্যে। ফলে পরিবার থেকে দীর্ঘদিনের এই বিচ্ছেদের কারণে নিজের নবপরিণীতা স্ত্রীকে তারা ভুলে যেত। বাড়ি ফিরে এসে চিনতে পারত না স্বামীর জন্য প্রতীক্ষারতা সেই অভাগিনী নববধূকে। বাশুলীমঙ্গালের ধুসদত্ত গৃহে প্রত্যাবর্তন করার পর সত্যবতী ও রুক্মিণী উভয়েই তার পা ধুয়ে দিয়ে তাকে প্রণাম করেছে। তখন সদাগর রুক্মিণীকে চিনতে না পেরে প্রথমা পত্নী সত্যবতীর কাছে তার পরিচয় জানতে চেয়েছে। অনুরূপভাবে, কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ধনপতি সওদাগরও প্রথম দর্শনে খুল্লনাকে চিনতে পারেনি। দ্বিজমাধবের মঙ্গালচণ্ডীর গীত কাব্যে ধনপতি ঘরে ফিরে এসে নিজের নবপরিণীতা স্ত্রী খুল্লনাকে চিনতে না পেরে, তার কাছে পরস্ত্রীকে পাঠানোর

অপরাধে লহনার চুল ধরে তাকে প্রহারে উদ্যত হয়েছে। স্ত্রী স্বামীর দৃষ্টিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল কেবল সম্ভোগের সামগ্রী, সন্তান উৎপাদনের ও পারিবারিক পরিচর্যার উপকরণ এবং নিত্য পরিচারিকা মাত্র। স্ত্রীর প্রতি প্রদর্শিত অনুকম্পার বেশিরভাগটাই ছিল পুরুষের আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার উপায়। পুরুষের তথা স্বামীর নির্মম নির্লজ্জ প্রবঞ্চনার তথা প্রবণতার নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসাবিজয় কাব্যে। মনসা যখন ভগিনী সম্পর্কের সূত্র ধরে সনকার কাছে আসে, তখন সুন্দরী তরুণীর ছদ্মবেশধারিণী দেবীকে দেখে চাঁদসদাগর মোহমুগ্ধ হয় এবং নিজের স্ত্রীর কাছেই ছদ্মবেশিনী দেবীর আসঙ্গ কামনায় অনুরোধ জানায়—

গুপ্তে সনকায় ডাকি বুঝাইয়া বলে।
তব ভগ্নি দেখি অঙ্গ দহে কামানলে।।

স্বামীর কথায় বিদীর্ণ হৃদয়ে হাহাকার করে ওঠে সনকা—"কর্ণে হস্ত দিয়া রাণী করে হাহাকার।" পরিবারে পুরুষের চেয়ে বেশি অধঃপতন এবং নারীর চেয়ে অধিক অমর্যাদা আর কী হতে পারে! স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কী মর্মান্তিক রূপ!

বণিক পরিবারেও নারীকে শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামী-সতীনের সঙ্গে সর্বদাই মানিয়ে চলতে হতো। তবে অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার কারণে শ্বশুরবাড়ির পারিবারিক অনুশাসনের অনুগত হয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে যেত তারা। তাই এমন পারিবারিক আনুগত্য তাদের কাছে স্বাভাবিক ছিল। কন্যাকে শ্বশুরালয়ের পাঠানোর আগে মা উপদেশ দিয়ে বলত—

সসুর সাসুড়ি ঘর তাকে জেন থাকে ডর
না লঙ্ঘিয় জামাইর বন্ধন।
পতিব্রতা করি তারে ঘুসিবেক সংসারে
জদি ভজ স্বামির চরণ।।

(নারায়ণ দেব : পদ্মাপুরাণ, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭।) বেহুলাকে বিদায়কালে তার মা আরো বলে—"শ্বশুর শাশুড়ি হয় মহা গুরু জন।/যতন করিয়া সেবা রাখিহ বচন।।/বাড়ির ছয় জাও সঙ্গে না করিহ দ্বন্দ্ব।/দাসদাসীতে মিছা দোষে না বোলহ মন্দ।।" (জগজ্জীবন ঘোষাল : মনসামঙ্গল, আশুতোষ দাস ও সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪।) এমনকি স্বামীর সংসারে আত্মত্যাগের শিক্ষাও কন্যাকে মা-ই দিতেন বিদায়কালে—"সকলিকে খাওয়াইহ করিয়া রন্ধন।/অবশেষে জেবা পায় করিহ ভোজন।।" (মানিক দত্ত : চণ্ডীমঙ্গল, শ্রী সুনীল কুমার ওঝা সম্পাদিত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৪ ব.।)

পরিবারে গৃহিণীরা গৃহকোণে বসে স্বামী-সন্তানের মঙ্গল কামনায় ব্রত-পুজো করত। এতে শাশুড়ীও বধূদের সঙ্গে থাকত। সনকাকে তার ছয় পুত্রবধূকে নিয়ে ব্রত কর্ম করতে দেখা গেছে। শাশুড়ি বধূর কাছে ছিল মায়ের বিকল্প। তারা তাদের যাবতীয় দুঃখ বা দুঃস্বপ্নের কথা শাশুড়ীকে বলত। তবে কখনো কোনো রকম পারিবারিক বিপর্যয় ঘটলে, তার দায় বর্তাতো নববধূর ওপর। তাই বাসর রাতে পুত্র লখিন্দরের মৃত্যুতে শোকাতুরা সনকা ওবধু বেহুলার প্রতি কটূক্তি করে কখনো বলেছে—"স্বরূপে জানিলাম তুমি নিশাচর জাতি।/বিয়ার রাত্রে খাইলা স্বামী নহিল বাসিরাতি।" (বিজয় গুপ্ত : পদ্মাপুরাণ, শ্রী জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত, কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।) কখনো আবার বলেছে—"আতিকুল কুলক্ষণী বেটি মটুক কপালী।/মারিল সুন্দর বালা নিরাশী বিড়ালী।।/দন্ত তোর দীঘল চিরণ মাথার চুল।/কুলক্ষণী ডুবাইলে বানিয়ার কুল।।" (জগজ্জীবন ঘোষাল : মনসামঙ্গল, আশুতোষ দাস ও সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪।) তবে দ্বিজ বংশীদাশ, বিপ্রদাস পিপলাই ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে সনকা পুত্রের মৃত্যুর জন্য পুত্রবধূকে দায়ী করেনি।

সমাজ-পরিবারের সর্বত্রই নারী যেন কখনো কেবল প্রয়োজনের সামগ্রী, কখনো বা উদ্বৃত্ত। বিবাহিতা ননদের ভাগ্যে বৈধব্যের বিপর্যয় নেমে এলে তার জীবন হয়ে উঠত দুর্বিষহ। শ্বশুরবাড়িতে স্বামীহারা বিধবা বধূর যেমন দুর্দশার অন্ত থাকত না, বাপের বাড়িতেও তেমনি বিধবা কন্যা এসে থাকতে আরম্ভ করলে সমস্যা উপস্থিত হত। ভাই-ভাজের সংসারে বিধবা বোন হয়ে পড়ত অবাঞ্ছিত। বিধবা ননদের উপস্থিতি ও আধিপত্য মেনে নিতে পারত না ভাজেরা। সধবা-বিধবার তথা আমিষ-নিরামিষের এই দ্বন্দ্ব সংসারে অশান্তি বহন করে আনত। আবার স্বামীর পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের কারণে সতীনের প্রতি বিদ্বেষবশত এক বণিক-বধূ তার সতীন অপর বণিক-বধূর অনিষ্ট সাধনে তৎপর হত। ধনপতির অনুপস্থিতিতে ছোটো সতীন খুল্লনাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে লহনা। স্বামীর প্রতি ঐকান্তিক অধিকারবোধই নারীর এই হেন কুমতির কারণ। জন্মাবধি সেই ভাবেই তৈরি করা হত তাদের মন-মানসিকতা। তাই স্বামী-ভ্রমরকে ধরে রাখার জন্য সতীনে-সতীনে রীতিমতো গুপ্ত প্রতিযোগিতা চলতে থাকত। ছোটো সতীন স্বামীকে প্রলুব্ধ করত তার রূপ-যৌবনের মাদকতায়, আর বড় সতীন বিবিধ কৌশলে ছোটো সতীনকে দমন করে স্বামীর মন পাবার চেষ্টা করত। শ্রী কবিবল্লভ বিরচিত সত্যনারায়ণের পুথিতেও দেখা যায়, দুই সদাগর সদানন্দ ও বিনোদের দুই স্ত্রী সুমতি ও কুমতি ঈর্ষাপরায়ণা। এমনকি, বর্ণেশ্বর নৃপতির কন্যা সুন্দরী কুন্তলাকে দেবর মদনের সঙ্গে দেখে তারা মদনকে বিষ প্রয়োগে বধ করার ষড়যন্ত্র ক'রে কুন্তলার ক্ষতি করার চেষ্টা করে। একথা ঠিক যে, পরিবারে নারীর যাবতীয় অবাঞ্ছিত আচরণের অন্তরালে ছিল তাদের প্রতি পারিবারিক বঞ্চনা ও উপেক্ষা। ব্যর্থ জীবনের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সেই যন্ত্রনার হাত থেকে মুক্তি পাবার তাগিদে তারা নানারকম ষড়যন্ত্রমূলক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ত। জীবনের একমাত্র আশ্রয়টুকু স্বমহিমায় টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড নির্ধারিত হত। আর মনের জ্বালার সেই আগুনে ঘি ঢালত দাসী ও সখীরা। স্বামী সোহাগবঞ্চিতা নারী প্রভাবিত ও প্ররোচিত হত এই সমস্ত কুমন্ত্রণায়। সংসারে নিজের স্থান অটুট রাখাই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাই পুরুষের বহুচারিতা, নারী-জীবনের বঞ্চনা, সপত্নী-বিদ্বেষ প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক বৃত্তবন্ধন কখনও ছিন্ন হয়নি।

সুতরাং, সব দিক বিচার করে একথা অবশ্যই বলা যায় যে, একমাত্র নারীর সহনশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও পরিবারমুখীতার কারণেই পুরুষের যাবতীয় অনাচার, অবিচার ও ব্যভিচার সত্ত্বেও প্রাগাধুনিক সাহিত্যে চিত্রিত বাঙালি বণিক পরিবারে ভাঙন ধরেনি। সর্বংসহা নারী ভক্তি-ভালোবাসা দিয়ে পরিবারে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে। নারীর এই শান্ত-সংযত-কল্যাণী রূপই বণিক পরিবারের চিত্রিত হয়েছে।

বাইশ কবির অন্যতম জানকীনাথের পদ্মাপুরাণ : একটি বিহঙ্গ অবলোকন

নির্মল দাশ

অধ্যাপক সুকুমার সেন 'পদ্মাপুরাণ' রচয়িতা বাইশ জন কবির যে তালিকা দিয়েছেন, তন্মধ্যে দশ নম্বরে রয়েছে জানকী, জানকীনাথ, 'পণ্ডিত' জানকীনাথ, 'বিপ্র' জানকীনাথ—নামগুলো।[১] তিনি একই ব্যক্তি। বাইশ কবির পদ্মাপুরাণ মিশ্র ধরনের মনসামঙ্গল কাব্য সংকলন। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাইশ কবি রচিত মনসামঙ্গল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২] কিন্তু পণ্ডিত জানকীনাথ রচিত মনসামঙ্গল সম্পর্কিত আলোচনা উপেক্ষিত থেকে গেছে। অধ্যাপক সুকুমার সেনও কবির নামোল্লেখ ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই সংযোজন করেননি। সেটি সম্ভবও ছিল না। কেননা, এতকাল এই কবির রচিত মূল পুথি আবিষ্কৃতই হয়নি। অপরাপর সাহিত্য-ইতিহাসকারেরাও এই কবির বিস্তৃত কোন পরিচয় দিতে পারেননি।

জানকীনাথ এমন একজন কবি, যিনি স্বতন্ত্রভাবে রচনা করেছিলেন মনসামঙ্গল কাব্য। সম্প্রতি ত্রিপুরা রাজ্যের কমলপুর সহ এই রাজ্যেরই নানা স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে জানকীনাথের খণ্ডিত সাড়ে দশটি পুথি।[৩] উক্ত সাড়ে দশটি পুথি পাঠ করে একটি পূর্ণ পুথির রূপদান করা হয়েছে, সর্বোপরি সেটি গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। ফলে কবি পণ্ডিত জানকীনাথ চলে এসেছেন পাদপ্রদীপের আলোয়। সেই সময়ে, পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্য জনসমাজে সমাদৃতও হয়েছিল। প্রসঙ্গত, বাইশ কবির পদ্মাপুরাণকে যখন আমরা বলছি 'গ্রুপ প্রোডাক্ট' তখন পণ্ডিত জানকীনাথের পদ্মাপুরাণকে বলা যায় 'ব্যক্তিগত সৃষ্টি'।

কবি তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় প্রদান সম্পর্কে উদাসীন থেকেছেন। ফলে কবি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না।[৪] তিনি সম্ভবত মনসামঙ্গল কাব্যধারার অন্তিম কবি। তাঁর কাব্যের এযাবৎ প্রাপ্ত সর্বাধিক প্রাচীন পাণ্ডুলিপিটি[৫] রচিত হয়েছিল ১২২৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে। এর থেকে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে গেলে হয় ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দ। সম্ভবত সে সময়ে কবি জীবিত ছিলেন। কবি জানকীনাথ হবিগঞ্জের পৈল নাজিরপুরে জন্মেছিলেন। তিনি ছিলেন নাথ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। কবির এক পুত্রের নাম জানা যায়। তাঁর নাম ছিল আবু মন্ত। এখানে মন্ত, মহান্ত শব্দের সমার্থক। আবু মন্তের প্রয়াণের পর কবির বংশ লোপ পেয়েছে। কবির কাব্যে পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ অঞ্চলের ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

জানকীনাথ কাব্য রচনাকালে নারায়ণ দেবের কাব্যটিকেই মূলত অবলম্বন করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর নিজস্ব কাব্যে নারায়ণ দেবের ভণিতা ব্যবহার করেছেন। আবার অন্য কবিদের ভণিতাও ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ অন্য কবিদের কাব্যের ওপর, নির্ভর করেছিলেন তিনি। দেবখণ্ড ও বণিক খণ্ডের মধ্যে মোট ভণিতা রয়েছে ১০২ টি। তন্মধ্যে দেবখণ্ডের চল্লিশটি ভণিতার মধ্যে তাঁর রচিত ভণিতা রয়েছে আঠাশটি। আবার বণিক খণ্ডের বাষট্টিটি ভণিতার মধ্যে কবি রচিত ভণিতার সংখ্যা ঊনষাট। এছাড়া বাকি সামান্য কয়েকটি ভণিতার জন্য তিনি কৃষ্ণদেব সূত রচিত কাব্যের সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

প্রাক-আধুনিক কালের কবি পণ্ডিত জানকীনাথ সময়ের এগিয়ে চলাকে উপলব্ধি করেছিলেন। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি মঙ্গলকাব্যের বাঁধাধরা কাঠামোটি সম্পর্কে ভাবিত ছিলেন। ফলে আমরা দেখি, তিনি কাব্য রচনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কবি নারায়ণ দেবকে অগ্রগণ্যতা প্রদান করেছেন সত্য, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বক্তব্যটির যাথার্থতা প্রমাণ করতে গিয়ে, প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, কবি তাঁর রচিত কাব্যে, মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুসারে, সচেতনভাবেই কোনও দেববন্দনা যুক্ত করেননি, তথা রচনা করতে যাননি। বিষয়টি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ, কেননা, মধ্যযুগে মানুষের ধর্মবিশ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যারা, মঙ্গলকাব্যের শ্রোতা, গায়ক এবং দেবীর ভক্ত—তারা লোকবৃত্তের একেবারে সাধারণ স্তরের মানুষ। কালের ব্যবধানে কবি হয়তো অনুভব করেছিলেন, দেবীর ভয়ঙ্করতা মানুষকে যতখানি কাছে টানে, তার থেকেও বেশি, দেবীর ভয়ে ভীত থাকে। তাই হয়তো কবি তাঁর কাব্যে দেববন্দনা অংশটিকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তিনি এক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়েছেন সত্য, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কবি কিন্তু সেই সময়ে ছিলেন যথেষ্ট জনপ্রিয়।

কবির কাব্যের প্রতিটি প্রসঙ্গের শুরুতে কাহিনিসূত্রের নির্দেশ রয়েছে। বিষয়টি নতুন এবং অভিনব। অবশ্য বিজয়গুপ্তের কাব্যে কয়েকটি কাহিনিসূত্র রয়েছে। কিন্তু কবি পণ্ডিত জানকীনাথ এটিকে সার্বিক ও সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এখানে সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া হল—

১. প্রথম কালেত সৃষ্টি হইল জেনমতে।
২. তবে নাগ জর্মিল কাস্যব কদ্রু হতে।
৩. মাত্রিশাপ নাগলুকে পাহিলা জেনমতে।
৪. জরৎক্কার বিহা অস্থিক জর্মকথা।
৫. তবে জালু মালু ঘরে গেলা বিষহরি
করিল জালুএ পুজা মহাজত্ন করি।
৬. চর্মক নগরে পাছে করিলা প্রবেশ
সুনুকাতে সপ্নরূপে কহিলা বিসেস।
৭. সপ্ন দেখি সুনুকাএ প্রসন্নিত হৈল
সুবর্ন প্রতিমা ঘটে পোদ্দারে স্থাপিল।[৬]

পণ্ডিত জানকীনাথ তাঁর কাব্যে স্বপ্নাধ্যায় বা গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ রচনা করা থেকে বিরত থেকেছেন। এমনটি অভাবিত। মধ্যযুগের কবিরা মঙ্গলকাব্যের এই বিষয়টিকে মান্যতা

দিয়েছেন, এই প্রসঙ্গাটি মঙ্গালকাব্যের ক্ষেত্রে অবধারিত। অথচ এই বিষয়ে কবির উদাসীনতা বিস্ময়কর। আরও একটি বিষয় হল, আত্মপরিচয়হীন ভনিতা ব্যবহারেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। কবি তাঁর কাব্য রচনার ক্ষেত্রে যখন নিজেকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এমনই উদাসীন, বাস্তবতাকেই তিনি প্রাধান্য দেবেন, এমনটি মনে হতেই পারে। বাস্তবেও তাই হয়েছে। কাহিনি বয়নের ক্ষেত্রে, চরিত্র রূপায়ণে, এমনকী রস পরিণতিতেও তিনি অলৌকিকতাকে প্রাধান্য প্রদান অপেক্ষা বাস্তবতার হাত ধরেই এগিয়েছেন।

অপরাপর মঙ্গালকাব্যের কবিরা যত্ন সহকারে তাঁদের কাব্যে রাগরাগিনীর উল্লেখ করেছেন। তাঁরা চেয়েছেন, নির্ধারিত রাগরাগিণী অনুসরণেই কাব্যটি গীত হোক। কিন্তু পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে দেখি, কোথাও কোনো রাগরাগিণীর উল্লেখ নেই। সাধারণত এক শ্রেণির মানুষ, যারা 'ওঝা' পদবিধারী তারাই মঙ্গালকাব্যের গায়ক। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গো সঙ্গো মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে। এই নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষেরা ছাড়া অন্য পাঠক-গায়কেরাও মঙ্গালকাব্যের পাঠ করতে ও গাইতে শুরু করেছে। সে ক্ষেত্রে যে রাগরাগিনীর ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছিল, তা বলা যাবে না। মঙ্গালকাব্য পাঠে মানুষের যে ব্যাপক আগ্রহ, দেবী মনসার প্রতি মানুষের যে ভক্তি, তাঁকে এইভাবে রাগরাগিণীর বন্ধনে বেঁধে রাখতে চাননি কবি পণ্ডিত জানকীনাথ। সর্বসাধারণের পাঠ ও গায়নের জন্য পথ প্রস্তুত করে দেন তিনি। পল্লিসুরেও ভক্তির সঙ্গো মঙ্গালকাব্য গাওয়া হোক, এটাই ছিল কবির অভিপ্রায়। কবি পণ্ডিত জানকীনাথের জনপ্রিয়তার নেপথ্যে এটাও একটি অন্যতম কারণ।

কবিকে একজন সুরুচিসম্পন্ন মানুষ হিসেবেই কাব্যে আমরা দেখি। তুর্কি আক্রমণের প্রভাব মঙ্গালকাব্যেও পড়েছে। একসময় মঙ্গালকাব্যের কবিরা হাসান-হোসেনের কাহিনি খুব ঘটা করে বর্ণনা করেছেন। দেখা যায়, দেবী মনসা হাসান-হোসেনের ওপর বিধ্বংসী আক্রমণ করেছেন এবং দেবীর পূজা করানোর জন্য তাদের বাধ্য করেছেন। এতে সেকালের সমাজচিত্র আমাদের কাছে স্পষ্টতা পায়।

হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের দূরান্বয়ই এতে প্রমাণিত হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষ কমে এসেছে। কবি তাঁর কাব্যে এমন একটি অধ্যায়কে অপ্রাসঙ্গিক মনে করেছেন, সর্বোপরি এই অংশটি তাঁর কাব্য থেকে বর্জন করেছেন। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কবি হয়তো অস্বস্তিতেই ছিলেন। কিন্তু কবির কাব্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। কবির রচনারীতি অনুসরণ করে এই প্রক্ষিপ্ত অংশটিকে আবিষ্কার করা চলে।

কবি তাঁর কাব্যে সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় যেমন রেখেছেন, তেমনি পুরাণ, মহাকাব্যও যে তিনি পাঠ করেছেন, তার প্রমাণ মেলে। সেকালে কালিদাস পাঠ করতে হলে যে গুরুর টোলে বা পাঠশালায় ভরতি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, বলাই বাহুল্য। কবি যথার্থই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ফলে, আমরা বলতেই পারি, কবির নামের সঙ্গো এমন একটি উপাধি যুক্ত হওয়া অসঙ্গাত নয়। তাছাড়া, কাব্য রচনায় অনেক ক্ষেত্রেই তিনি স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছেন, তা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

কবি পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যের দেবখণ্ডে দেখি, তিনি অপরাপর মনসামঙ্গাল কাব্যের কবিদের কাছে থেকে নানা অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় হল, তিনি সর্বক্ষেত্রে হুবহু

নকল করেছেন, এমন নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, অলৌকিকতা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি বাস্তবতার হাত ধরেই এগোতে চেয়েছেন। একে আমরা কবির মৌলিকত্বই বলব।

'সৃষ্টিপত্তন' অংশে দেখা যায়, ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন রয়েছেন। এমতাবস্থায়, তাঁর কর্ণ থেকে দুই অসুরের জন্ম হয়। তাঁদের দেখে ভীত হন ব্রহ্মা। তিনি ভগবান বিষ্ণুর স্তুতি করতে শুরু করেন। নারায়ণ দেবের কাব্যে রয়েছে—

> অসুর ভএ চিন্তিত প্রজাপতি/কর জুড়ে ব্রহ্মাএ বিষ্ণুরে করে স্তুতি।/যুগ নিদ্রা যায় গোসাই হৈয়া অচেতন/নিদ্রারুপা দেবীরে করহে স্থবন।/তুমি সংহারিনী নিদ্রারূপে জোতির্মএ/প্রভুর চক্ষেত তুমি করিছ আলয়ে।

প্রভৃতি বাইশটি পঙ্ক্তি। কিন্তু পণ্ডিত জানকীনাথ মাত্র চার চরনে তার উপস্থাপনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যথা—

> অসুর দেখিয়া চিন্তিত প্রজাপতি/কর জুড়ে ব্রহ্মাএ দেবীরে করে স্তুতি।/ চক্ষু-নাসিকা-কর্ণ-হৃদয়-উরু হতে/নিকলিলা যুগনিদ্রা ব্রহ্মার সাক্ষাতে।

অলৌকিকতাকে ছাঁটাই করে বাস্তবকেই তিনি গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন। এতে কবির আধুনিক মনস্কতার পরিচয় মেলে। তিনি সময়ের অগ্রগতিকে বুঝতে পেরেছিলেন।

দেবখণ্ড থেকে পণ্ডিত জানকীনাথের স্বকীয়তার একটি চিত্র এখানে তুলে ধরে যেতে পারে। শিব-পার্বতীর বিয়ে বর্ণনায় কবি জানিয়েছেন, শিব বিয়ে করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। শিবের সঙ্গো চলেছে দেবতা-মানুষ-গন্ধর্বরা। কবি লাচাড়ি ছন্দে এর সুনিপুণ বর্ণনা করেছেন। নারায়ণ দেবের বর্ণনায়, শিবের বিবাহযাত্রায় ভুত-প্রেতেরা শিবের সহচর হয়েছে। নারায়ণ দেব যখন গতানুগতিকতাতেই আবদ্ধ থেকেছেন, তখন জানকীনাথ প্রচলিত ছক থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন।

মঙ্গালকাব্য পাঠ ও পর্যালোচনাকালে বঙ্গাদেশে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু সমাজের কৌলীন্য প্রথার মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজ-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে অবশ্যই ভাবনায় রাখতে হয়। প্রায় একই সময়ে বঙ্গো কৌলীন্যপ্রথা ও মুসলমান শাসনের সূচনা ঘটে এবং সমান্তরাল গতিতে এগিয়ে চলতে থাকে। প্রায় সমসময়েই মুসলমান শাসনের যেমন অবসান ঘটে, তেমনি সমাজে কৌলীন্য প্রথারও অবসান ঘটতে থাকে। মনসামঙ্গাল কাব্যে উক্ত দুটি বিষয়েরই প্রতিফলন আমরা লক্ষ করি। কৌলীন্য প্রথা সমাজে অনাচার, ব্যাভিচার, মানবিকতার অবনমনকে ত্বরান্বিত করেছিল। অপরদিকে সমাজের পতিত মানুষেরা হিন্দুধর্মে ঠাঁই না পেয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ইসলাম ধর্মের কাছে। এমনই ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মনসামঙ্গাল কাব্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে। মনসা দেবীর হিংস্রতা যেন তুর্কী শাসকদের আচরণের সঙ্গো সাদৃশ্যপূর্ণ। তাছাড়া, সেসব দিনগুলোতে কৌলীন্য প্রথার ভয়াবহতা সমাজকেও স্পর্শ করেছিল। মঙ্গালকাব্যের কবিরা তাঁদের কাব্যে সেসব দিকগুলোকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছেন।

মঙ্গালকাব্য কাহিনি কাব্য বলে চরিত্রচিত্রণের কাজটি অবধারিত, সব করিরাই নিষ্ঠার সঙ্গো এই কাজটি করেছেন। কবি পণ্ডিত জানকীনাথও এর ব্যাতিক্রম নয়। আর্য সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্য

সংস্কৃতির গণ্ডি ভেঙে নানা পথ পরিক্রমায় শির নানা স্বরূপে বঙ্গে এসে একটা নিজস্ব আদল পেয়েছেন। জানকীনাথ তাঁর কাব্যে শিবকে অনন্যতা দিয়েছেন। সেখানে তাঁর কাব্যে, শিব পত্নীশাসনে সংকুচিত একজন কুলীন ব্রাহ্মণ। আবার বিত্তশালী শিষ্যের কাছে যাজক ব্রাহ্মণ মাত্র তিনি। সর্বোপরি, জানকীনাথের কাব্যে তিনি একজন স্নেহশীল পিতাও বটে।

চাঁদ সদাগরের চরিত্র-চিত্রণেও দক্ষতা দেখিয়েছেন কবি। অষ্টাদশ শতকে বঙ্গ-সমাজের বুকে কৌলীন্য প্রথা ভয়াবহ সামাজিক ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। চন্দ্রধর প্রাচীনপন্থী, কৌলীন্য প্রথার অন্যতম সমর্থক। যতই কাব্য এগিয়ে গেছে, চাঁদ সদাগরের মধ্য দিয়ে, সমাজেব বুকে কৌলীন্য প্রথার ভয়াবহ স্বরূপ ততই স্পস্টতা পেয়েছে। এই চরিত্রটিকে কবি শৈল্পিক সমৃদ্ধিতে উপনীত করেছেন। এখানেই কবির দক্ষতার প্রকাশ লক্ষণীয়।

কুলীনের পরিবারে সন্তানহীনা হওয়ার কারণে নির্যাতিতার প্রতীক রূপেই রানি সনকাকে এঁকেছেন জানকীনাথ। দেবী মনসার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের বৈরিতার কথা জেনেও দেবী মনসার পূজা করতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু চাঁদ সদাগরই তার আকাঙ্ক্ষায় বাঁধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রার্থনা, অনুরোধ এমনকী আত্মহত্যার কথা বলে স্বামীর মন পাওয়ার চেস্টা করে গেছেন তিনি। মধ্যযুগের পুরুষশাসিত সমাজে সনকার এই প্রচেস্টাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মনসার বরেই তিনি ছয় পুত্রের জননী হয়েছেন। আবার মনসাই তাঁদের প্রাণনাশের কারণ হয়েছেন।

যখন সনকা শুনেছেন, চোদ্দোডিঙা মধুকরসহ পুত্ররা ফিরে এসেছে, তখন রাজকীয় আভিজাত্য ভুলে তিনি ছুটে গেছেন গুঞ্জরীর ঘাটে। এখানে অহঙ্কারহীন মাতৃত্বের স্বরূপটিই প্রত্যক্ষ করি আমরা। সব কিছুকে ছাপিয়ে সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার তীব্রতাও কবি সুনিপুণভাবে তাঁর কাব্যে রূপায়িত করেছেন—"সনাকাএ বুক ফুটে ভুমিতে লুটাএ/বুকে ছেন দিয়া পুত্রবধূ কুথা যাএ।"

কবি পণ্ডিত জানকীনাথ তাঁর কাব্যে বেহুলাকে কোনো টাইপ চরিত্র হিসেবে গড়ে তোলেননি। বেহুলার জীবন ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ। যখন বেহুলা বাস্তবের মাটিতে পা রেখেছেন, তখন তা উপলব্ধি করেছেন। আবার এসব পরিস্থিতির সমান্তরালে তিনি ক্রমে ক্রমে তেজস্বিনীও হয়ে উঠেছেন। বেহুলাকে দৈবী প্রভাবমুক্ত রাখতে চেয়েছেন কবি। ফলে নারীর মর্যাদা রক্ষা, সতীত্ব রক্ষার ওপরেই কবি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শির উন্নত রাখতে, বেহুলা প্রতিনিয়ত লড়াই করেছে। স্বাধিকার রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন বেহুলা। এখানে নতুন যুগের নারীদের সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ আমরা দেখতে পাই।

এক সময়ের চপলা কিশোরী বেহুলা যখন বাস্তবের মাটিতে পা রেখেছে, তখনই সে প্রতিকূলতাকে চিনতে পেরেছে। স্বামীর মৃতদেহ ভেলায় ভাসিয়ে সে নিজেও ভেসে পড়েছিল কলার মান্দাসে। সেদিন মানুষের লোভ-লালসার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল বেহুলা। কিন্তু তার দৃঢ় মনোভাব, নিষ্ঠা, সাহসিকতার জোরে নিজেকে রক্ষা করতেও পেরেছে সে।

মনসামঙ্গলের অপরাপর কবিরা দেখিয়েছেন যে, বেহুলা, দেবী মনসার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কবি জানকীনাথ ব্যতিক্রমী। কবি জানকীনাথের কাব্যে বেহুলা যেমন জাতিস্মর নয়, তেমনি মনসার অন্ধ ভক্তও নয়। অন্তরের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে তিনি মনসাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করেছেন। তার দৃঢ় মানসিকতাকে জনতাও প্রত্যক্ষ করেছে। মনসার

পূজা প্রচলনের জন্য চাঁদ সদাগরকে রাজি করাতে বেহুলা যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তেমনি এক্ষেত্রে জনতার সমর্থনও তিনি পেয়েছেন। অনমনীয় চাঁদ সদাগরকে পর্যন্ত টলাতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। কবির কলমে চরিত্রটির সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগতি ও বিস্ময়কর পরিণতির সূত্রে, একজন প্রতিভাবান কবিকেই আবিষ্কার করতে সক্ষম হই আমরা।।

উৎসের সন্ধানে

১. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড) অষ্টম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৪, পৃ. ২৪৭

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (তৃতীয় খণ্ড), ২০০৯-২০১০, চতুর্থ সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৩৭

৩. "পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গালের কবি পন্ডিত জানকীনাথ বিরচিত পদ্মাপুরাণ" শিরোনামাঙ্কিত গ্রন্থটির "পাঠ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ" করেছেন ড. হরেকৃষ্ণ আচার্য। এটির প্রকাশক : অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, ত্রিপুরা। প্রকাশকাল : ২০০৮, তিনি নিজেই পুথি সংগ্রাহক এবং একজন নিষ্ঠাবান পুথি গবেষক। প্রসঙ্গত, বর্তমান আলোচনায় ড. আচার্য-কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে নানা তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

৪. নারায়ণ দেবের দেবখণ্ড ও পন্ডিত জানকীনাথের বনিক খণ্ড মিলিয়ে অন্তত চারবার পদ্মাপুরাণ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই "কবি পরিচয়" উপেক্ষিত থেকে গেছে। নিউ এজ পাবলিকেশনস, ঢাকা থেকে প্রকাশিত (১৩৪৬) দুই কবির মিশ্র গ্রন্থটিতে "বেহুলার টেন্টনার বাঁকে গমন" অংশের শেষে রয়েছে কয়েকটি ছত্র, যেখানে বলা হয়েছে—

    শ্রীভূমি শ্রীহট্টে বাস উত্তম ব্রাহ্মণ।
    কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র শুদ্ধ শ্রীপতি নন্দন।।
    পরম পবিত্র মাতা মহামায়া নাম।
    তান গর্ভে ছয়পুত্র হৈলা গুণধাম।।
    পদ্মার চরণযুগে করি প্রণিপাত।
    দুস্তর সাগর লঙ্ঘে শ্রী জানকীনাথ।।

   গবেষক কর্তৃক এই তথ্য অস্বীকৃত হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা কালে কবির ছয় ভাইয়ের কোনও উত্তর পুরুষের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৫. পাণ্ডুলিপিটি রক্ষিত ছিল কৃষ্ণপুর, কমলপুর, ত্রিপুরা নিবাসী বামাপদ সূত্রধর-এর নিকট। তথ্য : দ্রষ্টব্য ৩ নং পাদটীকায় উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃ. ১৯

৬. দ্রষ্টব্য ৩ নং পাদটীকায় উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃ. ৩১

বাংলা মঙ্গলকাব্যের খাদ্যজগতে মধুররস মিষ্টান্নশিল্প ও মিষ্টান্নবিলাসের আখ্যান

প্রীতম গোস্বামী

ভারতবর্ষে খাদ্য, আহার, স্বাদ এবং পুষ্টির ক্ষেত্রে একটি অন্যতম চিন্তা হল ষড় রস অর্থাৎ মিষ্ট, তিক্ত, অম্ল, কষায়, কটু ও লবণের বিভাজন। এই ষড় রসের মধ্যে প্রথম ও অন্যতম প্রধান হল মিষ্ট বা মধুর রস। সমগ্র উপমহাদেশের খাদ্যরুচিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দক্ষিণ এশিয়ার এই বিশেষ অংশের খাদ্যাভ্যাসে প্রাণীজ প্রোটিনের (মূলত পশুমাংসের) উপর নির্ভরতা সামগ্রিকভাবে বিশ্বের অন্য যেকোনো স্থানাপেক্ষা কম। এহেন পরিস্থিতিতে মিষ্টদ্রব্যের বহুল প্রচলন (খানিকটা পশুমাংসের পরিবর্ত হিসাবেই) একান্ত স্বাভাবিক। প্রসিদ্ধ খাদ্য ঐতিহাসিক K.T.Achaya তাঁর গ্রন্থে বিশেষভাবে দেখিয়েছেন যে ভারতের যেসমস্ত রাজ্যে জৈন ও পরবর্তী কালে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের ফলে নিরামিষ আহার দৃঢ়বিস্তৃত হয় সেইসব অঞ্চলেই মিষ্টদ্রব্য ভোজনও বিশেষ বিকাশ লাভ করে।[১] 'প্রাচীন বাংলাদেশের ইতিহাস' বলতে যে সময়কালকে আমরা বুঝি তা বৃহত্তর উপমহাদেশের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে প্রকৃতপক্ষে 'আদি মধ্য যুগ' (Early Medieval)। এই আদি মধ্য যুগে বাংলা বা গৌড়দেশে যদিও বহুল প্রকারের মৎস্য এবং বিবিধ প্রকার মাংস (এমনকি অনেক স্মৃতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধ মাংস) ভোজনও প্রচলিত ছিল তবুও মিষ্টান্নের প্রচলনও কম ছিল না।

আদি মধ্য যুগের বাংলা (অর্থাৎ মোটামুটিভাবে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলায়) রচিত গ্রন্থসমূহে বিবিধ প্রকার মিষ্টান্নের উল্লেখ আমরা পেয়ে থাকি। বাংলার আদি মধ্য ও মধ্যযুগের মিষ্টান্ন সমূহের উপাদানের মধ্যে প্রধান ছিল ধান ও ধান্যজাত দ্রব্য যেমন লাজ (খই), চিপিটক (চিঁড়া) ইত্যাদি, আখের গুড় (পরবর্তী কালে গুড়কে চোলাই করে চিনি প্রস্তুত করা শুরু হয়), দুধ ও দুগ্ধজাত) এবং নারিকেল। বিবিধ দুগ্ধজাত খাদ্য যথা ঘি, ক্ষীর, মাখন ইত্যাদি উচ্চবর্গীয় মানুষদের অন্যতম খাদ্য ছিল যেগুলি মিষ্টান্ন হিসাবেও গণ্য হত। এছাড়াও মিষ্টান্নের মধ্যে ছিল খাজা, নাড়ু (লড্ডুক), খাঁড় (খণ্ড, পাটালি বা নবাত জাতীয় গুড় বা চিনির শক্ত মিষ্টান্ন), ফেনি (ফানিত বা বাতাসা), কদমা (কদম্ব ফুলাকৃতি চিনির শক্ত মিষ্টান্ন), খিরিস, দ্রগড় (পাতলা দই) দুগ্ধশাকর (চিনির পায়স), খণ্ডশালুক (নবাত বা তিলুয়া) ইত্যাদি।[২] আদি মধ্যযুগের বাংলার কবি শ্রীহর্ষ রচিত নৈষধচরিত কাব্যে উল্লেখ আছে বরফশীতল কোন মিষ্টান্নের। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত প্রাকৃতভাষার পদসংকলন 'প্রাকৃতপৈঙ্গাল'-এ আছে ঘি দিয়ে 'পাকানো' মণ্ডার কথা।[৩] কালবিবেক ও কৃত্যতত্ত্বার্ণব গ্রন্থে উল্লেখ আছে কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে আত্মীয়-বন্ধুদের চিঁড়া ও বিভিন্ন

প্রকার সন্দেশ দ্বারা আপ্যায়িত করতে হত। আখের রস ও গুড় সাধারণভাবে একটি প্রিয় পানীয় ছিল। আখের রস জাল দেওয়া নূতন গুড়ের সুবাসে আমোদিত সম্পন্ন গ্রামের বর্ণনা আছে সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোকে।[৪] মিষ্টান্ন স্বাদ ও প্রস্তুতির এই ঐতিহ্যই আরও বিস্তৃত ও বিপুল মৌলিকতার স্বাক্ষর নিয়ে আসে মধ্য ও আদি আধুনিক যুগের বাংলায়। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলার যে সমস্ত সাহিত্যধারায় আমরা এই মিষ্টান্নের বিপুল বর্ণনা পাই তার মধ্যে অন্যতম হল মঙ্গালকাব্য ধারা।

মঙ্গালকাব্যের মিষ্টান্নের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও উপাদান : আদি মধ্যযুগের মতোই মধ্যযুগেও বাংলার মিষ্টান্ন প্রস্তুতের প্রধান উপকরণগুলি ছিল ধান ও ধান্যজাত দ্রব্য যেমন চাল, চালগুঁড়া, খই, চিঁড়া, মুড়ি ইত্যাদি, তিল, তিলগুঁড়া, আখের গুড়, বাটা চিনি, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য যেমন ক্ষীর, ঘি ইত্যাদি এবং বিভিন্ন ফল যেমন নারিকেল, তালরস ইত্যাদি। মিষ্টান্নের স্বাদবৃদ্ধির জন্য কর্পূর ও বিভিন্ন মশলা তাতে যোগ করা হত। পিঠা প্রস্তুত করার জন্য আটা ব্যবহার করার কথা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে পাওয়া যায়(নির্মাণ করিতে পিঠা, বিশাদরে কিনে আটা, ক্ষণ্ড কিনে বিশা সাত আট)।[৫] অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের রচনায় পাই ঘি ও ময়দা সহযোগে 'ঘিওর' জাতীয় মিষ্টান্ন তৈরির কথা আশডাল ব্যবহার করে 'মুগের শামুলি' তৈরির কথা। যে ছানা বর্তমানে বাংলার মিষ্টান্নের প্রতিভূস্বরূপ তার কোনো উল্লেখ মঙ্গালকাব্যে পাওয়া যায় না। রসগোল্লা সন্দেশ ইত্যাদি ঊনিশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও গ্রামদেশে 'কলকাতার মিষ্টি' নামে পরিচিত ছিল।[৬] এই সকল মিষ্টান্ন যে পর্তুগীজ মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারকরা বাংলার বিভিন্ন বন্দরের কাছাকাছি প্রস্তুত করত তা আমরা ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণে পাই।[৭]

বাংলার নিম্নভাগে বিশেষত হুগলি, নদীয়া ও মুরশিদাবাদ অঞ্চলে বিপুল আখের উৎপাদন ছিল যা খাঁড় গুড় ও চিনির সরবরাহকে নিশ্চিত করত। পর্তুগীজ পর্যটক দুয়ার্তে বারবোসা যিনি ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাংলায় আসেন তিনি তুলা, ধান ও চিনিকে বাংলার প্রধান রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। ফরাসী পর্যটক লুডোভিকো দ্য ভার্থেমা বাংলার কোনও একটি নূতন শহরে (শহর-ই-নও) বিপুল পরিমাণ ধান, চিনি, কার্পাস এবং আদার সরবরাহের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগীজ পর্যটক ও ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারক সেবাস্টিয়েন ম্যানরিক গৌড় শহরে চিনিদ্বারা প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকার উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নের (appetizing sweets) স্বাদ গ্রহণ করেন।[৮] মধ্য অষ্টাদশ শতকে ফরাসি চিকিৎসক ও পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের বাংলায় চিনি উৎপাদন ও রপ্তানীর বিপুল সমৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন। বার্নিয়ের জানান যে বাংলার চিনি সড়ক ও জলপথে উপমহাদেশের মধ্যে পাটনা, মসলিপট্টম, করোমণ্ডল উপকূলের বিভিন্ন বন্দর, গোলকুন্ডা, কর্নাটকের বিভিন্ন অঞ্চল, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা এমনকি পশ্চিমে আরব, পারস্য ও মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন বন্দরে পৌঁছাত। বাংলায় চিনিকে চোলাই করে 'বুলেপঞ্জ' বা 'বেঙ্গাল অ্যারাক' নামে একপ্রকার অত্যন্ত কড়া মদ প্রস্তুত হত।[৯] কাজেই মিষ্টান্ন প্রস্তুতির কোন মৌলিক উপাদানের জন্য পরনির্ভরশীল হতে হয়নি। এই সকল কৃষি উপাদানের দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্নের বহুল ব্যবহার ও আস্বাদনের উল্লেখ আমরা সমসাময়িক সাহিত্যে পাই। মিষ্টান্নে ব্যবহৃত বিভিন্ন মশলা ও কর্পূরের ব্যবহার ষোড়শ শতক থেকে বৃদ্ধি পায়। ইউরোপীয় বণিকরা (মূলত পর্তুগীজ ও ডাচ) বাংলায় আসার ফলে বাংলা, করোমণ্ডল, মালাবার ও দক্ষিণ পূর্ব এশীয়ার মশলা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যে বাণিজ্যিক সূত্র (trade network) স্থাপিত হয় তার ফলশ্রুতিতে এইসকল মশলা বাংলার হাটে পৌঁছায়।[১০]

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বণিক পর্বে আমরা দুর্বলা দাসীকে হাট থেকে মিষ্টান্নের জন্য কর্পূর, এলাচ ও লবঙ্গ ক্রয় করতে দেখতে পাই (বাজারে কর্পূর নাই, চাহি বলি ঠাঁই ঠাঁই, যতনে পেলাম পাঁচ তোলা)।[১১]

একথা অনস্বীকার্য যে মধ্যযুগের বাংলায় মিষ্টান্ন বর্ণনার বৃহত্তম সূত্রটি মঙ্গালকাব্যের ধারা নয় বরং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য। সপ্তদশ থেকে সবেগে বিকাশশীল বিভিন্ন চৈতন্যচরিত সাহিত্যগুলি, বৈষ্ণব আধ্যাত্মিক গ্রন্থগুলি, রাধাকৃষ্ণ লীলাবর্ণনা গ্রন্থগুলি ও বিভিন্ন বৈষ্ণব পুরোধা ব্যক্তিত্বদের জীবনীগ্রন্থগুলিতে মিষ্টান্নের ব্যাপক উল্লেখ ও পরীক্ষা দেখতে পাওয়া যায়। মূলত আমিষাহার নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে তার স্থান পূরণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা শাকসব্জী ও দুগ্ধ এবং মিষ্টান্নজাতীয় দ্রব্য নিয়ে প্রভূত পরীক্ষানিরীক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু এই বর্ণনাগুলির তুলনায় সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও (আমিষ ও নিরামিষ ব্যাঞ্জনকে মুখ্যস্থান ছেড়ে দেওয়ার ফলে) মঙ্গালকাব্যগুলিতে মিষ্টান্নের প্রচুর উল্লেখ এবং বৈচিত্র্য দেখা যায়। বৈষ্ণবসাহিত্যগুলি মূলতপক্ষে নদীয়া এবং রাঢ় অঞ্চলে রচিত হয়েছিল। ফলে এই গ্রন্থগুলিতে এই সব স্থানেরই মিষ্টান্নের বর্ণনা পাওয়া যায়। অপরদিকে মঙ্গালকাব্যগুলি রাঢ়, বঙ্গাদেশ, সমতট, বরেন্দ্রভূমি, হরিকেল বা চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীর কবিদের দ্বারা রচিত হয়। ফলে যে বিপুল আঞ্চলিক বৈচিত্র্য (subregional variation) মঙ্গালকাব্যে খাদ্যাভ্যাসগুলিতে দেখা যায় তার প্রকৃষ্ট চিহ্ন আমরা মিষ্টান্নের বর্ণনাতেও পাই।[১২] অপরদিকে মধ্য ষোড়শ শতক থেকে চৈতন্যপন্থী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব রাঢ় অঞ্চলেও সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে এই অঞ্চলে রচিত মঙ্গালকাব্যগুলিতে বিশেষত ধর্মমঙ্গাল কাব্যগুলিতে মিষ্টান্নের ক্রমবর্ধমান উল্লেখ দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা মানিকরাম গাঙ্গুলী, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক, যাদুনাথ ও নরসিংহ বসু প্রমুখের ধর্মমঙ্গাল কাব্যগুলিতে মিষ্টান্ন ও ঘৃতপক্কের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের কৃষ্ণনগর রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের রচনায় 'ঘিওর' প্রভৃতি উত্তরভারতীয় মিষ্টান্নের উল্লেখ পাওয়া যায় যা মঙ্গালকাব্যের কবিদের অন্য রাজ্যের খাদ্যাভ্যাসের সাথে পরিচিতির সুস্পষ্ট প্রমাণ। অষ্টাদশ শতকে তীর্থ পর্যটক শৈবভাবাপন্ন চণ্ডীমঙ্গালের কবি রামানন্দ যতীর কাব্যে আমরা বহু আধুনিক মিষ্টান্নেরও নাম পাই যেগুলির অনেকগুলিই উত্তরভারতের। তীর্থ পর্যটক কবি এগুলির সাথে সেখানেই পরিচিত হন অনুমান করা যায়।[১৩] সাধারণভাবে বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লিখিত মিষ্টান্নের মতোই মঙ্গালকাব্যের মিষ্টান্নগুলিকেও দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—১. গুড়, চিনি, নারিকেল, রস, চিঁড়া, আটা, চালগুঁড়া, ডালবাটা ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত কঠিন মিষ্টান্ন যা জলযোগ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। ২. চাল, দুধ ও অন্যান্য গব্য দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্ন যা মধ্যাহ্নভোজনের শেষে মিষ্টখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

মঙ্গালকাব্যে মিষ্টান্ন : বর্ণনা ও বৈচিত্র্য : বাংলা মঙ্গালকাব্যগুলিতে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে মিষ্টান্নের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রথমত আমিষ ও শাকসবজির ব্যাঞ্জনের পাশে মিষ্টান্নের স্বল্পায়তন উপস্থিতি এবং দ্বিতীয়ত মিষ্টান্নের বর্ণনায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য। মৎস্য ও মাংসের বিপুল বাহুল্যযুক্ত পূর্ববঙ্গে রচিত মঙ্গালকাব্যগুলির (পূর্ববঙ্গে রচিত মঙ্গালকাব্যগুলি প্রায় সবই মনসামঙ্গাল) এই বৈশিষ্ট্যগুলি খুবই স্পষ্ট। পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গালের জনপ্রিয়তম কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে আমরা পাই যে চাঁদ সওদাগর ও তার পুত্রদের জন্য সনকা প্রচুর শাকসবজি ও মৎস্য মাংসের ব্যাঞ্জন প্রস্তুত করে অবশেষে—

মিষ্টান্ন অনেক রান্ধে নানাবিধ রস।
দুই তিন প্রকারের পিষ্টক পায়স।।
দুগ্ধে পিঠা ভালোমত রান্ধে ততক্ষণ।[১৪]

এই অতিশয় নিরাভরণ বর্ণনার আরো সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাই সনকার সাধ ভক্ষণে। মৈমনসিংহের কবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে মিষ্টান্নের বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে লখীন্দরের খাওয়ার জন্য বেহুলার ভ্রাতৃবধু তরকা অন্যান্য রন্ধনের শেষে পরমান্ন, পিঠা, কলসে দুগ্ধ আবর্তন করে তাতে রসবাস ও মরিচের গুঁড়ি মিশ্রিত মিষ্টান্নপদ, দুধে গুড় ও রাঁধুনী ফোড়ন মিশ্রিত করে খিরিসা, আলুবড়া, চন্দ্রপুলি, ঘৃতসিক্ত মনোহরা, লালবড়া, চন্দ্রকাতি, বুটি পিঠা, দুধে চুয়ানো বাটি ভরা পাত পিঠা ইত্যাদি প্রস্তুত করে।[১৫] সপ্তদশ শতকে পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গালের কবি দ্বিজ বংশীদাসের রচনায় আমরা ঘৃতে ভাজা চিঁড়ে ও নারিকেল দিয়ে মিষ্টান্ন প্রস্তুতের কথা পাই যা পূর্ববঙ্গের মঙ্গালকাব্যগুলিতে দুর্লভ। তাঁর পদ্মাপুরাণে আমরা দেখি সনকা, চাঁদের বাণিজ্যযাত্রার আগে রন্ধনের সময়—

ঘৃত পোয়া চন্দ্রকাইট আর দুগ্ধপুলি।/আইল বড়া ভাজিলেক ঘৃতেতে মিশালি।।/জাতিপুলি ক্ষীরপুলি চিতলোটি আর।/মনোহরা রান্ধিলেক অনেক প্রকার।।/অন্ন ব্যাঞ্জন রান্ধি করিল প্রচুর।/ফলারের দ্রব্য কৈল মুগের অঙ্কুর।।/আদা চাকি চাকি আর ভুনা কলাই।/ঘৃতের দুভাজা চিড়া শর্করা মিশাই।।/সুগন্ধি শালির চিড়া গন্ধে আমোদিত।/খণ্ড খণ্ড নারিকেল তাহাতে মিশ্রিত।।/উত্তম ক্ষীরসা দিয়া গঙ্গাজলী লাড়ু।/ইক্ষুরস রাখিলেক ভরি লোটা গাড়ু।।[১৬]

এই শালি ধানের চিড়ার ফলার ও আখের রস দুইই পূর্ববঙ্গের মঙ্গালকাব্যের বর্ণনায় বিরল। দ্বিজ বংশীদাসের রচনায় বহুল আলোচিত বৈষ্ণব প্রভাবের উদাহরণ হিসাবে এই দুই বৈষব পরিমণ্ডলে প্রচলিত পদের উল্লেখ করা যেতে পারে। নিম্নবঙ্গ অঞ্চলের কবি বিপ্রদাস পিপলাই তাঁর অষ্টাদশ শতকে রচিত মনসামঙ্গালে পরমান্ন রন্ধনের এক অতি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। লখিন্দরের জন্মের আগে সনকার সাধ ভক্ষণে তাঁর বধূমাতারা দুগ্ধ, গুড়, শর্করা নবাত, বিবিধ পিষ্টক, গুড়, দুধ মিশ্রিত অন্ন, দুধে ভিজা আসকে পিঠা, দুগ্ধ চুষি, ক্ষীর পুলি,নারিকেল পুলি, মুগ সামুলি, রুটী, সরু চাকলি, গুড় মিশ্রিত লাউএর ব্যাঞ্জন ইত্যাদি তৈরি করেন। তারপর সুক্ষ তণ্ডুল ও দুধ ভিজিয়ে রাখে। তারপর—

পশ্চাতে শর্করা দিয়্যা ওল্যায়া রাখিল। আর বধূ এক হাড়ি ঘৃত চড়াইল।।
সুপক্ক হইল ঘৃত দেখিয়া সত্বর। পরমান্ন দিল নিয়া তাহার উপর।।
লবঙ্গা মরিচ জিরা আর জায়ফল। এলাইচ দালচিনি গুড়াইয়া সকল।।
আগে নারিকেল কোরা দিলেক তাহাতে। সকল মশলা লইয়া দিলেক পশ্চাতে।।
ঘন ঘন কাটি দিয়া ঢালিলো পাত্রেতে। শাল্যা তণ্ডলের অন্ন রান্ধে হরষিতে।।[১৭]

সমস্ত মঙ্গালকাব্যের ভোজন বর্ণনায় এই বিবরণটিতেই মিষ্টান্ন প্রস্তুতে সর্বাধিক মশলার বিবরণ পাওয়া যায়। রাঢ় অঞ্চলের কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গালে পিঠা তৈরির জন্য দুর্বলা দাসীকে আটা এবং নানাবিধ মশলা তৈরি করতে দেখিয়েছেন। তাঁর ফুল্লরা, খুল্লনাদের সাধের মিষ্টান্নে বেশিরভাগই আছে দুধ, দই এবং চিঁড়া ও খুদের ফলার আর নারিকেলের ছাঁই এবং চালগুঁড়িতে তৈরি পিঠা। এই মিষ্টান্নের সাধের বর্ণনাগুলি বাংলা সাহিত্যে প্রবাদপ্রতীম হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুল্লনা তার সাধের জন্য যেসব মিষ্টান্ন চায় তার মধ্যে আছে মহিষের দুধ থেকে তৈরি দই, চিনি, খই এবং পাকা কলা মিশ্রিত ফলার। এছাড়াও খুল্লনা চায়—

মনে করি সাধ খাইতে মিঠা।/ক্ষীর নারিকেল ছাঁইর পিঠ।।/দুগ্ধ তিলগুঁড়ি মিশায়ে ল।/দধির সহিত খুদের জাউ।।/চিঁড়া পাকাকলা দুধের সর।/কহি দুয়া এই শুন গো আর।।/ঝুনা নারিকেল চিনির গুঁড়া।/কহি আপনার সাধের চূড়া।।[১৮]

দীর্ঘদিন বাদে ধনপতি সওদাগর দীর্ঘদিন বাদে গৌড় থেকে উজানি ফিরলে খুল্লনা স্বামীর জন্য রন্ধনের শেষে কলাবড়া, নুগশাউলি, ক্ষীরমোননা, ক্ষীরপুলি, পায়েস ইত্যাদি প্রস্তুত করে।[১৯] ত্রিবেণী নিবাসী চণ্ডীমঙ্গালের কবি দ্বিজমাধব তাঁর সারদামঙ্গালে দেখিয়েছেন যে খুল্লনা বিভিন্ন আকারের ও সজ্জার পিঠা প্রস্তুত করে ধনপতির প্রত্যাবর্তনের পর—

ক্ষীরপুলি গঠি রামা হরষিত হয়ে।/ডুবাইল ওলাইল তাহে ঘনাবর্ত পয়ে।।/অপূর্ব পিস্টক রান্ধে লাল মৃণাল।/চুপি পানা পিঠা রান্ধে অতিশয় ভাল।।/সমুদ্রের ফেনা পিঠা অতিশয় গনি।/দুগ্ধ-চুয়া চন্দ্রকান্তি রান্ধে সুবদনী।।/কলাবড়া পিঠা রান্ধে মনের হরিষে।/নানান সুগন্ধি দিয়া সম্ভারয়ে শেষে'।।[২০]

রাঢ় অঞ্চলের মহাকাব্য বলে পরিচিত ধর্মমঙ্গালগুলিতে রাঢ় অঞ্চলের আমিষ খাদ্যের অপ্রতুলতার কারণেও বটে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের ফলেও মিষ্টান্নের প্রাচুর্য দেখা যায়। বিবিধ লাড্ডু, ঘৃতপক্ক লুচি, মণ্ডা, মালপোয়া, মিছরি ও ক্ষীরখণ্ড এই অঞ্চলের মিষ্টান্নের বৈশিষ্ট্য সপ্তদশ শতকের কবি রামদাস আদকের অনাদিমঙ্গালে আমরা ডোমদের ভাঙপূজার বিবরণে পাই—'ক্ষীরখণ্ড রাখে কত চিনি চাঁপা কলা/ মধুর পিঠে মিলনে সৌরভ বহে যায়/ ওদন ব্যাঞ্জন পিঠে পরিপূর্ণ তায়।'[২১] আদি অষ্টাদশ শতকের কবি ঘনরাম দাসের শ্রীধর্মমঙ্গালে (আনুমানিক ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে রচিত) আমরা রানি রঞ্জাবতীর সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানের বিবরণে পাই—

ক্ষীরখণ্ড ছেনা ননী চিনি চাঁপাকলা।/পাঁচ পিঠা প্রচুর পায়েস পাত খোলা।।/মজামর্তমান মিছরি মিশাইয়া দই।/কাছে বসি হরিষে খাওয়ায় কোন সই।।[২২]

নায়ক লাউসেনকে আপ্যায়িত করে তার অধিকারে আনতে গোলাহাটে গণিকা সুরীক্ষা যে বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে তার মধ্যে আছে নানাপ্রকার ভাঙ মিশ্রিত মিষ্টান্ন এবং সুমিষ্ট অন্ন—

সকাল বকাল কত মিছরি মিশাইয়া।/দুগ্ধ মারি ক্ষীর করি রাখে জুড়াইয়া।।/উড়ি জ্বালি গুঁড়ি কুটি সাজাইল পিঠা।/ক্ষীরখণ্ড ছানা ননী পুর দিয়া মিঠা।।/ঘৃতপক্ক লুচি পুরি নাগর উদ্দেশে।/অপূর্ব উড়ির অন্ন রান্ধে অবশেষে।।[২৩]

বীরভূম নিবাসী ধর্মমঙ্গালের কবি যাদুনাথের বর্ণনায় আমরা রঞ্জাবতীর সাধ ভক্ষণে ঘিয়ে ভাজা চিঁড়া-মুড়ি, ফেনি ও মিছরি মিশ্রিত তরমুজ এবং দুধে ফেলা ঘৃতসিক্ত চালাজার, ফেণী বাতাসা দিয়ে দইভাত ও ভাজা ক্ষীরপিঠার উল্লেখ পাই। অষ্টাদশ শতকের অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে রাঢ় অঞ্চলে ঘৃতপক্কের ক্রমাগত প্রসারের লক্ষণ এই বর্ণনাগুলি।[২৪] তবে ধর্মমঙ্গালগুলির মধ্যে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গালে মিষ্টান্নের বর্ণনা সর্বাধিক। বীরভূম রাজের সচিব নরসিংহ মুর্শিদাবাদে বীরভূম রাজের প্রতিনিধি ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নাগরিক সংস্কৃতির সাথে পরিচিত নরসিংহের মিষ্টান্নের বর্ণনা বিস্তৃত, আধুনিক ও রাজসিক। তাঁর বর্ণনায় রাজকুমারী কলিঙ্গাকে যে সব মিষ্টান্ন উপচারে দেবীপূজা করতে দেখি তার মধ্যে আছে মালপোয়া, সরভাজার, আটাভাজার মত আধুনিক মিষ্টান্নও—

দুগ্ধ ননি ছানা পানা চাছি ইক্ষুদণ্ড।/উপহার মিষ্টান্ন নবাত লুচিখণ্ড।।/মালাই সন্দেশ মণ্ডামুণ্ডি সরভাজা।/মালপুয়া ভুজা লাড্ডু পেড়্যা পেলো খাজা।।/চিড়া মুড়ি মুড়কি বাতাসা বান্দ্যা খই।/ডালা ডালা আটভাজা হাড়া দশ দই।।[২৫]

তাঁর রচনায় ব্রাহ্মণভোজনেও আমরা পাই ছানা, পানা, লুচি, নাড়ু, দধি, মধু, নিখুতি, নবাত, মণ্ডা, মতিচুর, ক্ষীর, ভৃঙ্গারপূর্ণ সুশীতল জল প্রভৃতির উল্লেখ।[২৬] ধর্মমঙ্গাল কাব্যগুলিতে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই যে এই মিষ্টান্নগুলি মূলত উচ্চবিত্তশ্রেণির খাদ্য হিসেবে গণ্য ছিল। ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্মমঙ্গালে নায়ক লাউসেনের অনুপস্থিতে মহামদ ময়নানগর আক্রমণ করলে সেনাপতি কালু ডোম যখন যুদ্ধদানে অনিচ্ছা জানিয়ে তার প্রাচীন আরণ্যক জীবনে ফিরে যেতে চায় তখন তার স্ত্রী লখ্যা ডোমনী তাকে ধিক্কার দিয়ে বলে—

> সম্প্রতি ভোজনকালে কোলে থাল গাড়ু।/সুখে খেতে খুদকুঁড়া এবে তুচ্ছ লাড়ু।।/বেজার হয়েছে বুঝি খেতে খেতে ঘি।/জেতের স্বভাব নাথ তোরে দোষ কি।।[২৭]

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ঘৃত, লাড়ু ইত্যাদি মিষ্টান্ন রাজানুকুল্য ভুক্ত বা উচ্চ অর্থশালী লোকেরই ভোগ্য ছিল। তবে ডোম সম্প্রদায়ের মদ্য মাংস নির্ভর খাদ্যাভ্যাসে যে মিষ্টান্ন সর্বদা রুচিকর ছিল না তা ধর্মমঙ্গালগুলির উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় (দধিদুগ্ধ ঘৃতে তবে প্রীত নয় বাড়া/না হয় পারনা মোর মদ্য মাংস ছাড়া)।[২৮]

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গাল কাব্যে (১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত) শ্রোতারা রাজানুগ্রহপুষ্ট কৃষ্ণনগরের বিদগ্ধ জনসাধারণ যাদের কলারুচির মতো আহাররুচিও ছিল বিদগ্ধ ও আর্থিক প্রাচুর্যপুষ্ট। ভারতচন্দ্রের ভোজন বর্ণনার বিন্যাসেও তাই রয়েছে উচ্চবিত্ত পরিমণ্ডলের উপযোগী একপ্রকার আহার্য ও রন্ধন বর্ণনা যা প্রায়শ বাংলার বাইরের এবং মুর্শিদাবাদী নবাবী 'রসুইয়ানা'র সাথে পরিচিত ছিল। তাঁর মাংসাদি বর্ণনায় যেমন সেকচি সামোসা, শিক কাবাব, কোফতা, বাঘা, কালিয়া, রসার বর্ণনা পাওয়া যায় তেমনি মিষ্টান্নের বর্ণনাতেও উত্তর ভারতীয় ঘিওর, রামরোট, মিষ্টি খিচুড়ি, বাজরার চাল ও ভুরা গুড় মিশ্রিত পরমান্ন ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায় সমকালীন নানা বাঙালি মিষ্টপদের পাশাপাশি। তাঁর মিষ্টান্নের তালিকায় আছে—

> অম্বল রান্ধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা।/সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা।।/বড়া এলো আসিকা পীযূষী পুরী পুলী।/চুষি রুটী রামরোট মুগের সামুলী।।/কলাবড়া ঘিওড় পাপড়ভাজা পুলি।/সুধারুচি মুচি মুচি লুচি কতগুলি।।/পিঠা হইল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা।/চালু চিনা ভুরা বাজরার চালু দিলা।।/পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।/বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার।।[২৯]

সপ্তদশ শতকের আগে বাংলায় ঘৃতপক্ক রুটী, লুচি, পুরীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে গোপীজনবল্লভ দাস বিরচিত বিখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রচারক রসিকানন্দ মুরারীর চরিতগাথা রসিকমঙ্গালে আমরা প্রথম 'নুচি', 'রুটি' ও 'পুরী' শব্দ পাই।[৩০] অষ্টাদশ শতকে রচিত বিপ্রদাস পিপিলাই, ঘনরাম চক্রবর্তী ও ভারতচন্দ্রের মঙ্গালকাব্যের ঘৃতপক্কের উল্লেখগুলির তুলনা করলে আমরা পাই যে এই রুটি বা লুচিগুলিকে সেই সময় সরাসরি মিষ্টান্নরূপেই দেখা হত ও তাদের পরিবেশনও হত শেষ পাতে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হিসাবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থগুলির তুলনায় কম হলেও ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে রচিত মঙ্গালকাব্যগুলির ভোজন পরিধিতে (gastronomic space) যথেষ্ট গুরুত্ব রেখেছিল। বাংলার ভোজনবৈচিত্র্যের ও রন্ধনপদ্ধতির স্থানীয় বিভেদগুলি জানতে গেলে এই বর্ণনাগুলির আশ্রয় নিতেই হয়। মিষ্টান্ন চিরকালই বাংলায় আপ্যায়নের সম্পর্কবন্ধনের প্রতীকস্বরূপ গণ্য ছিল। কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গাল কাব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোন বন্দিদশা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মুক্তির প্রতীক হিসাবে পরিস্কৃত জলে স্নান ও মিষ্টান্ন ভোজন করান হত।[৩১] বিপ্রদাস

পিপলাই ও কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে বাংলা, মালাবার, করোমণ্ডল ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উপকূলের (SouthEast-Asian Archipelago) মধ্যে ইউরোপীয় বণিকরা ও তাদের ভারতীয় সহচরদের মাধ্যমে যে মশলা বাণিজ্য চক্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার ফলে বহু মশলা বাংলাতেও পৌঁছেছিল এবং এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, জিরা, জায়ফল, মরিচ, মহুরী ইত্যাদি মশলা ব্যবহৃত হত মিষ্টান্ন প্রস্তুতিতে। যদিও পোর্তুগীজ ও ডাচদের অবদান ছানার মিষ্টান্ন তখনো মিষ্টান্নক্ষেত্রে প্রবেশ করেনি তবু মিষ্টদ্রব্যের বৈচিত্র্য ছিল বিস্ময়কর। এই বিষয়ে পূর্ণ অনুসন্ধান মধ্য ও আদি আধুনিক বাংলার খাদ্য ইতিহাস তথা আর্থ-সামাজিক ইতিহাসে নতুন আলোকপাত করার সম্ভাবনা রাখে।

উৎসের সন্ধানে

১. K. T. Achaya, Indian Food : A Historical Companion, Oxford University Press, New Delhi, 1998 edition, pp. 133-34

২. সুকুমার সেন : ‘প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ,পৃ. ৫১

৩. Taponath Chakravarty : ‘Food and Drink in Ancient Bengal’, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1959, p. 17

৪. নীহাররঞ্জন রায় : ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব’, কলিকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০০৯ সংস্করণ, পৃ. ৪৪৭

৫. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : ‘কবিকঙ্কন চণ্ডী’, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯২১, পৃ. ১৬১

৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ‘ইছামতী’, দ্রষ্টব্য বিভূতি উপন্যাস সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড, কামিনি প্রকাশণ, কলিকাতা, ২০১১, পৃ. ২৩৮

৭. বিনয় ঘোষ : ‘বাদশাহী আমল’, অরুণা প্রকাশনী, কলিকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৮, পৃ. ২০৮

৮. Biplab Dasgupta : ‘Trade in Pre-Colonial Bengal’, Social Scientist, 2000, 28 (5-6), pp. 47-49

৯. Francois Bernier : ‘Travels in the Mogul Empire A.D. 165-1668, revised by Vincent Arthur Smith, Oxford University Press, London, 1916, pp. 436-441

10. David L. Curley : Poetry and History : Bengali Mangal-Kabya and Social Change in Precolonial Bengal, Chronicle Books, New Delhi 2008, pp. 165-176

১১. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : ‘কবিকঙ্কন চণ্ডী’, পৃ. ১৬২

১২. Utsa Ray : ‘Culinary Culture in Colonial India : A Cosmopolitan Platter and the Middle Class’ New Delhi : Cambridge University Press, 2015, pp.

আধুনিকের চর্চায় মনসামঙ্গল

শর্মিষ্ঠা নিয়োগী

In the Chinese zodiac circles, the snake is often viewed as a symbol of immense wisdom. However, in India, especially in the Hindu mythology, snakes are seen fearsome entities representing eternity as well as maternity, life as well as death. (Wikipedia)

শুধুমাত্র ভারত এবং চিনেই নয়, এশিয়ার আরও অনেক দেশে ইয়োরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকার পুরাণেও সর্পদেবতার উল্লেখ আছে। হিন্দু মিথোলজির জন্ম ও মৃত্যুর এই দেবতাকে কেন্দ্র করে প্রচুর লোককাহিনি তৈরি হয়েছে—সবই মৌখিক সাহিত্য। তুর্কি আক্রমণের পর মুসলমান শাসনের সময় বাংলার হিন্দু জনসমাজ এতটাই বিপন্ন ও অস্থির হয়ে উঠেছিল যে সেইসময় তারা হিন্দু দেব-দেবীকে বিশ্বাস করেও শান্ত হতে পারছিল না, নতুন নতুন দেব-দেবীকে খুঁজে নিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিল। এই সময় অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকে আমরা মঙ্গলকাব্য বা দেব-দেবী বন্দনামূলক কাব্যে লৌকিক দেবী মনসার কাব্য পেলাম কানা হরিদত্তের রচনায়। পঞ্চদশ শতকে নারায়ণ দেব ও বিজয়গুপ্ত দুজনেই মনসামঙ্গল রচনা করেছেন 'পদ্মাপুরাণ' নামে। এছাড়াও সেই সময়কার আরেকজন উল্লেখযোগ্য কবি বিপ্রদাস পিপিলাই। তাঁর কাব্যের নাম 'মনসাবিজয়'। সপ্তদশ শতকে পেলাম কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল এবং জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল। অষ্টাদশ শতকে জীবনকৃষ্ণ মিত্রের মনসামঙ্গল পাওয়া গেল। লক্ষণীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের কালপর্বে যে মঙ্গলকাব্য পাওয়া যায় তার টেক্সট টুকুই আমাদের হাতে আছে। কবির অভিপ্রায় সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি না কারণ কবির জীবনী, ডায়ারি, সাক্ষাৎকার কিছুই নেই। শুধু কালগত প্রেক্ষিত থেকে আমরা বুঝতে পারি দেবতার প্রবল প্রতাপের ছবিটাই তাঁরা আঁকতে চেয়েছিলেন, এর বেশি কিছু নয়।

কারণ, বিশ শতকে যখন মনসামঙ্গল কাব্যের ব্যাখ্যায় নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে উচ্চবর্গের দ্বন্দ্ব অথবা প্রান্তিক মানুষজনকে কেন্দ্রে আনার অভিপ্রায়ের আলোচনা উঠে আসে তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে—এই ব্যাখ্যা আধুনিক পাঠকের নিজস্ব সময় ও প্রেক্ষিতের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা। মনসামঙ্গালের কবিদের যে ঠিক কী অভিপ্রায় ছিল তা আমাদের পক্ষে অভ্রান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। উনিশ শতকে মঙ্গালকাব্য হিসেবে মনসামঙ্গল আর লেখা হল না, কিন্তু মনসা যাত্রার প্রচলন হল। যদিও যাত্রার প্রচলন অষ্টাদশ শতকে, তবু সেই যাত্রা ছিল মূলত রামলীলা, কৃষ্ণলীলা নিয়ে। মনসার কাহিনি যাত্রার অন্তর্ভুক্ত হয় উনিশ শতকে। মনসা যাত্রার পাশাপাশি রয়ানি বা জাগরণ পালার প্রসার ঘটে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ এলাকায়। পূর্ববঙ্গে শ্রীহট্ট-কাছাড়

এলাকায় মনসা পুজোর সময় রাত্রিব্যাপী যে মনসামঙ্গল গানের অনুষ্ঠান হয়, সেখানে মুখ্য গায়কের ভুমিকায় থাকে গুরমা বা নপুংসক পুরোহিতরা। এখানে গুরমারা সর্পাঘাতের চিকিৎসাও করে থাকেন, তাই মনসামঙ্গল অনুষ্ঠানে তাদের অভিধা হয় 'ওঝা'। এই সঙ্গীতানুষ্ঠানের স্থানীয় নাম ওঝাগান অথবা পদ্মাপুরাণ গান। মনসা পুজোর পৌরোহিত্যে অবশ্য গুরমাদের ভুমিকা নেই, কিন্তু ওঝাগানে তাদের অগ্রাধিকার স্বীকৃত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে গুরমারা ডরাই দেবীর পুজোয় পৌরোহিত্য করে। মনসা পুজোর সঙ্গে গুরমার এই সম্পর্কটা খুব স্বাভাবিক কারণেই স্থাপিত হয়েছে। ডরাই মূলত জলদেবী, মনসাও তাই, তার জন্মও জলাশয়ে। মনসামঙ্গলে জালো ও মালোর যে কাহিনি রয়েছে তাতে মনে হয় মনসা ছিলেন ধীবরদেরও দেবী। অন্যদিকে ডরাই সর্পধারিণী, সেই সূত্রে সর্পদেবীও বটে। মনসাপুজো লোকসমাজে তুলনামূলক বিচারে অনেক বেশি আদৃত এবং বিস্তৃত, সেক্ষেত্রে সবলতর কাল্ট হিসেবে তা স্বাভাবিক ভাবেই ডরাই কে আত্মস্থ করেছে। (সূত্রঃ প্রাচীন ভারতের মাতৃপ্রাধান্যঃ কিংবদন্তীর পুনর্বিচার, সুজিত চৌধুরী, প্যাপিরাস, কলকাতা, মে, ১৯৯০, পৃ. ৬৬)। গুরমারা পদ্মাপুরাণ গানে অংশগ্রহণ করে নর্তকীর বেশে এবং চামর ব্যবহার করে, তবে অশ্লীলতার মাত্রা ডরাই পুজোর তুলনায় এখানে অনেক কম দেখা যায়, সংগীত ও নৃত্যাংশও অনেকখানি শিল্পসম্মত। তাহলে দেখা যাচ্ছে সময় যত এগিয়েছে, মনসামঙ্গল তার সাহিত্যরূপকে অতিক্রম করে অভিকরণ শিল্পের দিকে ক্রমশ নিজেকে বিস্তার করে জনপ্রিয় সংস্কৃতির অভিজ্ঞান নির্মাণ করেছে।

বিশ শতকে সাহিত্য সংরূপের ক্ষেত্রে 'মনসামঙ্গল'-কে বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হচ্ছে এক অন্যরকম ভাবনা থেকে। এই কালপর্বে প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাচ্ছি কালিদাস রায়ের 'চাঁদ সদাগর' কবিতা। কালিদাস রায় তাঁর 'ব্রজবেণু' কাব্যগ্রন্থের এই কবিতায় 'চাঁদ সদাগরকে বিংশ শতকের রাষ্ট্রনৈতিক ষড়যন্ত্রের প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন যাকে দৈব বা নিয়তির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়। এখানে যেন যুগ যন্ত্রণাকে ধারণ করে আছে নায়ক চাঁদ সদাগর। এরপর সময় যত এগিয়েছে আধুনিক কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিকদের চর্চায় চাঁদ, মনসা, বেহুলা চরিত্রগুলি নিজেদের প্রাতিস্বিকতা তৈরি করে নিচ্ছে। প্রত্যেকেই একটি বিশেষ সামাজিক স্তরের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রাতিস্বিকতা তৈরির এই বিষয়টি কিন্তু মধ্যযুগের প্রেক্ষিতে লেখকের ভাবনায় আসা সঙ্গত বা স্বাভাবিক ছিল না। Individual personality-র ধারণা বিংশ শতকের ভাবনার ফসল। ফলে, শম্ভু মিত্র যখন 'চাঁদ বণিকের পালা' লিখছেন তখন দৃষ্টিকোণের বদল ঘটেছে—ব্যক্তি হয়ে উঠেছে ভরকেন্দ্র। সেই ব্যক্তিকে মহাশক্তিধরের প্রতিনিধি করে দেখালেন প্রচণ্ড শক্তিমান যে তাকেও পরাজয় স্বীকার করতে হয়। মনে রাখতে হবে এর আগেই তিনি 'রক্তকরবী' অভিনয় করেছেন এবং সেখানেও দেখানো হয়েছে যন্ত্র সভ্যতা যত ক্ষমতাধর হয় তত তার শক্তি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। হতে পারে 'রক্তকরবী' নিয়ে চর্চাকালীন মনসামঙ্গালের কাহিনি তাঁকে এইভাবেই ভাবিয়েছিল। পরে, এই রকম ভাবনা নিয়েই নাটক লিখেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—'সওদাগরের নৌকা' (১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম মঞ্চস্থ হয়), এই নাটকের প্রধান চরিত্র প্রসন্ন একজন যাত্রা শিল্পী। কিন্তু বয়সের ভারে কাজ না করতে পেরে তিনি কার্যত পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, যার জন্য তিনি ক্রমশ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অস্থিরতা সমাজের চোখে হয়ে দাঁড়ায় 'পাগলামি'। সেই পাগলামি তাঁর একমাত্র ছেলেও সহ্য করতে না পেরে তাঁকে আঘাত করে বসে। রাগের বশে তেমনটা করে ফেললেও পুত্র 'কালো' ক্রমে অনুতপ্ত বোধ করে এবং পিতার কাছে ক্ষমা চায়। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ প্রসন্ন পুনরায় পালাগান করার সুযোগ

পান, তাঁর শিল্পীসত্তা জেগে ওঠে, যাত্রাদলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন কিছুদিনের জন্য। চাঁদ সদাগরের ভূমিকায় অভিনয় করেন। কিছু উপার্জন হবার পর বাড়ি ফিরে আসেন। পরে আবার বড়ো যাত্রাদলের কাছ থেকে ডাক পান পালাগানের জন্য। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন বলে তারা গৌণ চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করার প্রস্তাব দেয়। প্রথমে নারাজ হলেও পরে প্রসন্ন রাজি হন পারিবারিক স্বচ্ছলতা ও আত্মসম্মানের কথা ভেবে এবং যাত্রাদলের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন এক অজানার পথে—চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রার সঙ্গে এই অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা যেন মিলে যায়। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয় শামসুর রহমানের কবিতা "চাঁদ সদাগর", 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' (১৯৮৩) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত হয়ে। যে কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই কবি ব্যক্তির এই প্রাতিস্বিকতাকে রূপকায়িত করেন—"আমি কি এখন সত্যি বেঁচে আছি? না কি জীবন্মৃত পড়ে আছি বিড়ম্বিত মাস্তুলের মতো"। আধুনিক পৃথিবীর অর্থনৈতিক সংকট ধরা পড়ে এই কবিতার শুরুতেই—

> বণিকের/খ্যাতি আছে কিছু টিকে, অথচ যাইনা বাণিজ্যেতে/কতকাল, কতকাল সপ্তডিঙ্গা ভাসেনা তরঙ্গে/ সমুদ্রের জ্বলজ্বলে প্রাসাদের মতো হা আমার/ মধুকর সেই কবে গেছে ডুবে কালীদহে।

মনসামঙ্গলে সর্পদেবী মনসা যেমন যেন তেন প্রকারেন চাঁদের পুজো পাওয়ার জন্য তাঁকে কতরকম ভাবেই না বিপর্যস্ত করেছেন, এখানেও আধুনিক সমাজের শোষকগোষ্ঠী মনসার রূপকে বর্ণিত হয়েছে—

> কতবার চ্যাংড়ামুড়ি কানি/নানা ছলে কেড়ে নিয়ে আমার ঘর্মাক্ত দিনান্তের/কষ্টার্জিত অন্ন খলখল ব্যাপক উঠেছে হেসে,/ভেবেছে অভুক্ত আমি ক্ষুধার করাতে চেরা, ভয়/পেয়ে হবো নতজানু, ঘটে তার ঠেকাব আমার।/ অবসন্ন মাথা দীন/ভিক্ষুকের মতো।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—এই কবিতায় সমকালীন অবক্ষয়কে কবি যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা দেশ কালের ঊর্ধ্বে চিরন্তন সত্যকে চিহ্নিত করে—

> ঘরে ঘরে এমন কি প্রত্যেকের মগজের কোষে/কোষে দোলে ফণা, নিত্য দিন-দুপুরেই/পথিক লুণ্ঠিত হয় জনাকীর্ণ চৌরাস্তায় আর/প্রহরী নিশ্চল দিকচিহ্ন শুধু। এখন বাছেনা/ঠগ কেউ, পাছে গাঁ উজাড় হয়ে যায়, উপরন্তু/নারীর শ্লীলতাহানি করে না অবাক কারুকেই।/সৎ অসতের ভেদাভেদ লুপ্ত, মিথ্যার কিরীট/বড়ো বেশি ঝলসিত দিকে দিকে, লাঞ্ছিত, উদ্ভ্রান্ত/সত্য গেছে বনবাসে।/আন্ধার প্রথার কাছে আনুগত্য করেছে স্বীকার /স্বেচ্ছায় সবাই প্রায়, অদ্ভুত আচার, কুসংস্কার/মেলেছে অদৃশ্য ছাতা সুবিশাল, শিবিরে শিবিরে/ভীষণ বিভক্ত আজ বিপন্ন মানুষ।

এই কবিতায় সমাজের চরম অবক্ষয়কে দেখানো হয়েছে এবং এখানে চাঁদ সদাগর আধুনিক, সচেতন, মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের প্রতিনিধি। তিনি এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েও পারছেন না। কারণ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই এই অসামাজিক কার্যকলাপকে সমর্থন করে, তাদের মধ্যে সৎ চিন্তা ও মূল্যবোধের অভাব বড়ো বেশি প্রকট। মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্বকে কবি এখানে নতুনভাবে রূপায়িত করেছেন—"আন্ধার প্রথা" এখানে মনসার প্রত্নপ্রতিমাকে ধারণ করে পুরাণের নবনির্মাণ ঘটিয়েছে।

অমিয়ভূষণ মজুমদার লিখেছেন 'চাঁদবেনে' উপন্যাস (১৯৯৩)। মনসামঙ্গলের প্রসঙ্গ তিনি 'গড় শ্রীখন্ড' উপন্যাসেও এনেছেন। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কাহিনি অবলম্বনে অমিয়ভূষণ এই 'চাঁদবেনে' উপন্যাসটিই রচনা করেছেন। তবে চাঁদবেনে অমিয়ভূষণের নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টি। প্রথম তরঙ্গ, দ্বিতীয় তরঙ্গ, তৃতীয় তরঙ্গ ও চতুর্থ তরঙ্গ—এই চারটি পর্বে এবং ২৯টি অধ্যায়ে রচিত এই উপন্যাসে অষ্টম ও নবম শতকের বাংলা ও বাংলার বাইরের সুদূর পূর্বদ্বীপপুঞ্জ থেকে

ভূমধ্যসাগরের বিস্তৃত অংশকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন তিনি। সেই সময়ের মানুষের কথা, যখন মানুষের মধ্যে অলৌকিক বিশ্বাসের পাশাপাশি বিজ্ঞানচেতনাও ছিল ম্যাজিক ও রিয়ালিটির মতোই। সেইসব মানুষদের পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রেম-ভালোবাসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার গল্প যেমন উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে, তেমনি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়েছে। দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক দেখানোর জন্যই তিনি উপন্যাসের কাহিনিতে অলৌকিক ও বাস্তবকে মিলিয়েছেন। মনসামঙ্গালের চাঁদসদাগর এখানে নেই, এই উপন্যাস চম্পাবতী নদীতীরবর্তী সমতট চম্পকনগরের বণিক চন্দ্রশেখর বসুর বাণিজ্যিক জীবনের কাহিনি। এই চন্দ্রশেখর বসুর বাণিজ্যিক জীবনের কাহিনির সূত্রেই উপন্যাসে এসেছে বাণিজ্য যাত্রার প্রসঙ্গ, বাণিজ্যযাত্রার সমস্যা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বণিকের সভা, যৌথ বাণিজ্য, বাণিজ্যের হিসেব ও লভ্যাংশ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গ। ‘চাঁদবেনে’ উপন্যাসে চন্দ্রশেখর বসুর চরিত্র মনসামঙ্গালের চাঁদ সদাগরের মতো ট্র্যাজিক মহিমাসম্পন্ন না হলেও তাঁকেও শত বিপর্যয়ের মধ্যেও উচ্চাশার সঙ্গে তা অতিক্রম করে সাগরদ্বীপের উত্তর উপকূল পেরিয়ে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরি এগিয়ে চলার মতো করেই এগিয়ে চলতে হয়েছে। এইভাবেই ফুটে উঠেছে চাঁদ বেনের বিপদসংকুল জীবনের কাহিনি।

একবিংশ শতকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—‘সওদাগরের নৌকা’র পুনর্নির্মাণ করেন দেবেশ চট্টোপাধ্যায়। ২০১৬ সালে দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের নাট্য সংস্থা ‘সংসৃতি’ এটি মঞ্চস্থ করে আমেরিকায়। ২০১৮ সালে দেবেশবাবু নিজেই সম্পূর্ণ নতুন করে একটি নাটক লিখলেন ‘চাঁদ মনসার কিসসা’, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গাল কাব্য অবলম্বনে। মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম প্রযোজিত হয় নাটকটি, পরিচালনায় ছিলেন শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। এই নাটক সম্পর্কে একটি দৈনিক পত্রিকায় দেবেশ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

> কনটেন্টওয়াইজ এটা শুধুমাত্র মনসামঙ্গাল নয়। ধর্ম নিয়ে যে চারপাশে এতকিছু ঘটছে, ধর্ম নিয়ে যে পক্ষ তৈরি হয়, তাদের হার-জিত হতে থাকে, এই খেলাটা যে আমাদের দেশে অনবরত চলছে সেটা অ্যাড্রেস করা দরকার ছিল। তাই শুধু মঙ্গালকাব্যের মতো নয়, এর মধ্যে দুটো ভাঁড়ের চরিত্র আছে, যারা অনবরত সময়টাকে ধরে ক্রিটিসাইজ করতে করতে যায়। বেহুলা যখন ভেসে যাচ্ছে তখন কেউ ওকে বলছে না যে যাওয়ার দরকার নেই বা কেউ ওকে তেমন হেল্পও করেনা। এদিকে এত কাণ্ড করে সে যে স্বামীকে বাঁচায় সেই স্বামী প্রথম প্রশ্ন করে যে বেহুলা সতী কিনা, সেটা প্রমাণ দিতে হবে। আজও কিন্তু মেয়েরা এ রকম নানা প্রশ্নের মুখে পড়ে। সে দেরি করে বাড়ি ফিরলে তাকে প্রশ্ন করা হয়, যাবতীয় এথিকস তাকেই ধরে রাখতে হয়। এদিক দিয়ে এই মঙ্গালকাব্য কোথাও যেন কনটেম্পোরারি। প্রশ্ন হল মনসামঙ্গাল কার? চাঁদের সম্মান প্রতিষ্ঠার গল্প নিম্নবর্গীয় দেবী হিসেবে মনসার লড়াইয়ের কাহিনি? না বেহুলার একক সংগ্রামের গল্প? (এই সময়, ২১ মার্চ, ২০১৮)

একবিংশ শতকের প্রেক্ষিতে দেবেশ চট্টোপাধ্যায় তাঁর চাঁদ মনসার কিস্‌সার মধ্য দিয়ে আত্মা বনাম ধর্ম তথা দেশ বনাম ধর্মকে দেখালেন। দেবেশবাবু দেখিয়েছেন ‘মনসা’ দেবী হিসেবে এক এক করে সবার কাছ থেকে স্বীকৃতি পেতে চেয়েছেন কিন্তু চাঁদ তাঁকে অন্য দেবতার সঙ্গে একাসনে দেখতে রাজি হননি এবং মনসার সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ও আনুগত্য অর্জন করতে চেয়েছেন। সুতরাং দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে দুই পৃথক অবস্থান থেকে কিন্তু একটাই লক্ষ্যে—ব্যক্তিগত দর্শনের প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মের ভাষ্যে। এই প্রসঙ্গে চাঁদ মনসার কিস্‌সার Director’s note—এ দেবেশ জানিয়েছেন—

> In today’s world, it seems, destination will remain forever elusive unless we

absorb the insults thrust upon us. As if penumbra of failure, sinfulness and inequity circumvents into the radiant sphere of success. Hence skepticism has become a dominant ideology of modernism. And also, in the theatre of self-awakening. The traditionally—celebrated Chaitanyaesque precept—trinadapi sunicen that had been hermeneutically popularized as abiding faith has been swept away by the multipronged collision of egoism, power and politics between the subaltern snake-goddess and the mercantile protagonist Chand Banik. (www.theatresansriti.org)

তাই আধুনিক সময়ের দাবিতেই মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগর হয়ে ওঠে আধুনিক সমস্যা সম্পন্ন মানুষ। ২০১৯ সালে প্রকাশিত "Gun Island" উপন্যাসে অমিতাভ ঘোষ দেশান্তরণ (Migration) -এর গল্পের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন চাঁদ সদাগরের কাহিনিকে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ডিন দত্ত নিউইয়র্কের দুষ্প্রাপ্য বই ব্যবসায়ী। ডিন তাঁর অন্তর্জগতে শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাতেন, কিন্তু একদিন তাঁর নিজস্ব দৃঢ় বিশ্বাস বদলে গেল, তিনি বাধ্য হয়ে বেরিয়ে পড়লেন এক অসাধারণ যাত্রাপথে। যে পথের গল্প রচিত হল ভারত থেকে ভেনিস হয়ে লস-অ্যাঞ্জেলস যাত্রার অভিজ্ঞতায়। ভেনিসে ডিনের সঙ্গে পরিচয় হয় এক বন্দুকী সদাগরের। বন্দুকী সওদাগরের অর্থ শুধুমাত্র বন্দুক ব্যবসায়ী নয়, ডিন জেনেছিলেন দূর অতীতে ভেনিসের আরবী নাম ছিল আল-বুন্দুকিভ্যা, সেই থেকে ভেনিসগামি সব সওদাগরই বন্দুকি সওদাগর নামে পরিচিত হতেন। সেই ডিন সুন্দরবনে এলেন সপ্তদশ শতকের বণিকের (যাকে বলা হয়েছে বন্দুকি সওদাগর) সঙ্গে সর্প-দেবী মনসার সংঘাতের রহস্যকে উন্মোচন করার জন্য। পরে ডিন ভেনিসে যান এই বন্দুকি সদাগরদের বিষয়ে আরও গবেষণার জন্য, সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন প্রচুর বাংলাদেশি বে-আইনি অনুপ্রবেশকারী শ্রমিক হিসেবে সেখানে কর্মরত। সেই সব দেশান্তরিত বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিপজ্জনক জীবন কাহিনি স্থান পায় তাঁর উপন্যাসে। তাঁর কাহিনির বৃত্ত তাই দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে এক অসীম অনন্তের দিকে পাড়ি দেয়। সুন্দরবনের ব-দ্বীপ থেকে ইতালির ভেনিস সবই হয়ে যায় সেই মানচিত্রের অন্তর্গত। পরিযায়ী মানুষের সমস্যার সমান্তরালে চলতে থাকে চাঁদ-মনসার কাহিনি। নিঃস্ব, সর্বস্ব হারানো চাঁদ সদাগর কখন যেন মিশে যায় আধুনিক জনতার মিছিলে। শতকের পর শতকে আধুনিকের চর্চায় এইভাবে চর্চিত হতে থাকে মনসামঙ্গল কাব্য। সময়ের সঙ্গে সমান্তরালে চলতে চলতে, চর্চিত হতে হতে, আধুনিক বিশ্লেষণী তত্ত্বকে অনায়াসে ধারণ করে নিয়ে প্রাসঙ্গিক হতে পারে আধুনিকের চর্চায়।

উৎসের সন্ধানে

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৮৯

২. সুজিত চৌধুরী : 'প্রাচীন ভারতের মাতৃপ্রাধান্য : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার', প্যাপিরাস, মে,১৯৯০

৩. শামসুর রাহমান : 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ', বিভাস, বাংলাদেশ, ২০১৬ (এই কবিতার পিডিএফ দেখা যাবে www.bangla-kobita.com-এর ওয়েবসাইটে।)

৪. অমিয়ভূষণ মজুমদার : 'চাঁদ বেনে', গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ বৈশাখ, ১৪০০

৫. দেবেশ চট্টোপাধ্যায় : "Director's note", www.theatresansriti.org

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর নারী মনস্তত্ত্ব এবং নারী চরিত্রের আধুনিকতা ও অভিনবত্ব

রাকিবুল হাসান বিশ্বাস

মঙ্গলকাব্যগুলি মূলত দেব-দেবীর মহিমা প্রচারমূলক কাব্য। তাই এইসব কাব্যে অলৌকিকতার আমদানি কোনো বিস্ময়কর কিংবা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। চণ্ডীমঙ্গালের কাহিনি দেব-দেবী মাহাত্ম্যমূলক হলেও এবং মাঝে মাঝে অলৌকিক কাহিনির বর্ণনা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এবং বিশেষ করে চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে কবির বাস্তববোধের প্রশংসা না করে পারা যায় না। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গালে জীবনের যে প্রত্যক্ষ রূপ, যে স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রচুর জীবনরস-রসিকতা পাওয়া যায় তা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব।"

কবিকঙ্কণের কাব্য প্রথাবদ্ধ সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বন্ধ হয়ে পড়েনি এর কারণ হল কবির আধুনিক মনোভাব ও দূরদৃষ্টি। সমসাময়িক যুগ ও জনতার সন্তুষ্টি বিধান করেও কবিকঙ্কণ শেষপর্যন্ত যুগোত্তীর্ণ কবি; কেননা, তাঁর কাব্যের মহিমা আজও ক্ষুণ হয়নি বরং আরও মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে উত্তরোত্তর, এখানেই কবির স্বাতন্ত্র্যতা। কবিকঙ্কণের জীবনবোধের গভীরতা তাঁকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির উপাদান সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছে আর সে কারণেই গতানুগতিক মঙ্গালকাব্যের ধারায় অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন কবি। কাহিনির পাশাপাশি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি বিশেষত নারী চরিত্রগুলিও প্রথাবদ্ধ গণ্ডি ভেঙে বাস্তবমুখী, আধুনিক এবং শাশ্বত হয়ে উঠেছে।

২

ফুল্লরা কালকেতুর ধর্মপত্নী। কালকেতুর বিয়ের পরই ফুল্লরার শ্বশুর-শাশুড়ি কাশী চলে গেছে। ফুল্লরা ও তার স্বামী দু'জনের সংসার। কালকেতু সারাদিন পশু শিকার করে মৃত পশুর ভার নিয়ে অপরাহ্নে বাড়ি ফেরে। ফুল্লরা যত্ন করে স্বামীর জন্য রান্না করে রাখে। স্বামীর সাড়া পেয়েই সে স্বামীর আহারের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে—

দূর হইতে ফুল্লরা বীরের পেয়ে সাড়া।
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণ চামড়া।।
মোচা নারিকেলেতে পুরিয়া দিল জল।
ঝাটি জল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল।।

শুধু গৃহকর্ম সেবা নয় ফুল্লরা মাংসের পসরা নিয়ে হাটে বিক্রি করতেও যায়। শাকপাতা তুলে

উদারান্নের ব্যবস্থাও করে। ফুল্লরার প্রকৃত পরিচয় সে স্বামী সোহাগিনী। সংসারের অভাব-দারিদ্র্য সে হাসিমুখে সহ্য করে। ঘরে খাবার না থাকলে সখীর বাড়ি থেকে ক্ষুদ ধার করে আনে। নয়তো শাকপাতা ফলমূল খেয়ে থাকে। নিজের দুঃখ দারিদ্রের জন্য সে অদৃষ্টকে নিন্দা করেছে, নিজের বা-মাকেও দোষ দিয়েছে। কিন্তু কখনো স্বামীকে দোষী করেনি—

বড় ভাগ্য মনে গনি বড় ভাগ্য মনে গনি।
কতশত জোঁক খায় নাহি খায় ফনি।।

এই দুঃখের মাঝেই ফুল্লরার সুখ তার স্বামীকে নিয়ে। কিন্তু সেই স্বামীকে অধিকার করতে তার ঘরের দরজায় চণ্ডী যখন টোকা দিয়েছে তখনই ফুল্লরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। নানাভাবে সে এই সুন্দরীকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেছে, সে শুনিয়েছে পুরাণ, বর্ণনা করেছে বারোমাসের দুঃখ-কথা। বারোমাসের বিবরণী পেশ করার পরেও যখন দেবী বলেন—"থাকিব দুজনে যদি না বাসহ লাজ।" তখন ফুল্লরার ক্রোধ ও অভিমান গিয়ে পড়ে কালকেতুর ওপর—

পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।।

এবং এরপর কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই ফুল্লরা আবার বলে—

বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটীর ঘরে শোভা পাইবে উর্বশী।।

বলাবাহুল্য ফুল্লরার এই উক্তি তিরস্কার নয় বরং এর পিছনে রয়েছে অনুরাগ, চোখের জলেই তার প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং ফুল্লরা যে স্নেহে, মমতায়, ভক্তি-শ্রদ্ধায়, সেবায়, পরিচর্যায়, ঈর্ষায়, বিদ্বেষে, অভিমানে ও আশঙ্কায় এক জীবন্ত নারী হয়ে উঠেছে তা অস্বীকার করা যায় না।

৩

লহনা বাঙালি ঘরের অতি সাধারণ বধূ। কোনো বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লেখক তার চরিত্রে অঙ্কন করেননি। লহনা ধনপতির প্রথম স্ত্রী। প্রথম জীবনে সে যথার্থই স্বামীর স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছিল। অন্যান্য নারীর মতো সেও স্বামীর সোহাগের ভাগ দিতে নারাজ। যখন সে শুনল যে তার স্বামী তারই ভগ্নী রূপসী খুল্লনাকে বিবাহ করতে চাইছে, তখনি তাকে নিদারুণ অভিমান গ্রাস করেছে—

লহনা লহনা বলি ডাকে সদাগর।
অভিমান ভরে রামা না দেয় উত্তর।।

কিন্তু চতুর ধনপতি শাড়ি আর গহনা দিয়ে অভিমানিনী লহনার চিত্র জয় করে নিয়েছে। যে-কোনো সাধারণ রমণীর মতোই লহনা শাড়ি-গহনা ও মিষ্টিবাক্যে বশীভূত হয়েছে। পাঁচপল সোনা, পাটশাড়ি পেয়ে সে স্বামীকে পুনর্বিবাহের অনুমতি দিয়েছে—

রত্ন পায়্যা যত্নে নিল লহনা যুবতী।
বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি।।

লহনা সাদাসিধে সরলা প্রকৃতির। খল, কপটতা, কটুবুদ্ধি তার মধ্যে নেই। বাণিজ্যযাত্রাকালে ধনপতির লহনার হাতে খুল্লনাকে অর্পণ করে জননীর মমতায় পালন করতে অনুরোধ জানিয়েছে। লহনা সেজন্যে পরম স্নেহে সযত্নে খুল্লনার পরিচর্যা করেছে—

দুই সতীনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া লাগয়ে ধন্দ
সুবর্ণে জড়িত যেন হীরা।

কিন্তু দাসী দুর্বলা দুই সতীনের সখীত্ব সহ্য করতে পারল না। তারই কুমন্ত্রণায় লহনার বুকে সপত্নীর প্রতি ঈর্ষানল জ্বলে উঠল। শুরু করল খুল্লনার প্রতি অত্যাচার। সখী লীলাবতীর সাথে পরামর্শ করে ধনপতির নির্দেশিত জাল চিঠি দেখিয়ে মারধর করতেও দ্বিধা করেনি সে। আবার এক সময় দৈবনির্দেশে লহনা-খুল্লনার বিবাদ মিটে গেছে। তার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করেছে। খুল্লনাকে প্রবোধ দিয়ে বলেছে—

বৈর ভাব না ভাবিও মনে।
যার সনে বারোমাস একত্র করিবে বাস
অবশ্য কোন্দল তার সনে।।

সপত্নী কোন্দলের বিচিত্র গতি, ঈর্ষা, বিবাদ, মান-অভিমান, মানভঞ্জনের মধ্যে দিয়ে খুল্লনা লহনা চরিত্র দুটি প্রাণময়ী বাস্তব নারীরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

৪

খুল্লনা ধনপতি দ্বিতীয় স্ত্রী। সে অপরূপা সুন্দরী পরিপূর্ণ যুবতী এবং রসিকা। ধনপতি পলাতক পায়রা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য খুল্লনা শরণাপন্ন হলে ধনপতির সঙ্গে পরিহাস করতে ছাড়ে না সে—

ঈষৎ হাসিয়া রামা করে পরিহাস।/পারাবত হেতু সাধু তুমি ছাড়ো আস।।/আজিকার মত ছাড় মোর অনুরোধ।/আপনাআপনি সাধু করহ প্রবোধ।।

খুল্লনা নিতান্ত নির্বোধ নয়। বিয়ের পর সে তার বড়ো বোন তথা সতীন লহনার অনুগত হয়েই ছিল। কিন্তু সেও ধীরে ধীরে সতীন বিদ্বেষে জড়িয়ে পড়ে। ধনপতির নামে লেখা চিঠিখানা সে জাল বলেই গ্রহণ করেছে—

প্রভুর অক্ষর নহে দেখি ভিন্ন ছন্দ।
কেবা এ নিখিল পত্র করিয়া প্রবন্ধ।।

লহনা তার উপরে দৈহিক উৎপীড়ন শুরু করলে সেও নিরবে সহ্য করেনি। নিজে দুর্বলা হলেও সে লহনার অত্যাচারের উত্তর দিতে অগ্রসর হয়েছে—

চুলোচুলি দোঁহে অঙ্গনেতে করে।
চেয়ে রহে সবে নিবারিতে নারে।।

কিন্তু লহনার শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে খুল্লনাকে বাধ্য হয়ে লহনার আদেশ মেনে চলতে হয়েছে। খুল্লনা ছাগরক্ষণ স্বীকার করেছে—

এমন শুনিয়া রামা দুয়ার ভারতী।
ছাগরক্ষণে তবে দিল অনুমতি।।

মহামায়া চণ্ডী যখন কানন মধ্যে খুল্লনাকে বর দিতে চাইলেন, খুল্লনা তখন সুকৌশলে নিজের মনোভাবটি ব্যক্ত করেছে—

পুত্রবর মাগিব কি স্বামী নাহি ঘরে।
কি করিব বহুধন আছয়ে ভাণ্ডারে।।

শ্রীমন্তের জন্মের পর শিশুর অভিভাবক হিসেবে খুল্লনার অবদান যথেষ্ট। পিতার অবর্তমানে শ্রীমন্তের যথার্থ অভিভাবিকা রূপে সে সমস্ত কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে। বাৎসল্যময়ী জননী হিসেবে খুল্লনা এই পর্বে অতুলনীয়া।

খুল্লনা চরিত্রে কিছু কিছু অলৌকিকতা আছে, তবুও চরিত্রটিতে বাস্তব মানবীয় সুখ-দুঃখ, ঈর্ষা-অভিমান পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

৫

দুর্বলা দাসীর চরিত্রটি রামায়ণের মন্থরার চরিত্রের আদর্শে পরিকল্পিত। কিন্তু মন্থরার সঙ্গে পার্থক্যও রয়েছে প্রচুর। লহনার প্রতি দুর্বলার সহানুভূতি থাকলেও দুই সতীনের ঝগড়া বাধিয়ে মজা দেখার উদ্দেশ্যেই সে অনেক সময় লহনাকে উত্তেজিত করেছে। দুই সতীনের ভাব তার মোটেই সহ্য হয় না—

দুই সতীনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া দুর্বলা।
হৃদয়ে হইল তার কালকূট জ্বালা।।

দুর্বলা যেন এখানে নারদ ঠাকুরের ভূমিকা নিয়েছে। সে নিছক কোন্দল বাধানোর উদ্দেশ্যেই লহনাকে খুল্লনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। কেননা তাঁর মতে—

যেই ঘরে দুই সতীনে না হয় কোন্দল।
সেই ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল।।

খুল্লনার গর্ভাবস্থায় দুর্বলাই তার একমাত্র সঙ্গী হয়ে উঠেছে। খুলনার সাধভক্ষণের কাজ দুর্বলাই সমাধা করেছে। শ্রীমন্তের জন্মের পর আনন্দিত হয়ে নবজাতকের ক্রিয়াকর্মাদি সম্পন্ন করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে হাসিমুখে। শ্রীমন্তের ঠিকুজি নির্মাণ করার জন্য গণককে ডেকে এনেছে। আবার মাতা পুত্রের কথোপকথনের সময় কিংকরীর মতো ভৃঙ্গারে জল নিয়ে এসে শ্রীমন্তের পাও ধুইয়ে দিয়েছে দুর্বলা।

সুতরাং দুর্বলা শুধু খল বা চতুরা নারী নয়, সে একজন সাধারণ নারীও বটে। কবিকঙ্কণ তার ছলচাতুরি সাজসজ্জা, বেসাতি, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা যেমন চিত্রিত করেছেন, পাশাপাশি তার প্রভুভক্তি, মমতা, কর্মদক্ষতাকেও দৃশ্যায়ন করেছেন।

৬

কবিকঙ্কণ জীবনরসিক কবি। সর্বোপরি লোকচরিত্র সম্বন্ধে ছিল তাঁর নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি। সেই শক্তি বলেই তিনি চরিত্রের খুঁটিনাটি দিককে তুলে ধরে তাদের সমস্যা ও মানসিকতাকে নিপুণভাবে রূপ দেওয়ার চেস্টা করেছেন, যার ফলে তাদের চিন্তায়-চেতনায়, মননে দেখা দিয়েছে এক ভিন্নধর্মীতা, যা তাদেরকে ঈর্ষাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর রূপে গড়ে তুলেছে। আর তাই বণিক খন্ডের কাহিনিতে সবচেয়ে আকর্ষণীয় কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে সপত্নী সমস্যা, বারোমাস্যার মতো ঘটনা এবং লহনা-খুল্লনার মতো চরিত্রের মনস্তত্ত্ব।

লহনা ধনপতির প্রথম পত্নী। খুল্লনাকে ধনপতি দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে চান। এই সম্বন্ধে খুল্লনা বা রম্ভাবতীর সায় নেই; কারণ, তিনি একজন নারী হয়ে সতীনের ঘরে মেয়েকে ঘর করতে পাঠাবেন কী করে? স্বামীকে বলেন—

খুল্লনা বান্ধিয়া গলে মরিব গঙ্গার জলে
নাহি দিব দারুন সতীনে।

এর কারণ হিসেবে রম্ভাবতী বলেছে—

নাহিক মধুর কথা যে ঘরে লহনা সতা
ভেবে দেখ যেন বাঘিনী।
বিচারে হইয়া অন্ধ পদ গলে দিয়া বন্ধ
ভেট দিবে খুল্লনা হরিণী।।

অন্যদিকে ভাবী সতীনের আগমনে লহনার মনস্তত্ত্বকেও সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন কবিকঙ্কণ। লহনা দুর্বলাকে বলেছে—

কানে তোর দিব হেম চিন্তহ আমার ক্ষেম
যেমতে সম্বন্ধ ভাঙ্গা যায়।

যে জায়গায় তার একমাত্র অধিকার সেই অধিকার ভাগ সে অন্যজনকে দেবে কেন?

শোকানলে পোড়ে মন। দাবানলে যেন বন
আঁখিজল নিবারিতে নারি।
এ শেল রহিল মনে স্বামী দিব অন্যজনে
সঞ্চয় করিয়া ঘরবাড়ি।।

কিন্তু ধনপতির নারী মনস্তত্ত্ব জানা ছিল বলেই লহনাকে বশ করে বিবাহের অনুমতি আদায়ে কোনো কষ্ট হল না তার—

রত্ন পেয়ে যত্নে নিল লহনাযুবতী।
বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি।।

কবিকঙ্কণ লোকজীবনের নিপুণ রূপকার। তাই দুই সতীনকে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন, যাতে সমস্যা আরও বেশি করে ঘণীভূত হয়। এক্ষেত্রে তিনি নারী মনস্তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে সমস্যাটিকে নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন। লহনা বিগত যৌবনা বন্ধ্যা নারী এবং সেজন্য সমাজে তার অমর্যাদা। কিন্তু তারই সতীন যৌবনবতী সন্তানসম্ভবা। এই সমস্ত কারণে লহনার মনে সৃষ্টি হয়েছে হীনম্মন্যতাবোধ। লহনার এই হীনমন্যতাবোধকে মূলধন করে সপত্নী-সমস্যাকে আরও প্রকট করে দেখিয়েছেন কবিকঙ্কণ; কেননা, মানুষের হীনমন্যতাবোধ মানুষকে অসৎ কাজে লিপ্ত করে তাকে গড়ে তোলে প্রতিশোধপরায়ণ চরিত্ররূপে। লহনার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

শুধু বণিকখণ্ডে নয়, ব্যাধখণ্ডের বিভিন্ন চরিত্রে বিশেষত ফুল্লরার চরিত্রেও নারী-মনস্তত্ত্বকে সুনিপুণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন কবিকঙ্কণ। সতীন সন্দেহে সে দেবীকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। সতী নারীর আদর্শ ও কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছে এবং নিজের বারোমাসের দুঃখ কষ্টে অতিরঞ্জিত বিবরণী দেবীর কাছে পেশ করেছে। এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নারীর মনোবাসনা ও অভিনয় নৈপুণ্য ধরা পড়ে যায়।

বারোমাসের বিবরণী পেশ করার পরেও যখন দেবী বলেন—“থাকিব দুজনে যদি না বাসহ লাজ।” তখন ফুল্লরার ক্রোধ ও অভিমান গিয়ে পড়ে কালকেতুর উপর—

পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।

কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।।

ফুল্লরা পুনরায় বলে—

বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটীর ঘরে শোভা পাইবে উর্বশী।।

বলাবাহুল্য, ফুল্লরার এই উক্তি তিরস্কার নয়, বরং এই বিদ্রুপ ভাষণের পেছনে রয়েছে অনুরাগ, চোখের জলে তার প্রমাণ রয়েছে।

৭

কবিকঙ্কণের আধুনিক মন ও জীবনবোধের গভীরতা গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের ধারায় তাকে সজীবতা দিয়েছে। এই সজীবতার মূলে রয়েছে কবিপ্রতিভার সুস্পষ্ট অনন্যতা, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের অবিস্মরণীয় বিশিষ্টতা। সমালোচক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> কাব্যটির আধার তৈরি হয়েছে দেবী চণ্ডীকে ঘিরে, আর আধেয় হচ্ছে সজীব বাঙ্গালীর গৃহ জীবন।...চণ্ডীমঙ্গলের আকর্ষণ কাব্যটিতে পরিব্যপ্ত বাঙ্গালীর জীবনরসের জন্যে। এখানেই মধ্যযুগের কবি হয়েও মুকুন্দ স্বতন্ত্র। এটি যে জীবনকে নানা কোণ থেকে দেখা যায়, জীবনের উন্নতাকে উপলব্ধি করা, রূঢ় বাস্তবতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করাএখানেই কবির আধুনিকতা।

আধুনিক জীবন দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। কবি মুকুন্দের কাব্যেও আধুনিক জীবন সুলভ নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিস্ময়, উৎকণ্ঠা কিংবা কৌতূহলের নিপুণ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। ছদ্মবেশী দেবীকে ঘিরে ফুল্লরা ও কালকেতুর মনে যে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি হয়েছে তাতে রয়েছে অভিনবত্ব। যেমন ফুল্লরার প্রতি চণ্ডীর উক্তি—

হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ যায়্যা বীরে।
যদি বীর বলে যাব স্থানান্তরে।।

আধুনিক জীবন-সমস্যার মতো সামাজিক সমস্যা মুকুন্দের কাব্যে জীবন্ত রূপ ধারণ করেছে। যেমন সতীন সমস্যা মধ্যযুগের একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যা, যা চিত্রিত হয়েছে কালকেতুর বক্তব্যে—

শাশুড়ি ননদি নাহি নাহি তোর সতা।
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা।।

পতি সোহাগিনী নারী ফুল্লরা স্বামীর কাছে নিজের অধিকার যখন আদায় করতে চায়, সে তখন কেবল মধ্যযুগের নারী হয়েই থাকে না, হয়ে যায় আধুনিক রমণী, যে সব কিছুর বিনিময়েও স্বামী-সোহাগে কাউকে অধিকার দিতে চায় না। সংসার দুঃখের হোক, সংসারে দারিদ্র যন্ত্রণা থাক, তাতে কোনো ক্ষতি নেই, যদি তার স্বামী একমাত্র ফুল্লরাকেই স্ত্রী বলে মনে করে। তাই ফুল্লরার বারোমাস্যার অংশটি কবিকঙ্কণের কাব্যে নিছক বারোমাসের দুঃখের পাঁচালী না হয়ে তা হয়ে উঠেছে আধুনিক নারী ফুল্লরার অনবদ্য আখ্যান—

স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার সে বিধাতা।
স্বামী যে পরম ধন। স্বামী বিনে অন্যজন
কেহ নহে সুখ মোক্ষ দাতা।।

মনস্তত্ত্ব-নির্ভর চরিত্রচিত্রণ কবিকঙ্কণের আধুনিকতার অন্যতম দিক। চরিত্রের আঁতের কথাকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কবিকঙ্কণ ধনপতির কাহিনি বয়নে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। পরিচিত চরিত্রসমূহ কবিকঙ্কণের প্রতিভাস্পর্শে অভিনব হয়ে উঠেছে। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সহানুভূতি ছিল বলেই কবি চরিত্রের মনের গহনে ডুব দিয়েছেন এবং চরিত্রগুলিকে জীবন্ত ও শাশ্বত রূপ দিতে পেরেছেন। তাই দুর্বলা দাসী যেমন রামায়ণের মন্থরার নব সংস্করণ আবার তেমনি আধুনিক যুগের ঠকচাচার দোসর, আর হীরা মালিনীর পূর্বসূরী। লহনাও জীবন্ত চরিত্র। বিগতযৌবনা বন্ধ্যা নারীর মনস্তত্ত্বকে যেভাবে লহনার মধ্যে কবিকঙ্কণ রূপ দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনব। খুল্লনার প্রেম-ভালোবাসা ধৈর্য সহনশীলতা যেভাবে চিত্রিত করেছেন তাতে খুল্লনা একজন অসহায় অত্যাচারিতা নারীর প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে উঠেছে। চণ্ডীর প্রতি খুল্লনার এই উক্তিতে এ কথা স্পষ্ট—

পুত্র বর চাব কিবা স্বামী নাহি ঘরে।
কি করিব ধন বহু আছয়ে ভান্ডারে।।

এখানে নারীর মর্মকথাটি অকপটে ব্যক্ত হয়েছে। সত্যিই তো নবপরিণীতা বধূর কাছে স্বামী নেই—এর চেয়ে বড়ো আক্ষেপ আর কী হতে পারে! তাই নারীর পুত্র বর কামনা, অলংকার কামনা তার কাছে নিরর্থক হয়ে পড়ে। সেজন্য খুল্লনা দেবীর কাছে যে বর চায় তার মধ্যে বাঙালি নারীর ঐকান্তিকতা, ভক্তি ও বিশ্বাসের কথাই ব্যক্ত হয়—

যদি বর দিবা মাতা সেবক বৎসলে।
অনুক্ষণ রহে মন তব পদতলে।।

ঔপন্যাসিক নৈর্ব্যক্তিকতা আধুনিক সাহিত্যের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা কবিকঙ্কণের কাব্যে বর্তমান। কবি নিজে জীবনে দুঃখ পেলেও কাব্যে তার কোনো দুঃখবাদের পরিচয় নেই। কবিও দুঃখবাদী নন। খুল্লনার ছাগ চরানোকে কেন্দ্র করে খুল্লনার যে রূপ এঁকেছেন তাতে কবির নৈর্ব্যক্তিকতা স্পষ্ট। যেমন—

চোরা ছাগল সব চারিদিকে ধায়।
কুটিল কুশের কাঁটা রক্ত পড়ে পায়।।

কিংবা খুল্লনার উপর লহনার অত্যাচার বর্ণনায় কবির নিরাসক্ত চিত্তের পরিচয়—

দুঃখে না ভুঞ্জয়ে রামা চক্ষে বহে জল।
কোপেতে লহনা চক্ষু করিল পাকল।।

লহনার অত্যাচার চরমে উঠলেও খুল্লনা নির্বিকার, তদ্‌গত চিত্ত। তাই—

হৃদে বিষ মুখে মধু পাপ মতি বাঁঝি।/অবশেষে বড়ো সরা ভরে দিল কাঁজি।।/কিছু খায় কিছু ফেলে খুল্লনা সুন্দরী।/তৃণের শয্যায় তার গেল বিভাবরী।।

এই বর্ণনার মধ্যে একদিকে যেমন অসহায়া রমণীর করুণ রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি জীবন রসিক কবির উপলব্ধি গভীরতা তথা নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিও পাঠকের কাছে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং, কবিকঙ্কণ মধ্যযুগে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। তাই দেব-মাহাত্মমূলক কাব্য রচনা করতে বসেও কাব্যের মধ্যে অভিনবত্ব তথা আধুনিকতার পরিচয় রাখতে সক্ষম হয়েছেন এবং মঙ্গালকাব্যের ধারায় শ্রেষ্ঠ কবির আসনটি অনায়াস অধিকার করেছেন।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর অভিনবত্বের কথা বলতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন—

> মানব চরিত্র সম্পর্কে মুকুন্দরামের যে সুগভীর ও সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহা অভিনব। এই জন্যই তাঁর কাব্যের মধ্যে সুপরিণত চরিত্রসৃষ্টি সার্থক হইয়াছে।

সত্যই মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের বাস্তব রস জীবনানুভূতি, চরিত্রচিত্রণ ও সমাজচিত্রণ এত সার্থকতা মণ্ডিত হয়েছে যে এই বৈশিষ্ট্যগুলিই তাঁকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দিয়েছে। নারী চরিত্রের অভিনবত্বের কথা বলতে গিয়ে হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন—"নারী চরিত্রগুলি প্রায় সবই সুঅঙ্কিত হয়েছে। ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনা, দুর্বলা দাসী ফুল্লরার সখী বিমলা ও লহনার সখী লীলাবতী কেউই অস্পষ্ট নয় কেউই গতানুগতিক নয়। খুল্লনার জননী রম্ভাবতী চিরন্তনী বাঙালি জননী।" এই চরিত্রগুলির অন্তঃকরণের সুগভীর তলদেশ পর্যন্ত কবি দক্ষতার সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। দু-একটি ভদ্র চরিত্র ছাড়া বাকি চরিত্রগুলি সবই কবির সহানুভূতির জীয়নকাঠির স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

তথ্যের সন্ধানে

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬৪

২. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারা', হাউস অব বুকস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৫৭

৩. সুকুমার সেন : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯১

৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা.লি, কলকাতা, নতুন সংস্করণ : ২০০৬-০৭

৫. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত : 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (প্রথম ভাগ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, নূতন সংস্করণ, আগস্ট ১৯৫২

৬. দেবকুমার ঘোষ সম্পাদিত : 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' (ব্যাধ-খণ্ড), শিলালিপি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন, ২০০০

৭. দেবেশকুমার আচার্য সম্পাদিত : 'কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গাল' (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সঙ্গী-বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৬-০৭

৮. তদেব : দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সঙ্গী কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০০০

৯. সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : 'চণ্ডীমঙ্গাল পরিক্রমা' (প্রথম খণ্ড), প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ : জুলাই, ২০০৬

১০. সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত : 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' (কালকেতু পালা), তৃতীয় সংস্করণ, রত্নাবলী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১৩

চৈতন্য চরণ পালের পদ্মাপুরাণ সংগ্রহ : আঞ্চলিক সংস্কৃতির আলোকে

বুবুল শর্মা

চৈতন্য চরণ পালের 'পদ্মাপুরাণ সংগ্রহ' একটি সংকলিত গ্রন্থ। গ্রন্থ সংকলনে শ্রীহট্টের ষষ্ঠীবর দত্ত, নারায়ণ দেব, জগন্নাথ, দ্বিজ বংশীদাস, গোবিন্দদাস, জানকীনাথ, দ্বিজকৃষ্ণ প্রমুখ কবিদের কিছু উৎকৃষ্ট পদ এবং গায়ক কবি চৈতন্য চরণ পালের নিজস্ব কিছু রচনা নিয়েই এই সংকলনটি সম্পন্ন হয়েছে। আমরা জানি অঞ্চল বিশেষে পদ্মাপুরাণ গায়করা পর্যায়ভিত্তিক কিছু পদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। জনপ্রিয় কয়েকজন পদ্মাপুরাণ রচয়িতার বিশেষ কিছু পদে সংকলকরা নিজস্ব ভঙ্গিমার পরিচয় দেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়—

> প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণ সর্বদাই বিশিষ্ট কোন কবির আনুপূর্বিক রচনাযুক্ত পুঁথিরই সন্ধান করিয়া থাকেন এই সকল পুঁথির উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গায়েনদিগের (Traditional Musician) মধ্যে এই প্রকার পুঁথির প্রচলন ছিল না। গায়েনগণ যে অঞ্চলে মনসামঙ্গল গান করিতেন, সেই অঞ্চলের বিভিন্ন কবির রচনা একত্র করিয়া একটি সংকলন সম্পাদন করিয়া লইতেন, ইহাতে যে কবির যে অংশ সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইত, সেই কবির সেই অংশই সংকলিত হইত। এইভাবে বহু কবির রচনা একত্র করিয়া এক একটি পুঁথি গ্রথিত হইত। (সূত্র : ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ. ক,৬১)

এই হিসেবে চৈতন্য চরণ পালের 'পদ্মা-পুরাণ সংগ্রহ' একটি সংকলিত গ্রন্থ। উক্ত সংকলন গ্রন্থটি দেবখণ্ড ও বানিয়াখণ্ড নামে দুটি ভাগে বিভক্ত। নিজের আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে গ্রন্থের দেবখণ্ডের অন্তর্গত 'সূত্রবন্ধন' অংশে তিনি বলেছেন—

> পুরুষের কীট বলি না করি ঘৃণা।
> অধীন চৈতন্য মাগে সবার করুণা।।
> ক্ষুদ্র নবদ্বীপ বটে পঞ্চখণ্ড স্থান।
> লক্ষীসহ বাসুদেব সদা অধিষ্ঠান।।
> পো.আ. বিয়ানীবাজার খাসা নামে গ্রাম।
> প্রকাশিত দিঘীর পার শ্রীচৈতন্য নাম।।
> (সূত্র : পাল চৈতন্য চরণ, পদ্মা- পুরাণ সংগ্রহ, প্রকাশক-student's লাইব্রেরী, করিমগঞ্জ, আসাম, পঞ্চম প্রকাশ, পৃ. ৮; 'পদ্মাপুরাণ সংগ্রহে'র প্রত্যেকটি উদ্ধৃতি এবার থেকে আমরা শুধু পৃষ্ঠা উল্লেখ করব)

সংকলন কর্মের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'আমি আমার ওস্তাদ ভট্টশ্রী নিবাসী স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ পাল (বদি উঝা) মহোদয়ের নিকট হইতে যৎসামান্য যাহা শিক্ষা করিয়াছি এবং কুলাউড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ রাজবংশের উজ্জলরত্ন স্বর্গীয় ভৈরব চন্দ্র রায়, বারহাল নিবাসী স্বর্গীয় দুর্লভ নারায়ণ পাল ও বড়লেখা নিবাসী শ্রীলালচাঁদ পাল প্রভৃতি পূর্ব খ্যাতনামা ওস্তাদগণ হইতে যে উপদেশাদি পাইয়াছি তদনুযায়ী ষষ্ঠীবর, বংশীদাস, কালীচরণ,জগন্নাথ প্রভৃতি বড়ো বড়ো কবির রচিত পদ্মাপুরাণ হইতে সরসপূর্ণ অংশগ্রহণ ক্রমে নতুনভাবে একখানা পদ্মাপুরাণ ছাপাইবার অভিপ্রায় বহুদিন পূর্ব হইতে মনে পোষণ করিতেছিলাম; কারণ কালক্রমে ইহা প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। আমি বহু পরিশ্রম স্বীকার করত নানা স্থান হইতে প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ করিয়া নতুনভাবে দেশীয় ভাষায় দিশা ও পুরাতন গায়কগণের মালসীগান যোজনা করিয়া 'পদ্মাপুরাণ সংগ্রহ' নামে গ্রন্থখানা প্রকাশ করিলাম।' (পৃ. ভূমিকা অংশ)

চৈতন্য চরণ পালের মূল বাসস্থান শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ডের অন্তর্গত বিয়ানীবাজার গ্রামে। গ্রামটি করিমগঞ্জ সাবডিভিশনের এলাকাভুক্ত। পরবর্তীতে কবি বাসস্থান পরিবর্তন করে পাকাপাকিভাবে বসতি গড়েন একই সাবডিভিশনের অন্তর্গত নিলাম বাজারের 'ঈশ্বরশ্রী' গ্রামে। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটি প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পায়। গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার জন্য পরবর্তীতে আরও পাঁচবার প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি এতই জনপ্রিয় ছিল যে, করিমগঞ্জ সাবডিভিশনের অন্তর্গত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ঠাকুর ঘরে লাল শালু কাপড়ে মোড়া বস্তনিতে শোভা পেত চৈতন্য চরণ পালের 'পদ্মাপুরাণ সংগ্রহ'। গ্রন্থটি কাঠের রয়েলে রেখে পাঠ করা হতো অত্যন্ত ভক্তি সহকারে। দেশভাগের ফলে কবির পূর্ব নিবাস চলে যায় পূর্বপাকিস্তানে, আর সাড়ে তিন থানাসহ করিমগঞ্জ সাবডিভিশন ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে করিমগঞ্জ আসাম রাজ্যের একটি জেলাতে রূপান্তরিত হয়। আমরা জানি ১৯৪৭ সালের দেশভাগের ফলে সিলেট জেলার অধিকাংশ অংশই চলে যায় পূর্বপাকিস্তানে। সুরমা উপত্যকার এপারে থাকা আসামের তিনটি প্রশাসনিক জেলাই (কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি) বর্তমানে বরাক উপত্যকা নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে বিভাগপূর্ব সিলেট ও বর্তমান বরাক উপত্যকা স্মরণাতীত কাল থেকেই একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক জগতের বাসিন্দা।

২

আনন্দ উৎসব পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের এক বিশেষ অঙ্গ, এরমধ্যে বাঙালি জাতি উৎসবের দিক থেকে প্রথম সারিতে থাকবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। উৎসব বাঙ্গালিদের জীবনের একটা অংশ মাত্র নয়, বরং বলা যেতে পারে বাঙ্গালিদের জীবনটাই উৎসবের একটা অঙ্গ। বাঙ্গালিদের জন্য একটা কথা প্রচলিত আছে, 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'। বিভিন্ন পূজার মধ্যে বাঙ্গালিদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ববৃহৎ উৎসব দুর্গাপূজা। আর দুর্গাপূজার পরেই জনপ্রিয় উৎসব মনসা পূজা। এই অঞ্চলের জনমানসে দেবী মনসা অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি মূলত ধনের, সর্পের এবং বিষ হরণকারী দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বরাক উপত্যকায় পদ্মাপুরাণ গানের তিনটি রীতি প্রচলিত। ১. শ্রাবণ মাস এলেই ঠাকুর ঘরে লাল শালু কাপড়ে মোড়া চৈতন্য চরণ পালের 'পদ্মপুরাণ সংগ্রহ' কিংবা দ্বিজ বংশীদাসের 'পদ্মাপুরাণ' পাঠ করার রেওয়াজ এখনো আছে। সমগ্র শ্রাবণ মাস ধরে পুরুষ এবং মহিলা এক নির্দিষ্ট সুরে পদ্মপুরাণ গান গেয়ে থাকেন। এই গানে কোনো বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয় না। শ্রাবণ মাসের এক তারিখ থেকে পদ্মাপুরাণ গান শুরু করে একটু একটু করে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন পুজো দিয়ে (শ্রাবণী পূজা) সম্পূর্ণ পদ্মাপুরাণ পালা শেষ করা হয়।২. সমগ্র শ্রাবণ

মাস ধরে নারী পুরুষ একত্রে বসে সমবেত কণ্ঠে এক নির্দিষ্ট সুরে, তালে পদ্মপুরাণ গান করেন। গানের সঙ্গে কোথাও কোথাও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ৩. এই রীতি অনেকটা নাটকের মত, তাতে কীর্তন গানের মতো একজন মূল গায়ক থাকেন আর, অন্যরা তার দোহার হিসেবে পদগুলি আবৃত্তি করেন। অনেক সময় দোহার শুধু একটিমাত্র দিশা আবৃত্তি করেন, যা মূল পদের রসানুযায়ী হয়ে থাকে। শ্রাবণ মাসের সন্ধ্যায় নারী পুরুষ মিলে পদ্মাপুরাণ পাঠ করার রেওয়াজ আজও আছে। বরাক উপত্যকার বহু গ্রামাঞ্চলে রয়েছেন ওঝা বায়েন আর দোহারের দল। মূল গায়ক (ওঝা) বিশেষ ধরনের পোশাক পরে দুই হাতে চামর দুলিয়ে গান গেয়ে গেয়ে পদ্মপুরাণ পালাটি উপস্থাপিত করেন। সঙ্গে থাকেন দোহারের দল। এই নৃত্যের নাম 'গুরমার গান' বা 'ওঝা'র গান। গুরমা ঔপভাষিক শব্দ অর্থাৎ নপুংসক। কোনো এক সময়ে শুধুমাত্র নপুংসকরাই মনসামঙ্গালের গান করতেন।

৩

বিভিন্ন দিক থেকে বরাক উপত্যকার স্বাতন্ত্র্যতার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। মানুষের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে বেঁচে থাকার কর্মপ্রচেষ্টা থেকে। জল-হাওয়া-রোদে পুষ্ট এই অঞ্চলের মানুষ কর্মকে লাঘব করার আপ্রাণ চেস্টা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন পাল- পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠানের সঙ্গে অসংখ্য লোকাচারের। 'পদ্মাপুরাণ সংগ্রহে' প্রচুর লোকাচারের তথ্য আছে। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, নামকরণ, পিণ্ডদান, ব্রতোৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সিলেটে প্রচলিত লোকাচারের প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়। শ্রীহট্ট অঞ্চলে 'ষষ্ঠী পূজা' বা ষষ্ঠী ব্রত সন্তান জন্মের পর ছয় দিনের দিন পালিত হয়। চৈতন্য চরণ পালের 'পদ্মাপুরাণ সংগ্রহে' মনসার জন্মের পর ষষ্ঠী পূজা এবং নামকরণের অনুষ্ঠান পালন করতে আমরা লক্ষ করেছি—

১. জাত কর্মে ষষ্ঠী পূজা কৈল তপধন।
ব্রম্মা আসিলা আর দেব নারায়ণ।। (পৃ. ৭২)
২. দেবতা গন্ধর্ব সব আসিলেক পুনি।
সেইকালে করিলেক নামকরণী।
দেখিয়া সন্তুস্ট হইলা দেব ত্রিপুরারি।। (পৃ. ২৬)

সিলেটি বাঙালি হিন্দু জনজাতিদের জীবনে বিবাহকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানটি বহু লোকাচার ও লোকবিশ্বাসে সমৃদ্ধ। বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পালিত হয় নানা ক্রিয়াকর্ম এবং স্ত্রী আচার। 'পদ্মাপুরাণ সংগ্রহে' বিবাহকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে স্ত্রী আচারের পাশাপাশি নানা লোকাচারও পালিত হয়েছে। যেমন—বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করা, ছেলের আশীর্বাদ, মঙ্গালাচরণ, পানখিলি, অধিবাস, জলভরা, আদ্রিস্নান, সোহাগ মাগা, জামাই সাজানি, কন্যা সাজানি, জামাই বরণ, দধি মঙ্গাল, মূল বিবাহ পর্ব (সাত পাক, মালা বদল, মুখচণ্ডিকা) ইত্যাদি। এই অঞ্চলে সম্বন্ধ বিচার পর্বকে বলা হয় 'জুড়ুনী'। কন্যার বাড়িতে পাত্র পক্ষের লোকজন গিয়ে 'বাক্যদানে'র মাধ্যমে সম্বন্ধ স্থির করা হয়। লক্ষিন্দরের পিতা চন্দ্রধরও তাই করেছেন—

কূলে শীলে যোগ্য ঘর যেন কন্যা তেন বর
কার্য নাহি আর বিচারিয়া।।
বিলম্বের নাহি কাজ হস্তী ঘোড়া করো সাজ
যাব আমি বধুরে জুড়ুনী।। (পৃ. ১১৭)

সিলেট অঞ্চলে বিবাহকেন্দ্রিক 'জলভরা' একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। বিবাহ অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন শুভানুষ্ঠানে 'জলভরা' অনুষ্ঠান পালিত হয়। সিলেট অঞ্চলে পানখিলির পর বিয়ের আগের দিন

বিকেলে শুভ সময়ে বর-বধূকে গায়ে হলুদ মাখিয়ে স্নান করানোর রীতি আছে। বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বর-বধূকে স্নান করানোর প্রক্রিয়ায় স্ত্রী-আচারের একটি বিস্তৃত পর্ব আছে। অধিবাসের দিন পাত্র-পাত্রীর বাড়িতে সারারাত ধরে সিলেট অঞ্চলের জনপ্রিয় 'ধামাইল' লোকনৃত্যের মাধ্যমে পালিত হয়। এই রীতিটি চৈতন্য চরণ পালের 'পদ্মাপুরাণ সংগ্রহে' পরিলক্ষিত হয় এইভাবে—

১. কি আনন্দময়, মিলিলা সকল নারী লোকে।
কেহ নাচে কেহ গায়ে জল ভরিতে যায়,
লক্ষ্মীধরের বিয়ার কৌতুকে।।

২. তৈল ঘিলা দিয়া লখাইরে, করিলা নির্মল।
বিয়াল্লিশ ঘড়ায় আনে সুবাসিত জল।।
কালী, গৌরী, শ্যামলা, পিঙ্গালা বর্ণা নারী।
স্নান করাইলা সবে হস্তে লইয়া ঝারী।। (পৃ. ১০৫)

সিলেট অঞ্চলে বিয়ের দিনে প্রথমেই যে অনুষ্ঠানটি করা হয় তা হল নান্দীমুখ (আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ)। এই অনুষ্ঠানটির তথ্য চৈতন্য চরণের কাব্যে পাওয়া যায়—

মায়ে পুত্র যত ইতি কহিলা কাহিনী।
লড় লড় করিয়া লড়িলা শিরোমণি।।
নান্দীমুখ করে রাজা দ্বিজগণ লইয়া।...
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নৈবেদ্য প্রমাণ।
শাস্ত্র অনুসারে করে নরপিণ্ড দান।। (পৃ. ১০৫/১০৬)

তারপরে আসে, স্ত্রী-আচারের আরেকটি অনুষ্ঠান 'সোহাগ মাগা'। বিয়ের দিন বিকেলে কনের মা অথবা মাতৃস্থানীয়া কেউ সোহাগ মাগা পর্বটি পালন করেন। যিনি সুহাগ মাগবেন তার শাড়ির কোণে একটি আগাছা (আঞ্চলিক ভাষায় হেইছা গাছ) এমন ভাবে বেঁধে দেওয়া হয় যাতে তিনি হাঁটার সময় ওই আগাছাটি মাটি ছুঁয়ে যায়। ওই আগাছার সাথে বাঁধা থাকে ধান-দূর্বা, টাকা-কড়ি, কাঁচা হলুদ, সরিষা ইত্যাদি। মাথায় কুলা (বেতের এক ধরনের ঝুড়ি) থাকে অর্ধেক ঢাকা অবস্থায়, সামনে একটা জ্বলন্ত প্রদীপ থাকে। তারপর অন্যান্য নারীগণের সাথে কনের মা গান গাইতে গাইতে যে-কোনো পাঁচ প্রতিবেশীর বাড়িতে ঢুকে মাথা থেকে কুলা নামিয়ে রেখে হাত দিয়ে বিচিত্র মুদ্রার ভঙ্গিতে সোহাগ মাগেন। স্ত্রী-আচারের এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি চৈতন্য চরণের কাব্যে লক্ষ করা যায় এইভাবে—

১. গৌরীর বিবাহে—

ডালার উপর মঙ্গাল ঘটি, খাসা চাউল গুটি গুটি
সোহাগ লয় মঙ্গাল জুকারে।।
এই মতো পরিপাটি, চারিধারে যত বাটি,
সোহাগ সাধিল সুবদনী।। (পৃ. ১৮)

২. বেহুলার বিবাহে—

পাটের আঁচলখানি লুটাইতে লুটাইতে।
ব্রাহ্মণের নগরে গেলা সোহাগ সাধিতে।। (পৃ. ১১০)

বিবাহ উপলক্ষ্যে সিলেট অঞ্চলে বরের মুকুটে 'শেওরা' বন্ধন এবং দধিমঙ্গাল একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। চৈতন্য চরণের কাব্যে লক্ষিন্দরের বিবাহে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি এইভাবে পাওয়া যায়—

যতনে আনিয়া শেওরা শ্রীধর ব্রাহ্মণ।
মুকুটে বান্ধিয়া দিল করিয়া যতন।।
অধীন চৈতন্য গায় পদ্মার চরণ।
দধিমঙ্গাল করিবারে আইলা নারীগণ।। (পৃ. ১১১)

৪

লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ প্রবাদ। প্রবাদ প্রবচনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটা জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতার নির্যাস। সিলেট অঞ্চলের প্রবাদ-প্রবচনে রয়েছে বহু বছরের সঞ্চিত লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য। প্রবাদগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সিলেট অঞ্চলের বাঙালির সুখ-দুঃখ, দৈনন্দিন সংসারের নানা খুঁটিনাটি, ঘরকন্না আর সমাজজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সারৎসার। সিলেটি প্রবাদগুলো মুখে বলা যতটা সহজ, প্রচলিত বাংলায় লেখা কিন্তু অনেক কঠিন কাজ। সিলেট অঞ্চলের প্রবাদের প্রাথমিক রূপ গ্রাম্য ভাষায় এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন—লোকায়ত জীবনের নানা ঘটনা প্রবাহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনধারণ শৈলী, রসবোধ ইত্যাদি। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত সমাজের নানা চিত্রও ধরা পড়ে প্রবাদগুলির মধ্যে। চৈতন্য চরণ পালের 'পদ্মাপুরাণ সংগ্রহে' এই সিলেট অঞ্চলের প্রবাদের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়—

১. লোমে চোমে বুম্বা যেমন দশমীর বুড়া (পৃ. ১৮)
প্রসঙ্গা-কথা : বিসর্জনের উপযুক্ত/দৃষ্টিকটু।
২. আনা চীনে চিন যেন দশমীর বুড়া। (পৃ. ১৫৫)
প্রসঙ্গা-কথা : বিসর্জনের উপযুক্ত/দৃষ্টিকটু।
৩. গলায় ধরি কান্দে বুড়ায় ছলায় ধরি টানে। (পৃ. ৭৭)
প্রসঙ্গা-কথা : অতি ধূর্ত এবং লোভী মানুষ।
৪. কাকের মুখে দেখি সোনার কুমড়া। (পৃ. ২৯)
প্রসঙ্গা কথা : অনুপযুক্ত ব্যক্তি, অপাত্রের ধন প্রাপ্তি বুঝাতে।
৫. বৃদ্ধ কাকের মুখে দিলা পাকনা আম। (পৃ. ২৯)
প্রসঙ্গা কথা : অপাত্রে দান, অনুপযুক্ত।
৬. হাকিম হইয়া হুকুম দাও পেদা হইয়া মার। (পৃ. ৩০)
প্রসঙ্গা-কথা : বিশ্বাসঘাতক।
৭. তুষের অনলে যেন সর্ব অঙ্গা দহে। (পৃ. ১৩৭)
প্রসঙ্গা-কথা : দীর্ঘসূত্রী আঘাত।

৫

চৈতন্য চরণ পালের 'পদ্মাপুরাণ সংগ্রহ' সংকলিত গ্রন্থ হলেও সিলেটের আঞ্চলিক কথ্য ভাষার রীতিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গো তাঁর বক্তব্য'—

> এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে অতি প্রাচীন ভাষা পূর্বে যাহা প্রচলিত ছিল এখন তন্মধ্যে অনেক শব্দের ব্যবহার লুপ্ত হওয়ায় তাহার অর্থ বোধ হয় না। অভিধানের আশ্রয় লইয়া সেই সকল শব্দের অর্থ অধিগত হওয়া দুষ্কর এবং অনেক স্থলে পয়ার হ্রস্ব-দীর্ঘ ও অমিত্রাক্ষর অথবা মিত্রাক্ষর রক্ষার জন্য অব্যবহৃত শব্দ যাহা ছিল স্থানে স্থানে তাহার পরিবর্তনাদি ক্রমে নব্য শিক্ষিতগণের বুঝিবার জন্য নতুনভাবে সংযোজিত করিয়া দিয়াছি।' (পৃ. ভূমিকা অংশ)

সিলেটি কথ্যভাষার বিপুল শব্দভাণ্ডারের অনেক শব্দই কাব্য মধ্যে স্থান পেয়েছে। সিলেটি কথ্যভাষার প্রয়োগের ফলে কাব্যটি সিলেটের আঞ্চলিক পরিচিতি প্রধান করে। চৈতন্য চরণ তাঁর

মনের ভাবনা স্বাভাবিক ভাবেই সিলেটি শব্দ দিয়ে লিখেছেন। বলা যেতে পারে, সিলেটি শব্দ ব্যবহারের ফলে কাব্যটি আলাদা একটা উৎকর্ষতা লাভ করেছে। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করব—

১. বুড়া বেটা সদাশিব শ্মশানেতে খেলা।
আর কত কহিব কন্যা ধাঙ্গড় বুড়ার লীলা। পৃ. ১৪
(ধাঙ্গড়—অন্ত্যজ ব্যক্তি/ নিচু সম্প্রদায়)

২. পাটের ফেউসের মতন মুখে পাখনা দাড়ি।
হাতে পায়ে নখ গেছে কুদালের মত বাড়ি।। পৃ. ১৫
(ফেউস—পাট গাছের আঁশ)

৩. আফুটা আমড়ার জড় বাদুরের লুলি।
দানা চাচানীর জড় ছলাকাকের ঝুলি।। পৃ. ১৫
(আফুটা—অফুটন্ত, লুলি—গলার নালী)

৪. অঞ্জলি করিয়া দিও শিবের লাগাইয়া।
ভক্কা অইয়া চাইয়া রৈব পেচার থাবা খাইয়া।। পৃ. ১৫
(ভক্কা—বোকা, চাইয়া—দেখে)

৫. কাশ্যপে বলয়ে শুন কদ্রু সুন্দরী।
এই কন্যা নিবা তুমি পাতহ আতুরি।। পৃ. ২৬
(আতুরি—আঁতুড় ঘর)

৬. মূলমন্ত্র পাইয়া যদি বিষ নষ্ট হইলো।
হালুয়ার পুত্র বছাই বর্তিয়া উঠিল।। পৃ. ৩০
(হালুয়া—হাল চাষ করে যে)

৭. শুনিয়া যে মালতিয়ে চুল না বান্ধিল।
ধাইয়া আসি মরা পুত্র কোলে তুলে লইল।। পৃ. ৩০
(ধাইয়া—ধেয়ে আসা, তাড়াতাড়ি)

৮. তোর মত নাহি আমি পথিক ঢেমনী।
পর্বত রাজার কন্যা আমি সে ভবানী।। পৃ. ৩৩
(ঢেমনি—বিনা কাজে যে ঘোরাফেরা করে)

৯. এত শুনি কোপ করি কহিল চণ্ডিকা।
আর তোর আছে খুটা শুন তার লেখা।। পৃ. ৩৩
(খুটা—অপবাদ, দোষারোপ করা)

১০. এই মতে দুইজন করে যে ঝগড়া।
চুল আউলাইয়া দুহে নাহি পিন্দে কাপড়া।। পৃ. ৩৩
(আউলাইয়া—এলোমেলো)

১১. যখন মনেতে লয় সেঙ্গা বসিবার।
আমারে ছাড়িয়া যায় দিনে তিনবার।। পৃ. ৬৮
(সেঙ্গা—অস্বীকৃত যৌন মিলন/দ্বিতীয় বিবাহ)

১২. এতেক শুনিয়া জয় বিষহরী।
কুড়ুলা স্রোতের পাকে লাউ নিলা হরি।। পৃ. ৮৬
(কুড়ুলা—ঘূর্ণি)

তাছাড়া কাব্য মধ্যে শ্রীহট্টের আঞ্চলিক কিছু শব্দাবলি উক্ত অঞ্চলের ভৌগলিক পরিচয় প্রধান করে। উদাহরণ স্বরূপ : শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে—আউয়া (বোকা), কাউয়া (কাক)। দ্বিত্ব ব্যঞ্জনধ্বনি—তাইন (তিনি), আইছইন (এসেছেন)। সিলেট অঞ্চলের উপভাষায় মধ্যম ও নাম পুরুষে সম্মান জানিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় বাংলা 'উক' প্রত্যয় আকার যুক্ত হয়ে 'উকা' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (উজানির লোকে দেখউকা তোমার মুখ) দেখউকা : দেখবে। 'নি', 'কেনে' ইত্যাদি বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের বাকরীতি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যেমন—'ও তুই পারবে নি রে চান্দের লখাই।' রাজা বলে এই কথা মোরে জিজ্ঞেস কেনে।' সম্মানার্থক শব্দ 'তান' সর্বনামের প্রয়োগ কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত সর্বনামের এই সম্ভ্রমসূচক শব্দ শুধুমাত্র কথ্য ভাষার বৈশিষ্ট্য শুধু নয় সিলেট ও বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যেরও পরিচায়ক। যেমন—

সাহে রাজা বলে কেন থাক উপবাস।
যে মত অভীষ্ট তান পুরাইমু আশ।।

সিলেট অঞ্চলের 'সর্বনাম' জগৎ বিখ্যাত, যেমন—ইগু (এটা), হগু (ওইটা), ওগু (ওটা), কিগু (কোনটা) ইত্যাদি। সিলেটি কথ্য ভাষায় নাম পুরুষবাচক একবচনে—হে/তাইন, বহুবচনে—হেরা/তাইন তাইন। যেমন—'তাইন আইলা বিষহরি প্রণাম কর তানে। তাছাড়া অনুপদ হিসেবে পাওয়া যায় 'গোটা (একটা), গুইট (অনেকটা), আবার কখনো কখনো মাঝে একটি 'ক' জুড়ে হয়—ইকটা (ঐইটা), হিকটা (ওইটা), হকটা (ওটাই)। তাছাড়া, 'পদ্মাপুরাণ সংগ্রহে' পয়ার ও লাচাড়ির মধ্যে সিলেট অঞ্চলের কথ্য ভাষার প্রচুর শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়ে চৈতন্য চরণ পাল গ্রন্থটির আঞ্চলিক গুরুত্ব বর্ধিত করেছেন। যেমন—

* আই—মা
* বিচারিয়া—অনুসন্ধান করে
* লড়বড়—নড়েচড়ে
* পাকনা—পাকা
* ঝিয়ারি—কন্যা
* ইতা—এই সমস্ত
* আগুবাড়ি—এগিয়ে আসা
* আউলাইলো—এলোমেলো
* ঠাঠা—বজ্রপাত/অভিশাপ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।
* ইচামাছ—চিংড়ি মাছ
* বুন্দা—আটি
* আটকুড়া—নিঃসন্তান
* উবা—দাঁড়ানো/উর্ধ্বে
* ফেফরা—অনমনীয়
* ভুরা—ভেলা
* ছাবাল—শিশু
* বরি—বরশি
* উদলা—খালি গা

* ডেউয়া—এক ধরনের শাল গাছ বীচ বিশেষ
* ঘিলাচাকি—গোল চাকতি বিশেষ
* গাইলে—গালি দেওয়া
* করণ্ডি—বাঁশের তৈরি ঝুড়ি
* বিছনি—হাতপাখা
* ইছা রাঙ্গা—পূর্ণপক্ক নয়
* ফাফর—শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম
* লেঙ্গুড়—লেজ
* উবা—দাঁড়ানো
* সাতাইর—সাঁতার দেওয়া
* ডর—ভয় ইত্যাদি।

সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত স্ত্রী-আচার, বিভিন্ন লোকাচার, লোক খাদ্য, নারীশিক্ষার প্রসঙ্গও চৈতন্য চরণ উল্লেখ করেছেন, তাছাড়া লোক চিকিৎসার নানা পদ্ধতিও আমরা কাব্য মধ্যে পেয়ে থাকি। উদাহরণ স্বরূপ—চাঁদ সদাগরের হেমতালের আঘাতে যখন মনসার কোমর ভাঙ্গে, তখন লবণ সেকের মাধ্যমে তার আরোগ্য লাভ হয়। 'লবণ সেক দিয়া তাইর কাকাইল কৈল্ল ধড়ি।' পৃ. ৯৮ (কাকাইল-কোমর, কৈল্ল—করল, ধড়ি—শক্ত)। দধি, নারিকেল, লালিতা পাতা, পান্তা ভাত, দুধের ননী খেয়ে জ্বরের উপশম হয় তার পদ্ধতিও কাব্য মধ্যে উল্লেখ আছে।

নারদ বলে ওগো ভগ্নি জ্বরের ঔষধ আমি জানি,
খাও গো ভইন দধি নারিকেল।
আর ঔষধ আমি জানি শুনো ওগো ভগিনী
যদি তুমি আনিয়া মিলাও।
কাঁচা নালিতা পাতে, ছেচিয়া দিও মাথেতে
পানিভাত বিয়ানে যদি খাও।
কাঁচা দুধের কাঁচা ননী তারে যদি জানো তুমি
যদি খাও প্রভাত সময়।
জ্বর হবে পরম্মুখ,অঙ্গোতে পাইবায় সুখ। পৃ. ১৬৬

সিলেটি মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গো যাদের পরিচয় আছে, তারা অনায়াসেই বুঝতে পারবেন উপরে উল্লিখিত বাক্ভঙ্গি, বাক্য গঠন ও শব্দ গুলির সঙ্গো এই অঞ্চলের মানুষের কত ঘনিষ্ঠতা। এখনেও সিলেট ও বরাক উপত্যকার গ্রামের মানুষের কথায় কান পাতলে এসব নানা শব্দ ও বাক্ভঙ্গি শোনা যায়। অনেক সময় প্রচলিত শব্দটি ব্যবহার না করে এর মার্জিত শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। দর্শক শ্রোতার বিনোদন বা মনোরঞ্জনে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন পছন্দ থাকে, তাই প্রদর্শিত 'পদ্মপুরাণ সংগ্রহে' চৈতন্য চরণ সমকালীনতার উপর লক্ষ রেখেই বিষয়ের উপর স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়েছেন। ভগবত মনসার লাগি' তিনি গান লিখতেন, গান গাইতেন, গান সংগ্রহও করতেন। তিনি সিলেট অঞ্চলের নামকরা পদ্মাপুরাণ গায়ক (ওঝা)। পদ্মাপুরাণ সংগ্রহ বিশেষ করে বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলায় ব্যাপক হারে শ্রাবণ মাসে গীত হয়ে থাকে। তার জনপ্রিয়তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে সমকালীনতা ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি।